শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধুত প্রতিষ্ঠিত

CALCUTTA UNIVERSITY

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল

7
026/9

ফাল্গুন ১৮-৮-৭, ১৩৭৩, সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র ২০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

গঠন কর্ম পদ্ধতি—মহাত্মাজীর এই দুইটির উপরে শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমানন্দ-লিখিত ব্যাখ্যা-পুস্তকখানির একটি সমালোচনা বিগত ৫ই মার্চ ১৯৬৭ রবিবারের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। গান্ধিজী প্রস্তাবিত কর্ম-গুলি যে নিছক কর্মই নহে, তাহা যে একটি শাসন-শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করিতেছে, তাহা যে প্রাচ্যের ভাবাদর্শ ও পাশ্চাত্ত্যের কর্মাদর্শকে একটি বৃহত্তর সমন্বয়ে মিলাইবার প্রচেষ্টা—সমালোচক সে কথাটী সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন দৈনিক পত্রিকা তাহার নির্দিষ্ট দিনটীতে যেমন অপরিহার্য, তেমনি বাসী হইয়া গেলে বাঙ্গালীর ঘরে তাহার স্থান ও মর্যাদা কতটুকু তাহা কাহারও অজানা নাই। অথচ ত্রৈমাসিকপোপাল শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ-প্রবর্তিত চিন্তাধারার অভিনবত্ব একজন নূতন পাঠকের দৃষ্টিতে কেমন সুন্দরভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে! ইহা রক্ষা করিবার মত বস্তু। তাই কালের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য উক্ত সমালোচনাটি এই খানে প্রকাশ করিলাম।

...স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রণীত মহাত্মাজীর গঠনকর্ম পদ্ধতি বইটী বিশাল বিশ্বের পটে গান্ধীবাদের মূল্য ও যাথার্থ্য যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে তার একটি বিরল প্রমাণ। বইটির নাম শুনে মনে হতে পারে যে এটি গান্ধীবাদ প্রচারমূলক একটি মামুলি গ্রন্থ, কিন্তু পড়া শুরু করলে সন্দেহ থাকে না এটি এক অপূর্ব জ্ঞানের বই, পড়তে পড়তে লেখকের বক্তব্য সম্বন্ধে আগ্রহ জেগে ওঠে; কোন কোন জায়গায়—যেমন মার্কসবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে—প্রতিবাদে প্রস্তুত হতে হয়. প্রায় সব সময়ই চিত্ত উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং এ বই সম্বন্ধে বোধ করি এইটেই সব চাইতে বড়ো কথা যে মহাত্মাজীর গঠন-কর্ম পদ্ধতি একটি অসাধারণ চিন্তা উদ্বোধনকারী উদ্যম। যে সব চিন্তা ধারার সমালোচনা স্বামীজী করেছেন সে সবের সম্বন্ধেও তাঁর কোনও বিরূপ সংস্কার নেই, আবার যে সব চিন্তাধারার পক্ষ নিয়েছেন সে সবের প্রতিও যুক্তি ও বিচার-নিষ্ঠ। গান্ধীজীকে তিনি পৃথিবীর যে নেতাদের পাশে দাঁড় করিয়েছেন, গান্ধীবাদকে বিভিন্ন চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে যেমন করেছেন।

মহাত্মাজী যে গঠন কর্মের কথা বলেছেন তাকে বাস্তব প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আনতে গিয়েই আমরা আলোচ্য গ্রন্থের লেখক এই বহু বাঞ্ছিত সমাধান করে মহাত্মাজীর গঠন পরিকল্পনার ভিত্তি-প্রস্তর তাকেই উদ্ঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন। এই প্রক্রিয়াতে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, গান্ধীজী পরিকল্পনাতে প্রাচ্যের অধ্যাত্মচিন্তা তথা ভাবনীতি পাশ্চাত্ত্যের তীব্র প্রাণশক্তি তথা জড়নীতির এক অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে; একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি এবং প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য কেউই পরস্পর নিরপেক্ষ টিকতে পারে না, পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো দুটি তালের মতো গান্ধীবাদ এক পরস্পর শোষণ শাসন ও শোষণ মুক্ত পৃথিবীর দিকে পথ করেছে। মহাত্মাজীর গঠন-পরিকল্পনার পেছনে দর্শনিক সূত্র আবিষ্কার লেখকের মৌলিক অ আলোচ্য প্রসঙ্গে লেখকের পাণ্ডিত্য ও অধিকার, বক্তব্য সম্বন্ধে প্রত্যয়ের দৃঢ়তা, বক্তব্য স্থাপনে বি সংশ্লেষণের শক্তি ও স্পষ্টতা বইটিকে এক উচ্চ মনস্বিতার সাক্ষ্যরূপে তুলে ধরেছে। গান্ধী রচনা যেমন ইংরাজী থেকে বাঙালী পাঠকদের জন্যে হয়েছে, তেমনই মহাত্মাজীর গঠনকর্ম পদ্ধতি বাংলা বৃহত্তর পাঠকসমাজের জন্য অনুবাদ করা লেখকের বিরুদ্ধে শুধু একটি বক্তব্য আছে, বাংলা উপরে তাঁর দখল তিনি ভালোভাবেই প্রমাণ তিনি কেন মধ্যে মধ্যে ইংরাজী পরিভাষিক শব্দ ব্যবহার করলেন?

উজ্জ্বল ভারত—দ্বিমাসিক পত্রিকা—বিংশ বর্ষ

মাঘ ১৩৭৩—পৌষ ১৩৭৪, ১৯৬৭

বার্ষিক সূচী

অ-মৃত (নাটক) ২৩১
নাট্যকার মন্মথ রায়

আমাদের কথা ১
সম্পাদকীয়

আমাদের শিক্ষা ১৫২
সুনীতি চক্রবর্তী

আমি অমৃতের অধিকারী (কবিতা) ১১৬
শান্তশীল দাশ

উজ্জ্বল ভারত (কবিতা) ৮৬
শান্তশীল দাশ

একটি অপ্রকাশিত লেখা ১৫
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

ঔপন্যাসিক ককনার ৭৭
সন্তোষকুমার অধিকারী

কালীপূজার তত্ত্বকথা ১৯৪
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

কোঠারী কমিশন ২০১
গায়ত্রী ঘতি

গীতাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ ৫৯
শৈলেন্দ্রকুমার রায়

গ্রাম উন্নয়নের কথা ১১
রেজাউল করীম

চিত্তভূমি ১১৩
হৃষীকেশ দে

চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম ২১৪
রেজাউল করীম

জাদু নিত্যগোপাল (কবিতা) ৮২
হৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ

জীবনধর্মী শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ২৩২
রাধেশ্যাম মজুমদার

জ্ঞানবিজ্ঞান-তপস্বী রামেন্দ্রসুন্দর ২১৭
নিখিলরঞ্জন রায়

দাও আনন্দ আবেশময়ি (কবিতা) ১৯০
হৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ

দার্শনিক নীটশে ২৩৫
শৈলেন্দ্রকুমার রায়

নিঃসঙ্গ নায়ক বিদ্যাসাগর ১৯৭
সন্তোষকুমার অধিকারী

পঁচাশীতম জন্মদিনে ৩৪৬
রেণু মিত্র

প্রার্থনা (কবিতা) ১৭৫
দিবাকর ঘোষ

প্রার্থনাভাষীন ভাষণ ৫, ৪৪, ৯৩, ১৪৮
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি সমস্যা ১৩১
সুবোধকুমার সেনগুপ্ত

বঙ্কিম-হেস্টি বিরোধ ১৩৯
মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মন্বন্তরে প্রবন্ধতা ৩৮
গায়ত্রী ঘতি

মায়ের পূজা ১৮৮
রেণু মিত্র

মাতৃ বন্দনা (কবিতা) ১৮৩
শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

মাসমিতি ১৮৪
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

রবীন্দ্র বর্ষচিন্তার একদিক ২৫০
আশুতোষ ভট্টাচার্য
রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শ ১৭২
গায়ত্রী বসু
রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে ১৯, ৬৩
বীরেন চৌধুরী
লাঞ্ছনাক্লিষ্ট সৈনিক পতাকা ৪
শিক্ষক ৫১
...কণিকুমার বিশ্বাস
শিশুর ছোলা ছোলার যে হাত অনেক শক্তি ধরে'
সে যে বিশ্ব শাসন করে ২২৩
অনিলা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ স্মরণে ২৪৫
সন্তোষকুমার অধিকারী
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ২৪৯
সুনীতি চক্রবর্তী
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী ২৬, ৬৯, ১১৯, ১৪৪, ২৭৫
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ৮১
...কবিরাজ সাহা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও ... ২৬০
হৃষীকেশ দে
শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ৩১
সম্পাদিকা
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্মরণে (কবিতা) ১০৬
কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি ২৬৩
...শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেন
সমারসেট মম—প্রখ্যাত কাহিনীকার ১১৭

সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা ১০৪
অনিলকুমার সমাজদার
সাধুভাষার ভবিষ্যৎ ২৬৩
যীশু রায়
সাময়িকী : ৪৫
নূতন পথের নূতন পাঠক
শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা
নরনারায়ণ শিল্পকেন্দ্রের বাৎসরিক
শ্রীশ্রীদোলপূর্ণিমা : শ্রীমন্মহাপ্রভু ৮৫
পঁচিশে বৈশাখ
বর্তমান শিক্ষা মেয়েদের স্বধর্মচ্যুত করেছে কি না ১৫৫
দেশের বর্তমান অবস্থা ও তাহার
প্রতিকারের উপায়
ছাত্র সমস্যা
বিপর্যয় অন্তে ২৪১
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অন্নোৎসব ২৮৮
নরনারায়ণ আশ্রম সঙ্ঘের বার্ষিক সাধারণ সভা
বাংলার রাজনীতি কোন্ পথে
সাহিত্যে লোক-সাহিত্যের স্থান ৯৯
বিভা সরকার
সিদ্ধান্তদর্শন ২২, ৮৩, ১০৭, ১৭৬, ২৮৪
শ্রীনিত্যগোপাল
সেকাল আর একাল ২২৬
নরেন্দ্র চৌধুরী
স্বপ্ন রেখো (কবিতা) ১৮৭
ভারতী
হারানো দিন ২৬৮
শ্রীমান

(৬) উজ্জ্বল ভারতের অর্থনীতির প্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে 'মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্'—ঈশোপনিষদের এই মহাবাণী হইতে। 'লোভ করিও না, ধন কাহারও একচেটিয়া নয়। ধন বিশ্বের, ধন বিশ্বেশ্বরের'—ইহাই ভারতের জপমন্ত্র। উজ্জ্বল ভারত ধনিক-শ্রমিক পরস্পরকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সহযোগিতাদ্বারা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবে।

(৭) শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের (class-war) রক্তাক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল ভারত শ্রেণীসমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিবে। সাধনা তাহার আনন্দমঠের 'ভক্তি'—দেশভক্তি, বিশ্বভক্তি নরনারায়ণভক্তি।

(৮) প্রাচীন ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে ব্যক্তি সাধনার উপর জোর দিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা জোর দিয়াছে সমষ্টি সাধনার উপর। উজ্জ্বল-ভারত দুইয়েরই তুল্যমূল্য স্বীকার করিয়া সমগ্র দৃষ্টি লইয়া ব্যষ্টি সমষ্টির সমন্বয় বিধান করিবে। উজ্জ্বল ভারতে সমষ্টির চাপে যেমন ব্যষ্টি নিষ্পেষিত হইবে না, ব্যষ্টির উচ্ছৃঙ্খলতায়ও সমষ্টি তেমনি বিপন্ন হইবে না।

'উজ্জ্বলভারত', ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

(৯) উজ্জ্বল ভারতের মুক্তি আস্বাদন ধরার মুক্তিতে ঘনীভূত। উজ্জ্বল ভারত মাটির দেশেই ব্রহ্মলোককে আস্বাদন করিবে। মাটির দেশের নর ও নারীর মধ্যেই গোলোকের দেবদেবীকে প্রত্যক্ষ করিবে।

(১০) উজ্জ্বল ভারতে 'no method is too mean' নীতি চলিবে না। ভারতবর্ষে পথ ও গন্তব্যস্থল একই বস্তুসত্তার দুইটী দৃষ্টিভঙ্গি বা আস্বাদন মাত্র। আনন্দমঠের ভক্তিসাধনাই এই সমন্বয়ের খোঁজ দিবে।

(১১) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তি হইবে পল্লীব্রত। সহর থাকিবে এখানে পল্লীর সেবক। পল্লীই বাস্তব সত্তা, সহর একটা idea মাত্র। এই পল্লীসভ্যতাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে স্বর্গনাককে কৃষিমানের সেবকরূপে স্থাপন করিতে হইবে। কৃষিসভ্যতার চরণতলেই স্বর্গের উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল হইতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের 'মান' বাড়াইয়া তুলিলেই সম্ভব হইবে পল্লী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। অর্থের শাসনশোষণ মুক্ত অন্নই বিশ্ব প্রাণবর্দ্ধক। অর্থ থাকিবে অন্নের বাহকরূপে অন্নবস্ত্রকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার জন্য। + + +"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

Central Regd. No. R. N. 2571/57 Phone No. 57-2540 UJJWALBHARAT
PMG Regd. No. C 23

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের মুদ্রিত

১। ব্রহ্মসূত্র (অনুবাদ ও ভাষ্য)
- ১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী) ১।৩
- ২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্য্যন্ত) ৮৲
- ৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত) ৮৲

২। ঈশোপনিষৎ ২৲
৩। কেনোপনিষৎ ২৲
৪। কঠোপনিষৎ ৩৲
৫। প্রশ্নোপনিষৎ ১৷৹
৬। ঐতরেয়োপনিষৎ ১৸৹
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
৭। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ২৸৹
৮। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩৹
মুণ্ডকোপনিষৎ
৯। শ্রীনিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে ১৷৷৹
১০। স্বরাজের পূর্ণরূপ ৷৷৹
১১। গীতাজয়ন্তী ৵৹
১২। ঈশোদ্ভাষ্যভাষ্য (পুস্তিকা) ৷৷৹
১৩। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা ৩৲
(গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)

পাণ্ডুলিপি

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
৪। দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

৺প্রতিভা রায়ের

১। নারী-প্রগতির ভগ্নকথা ৸৹
২। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য নিত্যগোপাল ও শিক্ষা সুধার কথা ৮৹
৩। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ৫৲

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১। সম্বন্ধমূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপাল ৷৷৵৹
২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲
৩। শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন ৩৲
৪। সুবীক্ষ-ভূমা ৫৲
৫। প্রাথমিক শিক্ষা ৸৲

বরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

প্রতি সংখ্যা ০৮০ পয়সা, বার্ষিক পাঁচ টাকা

উদ্বোধন

মাঘ-ফাল্গুন, ১৮৮৭ শকাব্দ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ — বিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

আমাদের কথা

সম্পাদিকা

মাঘ ১৩৭৩ (জানুয়ারী ১৯৬৭) হইতে উদ্বোধনের [illegible] মাসিক পত্রিকার বিংশ বর্ষ আরম্ভ হইল। বিগত দুই বৎসর ইহা নিয়মিত প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। এজন্য উদ্বোধনের পাঠক, গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষকবর্গ ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ঘটনার অত্যধিক চাপে উদ্বোধনের দুইটি অনতীত আদর্শ সত্তা পর দুই বৎসর তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছে—সকল দিকে শুধু [illegible] নাই। এত বিপর্যয়ের মধ্যেও যে সে টিকিয়া আছে সে শুধু উদ্বোধনের জীবনদেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের কৃপা ও আশীর্বাদের ফলে। যাহা হউক, উদ্বোধনের বিংশ বর্ষ আরম্ভ হইল বলিয়া আমরা সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া উদ্বোধনের আদর্শের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজকে, তাঁহার জীবন-দেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালকে আমাদের প্রাণের প্রণতি নিবেদন করি—তাঁহাদের আদর্শ ও জীবনকে যেন আমরা অধিকতর ভাবে গ্রহণ করিতে পারি এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। জগতের তাহার উপযুক্ত মূল্য দান করিয়া আমরা যেন জগন্নাথীত হইবার সাধনা গ্রহণ করিতে পারি, যেন মানুষকে মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠিতে আমরা আমাদের সর্ব শক্তি নিয়োগ করিতে পারি, আমরা যেন জগৎ ও জগন্নাথের সেবা করিবার মনোবৃত্তি রক্ষা করিয়া আমাদিগকে ও আমাদের আশেপাশের আনন্দময় করিয়া তুলিবার পথে আগাইয়া যাইতে পারি—আজিকার দিনে তাঁহাদের নিকট এই প্রার্থনাই বারংবার করিতেছি।

বিংশ বর্ষ হইতে উদ্বোধনের চলার পথের কিছু পরিবর্তন হইল। উদ্বোধন নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র। নয় দশ বৎসর আগে পর্যন্ত শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-লিখিত পুস্তক প্রকাশন ও 'উদ্বোধন' প্রকাশনই ছিল নারায়ণ আশ্রমের প্রধান কাজ। অন্য কাজ তেমন আর কিছু ছিল না। কিন্তু তাহার পর হইতে আশ্রমের মধ্যে কয়েকটি নূতন দেবার কাজ—যেমন গ্রামীণ গ্রন্থাগার, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, প্রাক্ ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, চরকা ও তাঁত—ক্রমে ক্রমে আরম্ভ করা হইয়াছে। অবশ্য কর্মীর সংখ্যা বাড়ান সম্ভব হয় নাই। ইহার সঙ্গে অর্থ নৈতিক ও নানা ঘটনা বিপর্যয়ের চাপের মধ্য দিয়া নরনারায়ণ আশ্রমকে পথ চলিতে হইতেছে। এই সকল কারণে এই বিংশ বর্ষ হইতে উদ্বোধন দুই মাসে একটী অর্থাৎ বৎসরে ছয়টী প্রকাশ করা হইবে। সাময়িকভাবে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল—সুযোগ সুবিধা উপস্থিত

হইলেই আবার পূর্ব নিয়ম মত উদ্বোধনের প্রকাশ বাধিতে পারিব বলিয়া আমরা বিশ্বাস রাখি। এই নূতন ব্যবস্থায় উদ্বোধনের অগ্রগতির কোন ক্ষতি হইবে না বলিয়াই দেখা যাইবে।

আজ চারিদিকে দুর্যোগ। সাধারণভাবে বলা যায় জীবন মাত্রই দুর্যোগপূর্ণ। দুর্যোগ নানারকম। এ দুর্যোগের মূলে রহিয়াছে প্রধান কথা অনিশ্চয়তা—খাওয়া পরার অনিশ্চয়তা, রাস্তাঘাটে চলাফেরার অনিশ্চয়তা—এমনি সব ক্ষেত্রে। ঘরে মাসের মোরাক ধুয়ের কথা শুনের খোরাকও থাকে না—ইহাই সাধারণ নিয়ম। পাশে যেমন দেখার লোকের নাই, তেমনি পয়সা হইলেও জীবন-ধারণের প্রয়োজন চাল-ডাল না পাওয়া যাইতে পারে, আর যদি পয়সা হইলে অবশ্যই এবং যে-পথে পাওয়া যায়, তাহা দুষ্টিমের জন্য অনেকেরই আছে আর সে সাধু-পথের হাজারো কারণই না করিতে পারে—করিতেই না যেন? রাজনীতিক্ষেত্রেও দুর্যোগ। দুর্যোগ নীতি হইতে যে অর্থ লইয়া ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবন এত দিন আবদ্ধ হইয়াছিল আজ তাহাকে ধুলিসাৎ করিয়া রাজ-স্বার্থ-বোধই মানুষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। রাজনৈতিক জীবন বলিয়া ভারতবর্ষের কিছু ছিল না—তাহার ছিল সামাজিক জীবন যাহাই ছিল তাহার পরমার্থ, আর সামাজিক জীবন যাহা ছিল তাহার সঙ্গে ঐ অধ্যাত্ম জীবন এক সূত্রে গাঁথা তো ছিলই না, বরং ছিল তাহার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন-ভাবাপন্ন হইয়া। সামাজিক জীবনে আবার যে সামাজিক ভেদবুদ্ধি নিষ্ঠুর ও বিষাক্তও ছিল। এমনই ভারতবর্ষ মুসলমান ইংরেজের শাসন করিয়াছে শত শত বৎসর। এই শত শত বৎসর পাশাপাশি বাস করিয়াও মুসলমানকে আমরা সামাজিক জীবন-ব্যবস্থা হইতে দূরে সতর্ক প্রহরায় রাখিয়া নিজেদের ধর্ম ও সমাজকে বাঁচাইতে ছিলাম—তাহারই উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্লাবন লইয়া, অনেক ভাল অনেক মন্দ লইয়া আসিল ইংরেজের শাসন। সে অধ্যায় নৈপুণ্যে রাখিয়া অধিকারের আবেষ্টনে যাহা যে পথে আসিতে চাহিবে তাহা অন্তরে এই যে, ভারতের অধ্যাত্ম সাধনাকে আজ ভারতের ক্ষেত্রে নামাইয়া আনিতে হইবে কিংবা তাহাকে আশ্রমের ক্ষেত্রকে উন্নীত করিয়া অন্যান্য চেতনা তাহা বাসিত করিতে হইবে। অর্থাৎ পবিত্রতা প্রেম সেবাবুদ্ধি সংস্কৃতিবোধ বুদ্ধি দ্বারা আজ রাজনীতি করিতে হইবে, সামাজিক জীবন চালাইতে হইবে, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনও এই বুদ্ধিতেই চালাইতে হইবে। অধ্যাত্ম সম্পদ যদি ব্যবহারিক জীবনেই না আসিল—যদি তন্নিষ্ঠ বুদ্ধিতে ভগবানের এই সৃষ্টিকে দেখিতে না পারিলাম, যদি দেশকালপাত্রে নিরপেক্ষ হইয়া মানুষকে ভালবাসিতে না পারিলাম তাহা হইলে সে নিষ্ফলা ব্যর্থ অধ্যাত্ম সম্পদ লইয়া কি করিব? তাহার গৌরব কি? আধিভৌতিক দুর্যোগ হইতেছিই হউক বা অর্থনৈতিক হউক বা দুইই হউক সেগুলিকে সৃষ্টিভঙ্গি না বদলাইলে কোন দুর্যোগের হাত হইতে রেহাই পাইবার পথ পাওয়া যাইবে না। ভগবানের সৃষ্টিতে মানুষ নিজের বুদ্ধির দোষে বন্ধনের কারণ সৃষ্টি করিয়া তাহার স্বর্গ রূপ দিয়াছিল, নিজের অন্তরের আসক্তি-বিদ্বেষ মাখানো দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহাতে দোষ আরোপ করিয়াছিল—এমন যেমন জগতের সৌন্দর্যকে সে আস্বাদন করিতে পারে নাই, তেমনি আজও মানুষ নিজের বুদ্ধি দিয়া যাহা কিছু সৃষ্টি করিল, নিজের বুদ্ধি দোষেই আজ তাহারই হাতে বন্দী হইয়া সব কিছুকে সমস্যাসঙ্কুল করিয়া তুলিল—সৃষ্টি বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিল না। বুদ্ধি না বদলাইলে বিজ্ঞানের দয়ায়, আবিষ্কারই হউক কিংবা অর্থনীতি ক্ষেত্রে নূতন নূতন তত্ত্বই হউক, কিছুই সর্ব মানুষের কল্যাণ আনিয়া দিতে পারিবে না। দল বিশেষের কল্যাণ বা সুযোগ সুবিধা হয়, অতীতেও ছিল, আজও চলিতেছে। অতীতে অপরের অধিকার নাই এ কথাটা ঘোষণা করিয়াই অপরের অধিকার হরণ করা হইত, আজ কোন কোন স্থানে অধিকার বাহ্যতঃ স্বীকৃত হইলেও বুদ্ধি-দোষে সে অধিকারের সুযোগ সুবিধা সকলের কল্যাণে প্রযুক্ত হইতে পারিতেছে না। আর যাহারা এখনও সমাজের অংশকেই সর্ব বলিয়া ধরিয়া অপর অংশকে নিষ্প্রাণ করিতে চাহিতেছে তাহাদের চিন্তার দৈন্য ঘুচাইতে আবেষ্টনগত চাপ দায়ী

করিবে—সে দিনও খুব দূরে নাই।

এই তো গেল অন্তরের সৃষ্টিশক্তির কথা—আর বাহিরে আমাদিগকে সৃষ্টি করিতে হইবে, কর্মী হইতে হইবে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ চিরদিন সন্ন্যাসের দেশ বলিয়া জানিয়াছিল—কিন্তু কর্ম্ম ছাড়া অন্যান্য আসিবে কোন্ পথে? কর্ম্মকে যে মনে করিয়াছিলাম বলিয়াই আমরা বাস্তব জগতে মার খাইয়াছি, আঘাত খাইয়া আমরা সন্ন্যাসের কর্মী হই নাই, যতটা পাশ্চাত্যের অনুকরণ করি না কেন, নব জ্ঞান প্রেম ভক্তি বাদ দিয়া শুষ্ক ও ভোগসর্ব্বস্ব কর্মী হইয়াছি যাহা দ্বারা সৃষ্টি হয়—সে আদর্শ কোনো কালে আমাদের দেশে আসে নাই। ব্যক্তিগত ভোগসৃষ্টিতে কর্ম্ম হয়তো সহায়, কিন্তু তাহা কর্ম্মের একমাত্র পরিচয় নয়। কর্ম্ম করিতে হইলে অন্তরের সৃষ্টিশক্তি প্রকাশ পাওয়া চাই—নিজের ব্যক্তিগত ভাল লাগা মন্দ লাগা দিয়া নয়, কর্ম্ম না করিয়া, সৃষ্টি না করিয়া—অন্য সৃষ্টি না করিয়া—কোনমতেই বিশ্বের বুকে সম্মান লইয়া টিকিয়া থাকা যায় না।

ভারতবর্ষ চিন্তার ক্ষেত্রে, তত্ত্বের ক্ষেত্রে, আদর্শের ক্ষেত্রে যতটুকু, বিস্তার লাভ করিয়াছে, বাস্তব জীবনে তাহার কিছুই রূপ দিতে পারে নাই। এ যেমন হইয়াছে অতীতে ঘটিয়াছে, তাহা হইতে পারে বর্ত্তমানেও তাই। অতীতে সে সর্ব্বকে ব্রহ্ম বলিয়া তত্ত্বে জানিত, কিন্তু বাস্তবিক জগতে অপর মানুষকেই কুকুর অপেক্ষা ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে; আজও তাহার সংবিধানে সংকল্পিত আদর্শ সুন্দর বটে কিন্তু ভারতবর্ষেই লোক শিক্ষা যোগীর হাতে ওষুধে পর্য্যন্ত ভেজাল মিশাইয়া দিয়া হাসপাতাল চলাকেরা করিতেছে যাহা পৃথিবীর অন্য দেশ বোধহয় আজও কল্পনা করে না। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভারতবর্ষের অবস্থাই সকলের অপেক্ষা শোচনীয়—তাহার ইহঃ নষ্ট পরতো ভ্রষ্টঃ। সে অতীত ভারতের দৃষ্টিকোণে সৎ আত্মবান মানুষও রহিল না, বর্ত্তমান বিশ্বের কর্ম্ম-সাধনাও গ্রহণ করিল না; ভগবৎ সাধনায় তাহার গিয়াছে, কর্ম্মের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া দেশ ও জাতিকে বাঁচাইবার বুদ্ধিও তাহার হইল না। এক দৃষ্টিতে দেখিলে ভারতবর্ষের জীবন একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন আবার দেখি এই ভারতেরই মাটিতে সেই অতীত হইতে সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান বুদ্ধদেব হইতে এই সেদিনের শ্রীচৈতন্যপ্রভু, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল (আরও আছে—বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি মহাত্মাগণ) যে জীবন ও যে তত্ত্ব রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তো নষ্ট হইতে পারে না, ব্যর্থ হইতে পারে না—তাই এত অন্ধকারের মধ্যেও এই সকল তত্ত্ব ও জীবন লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবেই—দুর্যোগের ঘনান্ধকারের পটনের মধ্য দিয়াই নূতন অরুণ দেখা দিবে।

এ পটনের সংবাদ ত্রিকালদর্শী শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল রাখিতেন বলিয়াই নূতন অরুণের বীজও তিনি রাখিয়া দিয়াছেন শত বৎসর আগেই দাঁড়া ধর্ম্মের নূতন কাঠামো তৈরী করিবে। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-প্রসাদে নূতন যুগের ভোরে আমরা অনাস্থা ভয় অন্ধত্ব সমন্বিত নূতন ধর্ম্মের কাঠামো তৈরী করিয়া তুলিবেন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত যাহার মধ্যে পাশ্চাত্যের সকলের দর্শন মার্কসবাদ এবং ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনা উভয়েরই যথাযোগ্য স্থান মিলিয়াছে। উজ্জয়ন্তীর পরিষদ এই চিন্তাধারারই বাহক ও বাহক। জীবনে—জীবনের সমস্ত দিকগুলিকেই আজ নূতন করিয়া ভাবিতে হইবে। ধর্ম্মান্ধতা একদিন ভারতবর্ষকে একান্তভাবে পঙ্গু বিমুখ করিয়া ডুবাইয়াছে, আজ আবার ধর্ম্মহীনতার উচ্ছৃঙ্খলতায় সে বিপথগামী। তথাপি আমার একথাও সত্য যে ধর্ম্মকে নূতন দৃষ্টি লইয়া বুঝিতে ও আচরণ করিতে না পারিলে, ধর্ম্মকে পুরাতন রকমে চালাইতে চাহিলেও তাহার বাঁচার পথ নাই। এই নূতন ধর্ম্ম শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ রাখিয়া গিয়াছেন। উজ্জয়ন্তীর তাহাদের এই নূতন ধর্ম্ম, নূতন জীবন-চেতনাকে মানুষের দ্বারদ্বারে পৌঁছাইয়া দিবার প্রচেষ্টা প্রদর্শন করিয়া যাইবে। ধনজন হীনতার যত চাপ তাহার উপর আজ পর্য্যন্ত পড়িতেছে তাহা সহ্য করিয়া আগাইয়া চলিবার শক্তি বিশ্বনাথের ও তাঁহার প্রিয় বিশ্বের মানুষের সহযোগিতায় সে লাভ করিবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে তাই নূতন পরিবেশে নিজেদিগকে খাপ খাওয়াইয়া নির্ভয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে আমরা চলিতে পারিব বিগত উনিশ বছরের মত আমরা 'উজ্জয়ন্তী'তে গ্রাহক অনুগ্রাহক বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ সহযোগিতার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি—তাঁহারা উজ্জয়ন্তীর ও নরনারায়ণ আশ্রমকে তাঁহাদের প্রীতিছায়ায় ঘিরিয়া রাখুন। বিশ্বনাথ কৃপায় শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের জয় হউক, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জয় হউক, সর্ব মানুষের জয় হউক।

লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা

['লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা' নরনারায়ণ আশ্রমের তথা উত্তরলাবণ্যের পতাকা। প্রতি বৎসর মাঘোৎসব উপলক্ষে আমরা ইহাকে অভিবাদন জানাই। তাই শ্রীমৎ পূর্ণবোধানন্দ সেদিন সংকেতে ইহার যে অর্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা প্রতিধ্বনি করিতে উদ্যুক্ত হইয়া উহা এইখানে আমরা প্রকাশ করিলাম। সকলের সাথে মিলিত হইয়া একদিকে ব্রহ্মজ্ঞান—নৈষ্কর্ম্যের ঘোষণা চিহ্ন—আর একদিকে বাস্তব জগতের কল্যাণ—লাঙ্গল যাহার প্রতীক—সমন্বয়ের ইঙ্গিত-প্রতিষ্ঠায় নূতন দিনের যাত্রাপথে আমরা অভিবাদন জানাইতেছি]

বিশ্বমন্ত্র রচনার শুরুতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্ষকে অবশ্যই 'জ্ঞান-চক্র ও চক্রী-পুরুষের' সমন্বয় করিয়া নিয়া একটি 'ধর্ম্মচক্র' গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের জাতীয় পতাকায় অন্তর্নিহিত ধর্ম্মচক্রের নিগূঢ় অর্থ হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যা ও লাঙ্গলের সমন্বয়ে 'রাষ্ট্রলক্ষ্মী' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। পুরুষপ্রধান ভারতীয় ঋষি-সভ্যতার দৃষ্টি ছিল অন্তরের ব্রহ্মবিদ্যার দিকে; পাশ্চাত্যের বস্তুপ্রধান সভ্যতা চকল বাহিরের মঙ্গলময়ীর প্রতিষ্ঠার জন্য। কোনও একটি একান্ত সত্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ-সভ্যতাই এই দুইটি দৃষ্টিকে যথাস্থানে ও যথামানে সুবিন্যস্ত করিয়া অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্বসঙ্কুল হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ। ব্রহ্মবর্ত্মেই এই সভ্যতার ভিত্তি-পত্তন হইয়াছিল। সেখানে আমরা ব্রহ্মের গোষ্ঠে মাঠে রাখাল-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার গোষ্ঠবাসী বলরামের যুগল মিলনে ধারণাতীতকে আস্বাদন করিয়াছি। ব্রহ্মই ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার সার্থকতার কৃষি সাধনের সমন্বয়। এই সমন্বয়েরই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দাঁড়াইয়া বিশ্বজনগণের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। গীতাশাস্ত্রে জনক তাই এই সভ্যতার আদর্শ। জনক ছিলেন একাধারে ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও চষী-রাজা জনক। ভারতের মাটিতেই চাষী-রাজর্ষি ব্রহ্মজ্ঞানী জনকের আদর্শে কমিউনিজম হজম হইয়া গিয়া বিশ্বের যুদ্ধে তাহার উদ্ভূত হইবার প্রয়োজনকে সার্থক আস্বাদন করিবে। শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপ-সংবাহুত। কৃষি-ক্ষেত্রে-বিচরণকারী বলিয়াই তিনি 'কৃষ্ণ'। 'কৃষ্'-ধাতু হইতে 'কৃষ্টি' 'কৃষি' ও 'কৃষক' শব্দ নিষ্পন্ন। এই কৃষকক্ষেত্রেই জ্যেষ্ঠ সহোদর হলধর বলরাম। ভারতের স্বরাজ মূর্ত্ত হইবে হলধরেরই দেশে। তাই নরনারায়ণ আশ্রমের পতাকা 'লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা'।

উত্তরলাবণ্যের প্রান্তরপটে এই পতাকাই অঙ্কিত রহিয়াছে।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৬৭)

৬ বৎসর বোধা হয়ে ছিলাম, আমার সেই বোধাই হয়ে যায়...। কিছু এসেছে তাই আজ বলছি। মহাপ্রাণ আশ্রমের লোক ভাল, কথা ভাল—কিন্তু নিজেরাই যদি সে কথা না শোন কথার অর্থ কি? ...তিনি সঙ্গে না থাকলে কি আমি বাঁচতাম? নয়নাগোপে আশ্রম কল্পনায়, নয়নাগোপে আশ্রম গোলোক বৈকুণ্ঠ। আমারই পিতা মৃত্যুমাত্রে বলে গেছেন, নিত্যগোপাল প্রত্যক্ষ দেবতা... নিত্যগোপাল জয়, না তোমাদের অহংকারের জয়? কি ভাবে আমি জীবনে চলেছি—তোমাদের সেটা বুঝতে হবে—নিত্যগোপালের স্পর্শ একটু পেয়েছিলাম বলে এই ৭৩ বছরেও আমি গর্ব করতে সাহস রাখি...। মানুষের ত্রুটিকে পেয়ে বেড়াবে না, গোপনে বুকের মধ্যে নিয়ে তার ভুল দেখাবে...। পরমহংস দেবের নেমন্তন্ন আছে—এক বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে গেছেন—বলে আছেন, খেতে আর দেয় না—সঙ্গের লোকেরা অস্থির হয়ে পড়ছে—চলুন, খেতে হবে না। উনি জবাব দিলেন...আমি না হয় নাই খেলাম, কিন্তু আমি না খেয়ে গেলে গোপালের অমঙ্গল হবে যে রে শালা! তিনি খেয়ে তবে এলেন। আমিও তো মানুষের বাড়ী গেছি সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময়—বিরক্ত হয়ে বা ভয়ে কেউ কেউ বসতে পর্যন্ত দেয় নি—আমি পিঁড়ি চেয়ে নিয়ে বসে এসেছি।...এমনি করে অপরের ভাবনা ভাবতে শেখো।...মানুষ হলে টাকা আসে—বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী; আমি বৈষ্ণব হলে আমার ঘরে লক্ষ্মী আসবে না?...জ্ঞান হলে অন্ধ হতে হয়—মনবুদ্ধিকে শুদ্ধ করা যেখি এক বৎসরের মধ্যে আশ্রম এত চতুর্গুণ এগোতে পারে কি না।...

২৬, ১১, ৫৬। শ্রীনিত্যগোপাল এসেছিলেন—তাঁর আসার ফলে বর্ণাশ্রমের সকল আচার, সকল ব্যবহার একটা দিয়া প্রণাম—একটা প্রণাম দিয়ে সংগঠিত হবে। নিধনাধারে মাতৃদেহাগে শোকাতুর—বর্ণাশ্রম শোককে মলিনতা বলে দেখেছে—কিন্তু শোক যেমন মানুষকে মলিন করে, তেমনি শুচিও করে দেয়—আগুন পুড়িয়েও দেয় আবার পবিত্রও করে সেই শোকই মানুষকে শুচি করে—এই সময় পরলোকগত আত্মার সঙ্গে যুক্ততা রাখতে হয়...নিত্যগোপালের কথা—নিজ কানে শোনা—শ্রাদ্ধের অন্ন খেলে যদি প্রেম ভক্তি না হয়, তবে কলির জীবের প্রেমভক্তির আশা নেই। রামকৃষ্ণদেব গোস্বামী মহাশয়কে এসব খুব বলতেন। কিন্তু আরও নূতন করে বলতে হবে... শাস্ত্রটাপ যদি ঘাড়ে চাপে, শ্রাদ্ধান্ন খেলে প্রেতের শাপ যোচে, শ্রাদ্ধান্ন প্রেতের দৃষ্টি হয়—এ ভাবে না ভেবে পিতৃ শ্রীতার্থে আপন জনের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রীতি নিবেদন—তাদের শ্রাদ্ধের মধ্য দিয়ে আনন্দের পথে এগিয়ে দেওয়া এই ভাবে ভাবতে হবে। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ বলেছেন, আনন্দের খানিকটা কৃতানি আনন্দে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি...আনন্দং প্রয়ন্তি...আনন্দ থেকে মানুষের জন্ম, আনন্দে স্থিতি, আনন্দের মধ্যে মানুষের প্রয়াণ...। স্বামী ব্রহ্মানন্দের বোধ হয় মা মারা গেছেন... রামকৃষ্ণ-শিষ্যরা তো খাবেন না—নিত্যগোপাল খেলেন। রাখাল মহারাজ (ব্রহ্মানন্দ) নিত্যগোপালের প্রসাদ খেলেন। এরা মুক্তপ্রেত হলে—নিত্যমুক্ত অন্তটি।... পিতামাতা কুকুর বিড়াল গাছ—কুত বলতে সব—আনন্দের মিলন থেকে জাত—আনন্দেই বেঁচে থাকে—আনন্দেই প্রয়াণ (প্র-ই+অতি) (প্রেত—প্র+ই+ত) করে—সিদ্ধ মহাপুরুষই যে করে তা নয়—সকলেই করে। সমস্ত কাজই আনন্দ নিয়ে করতে হবে...রান্না যে করে তার যদি আনন্দ না থাকে, পরিবেশনকারীর যদি

আনন্দ না থাকে তবে তাদের সে কাজ শুধু তাদের পক্ষে ব্যর্থ হয় না—যারা যায় তাদেরও কোন কল্যাণ হয় না।.. তোমাদের আনন্দের মধ্যে যাওনীতি আলোচিত হয়...। মানুষ পাপ-সম্ভব নয়—আনন্দ-সম্ভব...। যা যা কর্ম করবে, মরার পরে তাই পাবে—সংসারকে যদি জ্বালাও, সেখানেও তাই—নরকের ভয়ঙ্কর...। তাদের না করতে যদি হাত পা কিঁকিয়ে যায়—মরার সময় এবং মরার পর সেই গতি হবে—এমনও মনে হয়, এমনও হয়লাও: কেননা মরার পর দেহ দীর্ঘ দিন থাকে না—অথচ লোভ থাকে—সে বড় অসহ্য অবস্থা। তেমন—একটা তৃষ্ণা না থাকে আর একটা তৃষ্ণা চাড়ে না মনের আগেই আর একটা দেহ সৃষ্টি হয়...যারা পাপী তাদের চোখের সামনে অন্ধকার এসে পড়ে—তারা কাল পেতে করে তাদের সামনে আলোর মতন হয়ে দাঁড়ায়...। দশহর বৎসর আগে একটা দেহ তৈরী হয়েছে...বিশ্বনাথ-বাবুর মায়ের ব্রহ্মগতি হবে না, কিন্তু ভাল গতি হবে আত্মহত্যা করলে কোন দেহ সৃষ্টি হয় না—তাই তার কোন প্রাক্তাপি থাকবে না—এ জন্য নেই যে তার তো দেহ জোটে নাই—সে কি ধরে থাকে—কাদের আকাঙ্ক্ষা আছে চোখ নেই, কান নেই।...আকাঙ্ক্ষা নেই, জন্য নেই—বিশ্বের আমি ছেড়ে না দিলে জন্ম আছে।...পাপোহহম্ পাপকর্মাহম্ উপনিষদের সঙ্গে মেলে না—আমার পাপ চিন্তা করে আমার লাভ কি? আমার তো উচিত—আনন্দের মধ্য দিয়ে আনন্দের পথে যাচ্ছেন—এ কথা তাঁর পক্ষেও আনন্দের, আমারও। প্রহ্লাদের ভক্তিতে হিরণ্যকশিপু উদ্ধার পায়, ভক্ত সন্তানের প্রার্থনায় মা উদ্ধার পান...। এখানকার দেওয়া সব কিছুই সেখানে পৌঁছায়, কিন্তু অন্য রূপে—যেমন এখানকার টাকা জার্মানীতে রূপ বদলে পৌঁছায়। একটা etherial body কখনও প্রকাশ পায়—কিন্তু তারাও যখন তখন আসতে পারে না।...বেশ, পিতা যদি পাপী হয়, তবে সমাজের একজন হিসাবে সকলে তাঁর পাপ—তাঁর পাপের ভার—সবাই মিলে ভাগ করে নেব—তাঁকে একলা পাপের ভাগী করব না, পাপ আমরাও ভাগ করে নেব।...বিশ্বনাথ-বাবু আমাদের এখানে—আমরা আশ্রমের পক্ষ থেকে তাঁর মায়ের আনন্দের গতি প্রার্থনা করি; মা, তুমি এগিয়ে যাও—তোমার মহাপাপ, তোমার প্রাণ তোমার সন্তান...। ভাগবত নরক মানে না—মানুষের কর্ম মানুষের লোক সৃষ্টি করে—ভক্ত পুত্র প্রহ্লাদ থাকলে পাপীও জলে না... ভাগবত নরক জানিয়ে পরলোকগত হতে বলেছেন।... নিত্যগোপাল, তুমি একটা আনন্দের পথ খুলে দিয়ে গেলে।...জগন্নাথ নিত্যগোপাল...।

২৭, ১১, ৫৬।...উপনিষদে ভগবানের একটী নাম হৃদয়ম্—হৃদি অয়ম্ —হৃদয়—যিনি (ব্রহ্ম) হৃদয়ে থাকেন বলে তাঁর নাম হৃদয়। বর্তমানে বিশেষ ভাবে এই হৃদয় অবতীর্ণ হয়েছে ভাগবত এই হৃদয়ের পাত্র—সেজন্য ইহাকে গায়ত্রী বলা হয়েছে—বেদের অর্থ বিশ্লেষিত করে এই গায়ত্রী। তন্ত্র ভাগবত বেদ—হয়ত ক্ষেত্র খুব জটিল, হৃদয় তখনই নামে—বুদ্ধি যখন জটিলতার মধ্যে আর কাজ করতে পারে না—তখন সেই জটিলতার হৃদয় নামে। বুদ্ধি একজনকে দাঁড়িয়ে রেখে মীমাংসা করে, হৃদয় পরস্পরের মুখা দিয়ে চলে... কলি যুগে প্রজ্ঞার সাধনা নেই—সব জটিলতার মধ্যে কি করে পথ করা যায় সেই সাধনা কলিযুগে—সে সাধনা একমাত্র হৃদয়ই করতে পারে। বুদ্ধি এখানে পথ পাবে না...ব্রহ্মের নাম সত্য—সকলের সাথী যেমন, যার যা মুখা তা দিয়ে চলতা পারা সমস্যা...। বুদ্ধি একটা সমস্যা আনতে পারে সেটা ছাটকাট দিয়ে... এতদিনের পুরুষ প্রাধান্যপূর্ণ সমাজে মেয়েদের কোন স্থান কোন প্রশ্নই ছিল না—কিন্তু আজ দুজনের সমান স্থান—যখন প্রজাবিদ্রোহ, সাম্য নিপীড়িত—তখন আর বুদ্ধি দিয়ে কিছু হবে না—রাশিয়া, আমেরিকা ইংরেজ সবাই ঠকে পড়েছে। হৃদয়—চিৎ×বৃৎ। হৃদয় হল চিৎ বৃত্তের সমন্বয়—আবার চিৎ বৃৎ সমন্বিত হলে হৃদয় আসে...। হৃদয় চিৎ-কাল নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধির কাছে...। বৃহদারণ্যক বলছে—সর্বেষাম্ বুদ্ধিনাম্ হৃদয়ম্ এব একায়নম্...। হৃদয়ম—মোক্ষ অর্থ হৃদয়ময়।...প্রেমের কোন আপীল আদালত নেই। এক তরফা বিচার।...কিন্তু গুরু শিষ্যের বেলায় তা নয় সেখানে গুরুর কাছে বসে শিখতে হবে সমর্পিত হয়ে।...

বুদ্ধির ৮টা বৃত্তি—

জ্ঞানায় নমঃ অজ্ঞানায় নমঃ
বৈরাগ্যায় নমঃ অবৈরাগ্যায় নমঃ
ধর্ম্মায় নমঃ অধর্ম্মায় নমঃ
ঐশ্বর্য্যায় নমঃ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ…

…তোমায় কথাটা বোঝাতে চাইলে অপরের দৃষ্টিটাও বুঝতে হয় [চিত্তবায়ু ও পরিবর্তের ঘটনা উল্লেখ করে আলোচনা] শুধু অন্ত একটা শুনেই বলে বসেছ—তুমি নিজের কথা এত শক্ত করে বুঝে আছ…। যেখানে পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ চলে সেখানে না…অর্জুন যখন কৃষ্ণের পায়ের নেমে নিজের তখনই ঘোড়ারা চলে বিদ্রোহী শিষ্যের সঙ্গে মিলতেও গুরু প্রাণপণ চেষ্টা করেন।… সকলের বুদ্ধির পিছনে যখন থাকে হৃদয় তখনই সে বুদ্ধি অন্যের সঙ্গে মিলতে পারে।…আমি হৃদয়ের সাধনা নিয়ে এসেছি প্রাণপণে অপরের কথা বুঝবার চেষ্টা করেছি ……টালীগঞ্জের পুলিন এল—এল—হৃদয় করলাম। তাকে দিনে তিনেক ধরে খাওয়ালাম, স্নান দিলাম—তার দেহ সুস্থ হল, মন সুস্থ হল।…কিন্তু যেদিন এলাম—তাকে পাওয়া গেল না আমাদের জিনিষপত্র পৌঁছে দেবার কাজে। সে বলল সে ব্যস্ত—কিসে বাধা? খেলার মাঠে হচ্ছে শুনতে পাবে তাই সে আসতে পারবে না। কোন মানুষ যে এমন করে ভাবতে পারে এ ভাবিনি কোনদিন—যাকে করের মাস খাওয়ান হল, স্নান দেওয়া হল, মানসিক সুস্থতাও সে লাভ করল—সে কত দিনা ভাবলে আমাদের জিনিষপত্র পৌঁছে দিল না—যদিও আমাদের অন্য কোন পুরুষ মানুষও ছিল না। তবু এ হেন পুলিনকে আমরা চলে এলে কাল কি ভাবে মনে করে এ অবস্থাতেও ১০টাকা দিয়ে এলাম। কেউ দেয়? ঠেকেছি যে ঐ হৃদয়ের কাছে।…বুদ্ধিমানেরা ঐ বিড়ালী শিবানীর মত—খাওয়াটা পাবার আগে ও পরে তার ব্যবহারে কত পার্থক্য—এটা জীবধর্ম্ম…। যদি হৃদয়ের দেবতা নিতাগোপালকে স্বীকার কর তবে হৃদয়ের সম্পর্ককে বাড়াও।…বুদ্ধিমানের মিল শেষ পর্যন্ত কিছুতেই হয় না—পাতঞ্জলের দ্রষ্টাদৃশ্য সম্পর্ক। সারাজীবন হৃদয় নিয়ে বাস্তবের সঙ্গে মেলাবার করেছি—সময়মত আমাকে জল দেয়নি—চেয়ে জল খাই—তেমনি জল না দিলে ও অপরাধ হয়…বুদ্ধিমান যখন চটে, আত্মহত্যাও করতে পারে…। নতুন যুগ এসে পড়েছে—রাজনীতিতে নেতৃত্ব তা বুঝতে পারছেন তোমরা যারা নিত্যগোপালের জন্ম খাও, তারা জানো নতুন যুগ—হৃদয়ের যুগ এসে পড়েছে—শরণাগত না হলে, পরস্পরং ভাবয়ন্ত না হলে এ যুগের মানুষ চলবে না …ও তাই আমি চলব না যেহেতু ওটা আমার ধাতে নয়—এ কাদা নিয়ে বর্ত্তমান যুগে চলবে না। তুমি যুগে যাবার…কিন্তু হৃদয়ের সাধনা না নিলে এখানে তো থাকা যাবে না—নরনারায়ণ আশ্রমের সাধনা শূন্যতার সাধনা—না থাকাই আমার সাধনা…। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী যে টাকা তুলে এসেছিলেন, সেই টাকাই সেখানে বিবাদ— .. নরনারায়ণ আশ্রম কিছু রেখে যাবে না নিজের সম্পত্তি --আমার সাধনা হৃদয়ের সাধনা—আমার শুধু সকলের দুয়ার খোলা… সকলের জন্য আমার দুয়ার খোলা…সকল না করে পল্লী আউর দরবেশ—বিবানী বিড়াল সকল করে না—সে জানে খাওয়া জুটবে—আমি যখন জেনেছি একজন আছেন, দেবেন—তখন সকল করব কেন ?…নিত্যগোপাল, আমার হৃদয় নিয়ে আমি বিপন্ন—কত মানুষ এসেছে গেছে—আমি তো তাদের ছাড়তে পারি নি—তারা আমার সঙ্গে থাকতে পারল না। নিত্যগোপাল, আমি তোমায় আমার দেহমন অর্পণ করব

২৮, ১১, ৫৬…: মানুষের দেহ দেখতে মনে হয় একটা জড় পিণ্ড, একটা জিনিষ—যেমন দালানকে বাইরে থেকে একটা বাড়ি মনে বুঝি, ভিতরের একতলা দোতলা বুঝি না—মানুষের মধ্যেও কত স্তরের কত রকমের মানুষ আছে বাইরে থেকে তা বুঝি না। একদল বলেছেন মানুষের মধ্যে সাতটা স্তর—ভূ ভূর্ব স্ব মহ জন তপ—এই দেহের মধ্যেই আছে—macrocosm আর microcosm সবই এ দেহে পাওয়া যাবে—যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে… সেখানে আনন্দময় মনোময় প্রাণময় বিজ্ঞানময় আনন্দময় কোষ—এই ৫টি স্তর

সন্দেহের। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ইহাদের শুরু। ওঁ—প্রথম সাধনায় অ—বিশ্বের স্থূলের দেহের সঙ্গে আমার দেহ এক—আদি সর্বদেহবান। উ—বিশ্বের সব সূক্ষ্ম দেহ মিলে একটা কারণ দেহ—ঈশ্বরের স্তর ...তারপর ব্রহ্মজ্ঞানে—প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী করে করে পি, এ, এম, এ। অনুভূতির এত স্তর—যে এক স্তরে থেকে তাকেই সব বলে মনে করল, তাই নিয়েই মত্ত হয়ে রইল, দেহ-স্তর নিয়েই মত্ত হয়ে রইল—তার মতটা বিনষ্ট—এক স্তরের স্বপ্নেই সে সন্তুষ্ট উপরে না উঠলে নীচের স্তরের জটিলতা করে না যতক্ষণ দেহ ও আমি ততক্ষণ জীবন তার দেহের দেহের উপরে উঠতে পারলে দেহের তার হয়ে—ভগবানকে মানুষ এমনি এমনি ভজনা করে না...জীবনের তার বহন করার শক্তি চাই—তাই তাঁকে দরকার ব্যক্তিগত ইষ্ট কি মুক্তি নাই।...পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় বাইরের প্রয়োজন বেশি বাড়াচ্ছে—তাতে অন্ন যেমন হয়ে, তেমনি ভিতরের শক্তও কমতে থাকে।...এ দেশের এরা আমার দেহের এই দেওয়াটাই সংযম বলে মনে করেন—সব সংযম দেহের ওপর পড়ল বলেই কৃষ্ণ এসে বলেছেন—না, মনের সংযম চাই—তাই যুক্তাহার, যুক্তবিহার, যুক্ত-চেষ্ট— ঊর্ধ্ব স্তরে যুক্ত থেকে আহার বিহার চেষ্টা সব কিছু—যে আহার বিহার চেষ্টায় তাঁর সঙ্গে যুক্ততা নষ্ট হয়ে যায় সেটাই বৈধর্মিকতা।...কণ্ড কাল জামা গায়ে দেই না, দুতো পায়ে দেই না, তেল মাখি না... উপরের ক্ষেত্রে উঠতে চাইলে বাইরের প্রয়োজন বাড়িও না...বাইরের বিশ্ব সত্য কিন্তু তারও মাত্রা আছে, ছন্দ আছে—অন্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য করেই তা সত্য—যে বাইরের জীবন অন্তরের সাধনাকে নষ্ট করে দেয়, তাকে বাড়িয়ে তুলে, না—জীবনে সে সত্য নয়, সহায়ক নয়—সমগ্র জীবনের পক্ষে সে অন্তরায়...প্রয়োজন minimum রাখে—তাতে উপরে উঠতে পারবে—অন্যের সঙ্গে মিলতে পারবে—দশের ভাবনা ভাবতে পারবে—আহার নিদ্রা যত বাড়াবে, তত বাড়বে। নিজের ভাবনা আর নিজের প্রয়োজনই যদি অত্যন্ত বেড়ে যায় তাহলে তাতেই তো জীবনের সব সমস্যা ও শক্তি নিঃশেষিত হবে—অন্যের কথা, দশের কথা আর ভাববার তখন সময় হবে কেমন করে? আর আজকাল যে দিনকাল।...দেহরক্ষার জন্য, চাকুরের সেবার জন্য নিজের দেহকেও সেবা করতে হবে—কিন্তু প্রয়োজন বাড়াবে না সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে—যতটুকু দরকার তা করতেই হবে—কিন্তু এই বৈরাগ্য জ্ঞান ক্ষেত্রে, মাটির ক্ষেত্রে না করলে মানুষ বিস্তার লাভ করতে পারবে না—দেহের ক্ষেত্রে মানুষ সব চেয়ে পরাধীন—সবগোড়ায় ছেলেকে মেওয়া যায়...কিন্তু ক্ষুধাতৃষ্ণার ক্ষেত্রে প্রাণ ধারণের ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে না বাঁচিয়ে খুব বেশীদূর যেতে পারবে না। এই স্তর থেকে মনের ক্ষেত্র আর বড়—মনে মনে সবাই মানুষ একথা ভাবা যায়; বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পঞ্চত্ব এক এতে আরও বড় হওয়া যায়...আনন্দের ক্ষেত্রে দুনিয়াদারী ভাল লাগে।...উপনিষৎ বলেছেন আনন্দকে যিনি ব্রহ্ম বলে জানেন, আনন্দকে যিনি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন তখনই তাঁর হাতে অন্ন সার্থক, তখন মানুষ অন্নাদ হয়।...যত মানুষ উপরে উঠে তত নীচের স্তরের অর্থ সার্থক হয়—Eddington... মালান যত উঁচু হবে, তিৎ তত নীচু করতে হবে—M. A ক্লাসের শিক্ষক ক্লাস 1 পড়াতে সব চাইতে যোগ্য—এটাই অরোভিলিয়ান্ মতো বইখানি—এক দের কয়লায় নিউ ইয়র্ক শহরকে তিন সপ্তাহ জ্বালাতে পারে atomised হলে—সীমার মধ্যে অসীম তুমি...। ভোগ করাতে হবে—কিন্তু অহংকার দিয়ে ত্যাগও সত্য নয়, ভোগও সত্য নয়—সেবা বুদ্ধি নিয়ে কর্ম যেতে হবে—যা কিছু কর সেবা বুদ্ধি নিয়ে করতে পারছ কিনা দেখ—না কি তোমার ব্যক্তিগত তাৎক্ষণ্য লাগা, ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধাই বড় কথা বা প্রধান কথা? সেবা বুদ্ধি বিশ্বনাথের প্রতি, সেবাবুদ্ধি সঙ্ঘের প্রতি—তুমি যা করছ, যা ভাবছ তা সেবা হচ্ছে কিনা এইটেই বড় কথা...। মানুষ খুব প্রকাণ্ড—মানুষের জীবনে কত কথা...গোলোক পল, বৃন্দাবন বল এই দেহেই—কেউ বাঁশী শুনছে, কেউ ডমরু শুনছে...। উপনিষৎ দেহকেই দেবালয়ঃ বলেছেন—দেবতা রয়ে আছেন আমার দেহের

মনোই—আমি যে দুঃখিনী তাহাতে সন্দেহ নাই [illegible] আজন্ম যাহা পাইয়াছি তাহা যে কত সত্য সে তত্ত্ব ছোটদের জানাইতে পারে, সাধ্য কাহারো তাহা ছোটদের এড়াইয়া চলে [illegible] চক্ষুই যেখানে ধোঁয়া হইয়া যায় সেখানে প্রার্থনা সরে—যে কিছু সম্ভাষণ নিয়ে এসেছি, আমি-অক্ষর যখন ফুটে উঠিবে, তখন আমি পুরুষোত্তম হয়ে গড়ে উঠব—পুরুষোত্তম ইচ্ছা অর্থাৎ—ব্রহ্মের মতন যতক্ষণ না চক্ষু ততক্ষণ আমার হওয়ার সাধ মিটবে না।...তুমি যে, গুরুর পাদপদ্মে বসে যেন তুমি কী অমৃত নিয়ে এসেছ...পুরুষোত্তম হওয়াই তোমার শেষ কথা...মরণ মরণ করে নিতে না পারলে পুরুষোত্তম-অমৃত পাওয়া যাবে না।...পুরুষোত্তম-চুম্বকের স্পর্শে তুমি পুরুষোত্তম হও—হরিদাস লাগি রহবে ভাই, মনন্তে মনন্তে মনি যাই

২৯, ১২, ৫৮ ওঁ নমঃ...ওঁ। উপনিষৎ সত্যের অন্তরে বাইরে ব্রহ্মকে আস্বাদন করাবার চেষ্টা করেছেন—তিনি অন্তরে তিনি বাইরে। যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে নানান দৃষ্টান্ত উপনিষৎ দিয়াছেন—আগুন যেমন কাঠের ভিতরে আছে, কাঠের বাইরেও, বায়ু গন্ধের ভিতরে আছে, বাইরেও। বাইরে যিনি তিনি transcendental অতীত; ভিতরে যিনি তিনি immanent—অন্তর্যামী আমার প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে জীবন আছে। বাপের বাইরে জীবন ছিল বলেই বাপ হওয়া সম্ভব হতে পেরেছে—অর্থাৎ প্রত্যেক অবস্থার ভিতরে যেমন একটা self contained পূর্ণতা আছে, তেমনি তার বাইরেও আছে।.. matter-এর অণুপরমাণুগুলি স্বাধীন না যাদের মত নাচিয়ে নাচিয়ে চলে—আমরা দেখছি অন্য রকম...। ডিমের ভিতরে যেমন তৈল, দুধের ভিতরে যেমন ঘি মাখন, তেমনি প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে ব্রহ্ম আছেন।...deductive—Mills logic। ব্রহ্ম থেকে জগৎ—জগৎ থেকেও ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। ...আগের ভিতরে রস আছে, তিল পিষলে তৈল হবে।...এই তো জীবনটা রয়েছে—এর থেকে কি করে ব্রহ্মকে বের করবে? দুধ থেকে যে process-এ মাখন বের করতে হয় তেমনি জীবন মন্থন করে ব্রহ্ম বের করতে হয় গুরু শিষ্যের মধ্যে ব্রহ্ম-তত্ত্বের একটা spark দিয়ে গেল...। গুরুর কাছ থেকে ব্রহ্ম-তত্ত্ব পেয়ে তাকে ধারণ করতে হবে...। গুরুর কাছ থেকে ব্রহ্মের অনেকে বড়ো-জীব মত সত্যানুভূতি ব্রহ্ম সৃষ্টি করতে পারে না। গুরুর অনুগত হয়ে ঐ মন্ত্রের জীবনের মধ্য দিয়ে আস্বাদন করলে ভগবানকে পাওয়া যায়।...ভগবান আগে আসেন না—শিষ্যের মধ্যে গুরুর দীক্ষা যা জীবনগত—তার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসেন আগেই খুব সাবধান হয়ে চলতে হবে। আমি অনেকবার বলেছি মন্ত্রোচ্চারণের আগের একটা গুরুতর experiment নিয়ে চলেছে। জীবন মন্থন করতে হবে... জীবন-জিজ্ঞাসা না থাকলে এখানে ঘুম পাবে না। যাদের যেমন সব জিনিষের মাত্রা বোধ হওয়া দরকার, তেমনি জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে...। মাত্রা-বোধই পুরুষোত্তম-তত্ত্বের বড় কথা। সূত্র অর্থ থেকে যারা তপীকৃত হয়ে তারা সূত্র...। মায়ের পেটের থেকে প্রত্যেকেই সূত্র হয়ে এসেছে... এখন জীবনটাকে সংস্কার করতে হবে—সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে, মাত্রা ঠিক রেখে সমস্ত বৃত্তিগুলির সমন্বয় করতে হবে—দুধের মাত্রা জ্বাল হওয়ার মাত্রা...। তাতে ধারা করতে কতটুকু জল লাগবে, কতটুকু আগুন, কতটুকু সময় লাগবে—সেই সব কিছুর মাত্রা ঠিক করতে হয়। বস্তুর—তত্ত্বের—সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ে মাত্রা-বোধই বড় কথা। তুমি কতখানি তৃপ্ত খেতে পারবে—প্রত্যেক আগুনের তাজ করে...তোমার প্রকৃতি ভেদে অনুযায়ী তুমি খাদ্য কতখানি কি পরিমাণ তাতে খেয়ে হিসাব করবে...। বুদ্ধ ভগবান মানেন না তবু তাঁর শিষ্যদের তাঁর প্রতি শরণাগতি ছাড়া উপায় নাই—বুদ্ধ experiment করেছিলেন। আইনষ্টাইন এ বৈজ্ঞানিকেরা কত বিনিদ্র রজনী experiment করেছেন...কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন...। ব্রহ্ম কোথায় একজন খুঁজতে বেরিয়ে ছিলেন...। গুরু সেটা বের করেছেন তিনি সমস্তটা তৈরী করে তোমাকে দিচ্ছেন...every one is a pilot in a calm sea, কিন্তু ঝড়ের ভিতরে তুমি বৈঠা বাইতে পারবে? আজ জীবনের চতুর্দিকে ঝড়; নূতন জীবন-চেতনা, নূতন নূতন মতবাদ, পুরাণ জীবনধারা সব ঘরের

যাওয়ার এই আবেষ্টনে এই স্তরের মধ্যে তুমি বাঁচতে চাইবে? ...ডক্টর ঠাকুরের সামনে যা কিছু ভাসা হয়...কিন্তু পরীক্ষা দিতে হলে জীবন্ত মানুষের কাছে দিতে হবে—শরণাগত না হলে চলবেই না...। নিত্যগোপাল তেমনই একজন গুরু যিনি এই সব কিছু ভাঙনের মধ্যে পথ দেখাতে পারেন, মানুষের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের সহজ সবুজ জীবনকে উত্তীর্ণ করতে পারেন। আমি তাঁর দীন সেবক...তাঁরই একটু কৃপা পেয়ে ধন্য হয়ে গেছি...জানি না কতখানি তাঁকে ধরতে পেরেছি...এখানে এসেছি—নিত্যগোপালকে ধরবার যে পথের কথা বলেছি সেই পথে চলো—ধন্য হবে। সংসার তো হলের ক্ষেত্র ছিল—কিন্তু হল বের করতে পারে কৈ মানুষ? মানুষ তো সংসারে জলে পুড়ে মরে।...ক্ষেতের গাছে তো হল ধরা—সেই ধরতে জানতে হবে তো? সংসারেও হল আছে—সেই ধরতে জানতে হবে...ডক্টর ঠাকুরের হুল থেকে ধরতে পারছে বাঙ্ময় চাই—ভক্ত বাঙ্ময় হলে ডক্টর তাঁকে থেকে নিতে পারবে সংসারের করতে পারবে কৌশল।...নিত্যগোপালের মধ্যে সেই ভক্তের ধন্য... অভক্ত অনন্তপ্রসাদের জন্য তিনি ধরবেন কোন্ পথে কি ভাবে?...তিনি তোর পথে কাঁটা ভাঙ্গা আঘাত করেন না...প্রেমের অমৃতধারাকে তুমি স্বাধীনভাবে পেয়ে... নিত্যগোপাল এসেছেন ধরার ধূলির ভ্রূকুটি স্বাগত করতে...।

৩০, ১১, ৫৬। ওঁ...ওঁ। নদীতে ভাটার টান যখন শেষ হয়ে আসে, তখন নদীর খুব নীচ দিয়ে জোয়ার আসতে থাকে—উপরে নীচে দুই রকমের টান হয়—সাগর থেকে বড় স্রোত নদীর বুকে ঢুকছে, ভাটার টান স্তব্ধ হয়েছে—সাগরের জল ঢুকলেই নদীর জল, সাগরে যাওয়া করতে থাকে। বর্ত্তমান যুগেও তাই হচ্ছে...খুব নীচ দিয়ে, খুব গভীরে শ্রীনিত্যগোপালের প্রাণ-প্রবাহ বিশ্বের ভিতরে আসছে...এই প্রাণ-স্রোতের সঙ্গে তাঁরই আশীর্বাদে যুক্ত ছিলাম...। সেইজন্য সাহস আছে, টাকা নেই তবু চলতে পারি। এই সমস্ত কর্ম্মের মূল তিনি। সমাজের লোক আজও দেখছে না—বাইরে অবনতি দুর্গতি চরম—অবস্থা প্রতিকূল খুব—কিন্তু এ তো আসবেই—এই সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে একটা প্রাণধারা এসেছে—সব দিকের চিরাচরিত ধারণা যখন বেগে খুব প্রবলেরা তখনই আবির্ভূত হতে পারে।.. মহন্মাবাদে আশ্রমের সঙ্গে এই প্রাণধারাকে বিশ্ব-সত্তাতে দেখেছিলাম বলে তোমরা। যারা আমার সঙ্গে আছে, তারা তখন যদি আমার সঙ্গে যুক্ত থাকত, শরণাগত হয়ে আমার বুদ্ধি দিয়ে নিজেদের গড়ে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করত, তাহলে প্রাণ-প্রবাহের তোমারটা আরও দ্রুত আসত ...তে চলে যাওয়া, এত বিপর্যয়... সত্ত্বেও শুধুই সেই প্রাণ-প্রবাহের জন্যই টিকে আছি।...মনে মনে মানুষের কাছ থেকে পাওয়া পিছটান আপাতত কমত...আমার দাবী ছিল—মনে মনে সে দাবী করব... যদি কল্যাণের প্রয়োজন থাকে আমার সঙ্গে এস হয়ে চল। ...আর যদি খেয়ালটোয়াল নিয়ে থাক..এখানে থাকার প্রয়োজন কি? শরণাগত হলে শ্রীনিত্যগোপালের যা গুণ তা তোমারও হবে...শুকনো নদী তাঁর টানে আবার এগিয়ে এগিয়ে যাবে...যৌবন জল-তরঙ্গ তোমারে কে, হয়ে ঘুমাবে। তাঁর আশীর্বাদে প্রাণ-প্রবাহের এ প্লাবন এগিয়ে চলবেই...। যারা ভাগ্যবান তারা জগন্নাথের এ রথযাত্রায় রজ্জু ধরতে পারবেন।...। চলবে ঠিকই —সারা জীবনের ইতিহাসে এই প্রমাণ করে যে আমি অল্প অল্প করে হলেও এগিয়েছি, এগোব। যারা অহংকার নিয়ে, আমি নিয়ে বাধা দেবে, তারা ছিটকে পড়বেই...।

ক্রমশঃ

গ্রাম-উন্নয়নের কথা

।। জনাব রেজাউল করিম ।।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলেছেন যে শহরের বিলাস ও প্রাচুর্য্য দেখে কেহ যেন মনে না করেন যে সমগ্রভাবে দেশ উন্নত হয়েছে। সর্ব্বাগ্রে দেখতে হবে লক্ষ লক্ষ গ্রামগুলির কোন উন্নতি হয়েছে কিনা। গ্রামে দেশের প্রকৃত সম্পদ নিহিত রয়েছে গ্রামের উপর। দেশের উন্নতি মানেই গ্রামের উন্নতি। সমগ্র দেশের সুখ সম্পদ শক্তি নিরাপত্তা স্বাস্থ্য শিক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতি নির্ভর করছে পাঁচ লক্ষ গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির উপর। গ্রামকে অবহেলা করলে দেশের উন্নতি হবে না। তাই গান্ধীজী বহু পূর্ব্বে গ্রামোন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তিনি ভারতের উন্নতি বলতে গ্রামের উন্নতিই বুঝতেন। গ্রামকে অবহেলা করলে "সর্ব্বোদয়" সমাজ গঠিত হতে পারে না। ভারতের সমগ্র অধিবাসীর প্রায় তিন ভাগ গ্রামেই বসবাস করে। গ্রামবাসীর উন্নতি, তাদের পরিবেশের উন্নতি, তাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, তাদের সাংস্কৃতিক ও মানসিক উন্নতি এ সব না হলে সমগ্র দেশ কাল-ক্রমে রসাতলে চলে যাবে। ভারতের উপর ইংরাজ দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছে। তারা নিজেদের স্বার্থের জন্য অনেক বড় বড় নগরের উন্নতি বিধান করেছে। পর্ব্বতে পর্ব্বতে বহু আরাম দায়ক শৈল নিবাস নির্ম্মাণ করেছে; কিন্তু তারা গ্রামকে করেছে সম্পূর্ণ অবহেলা। তাদের দুশো বছরের ইতিহাসে তারা একটিও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলে নি। বৃটিশ পার্লামেন্ট বিদায় গ্রহণের পর দেখা গেল যে দায়ী ভারতের গ্রামগুলি অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার পড়ে আছে। গ্রামে ভাল রাস্তাঘাট নাই, ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নাই। গ্রামবাসীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। এরূপ অবহেলিত অবস্থায় ভারতের গ্রামগুলিকে তাদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে বিদেশী শাসক নিশ্চিন্ত প্রস্থান করল। স্বাধীনতার পরও দেখা গেল যে ভারতের পাঁচ লক্ষ গ্রামের বিশেষ উন্নতি হয় নি। অবশ্য আমাদের স্বাধীন সরকার গ্রামের উন্নতির দিকে নজর দিয়েছেন। কিন্তু গ্রামের কতটা উন্নতি হয়েছে সেটাও বিবেচনা করে দেখতে হবে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কোন কোন গ্রামের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বিদ্যালয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সমগ্রভাবে গ্রামের উন্নতি হতে এখনও অনেক বাকী। আজও গ্রামাঞ্চলের অবস্থাটা কি? বহু গ্রাম বন জঙ্গলে পূর্ণ। মরলা পচা ডোবা ও খাল গ্রামের চারদিকে বিরাজমান। গ্রামের মধ্যেকার পুকুরগুলি মরলা জলে ভর্ত্তি তাতেই গ্রামবাসী স্নান করে। কোন কোন গ্রামে সেই পুকুরে গোমহিষাদিও নামে ও তাদের গা ধুয়ে দেওয়া হয়। এই প্রকার দূষিত জলে মানুষ নেয়া প্রয়োজনীয় কার্য্যকর করে, কাপড় কাচে, উহাই খাবার কাজে ব্যবহার করে। গৌণাদি কার্য্যও তাতেই করে থাকে। এই সব পুকুরের জলে কত ব্যাধির জীবাণু সৃষ্টি হয়। তার উপরে গ্রামে ভাল পানীয় জলের অভাব। গ্রীষ্মকালে এই অভাব আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইদারা ও নলকূপের ব্যবস্থা কোন কোন গ্রামে আছে বটে কিন্তু তা পর্য্যাপ্ত নয়। তাছাড়া সংস্কারের অভাবে সেসব নষ্ট হতে বসেছে। গ্রামে ভাল চিকিৎসা ব্যবস্থার অত্যন্ত অভাব। কঠিন ও মারাত্মক রোগের সময় হাতুড়ে চিকিৎসকের উপর নির্ভর করতে হয়। আর্থিক দৈন্য বশতঃ অধিকাংশ গ্রামবাসী মোটা ফি দিয়ে সহর থেকে ভাল চিকিৎসক নিযুক্ত করতে পারে না। সরৎচন্দ্র বর্ণিত 'পল্লীর সুমতি'র সেই হাতুড়ে ডাক্তারই অধিকাংশ গ্রামের একমাত্র সম্বল। অনেকের আবার হাতুড়ে ডাক্তারকে দেখাবার সামর্থ্যও নাই। তারা ভাগ্যের উপর, ভগবানের উপর নির্ভর করে থাকে।

এইভাবে অনাহারে, অনাহারে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের মধ্যে দরিদ্র গ্রামবাসীকে দিন কাটাতে হয়। তারা অর্দ্ধাহারে, অনাহারে, মাঠে কাজ করে, গৃহস্থালীর কাজ করে। আর দিনে দিনে শুকিয়ে শুকিয়ে সংসারে এই পুরুষানুক্রমে সাথে সংগ্রাম করে অবশেষে পরপারের পথে পা বাড়িয়ে দেয়। আমাদের দেশের গ্রামের কৃষককুল ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়েই জন্মগ্রহণ করে, সারা জীবন সেই বোঝা বহন করে চলে আর মৃত্যুর পর তাদের সন্তান সন্ততির উপর সেই ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে। এ'ত গেল স্বাভাবিক অবস্থার দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ইতিহাস তার উপর আছে প্লেগ, কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, অনাবৃষ্টি, বন্যার মত দৈব দুর্বিপাক। তখন পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশা চরম সীমায় উপনীত হয়।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর গ্রামের কৃষককুলকে বহু আশার বাণী শুনান হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তাদের অবস্থার বেশী উন্নতি হয় নি সত্য বটে, খাদ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে কৃষকের হাতে কিছু পয়সা এসেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যেরও মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতেই দাঁড়াচ্ছে যে কৃষকের প্রায় সব টাকাই খরচ হয়ে যাচ্ছে। জমিদারী প্রথা রহিত হয়েছে সত্য কিন্তু তার থেকে যতটা ফল আশা করা গিয়েছিল ততটা লাভ হয়নি। কৃষির মালিকদের নিকট থেকে গৃহীত উদ্বৃত্ত জমি কতদিনে যে কৃষিহীনদের মধ্যে বণ্টিত হবে তা জানিনা। কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন কৃষিহীন কৃষকদের কোন সুব্যবস্থা হবে না।

কিন্তু শুধু বলব যে হস্তক্ষেপ হলে চলবে না। আমাদেরকে সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে যে আমাদের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে গ্রাম। গ্রামের পর্ণকুটীরে যারা বাস করে তাদের কল্যাণেই আমাদের আসল কল্যাণ। সুতরাং গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও উন্নয়নের উপায় উদ্ভাবন করে যেতে হবে অবিরত চেষ্টার দ্বারা। এই মহৎ কাজ শুধু সরকার একা কিছু করতে পারবেন না। এ বিষয়ে সমগ্র দেশবাসীর দায়িত্ব আছে যথেষ্ট, উভয়ের সহযোগিতা ও সাহায্যে গ্রাম সংগঠন করতে হবে। সরকার দিবেন পরিকল্পনা, দিবেন প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক অর্থ। কিন্তু দেশবাসীকেই বিশেষতঃ গ্রামবাসীকে হৃদয় মন দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে। নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে যদি গ্রামবাসী গ্রাম উন্নয়নের কাজের ব্যাপারে চুপ করে বসে থাকে তবে কোন কাজই হবে না।

পশ্চিম বাংলার যে কোন একটি গ্রামে প্রবেশ করলে কতকগুলি বিষয় দৃষ্টি পথে পড়তে হবে। গ্রামে প্রবেশ করলেই দেখা যাবে চারদিকে ছড়িয়ে আছে কতকগুলি পচা পুকুর। দেখা যাবে যে স্নান ছেলেমেয়েরা স্নান করছে, সাঁতার দিচ্ছে, পানীয়ের ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাচছে, হাঁড়ি বাসন মাজছে আর পাশের ঘাটে বয়স্ক মেয়েরা অবগাহন স্নান করছে, অপরে ব্যবহারের জন্য কেউ কেউ কলসীতে জল ভরে নিয়ে যাচ্ছে। পুকুর থেকে একটু দূরে অগ্রসর হলে দেখা যাবে কতকগুলি শীর্ণকায় ছেলেমেয়েকে, তাদের কেউ কেউ নগ্ন দেহ, কেউ বা অর্দ্ধ নগ্ন। তাদের চোখে মুখে আনন্দের দীপ্তি নাই। তারা হয়ত খেলা ধূলাই করছে। কিন্তু তাদের সে খেলার মধ্যে প্রাণ-চাঞ্চল্যের একান্ত অভাব। আরও একটু অগ্রসর হলে হয়ত দেখা যাবে ছোট্ট একটি পাঠশালা। গ্রামের লোক-সংখ্যার তুলনায় পাঠশালার ছাত্র সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। তারপর সারা গ্রামখানি ঘুরে বেড়ালে আরও অনেক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়বে। বহু লোক নানা ব্যাধিতে ভুগছে। তাদের বিশেষ কোন চিকিৎসা হয় না। কাফ্‌সুঁক ডুকডাক, কবিরাজ, ডাক্তার, হোমিও ঔষধ এই সবই হচ্ছে তাদের অসুখের সময় ব্যবহার্য ঔষধ। গ্রামাঞ্চলে যখন কলেরা অথবা বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয় তখন সে কি অবর্ণনীয় অবস্থা। ডাক্তার অথবা ঔষধের বিশেষ ব্যবস্থা নাই। গ্রামের হতভাগা মানুষগুলি অসহায় অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর যে ভাগ্য বলে কোন রকমে বেঁচে যায় সে অন্ততঃ ছয়মাসের মত অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। সাধারণ লোক এখনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে টিকা বা টীনজেকসন নিতে চায় না। এ সব যেন

কেবল শিশুদের জন্য ব্যবস্থা। বয়স্ক লোকের যেন এ সবের কোন প্রয়োজন নাই, বড় সংখ্যক লোক এই বলে গর্ব্ব অনুভব করেন যে তারা জীবনে কোন দিন টিকা বা ইনজেকশন নেননি। আধুনিক যুগে রোগের নানা প্রকার চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু সে সবের অধিকাংশ গ্রামে প্রবেশ করেনি। ফলতঃ আমাদের বেশীর ভাগ গ্রাম এখনও মধ্যযুগের আবহাওয়া কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

সুতরাং পল্লী উন্নয়নের জন্য যে কোন পরিকল্পনা রচিত হোক না কেন, সর্ব্বাগ্রে ব্যবস্থা করতে হবে গ্রামবাসীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য। চাই সকল সুস্থ নীরোগ দেহ। প্রতিটি গ্রামে নিশ্চয়ই একটি করে হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে। জানি যে আমাদের দেশে ডাক্তারের অভাব আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। চার পাঁচটি গ্রামের জন্য একটি ডাক্তার নিযুক্ত করতে হবে। তিনি প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে এক একটি গ্রামের হাসপাতালে চিকিৎসা করবেন। কিন্তু গ্রামের রোগীরা যদি জানে যে তাদের গ্রামের হাসপাতালে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ডাক্তার আসবেন তাহলে সেই সময় সেই স্থানে রোগীরা উপস্থিত থাকতে পারবে এবং যথারীতি ঔষধাদি নিতে পারবে। বলেছি যে প্রত্যেকটি গ্রামে একটি করে হাসপাতাল থাকবে আর প্রত্যেকটি অঞ্চলে বা ইউনিয়নে একটি করে বড় হাসপাতালের ব্যবস্থা করতে হবে। তাতে থাকবে কতকগুলি শয্যা। এই সব হাসপাতালে ইনডোর ও আউটডোর এই দুপ্রকার রোগীরই চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। রোগাদি যাতে বিস্তার লাভ না করতে পারে সে জন্য প্রতিটি গ্রামের সব পুকুরগুলির আশু সংস্কার করতে হবে। পুকুরের মালিক যদি সংস্কার করতে সম্মত না হন তবে বিশেষ আইনের আশ্রয় নিতে হবে। একজন লোকের খেয়াল খুশীর উপর সমস্ত গ্রামের স্বার্থ ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না। গ্রামের চতুর্দ্দিকে যে সব জঙ্গল জন্মে থাকে অথবা যে সব অপ্রয়োজনীয় জঙ্গল সৃষ্টি হয়ে গেছে সেগুলিকেও পরিষ্কার করতে হবে। এজন্য একদল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা দরকার। আমাদের দেশে মান্ধাতার আমল থেকে কৃষি কার্য্যের যে পদ্ধতি চলে আসছে এখন তার আমূল সংস্কার প্রয়োজন কিন্তু তা সাধিত হবে? উত্তরে বলা হবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা। কিন্তু বাংলা দেশের কৃষিকার্য্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে গেলে বহু বিলম্ব ঘটবে। কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করা চলবে না। তাই বলি যে, গ্রামাঞ্চলে যে কৃষি যা প্রচলিত আছে তাকেই একটু সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করে প্রাথমিক ভাবে কাজ আরম্ভ করতে হবে। এখন আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করতে গেলে বহু বিলম্ব হবে। আমাদের দেশে যে উত্তরাধিকার আইন প্রচলিত আছে তার আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত সরাসরি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠবে।

সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করার প্রস্তাব অনেকেই সমর্থন করেন। এ পদ্ধতির অনেক সুবিধা আছে। গ্রামের জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে সমবায় পদ্ধতি যে অত্যন্ত কার্য্যকরী হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। সব জমিগুলি যদি সমবায় পদ্ধতিতে আওতায় আনা সম্ভব নাও হয় তবুও কিছু জমিতে যদি এরূপ করে সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করা হয় তবে সমবায়ের ও ব্যক্তিগত স্বার্থের কৃষকদের একটা প্রত্যক্ষ আকর্ষণ জন্মাবে এবং অকলে সমবায় পদ্ধতি সফল হলে অন্যান্য অঞ্চলে তা প্রসারিত হবে সহজেই। তখন নিজেরাই কৃষকগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে সমবায় পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করার জন্য আগ্রহ দেখাবে। বাস্তবিকই সমবায় পদ্ধতিতে সময় ও পরিশ্রম দুইই বাঁচবে। কিন্তু এদেশে সমবায় পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের পথে বহু অন্তরায় আছে। ইউরোপের কয়েকটি অঞ্চলে যত সহজে সমবায় প্রথা চালু হয়েছে, এ দেশে তত সহজ হবে না। তবুও বলব যে প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ দু চারটী আদর্শ সমবায় কৃষি ক্ষেত্র স্থাপন করতে হবে। কিন্তু যতদিন ব্যাপক-ভাবে সমবায় পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত না হয় ততদিন ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে উন্নত প্রণালীতে চাষের ব্যবস্থা করা দরকার। এদেশে বেশীর ভাগ জমিতে চাষ হতে থাকবে;

সুতরাং এই অবস্থা স্বীকার করেই চাষের উন্নতি বিধান করতে হবে। পশ্চিম বাংলায় কয়েকটি জেলাতে ক্যানেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু ক্যানেলের জলে কেবল মাউন ও আমন ধানই হবে। সারা বছর ধরে বিভিন্ন প্রকারের ফসল হবে না। বিশেষ করে বাণিজ্যের দোনো উপকার হবে না। কারণ সে জন্য জমিতে বারোমের জন্য জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা চাই। নতুবা বলিতে হবে না। সুতরাং প্রয়োজন পুকুরিণী ও নলকূপের। যে সব অঞ্চলে ক্যানেল নাই সে সব অঞ্চলে যদি প্রয়োজন মত পুকুরিণী ও নলকূপ অথবা ইদারা খননের ব্যবস্থা হয় তবে গ্রামের কৃষকগণ সেই জলের সাহায্যে চাষের সকল সময় নানা প্রকার তরিতরকারি ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন করতে পারবে। পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশ জেলাতে সাধারণতঃ একটি কি দুটি ফসল উৎপন্ন হয়। পুকুর ও কূপের উপযোগী নলকূপের ব্যবস্থা হলে আরও বেশী রকমের ফসল হ'তে থাকবে। কোন জমিই পতিত থাকবে না। এমন কি ডাঙ্গা জমিতেও ফসল হবে। পুকুরের চারিপাশে নানা রকমের ফলের চাষও হতে পারবে। এসব কাজ করতে হলে দীর্ঘ মেয়াদ পরিকল্পনার দরকার হবে না। অল্প অল্প কাজ করলে প্রত্যেক জেলাতে নানা ভাবে চাষের উন্নতি হতে থাকবে।

আজকাল প্রায় প্রত্যেক গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এখনও হয় নি। একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত গ্রামের প্রত্যেক বালক ও বালিকাকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। সেই সঙ্গে প্রাপ্ত বয়স্কদেরও শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতে হবে। এমন ভাবে শিক্ষাদান করতে হবে যেন আগামী দশ বছরের মধ্যে কোন গ্রামেই একজন লোকও নিরক্ষর না থাকে। একটা বিষয় দেখা গেছে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত হলে অভ্যাসের অভাবে অনেক ছাত্র ছাত্রী সব ভুলে যায়। তাদের শিক্ষা চর্চ্চার অভ্যাস যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্য প্রত্যেক গ্রাম বা দু তিনটি গ্রাম নিয়ে একটি করে পাঠাগার স্থাপন করতে হবে। জেলা পাঠাগারের তত্ত্বাবধানে এই সব গ্রাম্য পাঠাগার পরিচালিত হবে। এর ফলে কৃষকদের ছেলেরা নানা ধরণের পড়বার সুযোগ পাবে। এই পাঠাগারের মাধ্যমে মাঝে মাঝে সময়োপযোগী বিষয় নিয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা হলে আরও ভাল হবে।

গ্রামের কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার উদ্যোগী হয়েছেন। খুবই ভাল কথা। কুটির শিল্প গ্রামবাসীর জীবনে নব জাগরণ এনে দিবে। তাতে তাদের কিছু উপার্জনও হবে। দেখা গেছে ধান পাট চাষ করার পর গ্রামের অধিকাংশ কৃষিজীবী প্রায় ছয় মাস বেকার বসে থাকে। তাদের সামনে কোন বিশেষ কর্ম্মের উপায় উদ্ভাবিত থাকে না। এই সময় যদি কিছু কাজের ব্যবস্থা করা যায় তবে তাতে গ্রামের বিশেষ উপকার হবে। গান্ধীজী এই অবস্থার কথা চিন্তা করেই চরকা ও অন্যান্য কুটির শিল্পের প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করে ছিলেন। এখনও দেখা যাবে যে যেখানেই চরকা প্রবর্ত্তিত হয়েছে সেখানেই দরিদ্র গ্রাম্যবাসীর উপার্জ্জন কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য চরকা চালু করলে ও প্রত্যেক কাটুনী মাসে তিন থেকে চল্লিশ টাকা উপায় করতে পারবে।

আবার এই সব অনাদৃত কুটির শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। আজকাল এই গ্রামে ধান ভাঙ্গা কল স্থাপিত হয়েছে। ফলে গ্রামে ঢেঁকি বিদায় নিতে বসেছে। পূর্ব্বে গ্রামে এই দরিদ্র মেয়ে ঢেঁকিতে ধান ভেঙ্গে কিছু উপার্জ্জন করত। কিন্তু আজ ধান ভাঙ্গা কলের প্রসারে তাদের উপার্জ্জনের সে পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ধান ভাঙ্গা কলের ছাঁটা চালের পুষ্টিমূল্য অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। ঢেঁকি চালু করবার জন্য আন্দোলন করতে হবে যেন গ্রাম থেকে অচিরেই ধান ভাঙ্গা কলের প্রাদুর্ভাব কমে যায়।

আচার্য্য বিনোবাজি গ্রামদানের মাধ্যমে যে নয়া সমাজ গঠনের পরিকল্পনা উপস্থিত করেছেন তৎ প্রতি দেশের সকল শ্রেণীর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। গ্রামদান এমন একটা আদর্শ যা সমগ্র গ্রামবাসীর মধ্যে নূতন আদর্শ স্থাপন করবে। গ্রামের জমি দু'চার জন লোকের নয়—সমগ্র গ্রামবাসীর মধ্যবিত্ত পরিবারের

এতগুলি কুঠারী নিয়ে গ্রাম গড়ি, মনে হয় তার এক কাঠা জমি নাই যে-ও গ্রাম-জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ। গ্রামের মধ্যে তাদের হাজার দরিদ্র ভূমিহীন গৃহহীন মানুষ আছে। গ্রামের প্রতিটি জমিতে তাদেরও একটা অংশ আছে, অধিকার আছে। তাদের সঙ্গে বন্টন করে গ্রামের জমি ভোগ করতে হবে। বিনোবাজির আদর্শ গৃহীত হলে গ্রামের দারিদ্র্য ও অভাব দূর হবে। গ্রাম-সমাজ গড়ে উঠবে। গ্রামের বিবিধ সমস্যার সমাধান হতে যাবে। যাদের মন বস্তুতান্ত্রিক তারা বিনোবাজির আদর্শ উপলব্ধি করতে পারবে না। কিন্তু যাদের প্রাণে এতটুকু মানবপ্রীতি আছে আজ তারা সকলেই উপলব্ধি করেছেন যে গ্রামদানের আদর্শ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আদর্শ আর নাই। সামগ্রিক ভাবে গ্রামের উন্নতি করতে হলে গ্রামদানের আদর্শই গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক গ্রামবাসীকে বিনোবাজির আদর্শ গ্রহণ করবার জন্য আহ্বান জানাই। বহু দিন ধরে গ্রাম অবহেলিত। আর অবহেলা করলে চলবে না। গ্রামের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি। সুতরাং গ্রামের উন্নতির জন্য সর্ব্ব প্রকার উদ্যোগ করতে হবে।

একটি অপ্রকাশিত লেখা

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিত

(শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের নিজের হাতে লেখা এই পৃষ্ঠা কয়টি বহু বৎসর আগের লেখা। হাতের লেখা, রচনার ধরণ, কাগজ প্রভৃতি দেখিয়া সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে ইহা ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পূর্বের ইহা কোন সম্পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ বা রচনা নয়, মনে হয় ইহা কোন বক্তৃতা দিবার আগের নোট; অথচ ইহার মধ্যে অনেক তত্ত্ব রহিয়াছে যাহা রক্ষা করা নিতান্ত উচিত। এজন্য লেখাটুকু রক্ষা করিবার ইচ্ছায় ইহা উদ্বোধনে ছাপাইয়া সকলের নিকট উপস্থিত করিলাম। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের যে কোন লেখাই গভীর জ্ঞান ও তত্ত্বের ধারক, তাই তাঁহার এতটুকু লেখাও নষ্ট না হয় ইহাই আমাদের প্রচেষ্টা।—স—উদ্বোধন)

প্রণতি শ্রীশ্রীনিতাগোপাল

অক্ষয় উপাসনা

মূকং করোতি বাচালং

নিজের জীবনে প্রমাণিত।

১। জীব ঋণের বোঝা মাথায় করিয়া চলিতেছে, ঋষিঋণ শোধ করিতেই এই প্রয়াস। আরও

২। জগতের প্রত্যেক জীবে নিজের দিয়া নিজেকে বুঝিতে না চাহিলে সে অপূর্ণ এবং তাহার ভগবানও অপূর্ণ। নিজেকে জগতের সঙ্গে ভেদাভেদ ভাবে চিন্তা করিয়া শ্রীভগবানকে ধরিতে বিশ্ব একটী organism। প্রত্যেক জীব এই দেহে একটী কেন্দ্র, কোনও স্থানে কাহারও স্বামিত্ব নাই। বাঁচিতে হইলে কোন স্থানকে আটকাইয়া রাখিবার যো নাই। রাখিলে সে অহঙ্কারে ক্লীবত্ব বা জড়ত্ব পাইবে।

৩। জ্ঞান তাঁহার, তিনি প্রাণে প্রাণে যাহা বুঝাইয়াছেন তাহা তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিতে অভিলাষী। তিনি শ্রোতারূপে আমার সমীপে, তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞান তাঁহার সেবায় লাগাইয়া আমি কৃতার্থ হইব। এই জ্ঞান তাঁহার কৃপায় পাইয়াছি, একটুও আমার বলিয়া মনে করিতে পারি না।

চরাচরব্যাপ্তস্য তস্যোপাসনেঃ তাৎপর্য্যমবিদ্বাৎ—চরাচরের যাবতীয় ব্যাপার তাঁহার রসে ডুবিয়া আছে বলিয়া তাঁহার রসলীলার মাধুর্য্য প্রকাশিত করিতেছে। আজ প্রকৃতিরাণী এত অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিতা; তাঁহার প্রাণে

আজ এক রসের খেলা খেলিতেছে সে জড়তা পরিত্যাগ করিয়া আজ নবযৌবন লাভ করিয়া কুলবধূ-মোহিনী বেশে সেই গোপীলীলার যোগ দান করিতে পারিতেছে। আজ সবস্ত প্রকৃতি বসন্তোৎসবে মত্ত; বসন্তোৎসবের পরিণতি শ্রীশ্রীরাসলীলা। গোপলীলা রসের লীলা, কিন্তু রসের অনুভূতি জ্ঞানের ভিতর দিয়া না গেলে হয় না। রস জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হইলে তামসিকতায় পরিণত হয়। তাই শ্রীশ্রীগোপলীলায় যোগদান করিতে হইলে যোগমায়া-রক্ষিত বিদ্যাশক্তির অর্চনা আজ একান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বিদ্যাশক্তি কি প্রকারে প্রকাশিত?

বিদ্যাশক্তি নামে যা কম্পনের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই কম্পনই অক্ষরব্রহ্মে প্রকাশিত। অক্ষরের উচ্চারণ ও লয় এ দুইটী মাত্রের প্রকাশে এই কম্পন নিত্য রহিয়াছে উহা অক্ষর অর্থাৎ ন ক্ষয়, অর্থাৎ উহা নিত্য। তাই তাহার কম্পনও নিত্য, যেহেতু কম্পন ব্যতীত প্রকাশই অসম্ভব। আবার বিদ্যাশক্তি কম্পনের ভিতর অক্ষরব্রহ্ম ও জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছে এই অক্ষর বিন্দুর নিত্য উপাস্য অক্ষর ওঁকার দেহে কম্পন উৎপাদন হয়; কম্পন প্রতিমুহূর্তেই হইতেছে। সেই নামেই প্রত্যহ যারা হৃদয়কে উর্দ্ধরাগে রঞ্জিত করে এই অক্ষর হইতে জগতের উৎপত্তি এবং এই অক্ষর অবলম্বনে রসসাগরে ভাসিতে হইবে।

অক্ষর পঞ্চাশটী, তাই পঞ্চাশৎকৃপা পুথা; তার প্রকাশিত হইতে হইলে পঞ্চাশটী কম্পন ব্যতীত প্রকাশিত হইতেই পারিবে না। ইহাই মৌলিক (!) উচ্চারণ।

আর্য্যদের অক্ষরই মৌলিক, অন্য পক্ষে আর সব উচ্চারণ মৌলিক নহে পরন্তু মিশ্র। অক্ষরগুলি মানবের মস্তিষ্কান্তর্গত ষট্‌চক্রের ভিতর অগ্নিময়ী দীপ্তিতে আছে। এই মহাভাব সর্বশাস্ত্রের ভিতর দিয়াই নিত্যে প্রকাশিত হইতেছেন, হিন্দু তাহা জানিতেন তাই সকল ধর্মশাস্ত্র; ব্যাকরণের ঋষি পাণিনি পড়ুয়াদের; আয়ুর্বেদের ঋষি মহাদেব, বসনাদি পাঠে তিনি প্রকাশিত; অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহারই মহিমা। প্রত্যেক শাস্ত্রে কি ভাবে সেই রসময়ের রসময়ী জ্ঞান আছে তাহা দেখাইব।

ব্যাকরণ:— অক্ষরাণাং অকারোস্মি।

"অ" নির্গুণ, বৈয়াকরণিক মাত্রই জানেন। "অ" নির্গুণ বটে কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধি আছে। তাঁহার বৃদ্ধিও নির্গুণ, তিনি অন্য আছিয়াও বহু হইতে পারেন এই তত্ত্বই ইহাতে প্রচারিত। অক্ষরের বৃদ্ধিতে 'আকার' অর্থাৎ আকৃতি বা shape, তাই আকারও নির্গুণ। শ্রীজগন্নাথের আকার প্রাকৃত নহে কিন্তু অপ্রাকৃত।

আকার ও বিসর্গের তত্ত্ব মীমাংসা—জগৎ জ্ঞানময় ও শ্রীজগন্নাথও জ্ঞানময়—ইহা বিশ্ব জ্ঞানের ভিতরে বৃহৎ হইতেও বৃহৎ জ্ঞান ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয়ই সত্য।

চক্ষু ও জগৎ ভিতর দিয়া এই তত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে।

ধর্ম্ম: সাম্যাবস্থা উভয়ের প্রধানো ধর্ম্ম:।

শ্রীশিবের তত্ত্ব মীমাংসা।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির একত্র সন্নিবেশন; শ্মশান ও সংসার; তালী ও গম্ভীর ধর্ম্ম।

সরলতা ও কুটিলতা—

শ্রীশিবই সমদৃষ্টি। তাই মহাভাবজগতে শ্রীরাধা ও শ্রীশিব অভেদ, উভয়েই জগতে মহাভাব প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

বিজ্ঞান শাস্ত্র:—

বিদ্যুৎ—ধনাত্মক ও ঋণাত্মক positive negative বা পুরুষ ও প্রকৃতি। ইহার ভিতরে ঐ তত্ত্বই ব্যক্ত।

অঙ্কশাস্ত্র:—

G. C. M. বা গ, সা, ও

L. C. M. বা ল, সা, ও।

G. C. M.—ব্রহ্ম

L. C M.—ভগবান

শ্রীশ্রীবিদ্যাশক্তিকে বুঝিতে হইলে এই জগতের মধ্য দিয়া বুঝিতে হইবে; তিনি সর্বভূতে গূঢ়। তিনি এক হইলেও হৃদয় ভিতর প্রকাশিত; প্রত্যক্ষ উপাসনা অবলম্বনীয়। এই জগৎ প্রত্যক্ষ কিন্তু যা সর্বব্যাপী হইলেও সাক্ষাৎভাবে পাইতেছি না। তাই জগতের মধ্য দিয়া

তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিতে হইবে নচেৎ নিগুণা মায়ের পূজা হইবে না। দেখিতে হইবে যে কোন্ কোন্ ভাব যা বস্তুর ভিতর দিয়া প্রকাশিত। তিনি শ্রীগুরুমূর্তির ভিতর আমার সমীপে আমাদের জ্ঞানদানে ব্যস্ত। তিনি নিগুণ হইয়াও আমাকে ধরিবার জন্য আসিয়াছেন, এই অচিন্ত্য লীলা সাধনা ব্যতীত বুঝিবার শক্তি নাই এই গুরুদেব শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু দুই মূর্ত্তিতে আমায় প্রকাশিত। দীক্ষাগুরুর ভিতর দিয়া জ্ঞানানন্দময়ী মা পরাবিদ্যা দান করিতেছেন আর শিক্ষাগুরুর ভিতর দিয়া ঐ পরাবিদ্যা লাভ করিবার পথের শিক্ষাগুলি দিয়া চিত্তশুদ্ধি করিতেছেন।

পূর্ণব্রহ্মসনাতনসর্বশক্তিময়ী মা এই জগতের প্রত্যেক সত্তার ভিতর দিয়া প্রকাশিত; তাই এই জগৎও আমার গুরু। এই বিশ্বশিক্ষালয়ে আমরা সকলেই শিষ্য। এই বস্তুর ভিতর দিয়া তিনি নিজের পূর্ণ-সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানকে প্রকাশিত করিতেছেন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের ভিতর দিয়াই মায়ের প্রকাশ ধরিতে হইবে। তাই নিত্যাভৈরবকারিণী মায়ের রূপ প্রাকৃত রূপের ভিতর চিন্তনীয় হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ পূজার ব্যবস্থা শাস্ত্রেও আছে। যে পর্য্যন্ত এই জগৎ জড় এবং তিনি চৈতন্যময়ী সেই পর্য্যন্ত সব ভেদভাবে অবস্থিত, সে পর্য্যন্ত জগতের ভিতর দিয়া মাকে বুঝিতে অভ্যাস করিবে; এই জগৎ বাদ দিয়া শ্রীভগবানকে পূজা করিতে আকাঙ্ক্ষা করিলে তাহা ফলবতী হইবে না। মায়ের সৃষ্টি বিদ্যা ও অবিদ্যাকৃত এই তত্ত্ব সাধন ব্যতীত উপলব্ধি হইবে না। সেই মা-ই পুস্তক, সোপান ও কলসের ভিতর দিয়া প্রকাশিত, তাই এই অবলম্বনগুলির ভিতর দিয়া মাকে বুঝিতে হইবে, ধরিতে হইবে, ছুঁইতে হইবে। নচেৎ মাতৃপূজা কিছুতেই হইবে না।

জড় কোথায়? সব যে চেতন। জড়ের ভিতর দিয়া চেতনকে বুঝিতে গিয়া সব চেতন হইয়া যায়। জড় বাদ দিয়া চৈতন্য বুঝিতে গেলে ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ। তাই চেতনকে ধরিতে হইলে কিম্বা বিশ্বই যে জ্ঞানানন্দময়ীর প্রকাশ ইহা বুঝিতে হইলে জড়ের ভিতর চৈতন্যময়ীকে স্থাপন করিতে হইবে। জড় বলিয়া কিছু নাই, শুধু মায়ার জড় ভেদ এই ভেদবুদ্ধি। একমাত্র চেতনাই বহু আধারে প্রকাশিত। ইহাই লীলাময়ের লীলাবৈচিত্র্য।

মা তাই বীণা রঞ্জিত পুস্তক করে বিরাজিত।

কবিত্ব কি?

ধর্মবিজ্ঞান পরিপক্ক হইলে কবিতাকারে প্রকাশিত হয়। শ্রীভগবান আদি কবি। এই বিশ্বই শ্রীভগবানের রসময়ী কবিতা। এই রসলীলায় মন (?) সমর্পিত হইয়া অপূর্ব্বতা ধারণ করিয়াছে। শ্রীভগবান এই ভেদগুলির ভিতর দিয়া কি অপূর্ব্ব রস আস্বাদন করিতেছেন। যিনি ভেদের সত্যতা স্বীকার না করেন তিনি প্রকৃত কবি নন, তিনি একদেশদর্শী।

শ্রীকৃষ্ণাবতার পূর্ণ

জগতের প্রত্যেক ভাব আধ্যাত্মিক কিম্বা জগৎই যে আধ্যাত্মিক।* এই জগতের কিছুই ভেদ নহে, সমস্ত রসলীলার পোষক। পরন্তু যাহাকে শ্লীল বলিয়া আখ্যা দিয়াছি তাহা আমাদের যে অশ্লীলতার ভিতর দিয়াই বিশেষভাবে পুষ্টি লাভ করিয়াছে ইহা ভেদভাবে আবদ্ধ জীব ধারণা করিতে পারিবে না। বিশ্বাশক্তির পূর্ণ আরাধনা না হইলে, মহাযোগিনীর পূজার পাপে পুণ্যে সেই পরম পুরুষের প্রকাশ না দেখিলে সে প্রকৃত কবি হইতে পারিবেন না। তিনি moralist হইতে পারেন কিন্তু কবি বা রসিক নহেন। যিনি যতখানি এই জগৎ-তত্ত্বকে অন্তরের ভিতর ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন তিনি তত বড় কবি! এই জগৎ আমাদের চক্ষে শ্লীল অশ্লীলতা পরিপূর্ণ তাই পূর্ণ কবির কবিতাও শ্লীলতা অশ্লীলতা পরিপূর্ণ হইবে। প্রকৃত কবিতার লক্ষণ এই যে, যে ভেদভাবে ইচ্ছা সে সেই ভাবে সেই কবিতা আস্বাদন করিবে সাধু সাধুর ভাবে, অসাধু অসাধুর ভাবে জগৎকে বুঝিতেছে; প্রকৃত কবিতায় লেখাও যে রকম সে সেইরূপ বুঝিবে!

আমাদের প্রত্যেক অসৎ বৃত্তিগুলিও নিত্য ইহারাও শ্রীসময়ের লীলার সহায়কারিণী। কাম ক্রোধাদি শ্রীভগবানের সেবায় বড়ই মধুর। বিশ্বদেবীর অর্চনায় বিশ্বদ্রষ্টাও আত্মস্থ বুঝিতে না পারিলে যে জগতের এক অংশকে ব্রহ্ম বলিয়া মানিবে ও অপর অংশকে

ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করিবে—এই ভেদ যতদিন থাকিবে ততদিন কবিতা প্রকাশিত হইবে না।

পূজা হইতেছে না কেন? প্রশ্নের অভাব।

শ্রীশ্রীগীতা হইতে দুইটী শ্লোকের ব্যাখ্যা উদ্ধারের প্রয়াস—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

প্রার্থনা

মা! আমরা মূঢ় হইলেও তুমি জ্ঞানময়ী। তোমার অর্চনায় আমরা পৌত্তলিক বলিয়া আখ্যাত হইলাম। তোমার পূজার মর্ম বুঝিয়া গিয়াছি। জ্ঞানময়ীর পূজার নিত্যের আবশ্যক ব্যাপারে তোমার জ্ঞানের প্রকাশ না দেখিয়া বিভাব পূজায় কত ও চেতনের পার্থক্য বুঝিতে পারিতেছি না তাই আমরা পৌত্তলিক। পুতুলও যে তুমি, জড় বলিয়া যে কিছু নাই, একমাত্র জ্ঞানময়ী তুমিই যে আছ ইহা যদি আমরা তোমার পূজায় বুঝিতাম তবে আর তোমার নামে কলঙ্ক হইত না। তাই মা বরদে জ্ঞান দেও যেন তোমার নামে, তোমার পূজার ধন্য হইতে পারি।

ত্বাং সর্বাত্মতাপ্রাপ্তং যেষাং হৃদয়মাস্থিতম্
ক্রীড়ার্থমীশ্বরার্থেন তেষু নিত্যকৃতাত্মন।
মন্তাধীনো ভ ইতি মোদনী।

'মানুষের জন্য ধর্ম এবং ধর্মের জন্য মানুষ—দুই-ই সত্য হইতে পারিত যদি ধর্ম বলিতে বিশেষ কোন ধর্ম না বুঝাইয়া সর্বধর্মসমন্বয়ই বুঝাইত। সর্বধর্মসমন্বয়ই মানুষের স্বধর্ম। প্রতি মানুষ এই হিসাবে স্বধর্মী, সর্বধর্মী। .....ইহাও সত্য যে প্রত্যেকটি ধর্মই স্বয়ংপূর্ণ, উহা ঐ সম্প্রদায়ের সকল স্তরেরই আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও তুল্যভাবেই সত্য যে, কোনও বিশেষ দেশ-কাল-পাত্র বা বিশেষ দৃষ্টিকোণের মধ্যে সমগ্র মানবসমাজকে, এমন কি কোনও বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানুষকেও আটকাইয়া রাখা যাইবে না। সব বিশেষত্বকে ছাপাইয়া অখণ্ড বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানব ও মানবসমাজ আগাইয়াই চলিয়াছে, চলিবেও।'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-কৃত মহাস্বাজীর গঠনকর্ম পদ্ধতি

রাষ্ট্রভাষা প্রসংগে

॥ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ॥

রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজনীয়তা যে কেবল সরকারী কাজ কর্মের মধ্যেই নিবদ্ধ তাহা নহে, জাতীয় সংস্কৃতি, সংস্কৃতি ও এক-জাতীয়তা বোধ সৃজনে ও সংরক্ষণে রাষ্ট্রভাষার প্রভাব অপরিসীম। সুতরাং কোন্ প্রদেশের বা কোন্ শ্রেণীর প্রাধান্য লুপ্ত বা রক্ষিত হইতে চলিল এইসব ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া অথবা গুণাধিক্য তত্ত্বে ভীত হইয়া রাষ্ট্রভাষা নিরূপণে অগ্রসর হইলে চলিবে না, দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতেই সমাধান করিতে হইবে এই সমস্যার।

সর্ব্বপ্রথমেই আমাদিগকে একটি বিষয়ে মন স্থির করিতে হইবে। আমরা কি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিত্তিতে বর্ত্তমান জ্ঞান বিজ্ঞান সহায়ে দেশ গঠন করিয়া খাঁটি জাতীয় হিসাবে জগৎ-সভায় সম্মান ও আসন লাভ চাই, না এতাবৎকাল যেমন চলিয়া আসিয়াছি, দাসমনোবৃত্তি প্রসূত ইংরাজের অন্ধ অনুকরণে এই দেশটাকে একটি নকল ফিরঙ্গ ভূমে পরিণত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চাই? যদি প্রথম আদর্শটিকেই আমরা বাছিয়া নেই তবে অন্যান্য আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান সম্পন্ন স্বাধীন দেশসমূহের মত আমাদিগকেও পরাধীনতা যুগের শাসকজাতি নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রভাষা ইংরাজির মোহ ত্যাগ করিয়া যে কোন একটি বা একাধিক জাতীয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা দিবার সৎ সাহস অবলম্বন করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল প্রভৃতি দেশনেতা ব্যক্তিগণ সকলেই ছিলেন জাতীয় ভাষার সমর্থক। গান্ধীজি বলিতেন, 'মাতৃদুগ্ধ যেমন প্রয়োজন দেহের পুষ্টি-বিধানের জন্য তেমনই প্রয়োজন মাতৃভাষার জাতির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানসিক বিধানের জন্য'। রাষ্ট্রভাষা নিরূপণ প্রসঙ্গে স্বর্গীয় জওহরলাল নেহরু বলিয়াছিলেন—"No nation can become great on the basis of a foreign language. Why? Because a foreign language cannot be the language of the people." সুভাষচন্দ্রও তাঁহার আজাদহিন্দ্ ফৌজের জাতীয় সঙ্গীত ও অনুপ্রেরণা সঞ্চার প্রধান করিয়া ছিলেন হিন্দী ভাষায়। এমন কি এংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের নেতা ফ্রাঙ্ক এণ্টনী পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, "I realise that English cannot for many reasons be the national language of the country"। কোন দেশই বিদেশী ভাষার মাধ্যমে স্বীয় সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না এবং তাহা পারে না বলিয়াই পৃথিবীতে এমন একটি স্বাধীন দেশও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না যেখানে কোন বিদেশী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এমন কি নবসৃষ্ট দেশ ইসরাইল, যেখানকার সর্ব্বাধিক সংখ্যক অধিবাসীই ইংরাজি আর জার্মান ভাষাভাষী, সেখানেও দেশের সর্ব্বজনীন মতন কামনায় লুপ্তপ্রায় জাতীয় ভাষা হিব্রুকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, ইংরাজি বা জার্মান ভাষাকে সহকারী রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গণ্য করা হয়। আয়ারল্যাণ্ড তাহার জাতীয় ভাষা মৃতপ্রায় গৈলিক ভাষাকে প্রাণ-সঞ্চার করিয়া ইংরাজির স্থলে ঐ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করিবার জন্য কি প্রয়াসই না করিয়া চলিয়াছে। চীন-ও জাপানী ভাষা শিক্ষা করা খুবই কঠিন ও সময়-সাপেক্ষ এবং ঐ সব দেশে ইংরাজি জানা লোকের সংখ্যা আমাদেরই অনুরূপ, তথাপি তাহারা তাহাদের জাতীয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা দিয়াছে, ইংরাজি ভাষার সঙ্গে কেহ অপেক্ষাকৃত ওকালতিও করে নাই। আমাদের সঙ্গে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে পাকিস্থান, বর্মা, সিংহল

প্রভৃতি দেশ কিন্তু ঐসব দেশে নিজ নিজ মাতৃভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ব বাংলা তো তাহার মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিবার জন্য কত অমূল্য জীবন আহুতি দিয়াছে, কেবল তাহাই নহে ১৯৭১ সনের মধ্যে বাংলা ভাষার মাধ্যমে সকল প্রকার উচ্চ স্তরের শিক্ষা দিবারও সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে। ইহাই প্রকৃত স্বাধীন ও বীর্যবান জাতির লক্ষণ। আর আমরা কি করিয়াছি?

হিন্দী বিরোধী আন্দোলনের নামে অর্থাৎ সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত সংবিধান বিরোধী আন্দোলনের প্রবর্তন করিয়া বিদেশী ভাষা ইংরাজিকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সহকারী রাষ্ট্রভাষা রূপে বহাল রাখিবার জন্য জীবন দিয়াছি ও জীবন দিয়াছি এমন কি জাতীয় সম্পত্তি সহ মাননীয় রাষ্ট্রপতির অনুদান পাঠাগার ও শ্রীহট্টবাসীর স্বাধীন দান ধ্বংস করিয়া পৈশাচিক নৃত্যে মত্ত হইতেও লজ্জাবোধ করি নাই।

তবে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, এবং তাহা এই যে মাদ্রাজসহ দাক্ষিণাত্যের ২৩টি প্রদেশ ও পশ্চিম বাংলা ভিন্ন এই হিন্দী বিরোধী তথা ইংরাজির পক্ষে আন্দোলন কিন্তু ভারতের অন্যত্র অনুষ্ঠিত হয় নাই। ইহার কারণ এই যে মাদ্রাজ ও বাংলাই সর্বপ্রথমে ইংরাজের ও ইংরাজিয়ানার দাসত্ব বরণ করিয়া নেয় এবং ইংরাজের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়া ইংরাজি ভাষার দৌলতেই প্রতিষ্ঠা স্থাপন করে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সুতরাং ইংরাজির আধার প্রকৃষ অর্থাৎ নিজেদের প্রতিষ্ঠা লোপের আশঙ্কায় এই প্রদেশদ্বয় যে বিচলিত হইয়া উঠিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? দাক্ষিণাত্যের কথা আর কি বলিব, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, প্রফুল্লচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক বিশেষ ভাবে রবীন্দ্রনাথের অবাকধিত ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই দেখিতেছি কি শিক্ষা দীক্ষায়, কি কথাবার্তায়, কি পোষাক পরিচ্ছেদে, কিবা চাল চলনে নকল সাহেব সাজিবার প্রতিযোগিতায় নামিয়াছেন। তাঁহারা জাতীয় ভাষার কথা বলাটাকে কিবা জাতীয় দোষের পরিচয়টুকু বেশ একটু কৃপার দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন। আর যাক, ইংরাজি ভিন্ন বাংলাভাষার মাধ্যমে যে উচ্চশিক্ষা দেওয়া চলে তাহা পর্যন্ত তাঁহারা বিশ্বাস করিতে রাজী নন। যখন কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমস্যা আসিয়া দেখা দেয় তখনই শুধু স্বার্থ হানির ভয়ে চিৎকার সুরু করেন বাঙালী বলিয়া বা বাংলা ভাষার দোহাই দিয়া। প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা ভাষা বা বাংলার কৃষ্টির প্রতি আমাদের নাই বিন্দুমাত্র অনুরাগ।

অতএব স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে যে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত অন্যান্য দেশগুলি ইতিমধ্যেই পরাধীনতা প্রসূত দাস মনোবৃত্তি ত্যাগ করিয়া প্রকৃত দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, আর আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি বটে কিন্তু মানসিক গঠনের দিক হইতে এখনও রহিয়া গিয়াছি ইংরাজের দাসানুদাস।

ইংরাজিকে রাষ্ট্রভাষারূপে বহাল রাখিবার জন্য যে সব যুক্তি দেখান হয় তাহা প্রধানতঃ এই—

(১) ইংরাজি একটি উন্নত ভাষা (২) ইংরাজি আন্তর্জাতিক ভাষা (৩) ইংরাজির দরজা খোলা না থাকিলে আমরা বিশ্বের জ্ঞানের আলো হইতে বঞ্চিত রহিব (৪) ইংরাজি ভাষার প্রভাবেই একদা ভারতবর্ষে ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। আবার আর এক শ্রেণীর ইংরাজির অন্ধ ভক্ত আছেন যাহারা ইংরাজির পক্ষে কোন ভাল যুক্তি দেখাইতে না পারিয়া ইংরাজি ভাষাকে একেবারে ভারতের জাতীয় ভাষা বলিতেও কুণ্ঠবোধ করেন না যেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইংরাজি জানা লোক, যাহাদের মাতৃভাষা ইংরেজি নহে তাহাদের নিয়াই ভারতীয় জাতি গঠিত।

বাংলা, রুশ, ফরাসি, চীন, জার্মেনী প্রভৃতি ভাষার ন্যায় ইংরেজিও যে একটি উন্নত ভাষা তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু তাই বলিয়া ইংরাজি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হইবে কোন্ যুক্তি বলে? রাষ্ট্রভাষাকে যে একটি উন্নত ভাষা হইতেই হইবে এমন কথা পৃথিবীর কোন দেশই স্বীকার করে না। যদি তাহাই না হইবে তবে জগতের প্রত্যেক স্বাধীন দেশেই কোন না কোন

একটি উন্নত ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষারূপে বিরাজমান দেখা যাইত। আবার যাহারা ইংরাজিকে আন্তর্জাতিক ভাষা বলেন তাঁহারাও একটা মিথ্যার কুহেলিকা সৃষ্টি করিতেছেন মাত্র। ইংরাজ-অধ্যুষিত গুটি কতক দেশ ভিন্ন ইংরাজি ভাষার ব্যাপক প্রচলন কুত্রাপি নাই। এমন কি ইংলণ্ডের সংলগ্ন কন্টিনেন্টের কোন দেশেও ইংরাজি জানে এমন লোকের সাক্ষাৎও বিরল কদাচিৎ। আর থাক, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েলস্ প্রদেশেও ইংরাজি জানে এমন লোকের সংখ্যা মাত্র শতকরা বিশ জন। হাঁ, তবে প্রত্যেক দেশেই হাজারে ২৪ জন ছেলে মেয়ে অতিরিক্ত হিসাবে অন্যান্য বিদেশী ভাষার ন্যায় ইংরাজিও শিক্ষা করে। কেহ পড়ে ব্যবসায়ীর বা পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ করিবার জন্য, কেহ পড়ে বিদেশী সাহিত্যের রসাস্বাদন করিবার জন্য, আবার কেহ বা পড়ে অন্যান্যের মাঝখানে নিজেদের জ্ঞান শিক্ষাকে অধিকতর সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিবার জন্য। অতএব অন্যান্য স্বাধীন দেশে ইংরাজি বা অন্যান্য বিদেশী ভাষার জন্য যতটুকু সহজ খোলা আছে আমাদের দেশেও ঠিক ততটুকুই খোলা রাখিতে হইবে। তাই বলিয়া দেশের প্রত্যেকটি ছাত্রকে একটি বিদেশী ভাষাকে শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়া তাহাদের জীবনের তথা জাতির কর্মশক্তি ও অর্থের অপচয় ঘটাইবার পক্ষে কোন যুক্তি আছে কি? তারপর, ইংরাজি শিক্ষার জন্য নহে, একদিকে স্বাধীনতার স্পৃহা এবং অপর দিকে ইংরাজ-বিদ্বেষকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিতেছিল দেশে একতা। তাই দেখিতে পাই ইংরাজি শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন সত্ত্বেও স্বাধীনতা লাভের ও ইংরাজ চলিয়া যাওয়ার পরেই আবার দেখা দিয়াছে অনৈক্য প্রদেশে প্রদেশে ও আতিতে আতিতে। ঐ শিক্ষার ফলে একতা গড়িয়া উঠা তো দূরের কথা এই আতিভেদের ফলে বরং আরও একটা অতি ভয়ঙ্কর ভাতিভেদ সৃষ্টি হইয়াছে ঐ শিক্ষার প্রভাবে ইংরাজি অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞের মধ্যে। এই সব কুযুক্তি ভিন্ন আরও একটি কুযুক্তির অবতারণা করেন ইংরাজির সমর্থকগণ হিন্দীর বিরুদ্ধে। তাঁহারা বলেন দেশের শতকরা মাত্র ৪০ জন লোক হিন্দীভাষা-ভাষী সুতরাং হিন্দীর রাষ্ট্রভাষা হইবার কোন যোগ্যতা নাই। বলি, দেশের বড় জন লোক ইংরাজি জানুক বা নাই জানুক, এমন ভাষারা যদি থাকিতেন, যাঁহারা প্রাদেশিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে দেশ ও জাতির কল্যাণ সম্বন্ধে মন দিতে চাই তবে ইংরাজি ভাষার কোন দাসসুলভ মোহ যত শীঘ্র সম্ভব ত্যাগ করিবার জন্য এবং অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের মত যে কোন একটি এতদ্দেশীয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তবে রাষ্ট্রভাষা যাহাই হউক না কেন, প্রত্যেকটি প্রাদেশিক ভাষাকেই দিতে হইবে সম মর্যাদা এবং ঐ ভাষার মাধ্যমেই চলিবে যাবতীয় প্রাদেশিক সরকারি কাজকর্ম এবং প্রাদেশিক উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়কে তাহাদের মাতৃভাষা ব্যতিরেকেও শিক্ষা করিতে হইবে প্রাদেশিক ও রাষ্ট্রভাষা। রাষ্ট্রভাষার মাধ্যমে চলিবে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ ও আন্তঃপ্রাদেশিক ভাব বিনিময়। অবশ্য রাষ্ট্রভাষা উন্নত হইলে ঐ ভাষাতেও চলিতে পারিবে সকল প্রকার উচ্চ শিক্ষা দেওয়া প্রদেশে প্রদেশে, যেমন চলে ফ্রান্সিয়ার একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ফরাসীর মাধ্যমে।

ক্রমশঃ

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্ব প্রকাশিত)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় করাই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-ভাবের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মা এবং ব্রহ্ম অভেদ বলিয়া আত্মাও সর্বব্যাপী বলিতে হয়। অথচ তুমি-আত্মা কি অনুভব করিতেছ যে তুমি-আত্মাই চেতনাবিশিষ্ট সকল প্রকার সকল দেহে এবং অন্যান্য স্থানে আছ? সে অনুভব ত তোমার হইতেছে না। তবে তুমি চেতনা-বিশিষ্ট সকল প্রকার সকল দেহে এবং অন্যান্য সকল স্থানে আছ কি প্রকারে বলিবে? তুমি-আত্মা কেবল একটী চেতনাবিশিষ্ট এক প্রকার দেহে অবস্থান করিতেছই অনুভব করিতেছ। তুমি-আত্মা আপনাকে সীমাবিশিষ্টই জানিতেছ। তুমি-আত্মা আপনাকে অনন্ত-বোধও করিতেছ না। তুমি-আত্মা আপনাকে নির্বিকার বোধও করিতেছ না। তুমি-আত্মা নিজে নিত্য কি অনিত্য তাহাও ত বুঝিতেছ না। তুমি-আত্মা নিজে ছিলে কি না ছিলে তাহাও ত বুঝিতেছ না। তুমি-আত্মা পরে থাকিবে তাহাও ত বুঝিতেছ না। তবে তুমি কি প্রকারে তুমি-আত্মা গ্রহীত বাহা তাহাই নিত্য অনিত্য সত্য?

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত

শঙ্করাচার্য উক্ত ষট্‌চত্বারিংশ শ্লোকে 'সর্বমাত্মেতি' বলিয়াছেন বলিয়া

অদ্বয়ত্বোপায়ং লোকোব্যবহারক্ষমোপি সন্।
অসত্যপো যথা স্বপ্ন উত্তরক্ষণবাধিতঃ ॥ ৫৬
স্বপ্নোজাগরণেহলীক: স্বপ্নে জাগরণেপি হি।
যস্মেব নহে নাস্তি সন্দেহোপি উভয়োর্ন চ ॥ ৫৭
ত্রয়মেব জগন্মিথ্যা গুণত্রয়বিনির্ম্মিতং।
অস্ত ত্রষ্টা গুণাতীতো নিত্যো হ্যেকশ্চিদাত্মকঃ ॥ ৫৮

বলা যায় না। কারণ শঙ্করাচার্য কর্তৃক সমস্তই আত্মা স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া সমস্তই সত্য বলিতে হয়। কারণ বেদান্তমতে আত্মা সত্য। জাগরণ, স্বপ্ন এবং

সুষুপ্তিও 'সমস্ত' ব্যতীত অন্য কিছু নহে, সুতরাং ঐ তিন অবস্থাও মিথ্যা নহে।

একত্রিংশ সিদ্ধান্ত

অতি দূরস্থিত আকাশেই নীলত্ব দর্শন হয়, কিন্তু তোমার নিকটস্থ আকাশে নীলত্ব দর্শন হয় না। তুমি আকাশের যেখানে নীলত্ব দর্শন করিয়া থাক, সেখানে যাইলে তথায় আর নীলত্ব দর্শন করিবে না। তোমার নিকট হইতে মরুস্থলের যে অংশ তোমার অতি নিকটস্থ তথায় ও তোমার ভ্রমবশত জল দর্শন হয় না। বিশ্বে তুমি অবস্থানই করিতেছ, বিশ্ব তোমার অতি নিকট, বিশ্বের সহিত তোমার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বিশ্ব যদি না থাকিত, তাহা হইলে তাহাতে কি প্রকারে অবস্থান করিতে? বিশ্ব যদি না থাকিত তাহা হইলে তুমি তাহা দর্শনও করিতে না। বিশ্ব যদি তোমার নিকট হইতে বহু দূরে অবস্থান করিত, তাহা হইলে তুমি বলিতে পারিতে ভ্রমবশত বিশ্বদর্শন হইতেছে। সেইজন্য বলি, ভ্রমবশত অতি দূরস্থিত আকাশে যে নীলত্ব দর্শন হয়, তাহার সহিত তোমার অতি নিকটস্থ বিশ্বের তুলনা করিলে, তাহার ন্যায় তোমার অতি নিকটস্থ বিশ্বকে মিথ্যা বলিতে পার না। সেইজন্য বলি তোমার নিকট হইতে মরুস্থলের যে অংশ অতি দূরস্থ, তথায় তুমি ভ্রমবশত যে জল দর্শন কর তাহার সহিত তুমি যে বিশ্বে বাস কর তাহার সহিত, যে বিশ্ব তোমার অতি নিকট সে বিশ্বের তুলনা করিয়া তাহার ন্যায় তোমার সেই অতি নিকটস্থ বিশ্বকে মিথ্যা বলিতে পার না। নিকটস্থ স্থাণুতে কেহই ত ভ্রমবশত পুরুষ দর্শন করে না। যে বিশ্বে বাস করিতেছ, তাহাও তোমার অতি নিকট; তাহা যদি সত্য না হইত, তাহা তুমি দর্শনই করিতে না। তাহা যদি সত্য না হইত, তাহা হইলে তাহা তুমি স্পর্শ করিতেও সমর্থ হইতে না। সেইজন্যই বলি—

'যথৈব ব্যোম্নি নীলত্বং যথা নীরে মরুস্থলে।
পুরুষত্বং যথা স্থাণৌ তদ্বদ্বিশ্বং চিদাত্মনি।' ৬১

বলা সঙ্গত হয় নাই।

দ্বাত্রিংশ সিদ্ধান্ত

শঙ্করাচার্যের প্রতিপন্ন শ্লোকের মতে আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। তবে তিনি ঘৃত, বেতাল, গন্ধর্বপুর এবং বিচন্দ্রের বিষয় উল্লেখই বা কি প্রকারে করিয়াছেন? তাঁহার মতে যদি জগৎ নাই, তাহা হইলে তিনি জগতের উল্লেখই বা কি প্রকারে করিয়াছেন? তিনি ঐ সকলের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া ঐ সকল সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানও ছিল বলিতে হইবে। তিনি 'ঘৃতেবৈতালো গন্ধর্বনগরং পুরং' এবং 'বিচন্দ্রবৎ' প্রভৃতি শব্দগুলি যে ব্যবহার করিয়াছেন সে সকল শব্দও সত্য। যদি বলা হয় সে সকল শব্দ মিথ্যা, তাহা হইলে তাঁহার অদ্বৈত প্রতিপাদক যত গ্রন্থে যত শ্লোক আছে, সে সমস্তও মিথ্যা। তাহা হইলে তাঁহার রচিত নানা গ্রন্থে যে আত্মা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও মিথ্যা। তাহা হইলে তাঁহার রচিত নানা গ্রন্থে যে আত্মজ্ঞান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও মিথ্যা। তাহা হইলে তাঁহার রচিত নানা গ্রন্থে যে ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও মিথ্যা। শঙ্করাচার্য তাঁহার নানা গ্রন্থে সত্য বুঝাইবার জন্য যে বাক্যশক্তি ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি অসত্য বুঝাইবার জন্যও সেই বাক্যশক্তি ব্যবহার করিয়াছেন; অথচ তাঁহার মতানুসারেই সেই বাক্যশক্তিকেও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। কারণ শঙ্করাচার্যের মতে আত্মাই ত সত্য। বাক্যশক্তি তো আত্মা নহে, তবে তিনি তাহা অবলম্বনে তাঁহার নানা গ্রন্থে সত্যাত্মাকে কি প্রকারে বুঝাইয়াছেন? তাঁহার মত-সমস্ত অসত্য বাক্যশক্তিদ্বারা তাঁহার নানা গ্রন্থে তিনি যে সত্যাত্মাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার আত্মজ্ঞানের বিপরীত ভাবেরই পরিচয় দিয়াছে।

ত্রয়স্ত্রিংশ সিদ্ধান্ত

শঙ্করাচার্যের দ্বি-একটি শ্লোকানুসারে বেতাল মাইও প্রতিপন্ন করা যায় না, এবং জল-শূন্য স্থানে কখন কখন বেতাল দর্শন করা যায় না, ইহাও বলা যায় না। কারণ পূর্বে অনেকেই বস্তু দ্রব্য আছে বলিয়াই জানিতেন না,

কিন্তু পরে সেই সকল যে আছে তাহা বুঝিয়াছেন। এক্ষণে বেতাল আছে তিনি দেখিতেছেন না, পরে তিনি বেতাল আছেও ত জানিতে পারেন। অনেকেই পূর্বে কত দৃশ্য দর্শন করেন নাই, পরে যে তাঁহারা সেই সকল দর্শন করিতে সক্ষম হইবেন না, এ কথা তুমি বলিতে পার না। কেবে বেতাল তিনি দর্শন করিতেছেন না, পরে কখন তিনি বেতাল দর্শন করিতে সক্ষম হইবেন না, এ কথা কখনই বলা যায় না। জগতে এমন কত লক্ষ লক্ষ আছে যাহাদের আমরা এখন দেখি না, যাহাদের নামটুকু পর্যন্ত আমরা জানি না, তাহারা আছে তাহাও আমরা জানি না। সেই প্রকার বেতাল নাই, তুমি ইহা কখনই সিদ্ধান্ত করিতে পার না। অনেক হয় পুরাণে বলেন বেতাল আছে। অতএব শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির সহিত তুমি দর্শন-স্পর্শনযুক্ত জ্ঞানে এই স্পষ্ট পরিদৃশ্যমান জগতের কখনই তুলনা করিতে পার না। জগৎ যে আছে, সে সম্বন্ধে পূর্বেও প্রমাণ করা হইয়াছে বেতালের অস্তিত্ব যে প্রকারে প্রমাণ করা হইয়াছে, সেই প্রকারেই খপুষ্প গন্ধর্বদিগের 'পুর'ও প্রমাণ করা যাইতে পারে। নানা পুরাণ-তন্ত্রে গন্ধর্বদিগের 'পুরের' ও 'গন্ধর্বদিগের' উল্লেখ আছে। ঐ সকল গ্রন্থের মতে গন্ধর্বদিগের 'পুর' ও 'গন্ধর্বগণ মিথ্যা নহে। শ্রদ্ধা-দৃষ্ট গন্ধর্বপুরের সহিতও এই জগতের তুলনা হইতে পারে না প্রকৃত গন্ধর্বপুরও হয়ত কেহ কখন দর্শন করিয়াছেন কিন্তু এই প্রত্যক্ষ জগৎ প্রায় সকলেই দর্শন করিতেছেন। যে সকল লোক অন্ধ-কাল হইতে অন্ধ, তাহারা জগৎ দর্শন না করিলেও জগৎ যে আছে, ইহা তাহারা নিশ্চয়ই বোঝে। কারণ তাহারা এই জগতে বাস করিতেছে, এই জগতে তাহাদের অন্ন নিশ্চয়ই সৃষ্টি রহিয়াছে, সুতরাং তাহাদের সেই 'আধার' জগতের অস্তিত্ব কি প্রকারেই বা অস্বীকার করিবে?

চতুস্ত্রিংশ সিদ্ধান্ত

চন্দ্র নাই, এ কথাও বলা যায় না। কারণ যাহার চক্ষু আছে তিনি আকাশে চন্দ্র দর্শন করিয়া থাকেন। জগতে অনেক লোকেরই চক্ষু আছে। সুতরাং জগতের অনেক লোকই আকাশে চন্দ্র দর্শন করিয়া থাকেন। আকাশের চন্দ্রালোকে এই জগৎও আলোকিত হয়, তাহা কোন্ দৃষ্টিশক্তি ব্যক্তি না দেখিয়াছেন? এক চন্দ্র এবং সেই এক-চন্দ্রের শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল। কোন প্রকার চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে আকাশে এক-চন্দ্রের প্রকাশে দ্বি-চন্দ্র দর্শন হয় বটে, কিন্তু ঐ প্রকার রোগেও প্রকৃত পক্ষে আকাশে এক-চন্দ্র প্রকাশিত না থাকিলে ত দ্বি-চন্দ্র দর্শন করা যায় না। এক-চন্দ্রই দ্বিতীয় চন্দ্র দর্শনের কারণ। 'এক' বহু হইবারও অনেক প্রমাণ আছে। কোন কোন শ্রুতি এবং বেদান্ত অনুসারে একই আত্মা। কিন্তু আমি-আত্মা আমার এই দেহ ব্যতীত অন্যান্য দেহেও আছি কি বোধ করিতেছি? আমার ন্যায় প্রত্যেকেই, তাঁহার দেহ ব্যতীত তিনি অন্যান্য দেহে আছেন বোধ করেন না। সুতরাং শ্রৌত এবং বৈদান্তিক মতে একাত্মাকেই বহু দেহে বহুত্ব প্রতিপন্ন করা হইল। এক-চন্দ্র এবং এক-জগৎ যে সত্য, তাহা পূর্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। তোমার মতে কোন চক্ষুরোগগ্রস্তের এক-চন্দ্রের সহিত যে দ্বিতীয় চন্দ্র দর্শন করা হয়, সেই দ্বিতীয়-চন্দ্রও যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে এই এক-জগৎ যে মিথ্যা, ইহা কখনই বলিতে পার না। কারণ অনেকবারই প্রমাণ করা হইয়াছে, এই যে 'এক-জগৎ' যাহাতে আমরা বাস করিতেছি, তাহা সত্য। তোমার ঐ দ্বি-চন্দ্র দর্শনের উপমানুসারে যদিনি এই জগতের সহিত অপর জগৎ প্রকাশিত দেখিতাম, তাহা হইলে বরঞ্চ তুমি নিজ মতানুসারে সেই দ্বিতীয় জগৎ মিথ্যা বলিতে পারিতে। পরমহংস-শঙ্করাচার্যের ব্রহ্ম-মাধুরী-মালায় একোনবিংশ শ্লোকে আছে, 'ব্রহ্ম জগৎ সর্বমিতি'। সুতরাং ঐ পরমহংস শঙ্করাচার্যের মতেই যে জগৎ মিথ্যা নহে সে বিষয় সন্দেহ কি আছে? তাই বলি 'ঘটেষু নষ্টেষু যথাকাশো গন্ধর্বনাশাৎ পুরং যথা।
যথাকাশে দ্বি-চন্দ্রত্বং তদ্বৎ সত্যে জগৎ স্থিতং ॥ ৬২ ॥'

পঞ্চত্রিংশ সিদ্ধান্ত

শঙ্করাচার্যের ত্রি-ঘটী শ্লোকানুসারে জল ও তদ্ভব অন্নের। তাম্র ও তাম্র-পাত্র যেমন অন্নের বুদ্বুদ হয়,

যজ্ঞেশ ঐ শ্লোকানুসারেই আত্মা ও ব্রহ্মাণ্ড অভেদ বুঝিতে হয়। তিনি বলিয়াছেন,

'যথাস্তরন্ধ্রসম্ভোনৈর্জগমেঃ স্ফুরতাদৃশম্।
সাক্ষাদপেত তাদৃগ্ হি ব্রহ্মাণ্ডৌঘৈস্তথাস্তরা॥'

ঐ মহাত্মাই পরবর্তী শ্লোকে বলিয়াছেন,

ঘটনাদ্যা যথা পৃথ্বী পটনাদ্যা হি তদ্বয়ঃ।
জগদাদ্যা চিদাকাশি ভেদঃ তত্ত্ববাদকঃ॥

আমরা বলি, পৃথ্বী ঘটাকারে হইলে তবে ত তাহার নাম ঘট হয়। ঘট এই নাম উচ্চারণ করিলে ঘট ও পৃথ্বী এই দুই বোধই হয় তবে এই দুই অভেদ, এ বোধ হয় বটে। পৃথ্বীই ঘট এ বোধও হয় বটে। পট এই নাম উচ্চারণ করিলে পট ও তন্তুনিচয়, এই দুই প্রকার বোধই হয়। তবে এই দুই অভেদ, এ বোধ হয় বটে। তন্তুনিচয়ই পট, এ বোধও হয় বটে। চিৎ জগদাকার না হইলে চিৎ জগদ্রূপে অভিব্যক্ত হন না জগৎ এই নাম উচ্চারণ করিলে জগৎ ও চিৎ এই দুই প্রকার বোধই হয় তবে এই দুই অভেদ এ বোধ হয় বটে চিৎই জগৎ এ বোধও হয় বটে। শঙ্করাচার্যের অপরোক্ষানুভূতির শ্লোকানুসারে জগৎ মিথ্যা কি প্রকারে বলা যায়? সে মতে চিৎ সত্য, সেই চিৎই ত জগদাকার। অতএব আমি সেই চিজ্জগৎ মিথ্যা কি প্রকারে বলি? আমাকে সেই চিজ্জগৎ সত্যই স্বীকার করিতে হয়।

ষট্‌ত্রিংশ সিদ্ধান্ত

তাম্র-পাত্র গলাইলে যেমন তাম্রই থাকে, তদ্রূপ জগৎ লয় হইলে কেবল চিদাত্মাই থাকিবেন। যেমন তাম্র-পাত্র গলাইলে সেই তাম্র-পাত্রের অভাব হয় বটে, তবে তখন তাম্রের অভাব হয় না, তাম্র বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ জগতের লয় হইলে জগতের অভাব হয় বটে, তবে তখন চিদাত্মার অভাব হয় না, চিদাত্মা বিদ্যমান থাকেন।

সপ্তত্রিংশ সিদ্ধান্ত

জনক আত্মা। অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের পঞ্চটী শ্লোকে বলা হইয়াছে,

'সর্ব্বোঽপি ব্যবহারস্থ ব্রহ্মণা ক্রিয়তে জনৈঃ।
অজ্ঞানাৎ বিজ্ঞানস্থি দ্বানেন হি ঘটাদিকম্।'

জনগণ সর্ব্ব-ব্যবহারই ব্রহ্মের বিধি অনুসারে করিয়া থাকেন। সুতরাং কোন অবস্থাতে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলা যায় না। যে ঘট দর্শন করে, যাহার ঘট বোধ আছে, তাহার মৃত্তিকাই যে ঘট এ বোধও আছে। ঘটই যে মৃত্তিকা, তাঁহার এ বোধের অভাব আছে বলা চলা যায় না। মৃত্তিকা যেমন ঘটাকার হইয়াছে, তদ্রূপ শঙ্করাচার্যের মতানুসারে যদ্যপি ব্রহ্মশক্তি জগদাকার হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যে শক্তি জগৎ দর্শন করিতেছে, যাহার জগৎ বোধ আছে, তাহার ব্রহ্মই যে জগৎ এ বোধও আছে জগৎই যে ব্রহ্ম তাহার এ বোধের অভাব আছে বলা যায় না অতএব সেইজন্য

'সর্ব্বোঽপি ব্যবহারস্থ ব্রহ্মণা ক্রিয়তে জনৈঃ।
অজ্ঞানাৎ বিজ্ঞানস্থি দ্বানেন হি ঘটাদিকম্।'

বলিলেই হইত।

অষ্টত্রিংশ সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের ষষ্ঠটী শ্লোকে বলিয়াছেন—

'কার্য্যাকারতা নিত্যং ভাতি ঘটত্বযোগিবৎ।
তস্যৈব শ্রুতিযুক্তিভ্যাং প্রথক ব্রহ্মণোরিব॥'

মৃত্তিকা যখন ঘট হইতে থাকে, তখনই কার্য্য বিদ্যমান থাকে। ঘট-লক্ষণ সমাপ্ত হইলে কার্য্য আর বিদ্যমান থাকে না। তবে ঘট কার্য্যের পরিচায়ক বটে ব্রহ্ম যখন প্রপঞ্চাকার হন, তখন অবশ্য কার্য্যাকারও হন

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

– ১৯৫৩, ১৯৫৪ –

(৫৯)

ঠাকুর, আমার কীর্তিকথা লইয়া সংকোচে—রাজনীতি সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে, তোমাকে যখন স্থাপিত করিতে তো পারি নাই হেলেনেরেরা তোমাকে নেয় নাই, সমাজের লোক নেয় নাই, রাজনীতিতে তোমার স্থান গড়িয়া উঠে নাই। কত যে আমার বেদনা আছি আর কি বলিব। কেমন করিয়া তোমার জীবন ও দর্শন সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত করিব? শক্তি আমার নাই, যোগবল নাই। বর্তমান সময়ে যেরূপ সভ্যতা, তাহাতে তোমার সম্বন্ধীয় লেখা যদি লক্ষ লক্ষ leaflet করিয়া ছড়াইয়া দিতে পারিতাম, ঘরে ঘরে যদি তোমার আশ্রিতেরা তোমার কথা শুনাইত, সমাজের চেহারা বদলাইয়া যাইত। এস আমার জীবনে লক্ষ্মী ঠাকুর আমার! তোমার পায়ে পড়ি ...মটর কৃষ্ণগোপাল আসিয়া আমাকে ইনজেকশান দিয়া যায়, আমার পরম প্রিয়তা এটার টালিগঞ্জ ডাক্তারখানা প্রভৃতির বাসায় বসিয়া ও শ্রীনিতাগোপালে বিহরণ করিতে যায় আমি এটার পুরে মঠে যাই। নিত্যপ্রকাশানন্দ আসিয়াছে। তাহার সঙ্গে ঠাকুরের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বিদেশ হতে বই-এর 'সমন্বয়, নিত্যানিত্য সমন্বয়' প্রভৃতি লেখা যে ঠাকুরের তাহা ইহারা জানে না। বলে কি না, 'এই বই কি আপনার লেখা?'। এমন যে-মঠের সন্ন্যাসী তাহার সমন্বয় কোথায়? শ্রীনিতাগোপাল পুস্তিকার হেডমিস্ট্রেস নাম সে পছন্দ করে না। লিখিয়াছে সে, নাম দিব আমার কি করিয়া? উনবাঞ্চাশীও তো ছিলেন। ৯৯-টার রামপ্রসাদ সহ কিরি। তাহার নিকট মঠে বিদায় জন্য আগামী বুধবারের সভার বিজ্ঞাপন দিয়া যেই।

১২ই ডিসেম্বর

রাধারাণি আমার, বিশ্বের সকল পরিণামের, সকল স্পন্দনের পুরুষোত্তম-ছন্দ সৃষ্টি তুমি, তোমাকে বুকে লইয়াই বিশ্বপ্রকৃতি পুরুষোত্তম চক্রে গড়িয়া উঠিতে চাহিতেছে। তুমি আমার সাধ্যসাধনা, হৃদয়ের পুষ্পদল, জীবনসর্বস্ব। আমার গর্বের বিষয় তুমি, সারা জীবনের কল্পনার সৃষ্টি তুমি। তুমিই মহাসিদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী নৈর্ঋতী। পুরুষোত্তমে আমার তনুনির্বাণ লাভ হউক। আমি পুরুষোত্তম লিখিয়া যাই বসুদেব যেমন কড়বাদলের নিশুতি দিয়া পুরুষোত্তমকে বুকে লইয়া যমুনা পারি দিয়াছিলেন আমাদেরও তেমনি এই দুর্যোগের নিশুতি দিয়া নিতাগোপালকে লইয়া তুরোহিত বিষনদী পারি দিতে হইতেছে কৃষ্ণকে যাইব বিনা কৃষ্ণকে চলুই জানেন...মঠের কথাই বেশুরো সোর আসে। তাহার সঙ্গে কথা হয় পূর্বে দার্শনিক বিপ্লব না আনিলে কি করিয়া মঠ ও সঙ্ঘের 'আদর্শ'র সমন্বয় হইবে? শঙ্কর বলেন ব্রহ্মদর্শনই শ্রান্তি; আর বুদ্ধ বলেন, 'ক্ষণিকেষু স্থিরত্বাদি শ্রান্তিঃ অবিদ্যা'। কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে নিই? কাহাকেও বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। শ্রীনিত্যগোপাল বুদ্ধ-শঙ্কর সমন্বয় মূর্তি রামকৃষ্ণ ও শ্রীনিতাগোপালের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তাহা বুঝিতে হইবে। ৪ টায় পর পাঠ হয়। 'ত্রৈগুণ্য-বিষয়াঃ বেদাঃ' শ্লোকটী। ঠাকুরের মন্তব্যগুলি লিখিবার জন্য পাঠ করা আরম্ভ হয়। ৬ই কর্মঃ প্রেম উজ্জ্বল ভারতের দেখে দেখে। নিত্যব্রতকে ১০টা পেনিসিলিন দিতে হইবে। কি করিব টাকা না দিয়া? তাহার শরীরের যে অবস্থা আর এদিকের আর্থিক যে অবস্থা তাহাতে টাকা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। আমিই বা কোথা হইতে দিব! শরীরটা ভাল না হলিয়া আজ আর মঠে যাই

না। দুপুরে স্নান করি নাই ১৩ই ডিসেম্বর

ঠাকুর, এই দেহ লইয়া কেমন করিয়া তোমার কাজ করিব, কেমন করিয়া তোমার জীবন ও দর্শন ছড়াইয়া দিব? দ্বিতীয় এমন তো কেহ নাই যে এই কাজের ভার নেয় বরং সকলেই প্রতিক্রিয়াশীল, পিছন দিকেই টানাটানি করে। তোমার সম্প্রদায়ের কেহই তোমায় দেখা পর্যন্ত নাই দেশের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া তোমার জীবন ও দর্শনকে বুঝিতে চায়। তোমাকে 'ভগবান' প্রতিপন্ন করিবার যে প্রচেষ্টা ইহাদের তাহাতে হাসি পায়। বর্তমান বিশ্বের যুগে তোমার জীবন ও দর্শন আলোচনা করিবার কি কেহ আছে তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে? খুব সন্ধি হইতেছে বলিয়া আজ সকালে প্রার্থনার যোগ দেই নাই। সকালে সংবাদপত্র খুলে, দোকানে দোকানে উৎসব কালী পেজার কাজ চলিতেছে ...কৃষ্ণগোপাল আমাকে উপরে ইনভিটেশন দিয়া যায় প্রতিষ্ঠা ব্যাটারি পর বালিগঞ্জে শ্রীনিত্যগোপাল বিগ্রহ করিতে যায় আমি মহেন্দ্র সরকারের বাড়ী গিয়াছিলাম আমি ৪টার পর মঠে ফিরি আলোচনা হয়, নিত্যানন্দ ছিল। গীতার 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্' শ্লোক, ঠাকুর কর্তৃক ব্রহ্ম-আলোচনা সমন্বয়, হাঁদও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীগণ ব্রহ্ম-বিদ্যার সমন্বয় পর্যন্ত স্বীকার করেন, ঠাকুর আসিয়াছেন শঙ্করের ও পরের কথা, বুদ্ধেরও পরের কথা, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পরের কথা বলিবার জন্য। পরমহংসদেবের পায়ে সিঙ্গি মাছের কাঁটা ফোটে দেওয়া তাঁহার পায়ে হাত দিলে আর নিত্যগোপাল? এই যুগের দুই ফুল—রামকৃষ্ণ ও নিত্যগোপাল। সহজ সরল জীবনের সমন্বয় দিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আর জটিল কুটিল জীবনের সমন্বয় দিয়াছেন নিত্যগোপাল। যে-দর্শন রামকৃষ্ণপন্থীগণ অনুসরণ করিতেছেন, তাহা faulty। নিত্যগোপাল ছাড়া কোথায় মিলিবে সর্বধর্ম সমন্বয়? তিনি কোন্ জায়গায় দাঁড়াইয়া এবং কি উদ্দেশ্যে নিজে মাছ খাইতেন এবং শিষ্যদেরও খাওয়াইতেন? তিনি ছিলেন মহা বৈরাগিক, মহা পৌরাণিক, মহা তান্ত্রিক।

১৪ই ডিসেম্বর

ঠাকুর আমার জীবনের সকল সমস্যার সমাধানের সঙ্গী তুমি; তুমি বলিয়াছিলে, 'শরৎ, তোমার যখন যাহা প্রয়োজন ভগবান অন্তর্যামীরূপে যে তাহা পূরণ করেন, ইহা কি তুমি টের পাও না'? আমাকে তো তেমন করিয়া কোন সমস্যার জালে জড়াইয়া পড়িতে হয় নাই। তুমি আমাকে সেবান হইতে মুক্ত করিয়াছ। পথে বাহির-হওয়া-আমার কি যে-সে সমস্যা? ঘরের সমস্যা, বাহিরের সমস্যা, সংসারের সমস্যা, সন্ন্যাসের সমস্যা! এত সমস্যার মধ্য দিয়া আমি কি বাহির হইতে পারিতাম যদি না তুমি সঙ্গীরূপে থাকিতে? তোমার জয় হউক। ৩টায় বাহির হই, সিমলা ইন্দোদীর বাড়ী যাই।...প্রতিষ্ঠা মঠের কাছাকাছি শ্রীনিত্যগোপাল বিগ্রহ করে।...পাবনার উকীল সুরেনবাবুর সঙ্গে মঠে দেখা হয় তিনি শিবানন্দের (তারকনাথ ঘোষাল) শিষ্য ঠাকুরের চতুর্মূর্তি সমাধির পাশাপাশি কেমন করিয়া অতি ছোট ছোট কণা-দেহ উৎসাদিত হইত, তাহা করিলে বিস্ময় লাগে। নিত্য প্রকাশানন্দকে বলি—ঠাকুরের জীবনে যেখানে কেমন করিয়া কণা-দেহ বিমুক্ত হইয়াছে তাহা বিচরণ কিরূপে করা যায়। ইহাই তো বর্তমান যুগের মানুষের লক্ষণ। ৬টার পর আমি ও প্রতিষ্ঠা আসি।...অনন্তবাবু শম্ভু ব্যানার্জী (রাইট অনারেবল) প্রভৃতির স্বাক্ষরযুক্ত এক বাংলা আবেদন পত্র ও সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের স্বাক্ষর-যুক্ত এক বাংলা আবেদন পত্র মঠে রাখিয়া গিয়াছেন।

১৫ই ডিসেম্বর

গীতাজয়ন্তী: শুক্লা-একাদশী অগ্রহায়ণ; গোপার জন্ম দিন

ঠাকুর, নরীর যে-অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তোমার কাজ করিব কি করিয়া? এখন তোমার কাজ ঘাড়ে চাপিয়াছে। করিবারও তো কেহ নাই। 'কত অলি এলে কে বা আঁখি মেলে' —এই অবস্থা তোমার মঠের। তুমি মনস্তাপে ফেলে পালিয়ে গিয়াছ। আমাদের সঙ্গে যা-কিছু ভাল খাবার কষ্টন করিয়া খাইয়া গিয়াছ, আর আজ আমরা তোমারই ধন দিয়া কিনিয়া খাইতেছি, খাবার নিয়া ঝগড়া করিতেছি। কত বড় অকৃতজ্ঞ আমরা, নির্বোধ আমরা তুমি পথ দেও, আলো দেও,

শক্তি দেও, অর্থ দেও পেটটা আজ ভাল নয়, গলাও খুব ভাল। সকালে প্রার্থনা করিতে করিতে গলার জন্য পারি নাই, উহারাই করিয়াছে।...ঠাকুর, তুমি সোপাকে মানুষ করিয়া তোমার সেবা-প্রয়োজনে লাগাইও।...যাই। আজ দীতাদেবী সম্বন্ধে বক্তৃতা।...ধর্মক্ষেত্র আজ আর মৈথিলাঞ্চল নয়, ভারতের শেষ প্রান্তে পঞ্চনদে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উচ্চারিত হইয়াছিল আবার কি উপনিষদ আজ নাগরিক উপনিষৎ অপৌরুষের উপনিষৎ আজ পৌরুষের

১৩ই ডিসেম্বর

ঠাকুর, কেমন করিয়া তোমায় ডাক না করিয়া গতর খাটাইয়া চলিব? শরীর যাহা বাহিরে তোমার দেহ তোমার সেবায় নিযুক্ত বাঙ্গলাদেশের মনীষায় কি শোচনীয় পরাজয় যে তোমাকে চিনিতে পারে নাই। তুমি আসিলে, ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলে, কেউ তোমাকে ধরিতে পারিল না পরমহংসদেব তোমার স্বরূপ সম্বন্ধীয় কথা বলিতে বলিতেও চলিয়া গেলেন। 'নিত্যের স্বরূপ বললে নিত্য দেহত্যাগ করবে'। আজ তোমাকে লইয়া আর কেউ বিব্রত না হউক আমি তো বিব্রত। কেমন করিয়া তোমার দর্শন কলিকাতায় ছড়াইয়া দিব। আমাকে পথ দেও, সুযোগ দেও।...সন্ধ্যার পর থার্মোমিটার দিয়া দেখা হয় আমার তাপ হইয়াছে ১০০°৬। পেট ভাল নয়, আমাশয়ের মত। গলা ভাঙ্গা, দাঁতেও ব্যথা। অথচ আগামী রবিবার বক্তৃতা। যেমন করিয়া হউক যাইতেই হইবে। অসুখের জন্য বক্তৃতা বন্ধ করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। যদি বাগযন্ত্রী প্রকৃতিয়া বলেন আমার কথা আছে।...

১৭ই ডিসেম্বর

ঠাকুর, তোমার লীলা বুঝা ভার। এই বয়সে এখন দেহে আমার উপর এই গুরুভার চাপাইয়া তোমার কি কাজ হইবে বুঝি না। আগে তো শরীরের রোগ বলিয়া কিছু ছিল না, যতক্ষণ ইচ্ছা যত বার ইচ্ছা বক্তৃতা করিয়াছি, যখন তখন যেখানে সেখানে পড়িয়া রহিয়াছি। আজ তো আর তাহা পারি না। কোথায় গেল শক্তি। তোমার শক্তি তোমার কাছেই ফিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজে প্রত্যাহৃত হইয়াছে। কাল আর সকালের প্রার্থনায় যোগ দেই নাই ...দুর্গামোহনবাবু আসেন, গত বারের 'নারীর মুক্তি' প্রবন্ধে নারীর পারিবারিক জীবনে যে একটী মাধুর্য আছে তাহা লেখা হয় নাই বলেন। তিনি একান্নবর্তী পরিবারের জন্য নারীর অন্ন বসে বিবাহে ও ঘরে থাকা চান। কিছু দিন যে বেশ হইয়া গিয়াছে। ... প্রতিবার আমায় আর একটী ঘা দিতে ভুলিয়াছে।...

১৮ই ডিসেম্বর

ঠাকুর, সারা জীবন পথে পথে বক্তৃতা দিয়া সহস্র দৌড়াদৌড়ির পর কি আজ তোমার সাক্ষাৎ কর্মের সেবায় পঙ্গু হইয়া ঘরে পড়িয়া থাকিব? আমার যে বড় ভয় হইবে ঠাকুর। তোমার সেবা করিবার সুযোগ দেও, আমাকে ভাল কর। নিতে ইচ্ছা কর নিয়া যাও। তবে তোমার সেবা করার সাধ তো মেটে নাই! তোমাকে একেবারে অপরিচিত অবস্থায় রাখিয়া যাইতে বেদনা বোধ করি। বিশ্ব-সমস্যার সমাধানের যে formula জড়-অজড় সমন্বয়ের ভিতর তুমি রাখিয়া গিয়াছ তাহা অভিনব। তোমার জয় হউক।

১৯শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, তুমি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছ, 'আমার সহচর এবং সখী যিনি হইবেন, তাঁহাকে মহাপ্রেমিক ভক্ত মহাভাবুক হইতে হইবে এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় কথা বলিবার প্রয়োজন হইলে মহাপাকচক্র -মহাপাকপটু অথচ কুণ্ঠাবিহীন যেন পরাস্ত হয়'—নিত্য ধর্ম পত্রিকা ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা ৬১ পৃষ্ঠা। কে তোমার এই সহচর ও সখী? এই সমস্ত গুণাবলীযুক্ত হইয়া সহচর ও সখী হইবার লালসা আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। এই সব যোগ্যতা আছে যাহার, তিনি তোমাকে এই পরার মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। তুমি আমাকে তেমন কর। আজিও সকালে প্রার্থনায় যাই না।...নকুলেশ্বরবাবু (চাকুরিয়ার) আসেন। চাকুরিয়া যাইব বলিয়া দেই। ৩টায় গাড়ী নিয়া আসে। ৩॥০টায় পৌঁছি। তখন সভার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সম্পাদকের বিবৃতি শেষে রবীন্দ্র সম্বন্ধে ধীরেন বসুমল্লিকের

ভাবণ। তারপর আমার বক্তৃতা। 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে', 'শ্রীভগবান উবাচ'. 'একই রথে নরনারায়ণ যেমন বা স্বপর্ণা সযুজা সখায়া,' 'প্রাণের তত্ত্ব ও মনের তত্ত্ব,' 'মন্মনাভবসিদ্ধি:', 'সর্বধর্মান্পরিত্যজ্য প্রপত্তিস্বরূপীস,' 'মত্ত যোগেশ্বর: কৃষ্ণ:,' 'যুজ্ঞ রাধায়্,' 'সারথি সারথি, তুমি Divine companion,—ইত্যাদি বলি। ৪-৫টায় আমার ভাষণ শেষ হয়। তখনই গাড়ী করিয়া মঠে আসি। ৬-৩০এ পৌঁছি, এখানে ভাষণ দেই। ঠাকুরের দুইটি উক্তি পাঠ করা হয়—আমি সব সম্প্রদায়ের দ্বারে ভিখারী; আর শাক্ত বৈষ্ণব সব। End justifies the means এবং As the means so the end—এই দুইয়ের সমন্বয় শ্রীনিত্যগোপাল দিয়াছেন। 'আমার বাহিরের প্রাণ, ভিতরের প্রাণ, আমার সবই প্রাণ'। প্রাণ প্রবৃত্তির উপর দাঁড়াইয়া, আমার প্রাণ সবকিছু বলিয়া নিবৃত্তির শ্রীনিত্যগোপাল প্রাণকেও সর্ব সম্প্রদায়ের ভগবান করেন, আমার প্রতি সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা স্বীকার করেন। তিনি অদ্বৈতবাদী ও প্রপঞ্চবাদী দুইই।...তাই বলিয়া যাই আমি উদাসিনী বেণু ও গোপা। পথে মঠে যার প্রতিষ্ঠা ও মিষ্ট।... ২০শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, তোমার মত করিয়া আমায় গড়িয়া তোল যাতে 'মুখ দেখে মা তোর ছেলে বলে সকলে চিনে,' 'আমায় তেমনি করে সাজাও,' আমি এমন হইব যাহাতে আমাকে দেখিয়া মানুষ তোমাকে দেখিবে, আমাকে পাইয়া তোমাকে পাইবে, আমাকে ছুঁইয়া তোমাকে ছুঁইবে, আমাকে ভালবাসিলে তোমাকেই ভালবাসা হইবে। আমি কতদিন আর পৃথক থাকিব তোমা হইতে ওগো মহানির্বাণের কারণ আমার? তোমার জীবনে আমার মহানির্বাণ হউক। আজিও প্রার্থনার যোগ্য সেই নাই।...বেণু বাহির হইয়া যায় জলবাবুদের টিকেট কিনিতে ও উদ্বোধনের কাগজ কিনিতে।...সভা-সমিতিতে কিছু হয় বলিয়া ধীরেনবাবু বিশ্বাস করেন না। সভায় সব বুদ্ধের দল, উহাদের কোন মতামত নাই। যাহা শোনে সবই ভাল, কিছুই শোনে না ইত্যাদি।...

২১শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, যে জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়া মাথা উঁচু করিয়া আজিও চলিয়া আসিতে পারিতেছি সে শুধু তোমারই মহিমা, তোমারই চরণস্পর্শের ফল। যে কোন একটিতেই ভাসিয়া যাইতে পারিতাম, কিন্তু তাহা তো তুমি হইতে দাও নাই। যে দর্শন তুমি আমার জীবনে প্রদর্শিত করিয়াছ, তাহাই আমাকে সব বিপদের মধ্য দিয়া আগাইয়া নিয়া আসিয়াছে। Error of omission থেকেও রক্ষা পাই। যে দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে অপর দিক বিপ্রতীপ হইয়া পড়ে, তখন তারসাম্য (equilibrium) রক্ষা করা অসম্ভব। তখনই চতুর্দিক চঞ্চল হইয়া উঠে। তুমি শুধু তুমিই আজিও প্রার্থনার যাই নাই। সনাতন-ধর্ম সভা হইতে আপাতত বাহির হইবার জন্য চিঠি লইয়া এক ভদ্রলোক আসেন। কলিকাতায় আসিবার জন্য যাইব না বলিয়া দিলাম।...নিজেদের বাড়ির ছাইবার জন্য কত দিন হয় বলিয়া আসিতেছি। সময় চলিয়া গিয়াছে।... চিদানন্দের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় টাকা চাহিবার জন্য। কম টাকা হইতে বলিলেই resent করে কিছুতেই যে টাকা জমা দিতে চায় না।

২২শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, সারা জীবন যে ঝড় ঠেলিয়া যে ভাবে চলিয়াছি, তাহাতে 'আছি' এই মাত্র বলিতে পারি। তোমার জীবন ও দর্শন প্রচার করিবার মত অনুকূল অবস্থার সাক্ষাৎকার পাই নাই। অথচ তোমাকে বুকে লইয়া পথ বহিয়া চলিয়াছি। তোমাকে ছাড়িতে পারি নাই, সবাই আমাকে ছাড়িয়াছে। মঠের ওরা বলে—আমি যাহা বলি তাহা আমার মত, তোমার নয়। তোমার কি মত? তাহাদের বুদ্ধিতে তাহা কি কিছু আসে? মূলতঃ কোন কিছুই তোমার মত নয়—এই অবস্থায় আসিয়া তোমার মঠ দাঁড়াইয়াছে। কেমন করিয়া রক্ষা হইবে তুমি জান। তোমার মঠ বিশ্ব সত্তাতায় প্রতিষ্ঠা করুক, ইহাই তো চাহিয়া ছিলায়। তুমি জান কি হইবে। আজ ভোরে প্রার্থনায় যাই।...আমি ৪টায় মঠে যাই।... ২৩শে ডিসেম্বর

আবেদন লইয়া। বেণু ঠাকুরের মহালীলা লিখিতেছে। প্রতিক্ষায় তাপ ...।

২৪শে ডিসেম্বর

ঠাকুর,...তোমার খবর কে জানে? প্রাণের এই দাহনে চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। প্রাণ চির অপরিচিত। তোমার দর্শন—যাহা বর্তমান যুগে দরকার—লইয়া চলিতে হইবে। যা ঠাকুর বিবেকানন্দের তারাসুন্দরীর যেওয়া ধন সাধু ব্রহ্মচারীদের দিলেন না, দিলেন বাবুদের, বাকি বলতুল দিলে খ্রীষ্টান ডাক্তার আর কি তোমাকে আর তুমি? তোমার কাছে কি সত্য কি মিথ্যা অসত্য! কে তোমাকে লইবে বল? এরা যে বুর্জোয়াদের ঠাকুর ঠাকুরাণী...। - আগে বেণুর কাছে। সে বলে আমরা ভগবান মানি না। আমি বলিলাম 'বৃত্তনা তো মানো। বৃত্তনাই ভগবান'। সে বলিল, 'বৃত্তনাকে বৃত্তনা বলিয়া মানি, ভগবান বলিয়া নয়' ইহা ঠিক নয়, বৃত্তনাই যদি ইহারা মানিত তবে ভগবানের উপর এত নারাজ হইত না। প্রয়োজন মত বৃত্তনা ইহারা মানে, ইহার ঘুটোতে ভুরি ভুরি। বুদ্ধদেব বর্তমান যুগের এই সব নাস্তিক-দের জন্যই আসিয়াছিলেন, ঠাকুর ইহা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনে আস্তিকতার নাস্তিকতার সমন্বয় হইয়াছিল। ...আমি বলিলাম লোকে আনন্দ দিলে আমি ঠাকুরের দর্শনদ্বারা satisfy করতে দিব। একটী দর্শন ছাড়া যে কোন সম্প্রদায় দাঁড়াইতে পারে না—তাহা জোর দিয়া বলি।... ...

২৬শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, তারাপদ তারাসুন্দরী...তাদের শ্রীচরণ প্রান্তে বুকভরা বেদনা নিবেদন করিয়া জুড়াইবে? তারাসুন্দরী তারাপদ নিশ্চয়ই গিয়াছিল জুড়াইবার জন্য। কিন্তু তাহারা জুড়ায় তো নাই-ই বরং যে ব্যবহার তাহারা পাইয়াছে, তাহাতে তাহাদের জ্বালা আরও বাড়িয়াছে। মানুষের এত অভিমান সাধুত্ব না সততা লইয়া? পাপের চেয়ে কি মানুষ বড় নয়? ঠাকুর, ঠাকুর, তুমি আছ তাই ইহাদের স্থান আছে। তুমিই বিশ্বৈকশরণ। পাপী তাপী তোমার স্নেহ পাইয়া জুড়াইবে। ইহারা তো মুক্তিমানদের

ভাবাবাচ্য, তোমার আবেগে ও জীবনদর্শন আবাহন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ সবল পুরুষ তোমার দর্শন ও জীবনে প্রকৃতির পরা রূপ, পরকীয় রূপ, স্বাধীনবর্তৃকা রূপ, পুরুষ-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তুমি পরম পুরুষকেও transcend করিয়া আছ তাই তুমি শ্রীকৃষ্ণ-ভোক্তা। ভোগের বস্তু করিয়া দেখিলে তাহাকে ভোগ করা যায় না। ভোগকে মুক্তি দিয়াই না তাহাকে ভোগ করা সম্ভব? বিশ্বকে একান্ত ভোগ্য করিতে গিয়া ভোক্তা অনিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। যখন ভোক্তা ভোগ্য প্রেমে এক তখনই না সেখানে বাস্তব ভোগ সম্ভব? তুমিই ভোক্তা তুমিই ভোগ্য, ভোক্তা ভোগ্য তোমার জীবনে অদ্বৈত। ...তারিণীবাবু, কিতীশবাবু প্রভৃতির সঙ্গে কথা হয়। ওদের কাছে না নামিলে তরাডুবি হইবে। — হইল এখানে একটী সমস্যার বস্তু এই সম্প্রদায়ের কাছে। ইহারা ঠাকুরের জীবনে ইহাই ইতিহাস করে, অথচ ইহার যুগোপযোগী মূল্য, কোথায় তাহার সার্থকতা, কি ভাবেই বা ইহার সার্থকতা তাহার কোন জ্ঞান ইহাদের নাই। ইহারা ডুবিতে বসিয়াছে। এ সম্প্রদায়ের কেহ ইহা হইতে উদ্ধারের কোন পথের খবরও জানে না।... প্রতিক্ষায় প্রাণও আবার ঘুলিয়াছে।

২৫শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, তুমি স্বেচ্ছায় অযাচিত করুণায় আসিলে, চলিয়া গেলে। আমরা কেহ তোমাকে ধরিয়া রাখিলাম না। কি আমাদের দুর্ভাগ্য। অথচ তুমি যাহাদের কাছে ধরা দিয়াছিলে তাহারা তো সংখ্যায় বিস্তার কম নয়। কেহ কি তোমাকে চিনিলাম, না তোমার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইলাম! আর (?) যে অনাথ; সমস্যায় সমস্যায় জর্জরিত। কে ইহাকে রক্ষা করিবে। তুমি ছাড়া আমার কে আছে কি আছে। তুমি আমার গর্ব। আমার যাহা কিছু আছে তাহা তুমি। আমার দাঁড়াইবার মত স্থান নাই তোমার শ্রীচরণ প্রান্ত ছাড়া। ঠাকুর, আমাকে বল যেও তোমাকে বুকে লইয়া সমাজ-জীবনের মাঝে বহন করিয়া নিবার মত। তোমার জয় হউক। সকালে কিতীশ (মঠের) আসে প্রচুর বয়স লেখা একটা

ঠাকুর, অনাথের নাথ তুমি। তোমার জীবনে বৈরাগ্যের কৌপীনও নাই। সমাধিস্থ হইতে যেটা এবং উঠাও তেমন কৌপীন। কিন্তু সে কৌপীনও তুমি পরাও আমাদের ছোটবাটো দুঃখের বোঝা নিজ মাথায় লইয়া। তোমাকে ভয় হইত।...মঠে যাই। মঠে সন্ন্যাসী গৃহীর দল চলিতেছে। সন্ন্যাসীরা নাকি গৃহীদের সঙ্গে এক পংক্তিতে খাইতে প্রস্তুত নয়। মঠে স্থূলের চক্রবর্তী হইতে সূক্ষ্ম ব্রহ্মচারী সেও বেশ মানিয়া চলিতেছেন অথচ ঠাকুরই 'ভাবিশিষ্যে' লেখেন, 'সন্ন্যাসীর পক্ষে সন্ন্যাস ভেটে গাঁটরা বেঁধে এ বোধও বন্ধন'। ঠাকুর, তোমার তোমার প্রাণ?...ইহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। প্রায় প্রত্যেকেই বোধ অভিভূতগ্রস্ত। নিজ গুরুর অন্ত্যেষ্টিসৎকারের জন্য টাকা তুলিতে পারে, নিত্যগোপালের জন্য টাকা তুলিতে ছাপানো আবেদন চাই। ঠাকুর যদি সশরীরে না থাকিয়া যাইতেন, ইহাদের কাহারও জুটিত না। ছেলেরা যে যাহার লইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথক সংসার স্থাপন করিয়াছে। ঠাকুর আজ 'ভাবেতে' ঠাকুর। সকলের সব হইবে, এখানের জন্য তাহারও কোন দরদ নাই। বেশ আছে ইহারা। ঠাকুরের সন্ত গণ এখনও উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে তরাডুবি হইবে—ইহা জোর দিয়া বলিলাম। আমি একাই আসি

২৮শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, তুমি ছাড়া আর কাহাকেও তো বর্তমান যুগে দেখিতেছি না যাহাকে সামনে রাখিয়া বর্তমান বিশ্ব গড়িয়া উঠিতে পারে। সকলেই তো অল্পাধিক পরিমাণে one sided, পরস্পর বিরুদ্ধদের মধ্য হইতে একটিকে বাছিয়া লইয়া তাহাকে আশ্রয় করিয়াই চলিয়াছেন তুমিই পরস্পর-বিরুদ্ধদের সমন্বয় করিয়া গিয়াছ। টাকা ছুঁইলে হাত ধোয়াইয়া যায় ইহা একটি উত্তম অবস্থা বটে কিন্তু ইহা রসালো তো নিশ্চয়ই নয়। সম্পর্ক-বোধ না থাকায় কিছুর শিশুত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা সামাজিক মানুষের পক্ষে অচল। তোমার মত decently up to date, perfect social man কয় জন আছে? অথচ তুমি সমাধিস্থ। তোমার জয় হউক বিশ্বজীবনে। তুমি বর্তমান যুগের আদি মানব।...আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা বেশ মনে আছে। আমি চাইব সকলকে, পাইব না কাহাকেও, অথচ মুখও ভাঙিবে না, অন্তর উচ্ছ্বাস লইয়া চলিতে হইবে—ইহাই আমার জন্য বিধান তাহাই হউক। আমি ওটারে পর মঠে যাই,...কয়েক দীপশিখা মঠে যায়, সে মুখরে দেখিয়াই মঠ হইতে কাঁচাপাড়া যাইবে। আমি সঙ্গে করিয়া নিয়া আসি পরম বৈরাগ্যে দীপশিখা আনিয়া নিয়া যাইবে। সে যেন কাহাকেই পাইতে পারে, আমি তো ছাড়িয়া দিতে পারি না

২৯শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, ১৮ বৎসর সংসারময় ঘুরিয়া তিনটী সত্য শিখিয়াছি—১) চাহিব, চিরদিন মানুষ চাহিব, মানুষের অপেক্ষা করিব, ২) কিছু পাইবার আশা করিব না। ৩) অথচ না-পাওয়ার জন্য বুক ভাঙিয়া যাইবে না, কাহারও উপর অভিমান করিব না, যাহার সম্বন্ধে যে মানসিক-ভাব লইয়াছিলাম, সেখানে অক্ষুণ্ণ থাকিব চাওয়ার ভিতর থাকিবে প্রভুর সাধনা, আর প্রতিদানে কিছু না চাওয়া, না-পাওয়া এবং না-পাওয়ার ফলে বুক ভাঙিয়া না-যাওয়ার ভিতর আছে নিবৃত্তির সাধনা। এইভাবে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সমন্বয় সাধন করিব জীবন দিয়া একান্ত প্রবৃত্তি বা একান্ত নিবৃত্তি সহজ জীবন যাপনের পক্ষে অন্তরায়। তোমার জয় হউক। ঠাকুরের সন্ন্যাসীরা সেবা একজন সেবা করে ও সোনার জীবনের এমন সামগ্রিক সামঞ্জস্য 'কাহারও' জীবনে তো দেখি না। পরমহংসদেবের অতীত যুগের শেষ এবং বর্তমান যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়ানো বলা যাইতে পারে। আর শ্রীনিত্যগোপালকে বলা যাইতে পারে বর্তমান যুগের 'আদি পুরুষ', অতীত যুগের নিঃড়ানো ফল।...ঠাকুরের দর্শন লইয়া আমার যে অসহায়তা, তাহার তুলনা নাই। কি করিয়া বাঁচাইয়া পড়িব, তাহাই তো দিবারাত্রের ভাবনা। সন্ধ্যায় উহার প্রাথমিক আসিয়াছিল, আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই।...

২৯শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখিলাম, কত সাধু মহা-

পুরুষের কথা শুনিলাম, তোমার মত সর্বাঙ্গীণ সমগ্র জীবন যাপন করিতেছে, তোমার মত এমন আর একটীও তো পাইলাম না। এই দিক দিয়া আমার মত সৌভাগ্য কম জনের আছে? কিন্তু তোমাকে তো চিনাইয়া যাইতে পারিলাম না, যাহা হইলে মানুষের আলো ঘুচাইত, জটিল সমস্যার এক সমাধান মিলিত। আমার অযোগ ক্ষমিয়া দেও ঠাকুর, দোষটি তোমার। হাত হইতে এ্যাকাউন্ট দুইটী লইয়া ও গোলাম মহম্মদের ডাক্তারবাবুর কাছ হইতে অমৃতবাজার লইয়া বেণু ট্রাম ধরে। সকালে আনন্দবাজারে Philosophical Congress-এর সভাপতি সতীশ চাটার্জীর ভাষণে দেখিলাম—তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সমন্বয়ে এক বিশ্বদর্শনের কথা বলিয়াছেন। তাহার ইংরাজীটা অমৃতবাজার বা হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ডে পাওয়া যায় তাহার জন্য ডাক্তার বাবুর সংশ্লিষ্ট আনিতে যাওয়া সভাপতি আরও লিখিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্য দর্শনে পরস্পর বিরোধী মত আছে, অথচ সহনশীলতা নাই। প্রাচ্য দর্শনের উর্দ্ধতন ও অধস্তন ভাবে বিন্যাসদ্বারা একটা সহনশীলতা স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু নিত্যগোপালের প্রত্যেককে স্বয়ংসম্পূর্ণ দিয়া তাহাদের সম্বন্ধের খবর ইহাদের পর্যন্ত জানা নাই...মঠে খাওয়ার সময় ঠাকুরের দর্শনের অপূর্বত্ব আলোচনা হয়... কুসুম বলিয়াছিল, উৎসবের সময় আসি না আসিয়া টাকা পাঠালে হয় না? আমি বলিলাম, টাকা আমার দরকার আছে, কিন্তু মানুষের চেয়ে টাকা বড় নয়।

৩০শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে আছি যেখানে অন্তি আর মানুষই আমার কাছে থাকিবার জন্য লালায়িত। কেন আমার কাছে থাকিবে? কি আমার আছে আকর্ষণীয়? আমি অতিসন্ধিৎসু, তাই কেহ আমাকে ধরিতে সুবিধা পায় না। সকলের অনেক আছে। আমার কি আছে তুমি ছাড়া? তুমিও একা, আমিও একা। তুমি যে কি ও কে তাহা কাহাকে বুঝাইব? বুঝাইতে পারিলাম না। এই দুঃখ হৃদয়ে রহিল। তুমি বিশ্বদর্শন-সৃষ্টি। কেমন করিয়া তোমাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছাইব? আমায় শক্তি দেও, বুদ্ধি দেও, মনজন দেও, যাহা পাইয়া তোমাকে মানুষের হৃদয়ে পৌঁছাইয়া দিতে পারিব।..

৩১শে ডিসেম্বর

১৯৪৪

ঠাকুর, মধ্যম প্রাণ, 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'। উহাতে তরঙ্গায়িত এই সমুদ্রে আর বিক্ষোভ হইবে না। জড় অজড়ের, সৎ-অসতের, শুচি অশুচির এক কথায় পরস্পর বিরুদ্ধের সঙ্গমে এই সমুদ্র তরঙ্গায়িত। তুমি কোনও কূলে আছাড়িয়া পড় নাই, মাঝখান দিয়া চলিয়াছ দুইয়ের সমন্বয় বিধান করিয়া। তোমার মুখ, তোমার কমল নয়নের চাহনি, সেইজন্যই বাক্য আজও মনে জাগিতেছে। আমি চলিব তোমাকে বুকে লইয়া। তোমার ইচ্ছার ছাঁচে আমার দেহ প্রাণ মন গড়িয়া উঠুক। আমার জীবনে তোমার জয় হউক। বেণু মহৎবাবুর বাসায় যায় তাহার অনুমতি গ্রহণের জন্য আগামী ২৪শে জানুয়ারী ১০ই মাঘ রবিবার উজ্জয়িনী ভারতের প্রথম বার্ষিক প্রীতি সম্মেলনে সভাপতি হইবার জন্য। অনুমতি অনেক সাধ্য সাধনার পর আদায় করিয়াছে। অমার ওখানেও যাব, তবুও শরীর ভাল নয়। উমা র‍্যাপার লিখিবার জন্য সোমবার আসিবে। বিমলা আমার জন্য ২৷০ ও শতবার্ষিকীর জন্য ৩ টাকা দেয়। সিনিয়র আসে ১টার পর ...বেণু ৩টার পর আশুবাবুর ওখানে যায়। আশুবাবু শতবার্ষিকীর জন্য ২৫৲ টাকা দিবেন। বেণু সকালে অনিলবাবুর সঙ্গেও দেখা করে। 'ভক্তিযোগ প্রসঙ্গে' ছাপাইবার প্রসঙ্গ হয়। তিনি শতবার্ষিকীতে ৫০ টাকা দিবেন তবে ছাপাইবার মজুরী হইতে কাটাইয়া দিবেন। আমি ৪টার পর মঠে যাই।... খুব সকালে উপর হইতে নীচে যাইবার পথেই চারুবিকাশ নকুলেশ্বরবাবু চেতলার পথে উঁকি দিয়া যান। তাঁহাকে শতবার্ষিকীর সাহায্যের কথা বলি।

১লা জানুয়ারী ১৯৪৪

ঠাকুর, তুমি ছাড়া আমার মাথা গুঁজিবার স্থান আর নাই। আমি একেবারে নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িয়াছি। তুমিই আমার সঙ্গী কেহ তো আমার সঙ্গে রহিল না

আমার জীবনে এমন আসে নাই যেন হঠাৎ মনে হয় কেহ আমার সঙ্গে আটকাইয়া যাইতে পারে অথচ আমি তো মানুষকে সকল প্রাণ দিয়া তাহাদের সঙ্গে একাত্ম হইয়া ভালবাসিয়াছি। না বাঁচাইয়া ভালবাসি নাই, ভালবাসায় ফাঁকি দেই নাই, দায়িত্ব এড়াই নাই। তবুও তো কাহাকে পাইলাম না। তোমাকে বুকে লইয়া চলিব—ইহাই আমার ব্রত। দুলালী আছে। বীরেন সকালে আসিয়া প্রতিভাকে অর্ধেক streptomycin injection দিয়া যায়। তাহার সঙ্গে তাহার আধিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহাদের মত বন্ধুদের সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা আছে। শুকতর ঠেকায় হাওলাত দিলেও যথেষ্ট সেবা করা হয়।...৪টার পর মঠে যাই। ২।৩ জনের কাছে টাকা আদায়ের তাগিদ দই দেওয়া হইয়াছে। দিবা মামলায় মহেশ্বরানন্দের ঘর পাওয়া যাইবে না—ইহারা বলে।... আমি বুঝি না কেমন করিয়া এইরূপ মনোবৃত্তি ইহাদের হইল।...মঠ হইতে আমি একাই আসি। রোজ রোজ একজন লোক লইয়া আসা ভাল লাগে না। আর কে-ই বা প্রাণ খুলিয়া আসিবার জন্য বসিয়া আছে? আমার কে আছে?

২রা জানুয়ারী

ঠাকুর, আমি সারা জীবন কি করিয়াছি কি না করিয়াছি তাহার সাক্ষী তুমি। তোমাকে বুকে লইয়া দেশকে বুকে লইয়া চলিয়াছি। কি হইল? তোমার প্রতিষ্ঠা ঘরে ঘরে নর নারীতে দেখিতে চাহিয়াছিলাম, গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু কোথায় তুমি? প্রাণ ঢালিয়াই তো কাজ করিয়াছি। ফাঁকি তো কাহাকেও দেই নাই। কিন্তু যে প্রাণ নিয়া আমি মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছি, সে প্রাণ নিয়া তো তাহারা মিলে নাই। আজ তাহাদের ও আমার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বিষমতা ধরা পড়িয়াছে। সেই জন্য বড় অসহায় মনে হয়। সারা জগৎ যেন তোমার কাছেই ঠেলিয়া দিতেছে। মনে হয় সংসার হইতে কত দূরে সরিয়া আসিয়াছি। কাহারও সঙ্গে তো কিছুতেই মিলে না। তুমি আমার শরণ। যমুনা ৮টার পূর্বে আসে।... মতানির্বাচন মঠের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে তাহাদের বুদ্ধি ভাল নয়...আমি তো যমুনা গোপা মঠে অন্তরঙ্গিনী সমিতীর সাধারণ সভ্য যোগদানের জন্য যাই। আজ লোক সভ্য হয় নাই। নূতন লোক—ঠাকুরের আশ্রিত—আসিতেছেন রামায়ণবাবু আজও ১০০৲ টাকা দিলেন। সাড়া পড়িয়াছে। ডঃ কালিদাস নাগের ওখানে প্রফুল্ল বীরানন্দ গিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, একটী culture না দিলে বর্তমানের মানুষ শুধু কাসির ঘন্টায় মুগ্ধ হইবে না। আমিও তো তাহাই বলি। শ্রীনিতাগোপাল বিশ্বজয়ী এক culture রাখিয়া গিয়াছেন। আজ 'বিজ্ঞান কংগ্রেসে'র উদ্বোধন প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরুও কৃষ্ট সমন্বয়ের কথা বলিয়াছেন—যারা একান্ত রাজনৈতিক বা বৈজ্ঞানিকদের নাগালের বাহিরে।...

৩রা জানুয়ারী

ঠাকুর, তোমাকে বিশ্ব নরনারীর বিশ্বের মহলে প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে আশা আমার প্রাণে জাগ্রত রহিয়াছে, তাহা তোমাকে নিবেদন করিতেছি। আমার জীবনে তোমার কোন্ প্রয়োজন তুমি পূরণ করিতে চাহিতেছ, কেনই বা নবদ্বীপ ধামে সেদিন বলিয়াছিলে, 'সংসারে যাও, কাজ আছে', আবার কেনই বলিয়াছিলে 'ধরতের তর্ক যেন কামানের গোলা'—তুমিই তা জান। আমাকে জানিতে দেও আমার জীবনে তুমি কি চাও—আমি ধন্য হই। বর্তমান যুগে তোমার যে বড় প্রয়োজন ঠাকুর। তুমি জাগ্রত না হইলে পরস্পর বিবদমান এই বিশ্ব বাঁচিবে কেমন করিয়া? তুমি যে বিশ্বকল্যাণ মূর্ত্তি।...প্রতিভা ও যমুনা ১১টায় যাইয়া বাঁশবেড়িয়া রওয়ানা হইয়া যায়।...উত্তরভারতের প্রীতি-সম্মেলনী ২৫শে হইবে না, কেননা তখন কল্যাণীতে কংগ্রেসের অধিবেশন। প্রীতি-সম্মেলনী হইবে ৩১শে জানুয়ারী। রেণু সাবিত্রীবাবুর সঙ্গে দেখা করে।... রেণু সারাদিন ব্যাপার দেখে। সুহৃৎবাবুও ওখানে যায় ৩১শের কথা বলিতে।...সুহৃৎবাবুও নাকি কংগ্রেসে যাইবেন। তাহার হাতের চুড়ি আজ সকালে... — নিয়া

গিয়াছে। সবই তো গিয়াছে। হাতের একগাছি চুড়ি দিতে ইহাদের প্রাণে লাগিল না। কি দুর্ভাগ্য ইহার। ঠাকুর রক্ষা করুন এই নির্যাতন হইতে। ইহাদের কে আছে ঠাকুর ছাড়া?...

৬ঠা জানুয়ারী

ঠাকুর, তুমি আমি 'ছায়াভপরোচিত ব্রহ্মলোকে' একত্রস্থ, একপ্রাণ, একমন, একবিজ্ঞান, একানন্দ হইয়া থাকিব। তোমার জীবন মধ্যে হইয়াই আমার সত্তা চৈতন্য আনন্দ মূর্ত্তিত হইয়াছে। তুমি আছ তাই আমি আছি, তুমি চৈতন্য তাই আমি চেতন, তুমি আনন্দিত হও, তাই আমি আনন্দ পাই। আমি উর্ণনাভ, সমস্ত। তোমার 'আমি'-ই প্রকাশ 'আমি'। তোমার মাঝেই আমি সত্য। তোমার back-ground-এ, তোমার পটভূমিকায়ই আমি সত্য। 'যথাচ্য হেনাভ্রাদিভ্য এবং বাক্ অভ্যাদভ্যে তদেব ব্রহ্ম ভং বিদ্ধি...ননিদং উপাসতে'। তোমার জীবন দিয়াই আমি আমাকে চিনিব, আস্বাদন করিব। আমি তোমার মাঝেই আমি। আজও সারা-দিন রেণু ব্যাপার লেখে। রাত্রি ৮টার পর রেণু তাহাকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া আসে।...আমি গাড়ীটায় মঠে যাই। নবদ্বীপে নিতাইগৌরাঙ্গের মঠের indifference ও non-cooperation-এর জন্য বেদনা অনুভব করি এবং সে বিষয়ে চিদানন্দের সঙ্গে আলোচনা করি। ঠাকুর ইহা সহিবেন না; মহানির্বাণ মঠে এমন একটী আন্দোলন যদি সৃষ্টি করিতে পারে, তবে ইহারা একদিন বাধ্য হইয়া ইহাকে স্বীকার করিবেন এবং এখানে আসিতে বাধ্য হইবেন। ঠাকুর, তাই কর। একাই আসি। কে আসিবে আমার সঙ্গে? কে আছে আমার? সঙ্গী শুধু তিনি। তাঁহাকে সঙ্গে করিয়াই চলিব। রেখা তাহার মায়ের হাতে চুড়ি নাই শুনিয়া খুব কাঁদিয়াছে। সতী মৌমিক চিঠি দিয়াছে সে এখানে থাকিবে না, রবি টাকা পাঠাইয়া দিবে বলিয়া গেলেও পাঠাইল না। ইহারাই খবর রাখে না, তাহাদের আর কি বলিব? একাই চলিব। ঠাকুর, বল দেও।

৭ই জানুয়ারী

ঠাকুর, আমাকে বুঝিতে দেও তুমি আমার জীবনের প্রতি পরিক্ষেপে সঙ্গে সঙ্গে আছ। যে কড় ঠেলিয়া চলিয়াছি তুমি যদি সঙ্গী না থাকিতে, কোথায় চলিয়া যাইতাম জানি না। এমন প্রতিকূলতার মধ্যে কি আমি ঠিক থাকিতে পারিতাম? আজিও তো চলিতেছি। এ শুধু তোমারই মহিমা। ঠাকুর, আমি তো বিশ্বে প্রায় হারাইয়াই গিয়াছি। কয় জনে আমার জন্য বসিয়া আছে? কয়জনের কাছে আমার জীবনের কোন্ মূল্য আছে। তাহাদের কাছে আমি থাকিলেও যা, না থাকিলেও তা। তুমিই আমার শরণ, আশ্রয়। আমার পথ-চলার শক্তি কেবল তুমি। তুমি আমায় ডাক, কথা কও, কতদিন তোমায় আদর পাই নাই। বড় সাধ, আমায় আসিবে না? আমি যে বড় একা।... সন্ধ্যার সময় জগন্নাথ সাহা আসেন। তাহার সঙ্গে নিতাইগৌরাঙ্গ দর্শন ও বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাঁহার উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। রেণু রাত্রি ৮টায় যাইয়া ধীরেনের কাছ হইতে ইনজেকশান লইয়া আসে। সুরেন দত্ত (বরিশালের) গ্রাহক থাকিবে না চিঠি দিয়া জানাইয়াছে। আমার সমস্তীয় যাহারা তাহারা একে একে সরিয়া দাঁড়াইতেছে। এমনই আমার ভাগ্য বিধান! আজ আর মঠে যাই নাই।...

৮ই জানুয়ারী

ঠাকুর, তুমি আমার সঙ্গী চির জীবনের। আমি একাই কাঁদি, একাই চোখের জল মুছি। কাহার সঙ্গে তোমার কথা কহিব? কথা তো শিখাইয়াছ অনেক, কিন্তু কথা কহিবার লোক তো দিলে না। কাহার কথা শুনিবার সময় আছে? অথচ শুনিবার দরকার যে আজ ছিল সব কালের চেয়েও অধিক। মানুষ এমনই দিশেহারা। ঠাকুর, এমন করিয়াই কি আমার দিন যাইবে? লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে তোমার দর্শন মিলিবে। কেহ কি তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল? আজ যে আমি একা, একেবারে একা। প্রতিমা কাছে নাই, ভাল লাগে না। তাহার সঙ্গেও দুটা কথা কহিতে পারিতাম। রেণুকে তো বাহিরে বাহিরে থাকিতে হয়। রেণু দুপুরে

ফিলিপ্‌স্‌. সাটা প্রভৃতি খুলিয়া ৫টার সময় বসে। প্রতিভার পত্র আসে, নীলুর ইনভেলাপ আসে ১৬টাকা পাঠাইবার বিষয়ে সে অনেক কিছু লিখিয়াছে। আমার নিজের বলিয়া তো কিছু নাই। যাহা আছে সবই তো ইহাদের জন্য। ইহাদের সেবা করিবার জন্যই তো বাঁচিয়া আছি। বিশ্বের সেবা করিতে পারিলাম কই? চাহিয়াছিলাম তো। ঠাকুরের জীবন ও দর্শন দিয়া যাইতে পারিলেই সেবা হইত। আমি ৬টার পর মঠে যাই। তারিণী-বাবুকে বলি যতদিন না মঠ হইতে এমন একটী culture-এর প্রচার হয় যাহার আকর্ষণে মানুষ এখানে ভিড় করিবে, ততদিন শুধু পূজা পার্বণ, কেতের কলম আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।...ঠাকুর, জাগো, জাগো, তোমার দর্শন বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ুক, বলিয়াতা মহানির্বাণ মঠে টাঙ্গিয়া পড়ুক।

৭ই জানুয়ারী

ঠাকুর, আমি তোমার 'প্রকৃতি' হইব এই সাধ মনে ছিল বলিয়াই তোমায় চিঠি পত্রাদিতে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতাম। তুমি তাহা স্বীকার করিয়াও নিয়া ছিলে। আজ আবার সেই অবস্থা আনিয়া দাও। তোমার 'আমি'ই আমার 'আমি' হউক। আমি 'অহং ব্রহ্মাস্মি, বলিয়া যাই। আমার আমি তোমার আমি প্রকাশের যন্ত্র হউক। আমার 'আমি'র মহানির্বাণ হউক। আমার জীবনের প্রতি স্পন্দনে তোমার প্রকাশ সার্থক হউক। তুমি আমি, আমি তুমি। ওগো আমার আমি, আমাকে তো একদিন রাধা স্বরূপের আস্বাদন দিয়াছ। আমি রাধা, আমি তোমার পরমা প্রকৃতি। আমার সব-কিছু তোমাতে আত্মনিবেদিত হউক। তুমি আমি এক অদ্বৈত। কেশু সস্ত্রীকে থাইয়া প্রথমে প্রেমে যায়, পরে ওয়াণ্টার টম্পসন প্রভৃতি স্নানে যায়, ফেরে ৩টার পর।... মঠে নামি।...সন্ধ্যায় পূর্ণেন্দু ঘোষ আসেন। তাঁহাকে শতবার্ষিকীর সময় ভাগবত পাঠের কথা বলিয়া রাখি। ইহারা মানুষের মধ্যে আলোচনা করেন—মানুষের সত্যিকার problemটী কি বলিয়া ইহারা বুঝেন, কি করিয়া সমস্ত পাঠক-(?) আলোচনা একমুখী হয় যাহাতে শ্রোতাদের বুদ্ধি-ভেদ না হয়ত কল্যাণ হয়, তাহার আলোচনা করি। ঠাকুর, তুমিই তো মতলেশের cosmopolitan। এমন শক্তি কি তুমি দিতে পার না যাহাতে সকলকে মানাইয়া লওয়া সম্ভব হয়, সকলকে সমন্বয় করা যায়। তোমার আসার প্রয়োজন তো তাহাই। তেমন বল আমায় দেও। তোমার মঠ সকলের মিলন কেন্দ্র হউক। তোমার মঠে সব discordent element আসিয়া জড় হইয়াছে, কি উপায় হইবে? সেখানে গিয়াও তো একলাটি বসিয়া থাকি। কোথায় যাইব? কাহ নিকটের আজ আসি। অথচ বুক ভরা তোমাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার আনন্দ।

৮ই জানুয়ারী

ঠাকুর তুমিই আমার নিত্য সঙ্গী। না হইলে কি আমি চলিতে পারিতাম? তোমার প্রয়োজনে আটকাইয়া যাই না তোমার সঙ্গে আমার একটী অপ্রয়োজনের সম্পর্ক ছিল বলিয়া। বিশ্বের প্রতিটী ইন্দ্রিয়ের দুইটী বৃত্তি রহিয়াছে: একটী প্রয়োজনের, অপরটি বিলাসের বা অপ্রয়োজনের। খাওয়ার প্রয়োজন দেহরক্ষা, কিন্তু খাওয়ার বিলাসিতাও তো সত্য এবং উহা অপ্রয়োজনের বৃত্তি—খাওয়ার জন্যই খাওয়া। তুমি আমার অপ্রয়োজনের ধন, বিলাসের ধন আছ বলিয়াই তোমাকে সকল প্রয়োজনে পাই যখন সকলে আমাকে ফেলিয়া যায়। ওগো, তুমি আমার অপ্রয়োজন, সর্ব প্রয়োজন, নিত্য সঙ্গী আমার। তোমার জয় হউক আমার জীবনে। ...আমি ৬টার পর মঠে যাই। তারিণীবাবু সানিহাটি গিয়াছেন। একাকী বসিয়া ছিলাম। কত কথাই মনে হইতেছিল। সন্ধ্যার বেণুভূষণ সোম আসে। কিছু কথা হয়। সে জিজ্ঞাসা করে 'প্রাণধারায় প্রবর্তক শ্রীনিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন' ইহার অর্থ কি? তাহার জয় তো আছেই। আমি বলিলাম, 'Spiritual life is at the same time a fact and a task'। আমি-নিরপেক্ষ তাহার জয়ে আমার কি? আমি যখন সর্বেন্দ্রিয়ে সর্ব জীবনে তাঁহার জয় ঘোষণা করিব তখনই ঘটে তাঁহার জয়। আমি তাঁহাকে জীবনে বরণ

করিলেই না উঁহার ভয়? আমি তো লড়াই করিয়াই চলিয়াছি, আমার অহং এ উঁহার অহম্-এর প্রতিষ্ঠাই উঁহার ভয়। সে আমাকে ট্রাম পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়।...

১৯ই জানুয়ারী

শ্রীনিত্যগোপাল, তুমিই গুরুমূর্তি, সত্যং শিবং সুন্দরম্। তোমার অংশ-বিচ্ছুরিতরূপে বিবে সব গুরুদের আবির্ভাব। তুমিই সর্বগুরু সমন্বয় মূর্তি সর্বগুরু। তোমার মধ্যই সত্য যাত্রার গুরু পীঠ। তুমি সব ধর্মাচার্যগণের একত্র সংহত কর, যাঁহারা এতদিন মিলিতে পারেন নাই, বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে বিবের বিশেষ মতবাদে প্রবর্তন করিয়াছেন আজ এইসব মতবাদ পরস্পরসন্ধী হইয়া উঠিয়াছে। কে ইহাদের স্পর্ধা ঘুচাইয়া সমন্বয় বিধান করিবে তুমি ছাড়া? সব ধর্মযাজকগণের যে হাতে হাত মিলাইয়া রাজপথে গতিযাত্রা তুলিবে? ঠাকুর, প্রথম এই দৃশ্য দেখিয়া বড় কাঁদে কোথায় হৃদয়? হৃদয় থাকিলে কি একে অপরকে এমনভাবে খণ্ডন করিতে পারে? হৃদয় যে খণ্ডন অখণ্ডনের সমন্বয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তুমি হৃদয়-হরণ, তোমার জন্য হউক সকলে প্রথমে কবলা আসে, প্রাণ সঙ্গে সঙ্গেই মায়া ও ভব আসে, কিছু পরেই বেণুভূষণ আসে ৮টার পর আমি বেণু বিনু ও গোপা মঠে যাই। ৯॥টায় সভা আরম্ভ হয়। 'গিরিধারী' প্রসঙ্গ তুলিয়া ঠাকুরের 'জড়'বাদের আলোচনা করি। 'আত্মানমন্বিচ্ছোচ্চি' শ্লোকব্যাখ্যা আরম্ভ করি। ঠাকুরের ভাইয়ের এক সংশয় আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাড়ীতে গ্র্যাটার অব প্যারিসে গড়া ঠাকুরের মূর্তি আছে। তিনি পতঞ্জলিকীতে ৫০০০ টাকা দিয়াছেন, উন্নয়নভারতের গ্রাহক হইয়াছেন। টিপটিপ বৃষ্টি হওয়ায় সভা শেষ করি। তারপর বারান্দায় ১১॥টা পর্যন্ত আলোচনা হয়। আলোচনা বেশ জমে। বেণুকুঞ্জ পৌঁছাইয়া দিয়া যায়, সেবানন্দ সরযূ খাইতে দেয়। রবীন সভার গান গায় ও ঠাকুর সম্বন্ধে কিছু বলে প্রথমে। পড়াশুনা করিলে পারিবে। মঠ হইতে একটী লাউ ও কিছু দিম বেণু কিনিয়া আনে। দাম পরে দেওয়া হইবে

১০ই জানুয়ারী

ঠাকুর, আমার সারা জীবনে একাকী পথ চলার সঙ্গী আমার, কে আমার এই পাগল প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে? আমার পথ তো আরামের পথ নয়। এযে কড় ঠেলিয়া চলার পথ। তাই কেহ সঙ্গে নাই। এই মনে রোজ মঠে যাওয়া, রাত্রিতে একা আসা, এতদিন ধরিয়া একা বলা—তোমার আশীর্বাদেই পারিতেছি। বৈকাল হইলেই মঠে যাইতে ইচ্ছা করে। কেহ এক জন আসিলে তোমার কথা বলিবার তো কেহ নাই। কে ওখানে বসিয়া আছে তোমার প্রসঙ্গ লইয়া? কে যায় ব্যক্তিগত ধারা বাওয়া লইয়া বিব্রত। তাই আমি যাই, সুযোগ পাইলেই তোমার প্রসঙ্গ তুলি। কবে এমন হইবে যে সর্বদার জন্য ওখানে লোকের ভিড় হইবে তোমার কথা, তোমার দর্শন শুনিবার জন্য? সেই দিন আমার রোজ যাওয়া সার্থক হইবে। তোমাকে সঙ্গে করিয়া একা যাইব, একাই আসিব। আমার সঙ্গে থাকিবার জন্য কে বসিয়া আছে?.. রেণু ও সত্যব্রত প্রেসের জন্য বাহির হয় ৯টার পরে। ১১৪০টায় ছাপান লেবেল সহ ফেরে রেণু যাওয়ার পর ব্যাঙ্ক হইয়া কন্ট্রাক্টরের কাগজের জন্য ভবেশ্বরী যায়। মঠে ভাগবানন্দজীর বই ফেরত দিয়া এখানে ফেরে। আমি ৩টার পর মঠে যাই। ইতিমধ্যে ভস্মা আসে। সেই খবর লইয়া রেণু ও গোপা আবার মঠে যায়। আমি উহাদের সঙ্গে চলিয়া আসি। ঔষধ পরিবেশন করিবার সময় মুখার্জি ডাক্তারের প্রস্রাবের সুবিধার জন্য তাঁহাকে বলি। তিনি ব্যবস্থা করিবেন। মনে হইতেছিল পতঞ্জলিকী উৎসবে কোনও ইংরেজ যাবে বাইবেল পাঠ, কোনও অসাম্প্রদায়িক মুসলমানদ্বারা কোরাণ পাঠ, কোনও শিখদ্বারা গ্রন্থসাহেব পাঠের কথা। তাঁহাকে ঠাকুরের সম্প্রদায়ের লোক নিয়া একটী কনফারেন্স-এর কথা বলেন।...জয়া একজন গ্রাহকের (অনসূয়া) ৪৲ টাকা আনে।

১১ই জানুয়ারী

ঠাকুর, তোমাদেরই প্রাণের কথা কহিব। বলিবার তো আমার স্থান নাই, কাহাকেও তো আমার প্রাণের কথা, প্রাণের ব্যথা বুঝাইতে পারি নাই। তাই কেহ আমার সঙ্গে আসিল না। আমি একাই পথ চলিয়াছি, যে-পথ বলিয়া তুমি চলিয়া গিয়াছ। প্রাণের পথই তোমার পথ। সে পথ অতীন্দ্রিয়, অবাঙ্‌মনসগোচর। মনের কোনও একটী প্রান্তের সঙ্গে সে আটকাইয়া যায় নাই। সে দুই প্রান্তকেই, দুই তীরকেই সমভাবে চুম্বন করিয়া এবং সমভাবে ত্যাগ করিয়া বহিয়া চলিয়াছে অনাদি অনন্তে। সে পথের পথিক নিত্য অভিযুক্ত। তুমিও নিত্য-অভিযুক্ত, আমিও নিত্য-অভিযুক্ত। তাই তুমি আমি সখা সাথী বন্ধু স্মরণ সুহৃৎ স্বামী। তুমি আমি এক অদ্বৈত বেণু গুটায় মণি সেনের ওখানে হইয়া প্রেসে যাই, ক্যালকাটা কেমিক্যাল হইয়া ১১টার পর ফেরে। খাইয়া ইউনিয়ন ড্রাগে যাই, ফেরে ৪টায়। আমি ৪॥টায় মঠে যাই। মঠের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা হয়।... কিন্তু ইহাদের চলিয়া যাইবার পর মঠের কর্মভার নিবার মত যোগ্যতা তো কাহারো দেখিতেছি না। সকলেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ। মঠ এতদিন ছিল খাওয়া খাবার স্থান। একটী cultural centre গড়িয়া তুলিতে না পারিলে বাহিরের লোক আসিবে না ...এখন হইতে এমন একটী জনমত সৃষ্টি করিতে হইবে যাহার চাপে ইহারা পলাইয়া যাইবে, ফুলদাগান তৈরী করিলে কি মাছি সেখানে থাকে? তাই-এর সঙ্গে তাই-এর লড়াই-এর পথ বাহিরের লোকের সঙ্গের লড়াই-এর মত নয়। এখানে চলিতে হইবে আদর্শ লইয়া।—কে লইয়া খুব সাবধানে চলিবার প্রয়োজন হইবে। যেমন তেমন ভাবে আঘাত করিলে তাহাতে নিজেদের উপরেই আঘাত আসিবে। বেণুদুবন আমাকে পৌঁছাইয়া দেয়।...

১২ই জানুয়ারী

ঠাকুর, আমার বাঁচিয়া থাকিবার সাধ তুমি, আমার পথ চলার মন্ত্র তুমি। তোমাকে বুকে লইয়া চলিয়াছি এবং তুমি কোনও কিছুতেই আটকা নও, তাই তোমার সঙ্গে আজ কেহ নাই। আমি তো চলিয়াছি এই ৭১ বৎসর; কোথাও আটকাইয়া পড়ি নাই। তাই কেহ আমার নাই। চলে যে, তাহার সঙ্গে কে চলিবে? আমার সামনে যে পথ, অনন্ত পথ। আমার তো থামিলে চলিবে না। পথের আহ্বানে আমি ভুলিয়াছি। পথ আমাকে চলিতে হইবে। পথ-চলাতেই আমার আনন্দ। তুমিই আমার পথ, তুমিই আমার পথ-চলা, তুমিই আমার পথ-চলার মন্ত্র, তুমিই আমার পথ চলার আনন্দ। সাবরিকী 'বিশ্বদর্শন' নিতে...আমি তাহার পর জয়দেব যাদার যাই।...সেখান হইতে মঠে আসি সন্ধ্যায় বেণুদা ঠাকুর ঘরে চিৎকার করিতেছিল। ম্যানেজার তাহাকে আনিয়া এরূপ না করিতে বিশেষভাবে মেয়েদের সামনে বলেন। আমি বলিলাম, 'তাহার কি ভাব তাহা বিচার করার অধিকার আমাদের নাই কিন্তু তাহারও ভাব হইলে তাহা গোপন করাই বিধেয়, বিশেষতঃ যাহা অপরের স্নেহের বিষয় হইতে পারে, তাহা লোকসমাজের দূরেই করা উচিত' পুলিনের একদিন ঐরূপ করাকে ঠাকুর ধমক দিয়াছিলেন ঠাকুর থাকিতে তিনি যাহা সহিতেন, আজ অনন্তনাথের কাছে তাহা চলিবে না। আজ অধিকতর সংযমের দিন আসিয়াছে। এখান হইতে এখন মানুষের প্রাণ্য সুযোগ সব পাওয়া যাইবে, কিন্তু চলিতে হইবে অধিকতর সংযমের সহিত। অমূল্য চৌধুরী ষ্টীমে তুলিয়া দেয়। আসিয়াই অনিল সমাজপতিকে দেখি। তখনই সে চলিয়া যায়। মাখনবাবু লোক মারফত তাহার প্রবন্ধ, ২টী ফুলকপি ও কয়েকটী বীট পাঠাইয়া দেয়। প্রেস হইতে প্রুফ দিয়া যায়। কিছু পরেই সুশীলা (শুকতারা) পানিহাটী হইতে আসে।...

১৩ই জানুয়ারী

ক্রমশঃ

মন্দকাজে প্রবণতা

।। শ্রীগায়ত্রী খত্তি ।।

আমরা শিক্ষক শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ের প্রতি দিনের কাজের মাধ্যমে নানাস্তরের ছেলেমেয়েদের সংস্পর্শে এসে থাকি। পড়াশুনায় ভাল, মন্দ সবরকমই তো আছেই, এর সঙ্গে আবার কেউ চটপটে, কেউ বদ্ধুবৎসল, কেউ শান্ত ইত্যাদি। এ ছাড়াও কাউকে কাউকে এমন দেখা যায় যাদের মন্দ কাজের প্রতি একটা সহজাত আকর্ষণ আছে। ফলে পড়াশুনাতেও হয়তো ভালো করে অগ্রসর হতে পারে না, এজন্য তাদের কাছ থেকে ভালবাসা ও প্রশংসা তেমন পায় না; তাই অসামাজিক হয়ে ওঠে এবং দেশের ও দশের স্বার্থ-বিরোধী বহু কাজ নিজেদের অজান্তেই করে ফেলে।

মনঃসমীক্ষণবাদীরা বলেন যে এ সব ছেলেমেয়েদের ব্যবহার ও তাদের বিচার দেখে বাইরে থেকে করলেই চলবে না, এ সবের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে মনঃসমীক্ষণবাদীরা মূল ইচ্ছাগুলিকে নানা ভাবে শ্রেণীভুক্ত করে প্রকাশ করেছেন, যেমন desire, drive, urge, libido, ইত্যাদি। Freudian school of Psychoanalyst-রা সবগুলি ইচ্ছাই যৌন-সম্ভূত বলে বিবেচনা করেছেন। অবশ্য আমরা বিশেষ কোন মতবাদদ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিরপেক্ষভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের ইচ্ছা ও আচরণ পর্যবেক্ষণ করে দেখব ও অনুসন্ধানে রত থাকব।

মানুষের কতকগুলি আদিম প্রবৃত্তি আছে, যেমন ক্ষুধা, প্রজনন, লাজকরা, দৃষ্টি আকর্ষণ করা, নিরাপত্তা, ঔৎসুক্য ইত্যাদি। এই প্রবৃত্তিগুলি মানুষের জীবনে যদি সহজ ও নিয়মিত হয় তবে জীবনযাত্রাও অতি সহজ পর্যায়ে এসে পড়ে। কিন্তু দেখা যায় এই প্রবৃত্তিগুলি জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ঠিকমত প্রকাশের পথ না পেলে বিকৃত রূপ নেয়। যেমন ধরা যাক ভালবাসা—প্রথমে জন্মে নিজের শরীরের প্রতি, তারপর মা বাবার প্রতি ও পরিবারের অন্য সকলের প্রতি, এর পরে সমবয়সের বন্ধুর প্রতি, পরবর্তীকালে বিপরীত sex-এর ছেলেমেয়েদের প্রতি। প্রতি স্তরের ভালবাসা যদি ঠিকমত না হয় তবেই কুপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা।

নিরাপত্তার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে শিশু প্রথম অবস্থায় মাতাপিতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে আত্মনির্ভর হতে হবে এবং নির্ভরতার ক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ হবে। কিন্তু এমন যদি দেখা যায় যে শিশু বড় হওয়ার পরও তাকে খাওয়ান ও পোষাক পরিচ্ছদ পরান প্রভৃতি ছোটখাট কাজের জন্য অন্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হচ্ছে তাহলে বলতে হবে মাতাপিতা তাকে 'সুযোগ' মাফিক ভাল ছেলেই করতে পেরেছেন, কিন্তু সমাজ-জীবনের উপযোগী শক্তিশালী নাগরিকত্বের দীক্ষা দিতে পারেন নি।

আবার এমন অনেক শিশু আছে যারা introvert বা অন্তর্মুখী। কাজে অগ্রসর না হয়ে, বাস্তবের সম্মুখীন না হয়ে কল্পনার রাজ্যে ডানা মেলে নিজেদের আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে। কৈশোরের দিবাস্বপ্ন ও কল্পনা শিশুকে এমন একটা জগতে নিয়ে যায় যেখানে সে 'মেঘে মেঘে আকাশ কুসুম' তোলে, 'নদীর দেশের বন্ধু দুয়ারে হানা দেয়'—সেখানে অসম্ভবের পাখায় পেরিয়ে সব পেয়েছির দেশে পৌঁছে যায়। রূপকথার রাজ্যের নায়ক নায়িকার সঙ্গে শিশু একাত্মতা বোধ করে কখনও বিজয়ী রাজপুত্রের মাধ্যমে, কখনও বা দুঃখবলুণ্ঠিতা নায়িকার মাধ্যমে; উভয় ক্ষেত্রেই আনন্দ-সাগরে অবগাহন করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অন্তর্মুখীদল রূপকথার রাজ্যে বিচরণ করার ফলে জীবনে কতটা সুখী হয়? মানুষের জীবনে তো বাস্তবকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না, রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন

হলেই তাদের গগনচুম্বী কল্পনা তাদের মনের মত খান হয়ে মেজে পড়ে। বাপ-মায়ের উপেক্ষা না যদি করি তবেই জীবন-সংগ্রাম সহজ হয়ে উঠবে, কিন্তু কল্পনা-জগতে বিচরণ জীবন সংগ্রামে অদক্ষতা আনবেই। ফলে শিশু নিজেকে পারিপার্শ্বিক থেকে আরও শামুকের মত গুটিয়ে ফেলবে। জীবন যাপনই তখন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

কল্পনার আশ্রয় নেওয়ার ফলে আরও একটি কুফল দেখা যায়। কতখানি সত্য ও কতখানি কল্পনা এই পার্থক্য-বোধ ধীরে ধীরে লোপ পায়। তাই কথায় ও ব্যবহারে সত্য মিথ্যার তারতম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং অনেক সময়ই অজ্ঞাতে মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এর জন্যেও অবশ্য পিতামাতা অনেকখানি দায়ী। শিশুর সব কথাই অবিমিশ্র সত্য বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়। যেমন শিশু বিদ্যালয় থেকে ফেরার সময় নানাপ্রকার সত্যমিথ্যার সংকলন নিয়ে ফেরে এবং তার সত্যমিথ্যা মিশ্রিত চমৎপ্রদ গল্প দিয়ে অভিভাবকদের প্রভাবিত করে। শিশু হয়তো কোন কুকর্মের জন্য নিজেকে বাঁচিয়ে অন্যের উপর দোষ চাপায় এবং অভিভাবকেরা শিশুর কথার উপর ভিত্তি করেই নানাপ্রকার মন্তব্য করেন বা কর্মপন্থা স্থির করেন, কিন্তু শিশুর সব কথা শুনে (তাকে উপেক্ষার ভাব না দেখিয়ে) নিজেদের বিচারবুদ্ধি দিয়ে সবকিছু বিচার করে দেখা হবে পিতা-মাতার কর্তব্য।

শিশুদের জীবনের কোন কিছুই উপেক্ষনীয় নয়। শিশুদের আবেগ, কৌতূহল ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ করা অভিভাবক বা অভিভাবক শ্রেণীর লোকের কর্তব্য। কৈশোরে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে sex সম্বন্ধে সচেতন হয় ও নানাপ্রকার কৌতূহল মনে মনে পোষণ করে, কিন্তু এ গুলিকে যদি জোর করে অবদমন করা হয় তাহলে মন্দ ফল হয়। কাজেই তা না করে শিশুর কৌতূহল চরিতার্থ করতে হলে তাকে যতটুকু সদুত্তর দেওয়া যায় তা দেওয়াই ভালো।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শিশুকে যদি কোন মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয় তাহলে তার সেই কাজটি আরও বেশী করে করতে থাকে। পরার সম্পর্কে উপদেশ সত্ত্বেও অনেকটা যুক্তি ওঠে পরে। সেই জন্য অভিভাবকদের উচিত শিশুর মনোযোগকে অন্য পথে চালিত করে তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করা এবং না করার সম্পর্কে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া।

আবার অনেক সময় এমন হয় যে শিশু যে কাজ পছন্দ করে না সে কাজটি না করার জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করে, যেমন পড়তে বসে মাথা ধরা, পেট ব্যথা ইত্যাদি প্রায় অনেক অসুখের কথাই শিশুদের মুখ থেকে শোনা যায়। এগুলিকে প্রশ্রয় না দিয়ে উৎসাহ দিয়ে শিশুকে কল্যাণকর কাজটির প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। তা না হলে যত যুক্তিই থাকুক না কেন ক্রমাগত পেটব্যথা, মাথাব্যথার ফলে শিশু লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়বে।

আমাদের মনের কয়েক আবেগ সর্বদা পথ খোঁজে, কোন আলোকিত পথে আবেগটি যদি বাধা পায় তবে তীব্রতর হয়ে অন্য পথে প্রবাহিত হবে এবং সে কাজটি সর্বদা সমাজ-অনুমোদিত পথ নাও হতে পারে। যেমন বাড়ীতে মা বাবার কাছ থেকে কোন শিশু যদি ঠিকমত ভালবাসা না পায় তবে সে সেই ভালবাসাটা বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে compensate করতে চায় বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে ভালবাসা পেতে হলে তাদের খাওয়াতে হবে, তাদের সিনেমা দেখাতে হবে, তাদের ভাল ভাল উপহার দিতে হবে ইত্যাদি এর জন্য চাই অর্থ অথচ বাবা মার কাছে চাইলে অত অর্থ পাওয়া যাবে না। তাই তাকে বাবার পকেট মেরে ও মায়ের বাক্স ভেঙে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। শিশুর এই মন্দ কাজের জন্য তার সম্পূর্ণ দোষ দেখি না, এর জন্য পরোক্ষভাবে মা বাবাই দায়ী। স্কুলে পড়াশুনায় অনগ্রসর ছেলেমেয়ে সাধারণতঃ শিক্ষকের কাছ থেকে অশ্রদ্ধা করে বসে; শিক্ষকের প্রশংসা তারা পায় না। কিন্তু প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করার একটা অদম্য ইচ্ছা থাকে। তাই তাকে অবাঞ্ছিত পথে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করতে হয়, স্কুলে পড়ানর সময় গোলমাল করতে হয়, শিক্ষকের অবাধ্য হতে হয়,

সহপাঠীদের সাথে মারামারি করতে হয়, মিথ্যা কথা বলতে হয়, টিফিনের পয়সা চুরি করতে হয় ইত্যাদি। অনেক সময় দেখা যায় কোন শিশু প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত অথচ চুরী করে ফেলছে নিজের অজান্তে। এটাও একটা রোগ বিশেষ। তার মধ্যে সকল প্রবৃত্তি এত প্রবল যে যখন সে কোন কাজ কিনিষ দেখে তখনই তার সেটা সকল করতে ইচ্ছা করে এবং স্বভাবতঃ তাতেই কাজটি করেও ফেলে। এইসব শিশুকে কিছু শাস্তি ও পুরস্কারের মাধ্যমে সব সময় ভালো পথে আনা যায় না। তাদের ইচ্ছা ও আবেগকে সৎ পথে চালিত করাও উচিত। যে সৃষ্টি আনন্দ করতে চায় তাকে ভালবাসতে হবে, যে সকল করতে চায় তাকে stamp, ছাপ, পাতা, ক্যালেণ্ডার ইত্যাদি সকল করতে সাহায্য করা যেতে পারে।

অনেক সময় শিশুর অন্যায় দেখা হয়, এই ভেবে তার অভিভাবকদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। এই ভেদটি ভালো করে শাসনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে, তা না হলে এই ভেদ পরবর্তী কালে বিদ্রোহের রূপ নিতে পারে আর তার ফল মোটেই ভালো হয় না।

যাদের সঙ্গে শিশুর বিরোধের সম্ভাবনা আছে, তাদের কাছে তার কৃতকর্মের সমর্থন পেলে তার তাদের কাছে শিশু মিথ্যা কথা বলে। শিশুর মিথ্যা বলার অভ্যাস দূর করতে হলে তার সামাজিক গণ্ডীকে আরও বাড়াতে হবে। শিশু যদি ক্রমবর্ধমান বৃহৎ সমাজে মিশতে আরম্ভ করে তাহলে মিথ্যা বলার প্রয়োজন তার কাছে কমে যাবে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে মেয়েরা সাধারণতঃ ছেলেদের চেয়ে বেশী মিথ্যার আশ্রয় নেয়। কারণ হিসাবে একই কথা বলা চলে মেয়েদের সামাজিক গণ্ডী সীমাবদ্ধ। আমার অনেক শিশু শাস্তির ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে মিথ্যা কথা বলে, কাজেই শাস্তি ও পুরস্কার যারা দেবেন তাদের যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত

ফুল পালানর প্রবৃত্তি মেয়েদের থেকে ছেলেদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। Cyril Burt ইংল্যাণ্ডের ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে বলেছেন—April, May, June মাসে যখন আবহাওয়া ভালো থাকে তখন শিশুরা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বসে পড়াশুনা করতে ভালোবাসে না। আমাদের দেশেও শীতকালে ও বসন্তকালে ছেলেমেয়েরা বেড়ানর ইচ্ছা প্রকাশ করে, বাইরের মুক্ত পরিবেশ তাকে হাতছানি দেয়। শিশু আর থাকতে না পেরে বেড়িয়ে পড়ে, তার এই পালানর জন্য কারুর কাছে সমর্থন না পেয়ে নানাপ্রকার মিথ্যার অবতারণা করে। এর জন্য অবশ্য বিদ্যালয়-পরিবেশ অনেকখানি দায়ী। বিদ্যালয়ের পরিবেশ খানিকটা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে শিশু-মনের খবর কেউ রাখেনা; সে-ও তার মনের খোরাক পায় না, সে যদি 'আমি আজ কানাই মাষ্টার পোড়ো ঘোর বেড়াল চানাটি' বলে মনে করতে পারতো অর্থাৎ তার নিজের খানের জগৎ সৃষ্টি করতে পারতো তাহলে সে পালানর কথা চিন্তাও করত না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে তিনি এমন স্কুল করবেন যেখানে ছেলেমেয়েরা দৌড়ে খেলে পালিয়ে আসবে। প্রকৃতির কোলে বসে শিশু পাঠ গ্রহণ করবে। সমস্ত বিদ্যালয়ে হয়তো এ রকম পরিবেশ রচনা করা সম্ভব নয়, তবুও মাঝে মাঝে শিশুদের সাথে পরিবেশ পরিচিতি ঘটালে হয়তো খানিকটা শিশু-মনের খোরাক যোগান যায়। শিশু স্বাধীন, তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় বলেই তার কাছে বিদ্যালয়-জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। তাই তার ইচ্ছা ও প্রবণতা অনুযায়ী তাকে যদি তার মনোমত কাজ দেওয়া যায় তাহলে সে হয়তো চুড়িওয়ালাকে দেখে আর বলবে না——

"দশটা বাজে, দাড়ে দশটা বাজে
মাই তো তাড়া হয় বা পাছে দেরী
ইচ্ছা করে সেলেট ফেলে দিয়ে
অমনি করে বেড়াই নিয়ে দেরী।"

কখনও বা শিশু মালীর মালী হতে চায়, কখনও বা পাগড়ী পরে পাহারাওলা হতে চায়, কাজেই শিশুদের বিচিত্র সাধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষকদের শিক্ষা করতে হবে, শিশুদের জন্য বিচিত্র, অভিনব কর্মক্ষেত্র রচনা করতে হবে।

নিষ্পাপ সরল শিশুরা এই যে নানাপ্রকার অপরাধের মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে এর কারণ কি? গৃহ-পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, বিদ্যালয়-পরিবেশ এর জন্য সর্বতোভাবে দায়ী। অনেকের বাড়ীর অবস্থা স্বচ্ছল নয়, মা বাবাকে নিয়ত হয়তো অর্থচিন্তায় দিন কাটাতে হয়, ছেলেমেয়ের দিকে নজর দেওয়ার সময় কোথায়? কারুর হয়তো মা কিংবা বাবা নেই, অভিভাবকরা অত্যন্ত অনাদর করে থাকেন, কারুর হয়তো মা বাবার মধ্যে সদ্ভাব নেই—ছেলেমেয়ে কাকে আদর্শ হিসাবে সামনে রেখে বড় হবে?

আজকে কেবলমাত্র বাড়ীর পরিবেশ ভালো হলেই চলবে না, শিশুকে সঙ্গী-সাথীদের সাথে মিশতে হবে, কাজেই সামাজিক পরিবেশটিও শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উপযোগী হতে হবে।

এ ছাড়া আজকাল বেশীর ভাগ অভিভাবক শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও চরিত্র গঠনের দায়িত্ব শিক্ষক শ্রেণীর উপরে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন ফলে শিক্ষক শ্রেণীর দায়িত্ব অনেকখানি বেড়ে গেছে। শিক্ষককে এখন মাতা পিতা, বন্ধু, সখার ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষককে শিশুদের প্রবণতাগুলিকে জানতে হবে, তাদের ভালবাসতে হবে, একটি সহানুভূতিশীল মন নিয়ে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে হবে, তার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে হবে, তাকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর করে দিতে হবে। অনেক সময় শিশুর অনেক প্রশ্ন প্রশ্নীদের মন নিয়ে বিচার করলে নিরর্থক মনে হতে পারে কিন্তু একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে Pandora-র কৌতূহল পৃথিবীতে দুঃখ যেমন এনেছে—তেমনি এনেছে আশা, জীবনকে করেছে বন্ধুর, চকল আর রহস্যময়। আমরা আমি শিশু-মনে নিয়ত কত প্রশ্নই না উঁকি দেয়। তার মধ্যে থাকে তার জানবার অদম্য ইচ্ছা—তাকে রুদ্ধ করে দিলে শিশু-মন পঙ্গু হয়ে যাবে। অবশ্য সুশিক্ষক নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখবেন যাতে শিশু-মনে অনধিকার প্রবেশ কৌতূহল না জাগে। প্রচুর স্নেহ, ভালবাসা এবং সর্বোপরি শিক্ষকের চরিত্র মাধুর্যেই তিনি ছাত্রছাত্রীকে প্রভাবিত করবেন

"সবার উপরে মানুষ সত্য। হিন্দু তখনই সত্যকার হিন্দু, যখন সে 'মানুষ'; মুসলমানও তখনই সত্যিকার মুসলমান যখন সে মানুষ। মানুষ একান্ত হিন্দুরও 'উপর', একান্ত মুসলমানেরও 'উপর'। হিন্দু যখন সঙ্কীর্ণ হিন্দু-উপাধি ডিঙ্গাইয়া মানুষের স্তরে আসীন হইবে, তখনই সে সত্য বাস্তব হিন্দু; মুসলমানও যখন সঙ্কীর্ণ মুসলমান-উপাধি পরিত্যাগ করিয়া মানুষেরস্তরে উন্নীত হইবে, তখনই সে সত্য বাস্তব মুসলমান। দুই দুই থাকিয়া, দুই-এর বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া এবং তিন তিন থাকিয়া, তিন-এর বিশেষত্ব অটুট রাখিয়াও যেমন দুয়-এর মাঝে এক হইতে পারে, ঠিক তেমনি মানুষের মাঝেই হিন্দু-মুসলমান স্ব স্ব পারিবারিক সামাজিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া এক হইতে পারে। হিন্দু-মুসলমান যদি এই কৌশলের খোঁজ না রাখে, বুকে বুক মিলাইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য প্রাণপণ না করে, তবে হিন্দু মানুষও নয়, হিন্দুও নয়, মুসলমান মানুষও নয়, মুসলমানও নয়। সহজ মানুষকে জানিয়া, সহজ মানুষ বনিয়া গিয়া হিন্দু-মুসলমান নিজকে জানো, আত্মস্থ হও। * * মানুষ-রাজ প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের ধ্যানের বস্তু—হিন্দু-রাজও নয়, মুসলমান-রাজও নয়। * * *"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শিক্ষক

॥ শ্রীকণিভূষণ বিশ্বাস ॥

শিক্ষক তৈরী হয় না, জন্মায়। এই সহজ কথাটার মধ্যে কিন্তু গভীর মনস্তত্ত্ব রয়েছে। কেননা 'তৈরী হয়' আর 'জন্মায়'—এ দুটোর মধ্যেই অনেক তফাৎ। প্রথমটা কৃত্রিম, দ্বিতীয়টি অকৃত্রিম, স্বভাবজ।

প্রথমটিতে গড়ে পিটে আনতে হয় একটা গড়নে, দ্বিতীয়টির রূপ ধাতুগত। তা'র ধরণও নিজস্ব। আর গড়নটা যেন ছাঁচ। তার গায়ে খাঁজে একই মার্কার ছাপ, মডেলের ট্রেড মার্ক। ধরণটা কিন্তু আধারের মত। সে যেন স্বভাবের আঁধারে ধরণটাকে ধরে রাখে। সেখানে কোন ওজর খবরদারী নেই, আছে শুধু সোদার খোদকারী। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ টমাস ফুলারও ঠিক এহেন মন্তব্য করেছেন। বলেছেন যে ভগবান যাউকে ভূল মাস্টারের ছাচে ঢালাই করেছেন তিনি তাদের এমন 'তরিয়ে' দেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁদের আর কোন তালিমের দরকার হয় না। এখানেই প্রচেষ্টা আর প্রতিষ্ঠার কথা ওঠে।

এই প্রসঙ্গে ভয়ে 'পাওয়া' আর শুধু 'হওয়া'র কথা আসে। পাওয়াটা আসে একটা শক্তির উৎস থেকে। অন্যদিকে যে নিয়ে জন্মায় নি, তাকে নিজস্ব হ'তে হবে। এই হওয়াটা যে তার সাধনা। আবার একথা ঠিক যে, মানুষ কেবল ভাগ্য নিয়ে জন্মায় না, সে তার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিতও করে। এইজন্য অনুশীলনের বিশেষ প্রয়োজন। সামর্থ্যের সবটা গুণগুলোকে মুক্ত করে নিয়েই শিক্ষার্থীকে শক্তির উৎসের সন্ধানে যেতে হয়। সেই জন্য যে অনুসন্ধান তার নামই হলো অনুশীলন।

নাম না নিয়ে কেবল নামাবলী গায়ে দিলেই যেমন ভক্ত হওয়া যায় না, তেমনি যা' স্বভাবে নেই, তাকে সাধ্যের খুঠোয় পাওয়া যায় না। এই জন্য শিক্ষকদের হয় অনেক শক্তি আর ভাব-স্বভাবের সেই চিরন্তন আধার। তাঁকে কেবল দীক্ষিত পুরুষই হ'লে চলবে না। তাঁকে হ'তে হবে চলমান, অফুরন্ত, উৎসারিত স্রোতস্বিনী। যেখানে শিক্ষার্থীর মন পাবে তা'র বিচিত্র পিপাসার পর্যাপ্ত পানীয়। আর অবগাহনে তার দেহের ত্রি-তাপ জ্বালা জুড়াবে।

আদর্শে শিক্ষক শিশু বিদ্যালয়ের উৎস মাত্র নন। অথবা তিনি চলন্ত অভিধান, কিংবা শিশু ছাত্রদের কাজ-কারবারের রসদ সরবরাহকারীও নন। বরং তিনি হ'লেন ছাত্রদের পথ-প্রদর্শক, দার্শনিক এবং সুহৃৎ—সুদক্ষ চরিত্র নির্মেতা, দেহ মনের সংগঠক এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তির যাচাইকারক।

শিক্ষকতার যোগ্যতার এই ধাপে উঠবার আগে শিক্ষককে তন্ন তন্ন করে দেখে, বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে শিশুদের সমস্ত শিল্পকে বুঝে নিতে হ'বে। তাঁকে হ'তে হবে আচরণবাদী, মানসিক মনস্তাত্ত্বিক, শারীর তত্ত্ববিদ্ এবং নীতিজ্ঞ। ছাত্রদের স্বভাবের ঝোঁক যে দিকে, তাদের প্রবণতা যেদিকে, সেই দিকে শিক্ষকদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিতে হ'বে। শিক্ষক নামের যোগ্যতা অর্জনের জন্য তাঁদের হতে হবে স্বভাবসিদ্ধ। তাদেই ধাঁচের, এই পেশার নেশা নেই, ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি নেই, তাঁদের কখনই শিক্ষকতার চৌকাঠ পেরনো উচিত নয়—ব্যক্তিগত ভাবে নিজের জন্য তো বটেই, আর যাদের তালিম দিতে হ'বে তাদের জন্যও বিশেষ করে।

আর এই দুরূহ কাজের সাফল্যের জন্য তাঁকে হতে হ'বে অফুরন্ত ধৈর্যের অধিকারী। তাঁর ব্যক্তিত্ব হ'বে কৌতুককর, আকর্ষণীয়। পঠন-বিষয়ে থাকবে তাঁর সংশয়-মুক্ত অগাধ জ্ঞান, প্রয়োগ-কৌশলের নিখুঁত দক্ষতা। এ ছাড়া শিক্ষক যে আদর্শ মানুষ হ'বেন, তাঁর সেই মডেল চরিত্রের কি কি গুণাবলী থাকবে, শিক্ষাবিদ্‌রা তা'র লম্বা

ফিরিস্তি দিয়েছেন। বলেছেন যে, সমস্ত জ্ঞান বিবেচনার সঙ্গে শিক্ষকদের থাকবে একটা রুচি পরিমার্জিত হাস্য পরিহাসের ক্ষমতা, সহনশীলতা, বহুমুখী প্রতিভা, মৌলিকত্ব, অন্তর্দৃষ্টি, সজাগ-সতর্কতা, কষ্ট-সহিষ্ণুতার অনন্ত শক্তি, আশাভঙ্গ আশাবাদ, আত্মমর্যাদাবোধ, বিষয়-সিদ্ধান্ত-জ্ঞান, অনুকরণীয় চরিত্র, সূক্ষ্ম-পর্যবেক্ষণ শক্তি, সৌজন্যবোধ, পরিমার্জিত ব্যক্তিত্ব, ব্যবহারিক মিষ্টতা, সংযত মেজাজ, নির্ভুল মর্মন, প্রখর শ্রবণ শক্তি, কর্তৃত্ব, অধ্যবসায়, আত্ম-বিশ্বাস, বাক্যোচ্চারণ সামর্থ্য এবং সুস্পষ্ট মতিত অটল দৃঢ়তা এইসব গুণাবলী সমন্বিত হবে শিক্ষক হ'বেন a model man।

আবার বিচিত্র মানসিক তার প্রতিনিধি হ'বেন তিনি। অর্থাৎ তিনি হ'বেন মানসিক, নৈতিক, পারীরিক এবং ধর্ম প্রবণতার প্রতীক। জীবনই হ'বে তাঁর জাগ্রত বাণী। যা' যা' তাঁর জীবনে সত্য নয়, সেই অনাচারিত সত্যের প্রতি ছাত্রদের প্রত্যয় জন্মাবে কি করে? কাজেই শিক্ষক হবো বলে মনস্থ করলে অতি অবশ্যই তাঁকে নানা আদর্শের প্রতি অবশ্যই মডেল হ'তে হবে। তাঁর আচরণ আর জীবন বৃত্তির বৈচিত্র মডেল থাকবে ছাত্রদের সামনে। প্রথমটি দেখে ছাত্রেরা অনুকরণ করবে, আর দ্বিতীয়টির ছাঁচে ঢালাই হ'বে তাদের বিকাশোন্মুখ চরিত্র।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষকদের একটি নিগূঢ় দায়িত্বও আছে। সেটা শিক্ষকদের নৈতিক-দায়িত্ব। প্রকৃত শিক্ষক যিনি তিনি ছাত্রদের হৃদয়ে ভক্তি, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা জাগিয়ে তুলবেন। যে-ভক্তি ভালোবাসার মধ্যে থাকবে একটা ভয়-বিস্ময়-মেশানো শ্রদ্ধা। শিক্ষকদের ভ্রূকুটি হবে ছাত্রদের কাছে শাস্তি, তাঁদের হাসি হ'বে পুরস্কার। ছাত্রদের কাছে তিনি হবেন অন্তরে পিতা, হৃদয়ে মাতা আর শাসনে যমের তুল্য। আবার ছাত্রদের চাহিদারও উৎস হ'বেন তিনি। বিনয় নিষ্ঠাচার শেখানোর জন্য শিক্ষককে কখনই অবিনয়ী, অশিষ্টাচারী হলে চলবে না। উপরন্তু তিনি হ'বেন সময়-নিষ্ঠার জীবন্ত ঘড়ি। তাঁর চলা ফেরা দেখে ছাত্ররা সময়-নিষ্ঠা শিক্ষা করবে।

আর নিজ নিজ চরিত্রের প্রবণতা অনুসারে ছাত্ররা যাতে সঠিক মডেলের অনুকরণ করতে প্রয়াসী হয়, সেদিকে শিক্ষকদের সযত্ন দৃষ্টি দিতে হবে। কেননা, যেমন 'মডেল', তেমনি হবে সেই 'মেকারের' জিনিস। কুম্ভকার যেমন অনেকগুলি তৈরী ছাঁচের মধ্যে যেটি সবচেয়ে নিখুঁত, নিভুল, সেইটিকে আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে তা' থেকে ছাঁচ তোলে, ছাত্রগণও তেমনি বহু শিক্ষকের সাহচর্যে এসে, যার মধ্যে আপন আপন জীবন গড়ার সেই নির্ভরযোগ্য জীবনাদর্শের মডেলটি খুঁজে পাবে, সেই ছাঁচেই যাতে তারা নিজ নিজ জীবনকে গড়ে পিটে নিতে পারে, সেদিকে প্রধান শিক্ষককে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হ'বে।

শিক্ষকের দায়িত্ব কর্তব্য কেবল শ্রেণীর মধ্যেই সীমিত নয়, তার বাইরেও বটে। তিনি একার শিক্ষক হবেন—শ্রেণী কক্ষে বা তার বাইরে—সবেতেই সংগঠক, পরিচালক, পথ-প্রদর্শক, দার্শনিক-বন্ধু সার্বিকভাবে সর্ব বিষয়ের শিক্ষক। তিনি সদা সর্বদাই হবেন শৃঙ্খলার, উদ্ভাসনের, উদ্ঘাটনের নির্ভর। তিনি কখনই তথ্য-পরিপুষ্ট বিশ্লেষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন না।

এইসব দৈহিক এবং মানসিক গুণাবলী ছাড়াও তিনি হবেন আরও কতকগুলি বিশেষ এবং সাধারণ গুণাবলীর অধিকারী। প্রথমতঃ তাঁর পঠনের পরিধি হ'বে বিশদ এবং বহুধা। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি হবেন যথার্থ অর্থেই শিক্ষিত। দ্বিতীয়তঃ তিনি হবেন ছাত্রদিগের খবরাখবর, সাহিত্য এবং অধিকারের প্রামাণিক পরিবেশক। অধিকন্তু তিনি যে বিষয়ের শিক্ষক হবেন, সে বিষয়ে তাঁর থাকবে পুংখানুপুংখ সামগ্রিক ধারণা। তৃতীয়তঃ কেন বা কেমন করে শিখাতে হবে, সে সম্পর্কেও তিনি হ'বেন ওয়াকিবহাল।

চতুর্থতঃ প্রত্যাকীভূত পঠনের ফলন থাকবে শিক্ষকের দু' চোখে, বর্ণনায় নৈপুণ্যে সেই ভাবনার রূপ-চিত্র সৃষ্টি করার যোগ্যতাও থাকবে তাঁর। তা' ছাড়া তিনি হবেন স্বভাবসিদ্ধ আলাপচারী এবং আড্ডা গল্প বলিয়ে বা কথক।

সর্বোপরি তিনি অধ্যাপনাকে গ্রহণ করবেন শিল্প-রূপে আর সেই শিল্প-কর্মের তিনি হবেন কারিগর। ক্রমান্বয়ে সেই শিল্প-কৃতির উন্নতি ও প্রগতির জন্য তাঁকে অবশ্যই জানতে হবে সেই শিল্প-বিজ্ঞানের খুঁটিনাটিকে। এই কারণে অপরের অভিজ্ঞতা লাভে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে আত্মস্থ করার জন্য তাঁকে সক্রিয় ভাবে সচেষ্ট হ'তে হবে। আর এই মূল সত্যটী স্মরণে রাখতে হবে যে, প্রকৃত শিক্ষকতার গুণ অর্জিত নয়, সেগুলি একান্ত ভাবেই লব্ধগত। তথাপি যাদের ঐগুলি আছে, আর যাদের নেই—তাদের দুজনকেই পরিমার্জন আর অর্জনের জন্য অনুশীলন করতে হবে। কেননা কেবল দায়িত্ব নিলে কর্তব্যেই চলে না, অভিজ্ঞতার ইস্পাতে ঘসে ঘসে জ্ঞানের অসিকে শাণিত, তীক্ষ্ণ করে নিতে হয়। যোগ্যতা নিয়ে জন্মানটাই বড় কথা নয়, তার সদ্ব্যবহার করাটাই আসল কথা। কেননা বিশেষ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য মানুষকে নানা বিষিষ্ট ভাবনার মধ্য দিয়ে অনেক অনেক বিশিষ্ট অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট হতে হয়। এদিক থেকে শিক্ষকরা ভিন্ন। কেননা, 'হয়ে' জন্মেও আবার তাদের 'হতে' হয়। যে এই হতে জানে না, সে জন্মও দিতেও পারে না।

এই জন্যই তালিম দেওয়ার আগে, শিক্ষানবিশীর তালিম নিতে হয়। পেশাগত তত্ত্বকে সত্যে, ভাবকে ভাবনায়, কথাকে কাজে রূপায়িত করার জন্য শিক্ষকদের প্রতি পদক্ষেপেই উদ্যমী হতে হবে। এই কারণে যিনি তত্ত্বজ্ঞ হয়েও অভিজ্ঞ নন, পঠন-পাঠনায় যাঁর মুখের সঙ্গে অন্তর সাড়া দেয় না, অনেক সময়ক্ষেপ করেও যিনি নিজ পেশা সম্পর্কে স্বাসাকাঙ্খা জাগাতে পারেননি, তিনি যতোই উপাধি আর অভিজ্ঞানের বহরই নথিপত্রের অধিকারী হোন না কেন, তিনি অধ্যাপনার অনুপযুক্ত।

এই অর্থে আমরা কেউ কি নিখুঁৎ শিক্ষক? আর ক'জনেই বা এই অর্থে প্রকৃত শিক্ষক? তবু প্রকৃতিকে না জানলে যেমন প্রকৃতকে পাওয়া যায় না, সেইরূপ শিক্ষকতার শিল্পরূপকে না জানলে শিক্ষক হওয়া যায় না। তবে ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকলে ব্যক্তিগত দুর্বলতা, অক্ষমতা আর সমস্ত প্রতিবন্ধকতাগুলোকে অতিক্রম করে শিক্ষকেরা সেই শিক্ষা-শিল্প কৃতির সমন্বয়ের মাধ্যমে সাফল্যের দিকে অগ্রসর হতে পারেন।

এখন জানা দরকার এই প্রতিবন্ধকতাগুলি কি? উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে, যাঁরা বয়সটা যন্ত্রণা, তাঁদের এই আত্মিক দৌর্বল্যকে জয় করতে হবে। তাঁরা অবশ্যই চেষ্টা করবেন যাতে আইনের অনুশাসন মেনে চলতে পারেন; যাতে কাউকে অযথা শাস্তির না দেওয়া হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। শাস্তির অতিরিক্ত কোন শাস্তি না দিয়ে অনুসন্ধানের জন্য কিছু সময় নেওয়া উচিত। একজন শিক্ষাবিদ্ যা বলেছেন, এক্ষেত্রে সে কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে ভালো করেই জানি। আর সে জানা সম্পূর্ণ হলেই অন্যকে আত্মিক চরিত্রে করা যায়। কোন ছাত্রের ভুল ধরা দিতে হলে কথা ও কাজের সঙ্গে তত্ত্বকে তথ্যের জোর প্রয়োগ করে যাচাই করে নিতে হয়। কেননা আমরা জানি যে, অনেক সময় প্রকৃত সত্যের মান তত্ত্বগত আদর্শ মানের অনেক নীচে থাকে।

এখানেই মনাক্টীকরণের প্রশ্ন উঠে। আজ শিক্ষককে আগে ছাত্র, পরে শিক্ষক হতে হবে। যেমনটি অপরিণত-মতি শিশুদের কাছে হওয়া উচিত প্রত্যেকটি শিক্ষকের মধ্যে অবশ্যই থাকবে সেই শিশু-সুলভতা। এই যেমন আমরা আকাঙ্ক্ষা করছি, যেমনটি ভাবছি, ঠিক সেই পর্যায়ে নেমে সেই স্বাভাবিক উপায়ে ভাব-বিনিময়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রেরা যাতে স্বভাবেরই কাছে থাকে, কৃত্রিমতার দিকে না সরে যায়, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

যীশু যেমন শিশুদের মধ্যেই স্বর্গের সন্ধান পেয়েছিলেন, আজ শিক্ষককেও তেমনি শিশু-প্রেমিক হতে হবে। শিশুদের অনুপ্রাণিত, আকৃষ্ট, বিষিষ্ট করতে হলে শিক্ষককে স্বভাবে শিশু, ভাবে উৎসাহী কিশোর, প্রেরণায় তরুণ, পরিচালনায় কর্মঠ যুবক হ'তে হ'বে। যাঁর স্বভাবে শিশু নেই, সে শিশু-শিক্ষার যীশুকে একদিন হেরড রাজার মতন হৃদয়হীন নির্মমতায় হত্যা করবে। সেটা শিশুদের কাছে যেন অসহনীয় শাসন বলে, শিক্ষার সঙ্গে যমভূমি, আর শিক্ষকতার মৃত্যু ঘন্টা। এর কোনটাই কোন শিক্ষকের কাছে কখনই কাম্য হ'তে পারে না।

সাময়িকী

নূতন পথের নূতন পাসক : আজ এগারদিন হইল চতুর্থ নির্বাচনোত্তর বাংলাদেশ এক নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতির আস্বাদন করিয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা দেশের শাসন-ব্যবস্থায় অফিসিয়াল কংগ্রেসের পরাজয় ঘটিয়াছে। সংযুক্ত বামপন্থী দল শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে। আমরা সম্মিলিত এই নূতন শাসন-কর্তৃপক্ষকে স্বাগত জানাই—তাঁহারা জনচিত্তকে শান্ত করিয়া তাহাদের অন্তর্নিহিত কল্যাণ-বুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া তুলুন, তাহাদের সহযোগিতার বুদ্ধি প্রস্ফুটিত করিয়া তুলুন, দেশের সুদিন অনেকাংশেই করিয়া আসিবে। নূতন আশার মানুষ নিজেকে সম্বরণ করিতে, সংযত করিতে ইচ্ছুক হইবে। আমরা এই নূতনকে পুনরায় স্বাগত জানাই।

কংগ্রেসের আদর্শের পরাজয় ঘটিয়াছে তাহা নয়, কেননা আজ বাংলা দেশের শাসনভার প্রধানতঃ যাঁহার হাতে যাইয়া পড়িল প্রবীণ সেই শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও কংগ্রেসের আদর্শেই বিশ্বাসী, মহাত্মা গান্ধীজীর জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী। তাঁহার হাতেই কংগ্রেসের আদর্শ বাস্তবিকভাবে রক্ষা পাইবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি : অজয়বাবুও কংগ্রেসেরই মানুষ, মহাত্মা গান্ধীজীর চিন্তা-ধারায় অনুপ্রাণিত জীবন তাঁহার আজ পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। যে আধিনতার জন্য অত বড় উচ্চ আদর্শ লইয়াও এতদিনের অফিসিয়াল কংগ্রেস দীর্ঘ বিশ বৎসর রাজত্ব করার পর জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন হারাইয়াছে, কেবল সমর্থনই হারায় নাই, বলা যাইতে পারে ঘৃণার পাত্র হইয়াছে, অজয়বাবুর জীবনে তাহার ছোঁয়া আজ পর্যন্ত লাগে নাই, আমরা বিশ্বাস করি শেষ দিন পর্যন্ত লাগিবেও না। বাংলাদেশের অনেক দোষ, অনেক বিচ্যুতি—তথাপি আজ যে বিধাতা নেপথ্যে থাকিয়া প্রধানতঃ অজয়বাবুর হাতে বাংলাদেশের শাসন ভার তুলিয়া দিলেন—বলিতে হইবে তাঁহার এ কাজ গভীর অর্থদ্যোতক—সত্যেরই জয় হইল, সততারই জয় হইল, কংগ্রেসের নয়, কংগ্রেসের আদর্শেরই জয় হইল। জনগণী দলগুলির যে মিলন ঘটিলে অনেক আগেই অফিসিয়াল কংগ্রেসকে গদীচ্যুত করা যাইত, বিধাতার কোন্ ইঙ্গিতে সে মিলন এতদিন ঘটে নাই, আজ ঘটিল? অজয়বাবুর দলের শক্তিও ছিল, আজও আছে; কিন্তু কংগ্রেসের আদর্শকে রক্ষা করিবার জন্য তেমন ছিলেন না, অজয়বাবু প্রফুল্লবাবু সেই আদর্শ-হীনতা লইয়া কংগ্রেসের আদর্শকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব লইয়া যখন আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন জন-চিত্ত তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতে দ্বিধা করিল না। এবং এই জন্যই আজ একের পরের মাসের একটি সংগঠন জনচিত্তের এমন স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পাইল। Problem state বাংলা দেশই একদিন ইংরাজ-রাজত্বের অবসানের পথ দেখাইয়াছিল, আজও আবার নূতন যুগের ভোরে সে নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে। তাই অজয়বাবুদের অপেক্ষায় ছিলেন বিধাতা পুরুষ। আমরা কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক, সৎ, আদর্শবান পুরুষ শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতিদের স্বাগত জানাইয়া বলি, সততার ধারক হে জনদরদী বন্ধুগণ, বাংলা দেশ, ভারতবর্ষ তথা সমস্ত পৃথিবী আজ মহা সংঘর্ষের উত্তাপে তপ্ত হইতেছে। এ উত্তাপ শুধু কয়েকটী মানুষের দুর্নীতি বা দুর্নীতি সমর্থনের দুর্বলতার মধ্যে নাই—দুর্নীতি অথবা দুর্নীতি সমর্থনের দুর্বলতা আপনারা দৃঢ়ভাবে পরিবর্তন করিয়া জনসাধারণকে সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে সাহায্য তো করিবেনই—কিন্তু আজ তাহা অপেক্ষাও বৃহত্তর কাজে বিধাতা আপনাদের আহ্বান করিয়াছেন। আদর্শের পূর্ণতা সত্ত্বেও আজ যে দশ এগারটী দল দেশের জনসাধারণের স্বার্থের দিকে চাহিয়া হাত মিলাইয়া একত্রিত হইল—

এই ঘটনাটাই একটা সুদূরবর্তী সমাধানকে ডাকিয়া আনিতে পারে—সেইখানে আপনাদের আহ্বান জানাই। যখনই আদর্শ হল ভবিষ্যৎ থাকিলে সত্যই তাহাতে কখনও ধারণ হয় থাকে—বিশেষতঃ একতা বা সমন্বয়কর্তা বলিয়া একটা জিনিষ যাহা ভারতবর্ষ বাস্তবের ক্ষেত্রে কখনও আয়োজন করে নাই যদিও প্রবন্ধের শুরুতে সব কিছুই তাহার আছে বলা—সেই ভারতবাসী যে আমরা এই দাবী কতদিন রক্ষা করিতে পারিবে এ প্রশ্ন করা যায় বটে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, বাস্তবের প্রয়োজনে যে বিমল দৃষ্টি সে বিমলকে কি আদর্শের ক্ষেত্রেও আনা যায় না? এমন কি dynamic যোগ চিন্তাধারা ও দর্শন নাই যেখানে মার্ক্সবাদের অন্তর্নিহিত সত্য এবং ভারতবর্ষীয় জীবন-চেতনা মিলিতে পারে? আমরা বলিতে চাহি। শুধু প্রণালী এই মিলনকে আনিবার জন্যই বিশ্বাস-পুরুষের আজ বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া দল আদর্শের লোকের মিলন ঘটানো। তাই অরবিন্দের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, আজ যে ইন্দুরাই হাতে বাংলাদেশের শাসন ভার পড়িল তাহার এই অর্থ যে তিনি শুধু বাস্তবের ক্ষেত্রে ভুলনীতি দূরীকরণ কিংবা আশিকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলিরই সমাধান করিবেন তাহা নয়, তিনি মার্ক্সবাদ আর ভারতীয় জীবন-চেতনাকে এক dynamic দর্শনের মধ্যে মিলাইবেন।

এই উভয় চিন্তাধারাকে মিলাইয়া এক দর্শন যে আছে তাহা আমরা বলিয়াছি। সে দর্শন রাখিয়া গিয়াছেন ভারতবর্ষের প্রাক্-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-জীবনকে কেন্দ্র করিয়া বর্তমান যুগে শ্রীশ্রীনিতাগোপাল, আর শ্রীনিতাগোপালের জীবন ও দর্শনকে সামনে রাখিয়া প্রধানত্রয়ের মধ্য দিয়া এবং অন্যান্য বহু ব্যক্তি ও জীবনের আচরণের মধ্য দিয়া শ্রীবৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত। শ্রীবৎ পুরুষোত্তমানন্দ এই দুই চিন্তাধারার বর্তমান কালের মূর্ত বিগ্রহ রূপে শ্রীগৌরাঙ্গকে উপস্থিত করিয়া ভারতীয় অন্তর্মুখীনতা ও পাশ্চাত্যের জড়বাদের চরম রূপ মার্ক্সবাদে যে কেমন করিয়া মিলিতে পারে তাহাই দেখাইয়াছেন। তিনি তাঁহার উজ্জীবনী নামক মাসিক পত্রের পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় ১৩৮৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে লিখিতেছেন, "হেগেলের idea-র কাছে এই বিশ্ব শুধুই phenomenal, পক্ষান্তরে মার্ক্স-এর কাছে ideal হইতেছে human mind-এরই reflection ও forms of thought রূপ ঐ human mind-এরই translation। হেগেল বা মার্ক্স কেহই জড় অস্তিত্বের সারবত্তা স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহারা দুই-ই বৈধ বিচার অর্থাৎ বুদ্ধি (abstract intellect) দ্বারা বিচার করিয়াছেন, তাই সেখানে জড় ও অজড় একাত্মতায় দৃশ্য বা গৌণ হইতে পারিয়াছে; প্রত্যেকেই অপরকে 'surreptitiously' প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছে।

আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ-জীবন ও দর্শন কিন্তু পরা প্রকৃতির (Deeper nature, Higher nature) স্তরে স্থিত থাকিয়া দুই-এরই সমন্বয় বিধান করিয়াছে। সেখানে হেগেলীয় ও মার্ক্সীয় বুদ্ধিরও বিসর্জন সম্ভব হইয়াছে। এই স্তরেই বুদ্ধির গুণগত উন্নয়ন সম্ভবপর।...

অপরা বুদ্ধি 'simple', পরাবুদ্ধি 'com—lex',; অপর বুদ্ধি 'lower', পরা বুদ্ধি 'higher'; অপরা বুদ্ধির গুণগত অবস্থা হইতে পরা বুদ্ধির গুণগত অবস্থা উন্নততর। এই পরা বুদ্ধির একটা onward and upward movement রহিয়াছে। তাই এই স্তরে জড় ও অজড়ের রহিয়াছে 'inter connection and inter dependence'। এই inter connection ও inter dependence-এর ফলে জড় ও অজড়ের মধ্যে এমন একটা গতির জন্ম সম্ভব হয়, যাহার ফলে এই দুই-এরই প্রতি মুহূর্তে 'change' 'development', 'coming into being' এবং 'going out of being' সম্ভব হইতেছে। জড় ও অজড় দুই-ই অন্যোন্য-মৈথুনের (interpenetration) বিষয় দিয়া বিবর্তিত হইয়া যে অবস্থাটীতে পড়িয়া উঠিতে পারে, তাহাই শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শন বা পুরুষোত্তম-দর্শনের প্রতিপাদ্য।...

সমগ্রই (integral) পূর্ণে এবং মূর্তোমো ও প্রোলেটারিয়েট সমগ্রেরই দুই দিক বলিয়া উহারা সমগ্রের পশ্চাৎ, কিংবা অংশমাত্রই পূর্ণে, অংশমাত্রের অন্যোন্য-

ইথ্‌নের স্বরূপ সমগ্র সম্বন্ধে পাওয়া—ইহার কোন একটীকেই একান্ত সত্য বলা চলে না "There is no contradiction in this that our independent being should be at the time a member of a system : It lives at once *by* and *for* it ; it is, therefore, as Kant says, both means and ends. And finally, that in the cell itself considered as nucleus of life, all the parts are correlatives to the whole, and the whole to the parts,—Paul Janet প্রবর্ত্তী deductive method, দ্বিতীয়টি inductive। এক দর্শন এক একটীকে অগ্রে ধরিয়া যাত্রা করিয়াছে ; অজড়-দর্শন deductive, জড়-দর্শন inductive কিন্তু প্রত্যেকটীই সত্য।

এই দুই-ই যে তুল্যভাবে সত্য হইতে পারিতেছে, তাহার একমাত্র কারণ হইতেছে উহারা একই সমগ্র জীবনের দুইটী দৃষ্টিকোণ মাত্র

শ্রীগৌরাঙ্গ-জীবনের একটী দৃষ্টিভঙ্গী পরা জড়সত্তা ও অপরটী হইতেছে পরা অজড়সত্তা। তিনিই idea in terms of matter এবং যুগপৎ matter in terms of idea। জড়বাদীদের সাধনা inductive, অজড়-সত্তাবাদীদের সাধনা deductive।

প্রথম দল ঘটনার অবলম্বনে অর্থকে খোঁজেন ; শেষোক্ত দল অর্থকে আশ্রয় করিয়া ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেন। জীবনে দুই-ই সমভাবে সত্য।

...জড় হইতে চেতনের জন্ম স্বীকৃত হইলেও চেতন যখন জড়ের বুক চিরিয়া জন্মিয়াছে, তখন পিতৃস্থানীয় জড় নিজের চিরন্তন গুণ পরিবর্ত্তন করিয়াও পুত্রস্থানীয় চেতনাকে বিবর্ত্তিত করিতে পারিবে না। চেতনই চেতনের রূপ উদ্ঘাটন সাধন করিতে পারে। 'we are to meet idea by idea'

মার্কিণীয় দার্শনিকগণ এখানে হোঁচট খাইয়া তাঁহাদের সমস্ত মতবাদটীকে আবার mechanical করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা Duhring, Feuerbach-এর দর্শনকে সুষ্ঠুভাবে অতিক্রম করিবার শেষ পর্যন্ত ঠিক ঠিক organic হইতে পারেন নাই ...সৃষ্ট-সৃষ্টি-স্রষ্টা—তাহা জড়দর্শনের দোষেই হউক বা অজড় দর্শনের দোষেই হউক—প্রত্যেকটী অনন্ত নিরপেক্ষ স্বয়ংসত্তাবান বস্তু। উহাদের interconnection' interdependence ও interpenetration-এর কথাই এই দিক দিয়া বলা যায়। ভারতবর্ষে বিশেষভাবে বাঙ্গলায় মাধ্বীয় দর্শনের এই সমন্বয় রূপ ফুটিয়া উঠিবার জন্য আনুকূল্য করিতেছে ..."

চিন্তাধারার বিবর্ত্তনের এই সমন্বয় রূপ ফুটিয়া উঠিবার এক বিশ্বতর দৃষ্টান্ত বা ইঙ্গিতই কি বহির্দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে উদ্ভূত আধিকার এই বহু দল-সম্মিলিত মন্ত্রী-পরিষৎ ? আমরা সংঘের সম্মিলনের কিরূপ দিয়া একটা একটী সুন্দর প্রণালী বাহির করিবার প্রয়োজনই অপেক্ষা করিতেছি। কেবল রাষ্ট্রিক সমস্যার সমাধান করিবে বলিয়া নয়, ঐ দিকে দৃষ্টিটাই সম্মিলিত-এর সত্যকে পরিপাক করিয়া এক সামগ্রিক জীবন-চেতনার উদ্ভবের সম্ভাবনার দিকে তুলিয়াই আশান্বিত আমরা এই সম্মিলিত মন্ত্রী-পরিষৎকে সাদর সাগত জানাইতেছি সেই জীবন-চেতনার সামগ্রিকতা দিয়াই শুধু ভারতবর্ষের বস্তুবের বাস্তব রূপ ফিরিতে পারে, আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ কি করিয়া বাস্তব জীবনে সত্য প্রেম পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে অথচ পরের দাসত্ব না করিবার বীর্য লাভ করিতে পারে, পরিবারে সমাজে ও রাষ্ট্র-জীবনে সৌষম্যময় মর্যাদাপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারে সেই কথা শিখিতে পারে।

অপর দিকে যে মনোবৃত্তি লইয়া আজ বাংলা দেশে এই বহু মতাবলম্বীদের মিলন সম্ভব হইল—তন কল্যাণের সেই মনোবৃত্তি মন্ত্রীমণ্ডলীকে সকল অন্যায় অসত্য দুর্নীতিকে ভিতরে বাহিরে, সামনে ঘুরে দৃঢ় হস্তে পরিবর্জিত করিবার শক্তি প্রদান করুক, ঐক্যবদ্ধ বাঙ্গালীকে কর্ত্তব্য কর্মে উদ্বুদ্ধ রাখিতে প্রেরণা দিক, মানুষের আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করুক, জীবন সুস্থ হউক, জাতির চিত্ত ব্যক্তিগত জীবন-চেতনার উর্দ্ধে উঠুক, বিভিন্ন গতির

সম্বন্ধে সত্যিকারের দীক্ষা লাভ করিবে। আমরা সকলকে বিচার ও ধৈর্যপূর্ণ দৃষ্টি লইয়া এই নূতন পথের নূতন পরিচালকের সঙ্গে চলিতে আহ্বান জানাই। বন্দেমাতরম্

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা—বিশ্বের জ্ঞানদাত্রী, রসময়ী বিদ্যা সত্তা রূপ ব্যক্ত করিয়াছে বাঙ্গালীর ধ্যানে শ্রীসরস্বতী মূর্ত্তিতে। মাঘী শ্রীপঞ্চমী দিনে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই আনন্দ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকেন। বঙ্গের শ্রীসরস্বতাশ্রম চট্টোপাধ্যায় প্রেরিত আমন্ত্রণে নিজের প্রার্থনার সঙ্গে আমাদের প্রার্থনা যোগ করিয়া দিলাম—

"সমস্ত সৃষ্টিরহস্যের অন্তরালে যে অনন্ত কাল অজ্ঞানের অন্ধকারের রূপে বর্ত্তমান রয়েছে। ঘুম ঘুমাচ্ছে, তার চারদিকে ঘনীভূত বাধা বেদনার একটা ভারী মূর্চ্ছনা স্তব্ধ হয়ে আছে। জীবের অন্তর্নিহিত আনন্দ, সৃষ্টির গভীর প্রলয়ে উৎসারিত প্রেরণা, উষ্ণতা যাদের বুকে গভীর ঘনিষ্ঠতার আবেশ বিলাচ্ছে—সে [illegible] পরে এরা বিমুগ্ধ হয়ে অচেতনতা, জড়িমা, দুঃখ ও দুঃখ মাঝখানে মহা-প্রলয়ের পথে টেনে নিয়ে চলেছে মুক্তি ও বুদ্ধির, বিজ্ঞান ও প্রকৃতিজয়ের দেওয়ালীর দৃপ্তি বিদ্রোহী ও অস্থির হয়ে উঠেছে। সভ্যতার নবীন গতি, শক্তি সকলের বিদ্যা প্রকাশ ঘুমের অন্তর্দেশে অনুপ্রবিষ্ট করেছে। বৈজ্ঞানিকের প্রকৃতি-বিজয়ের জীবের নবজীবনগামী পথ রুদ্ধ করেছে। আজ আষাঢ় কখনো বাতাস ঘনেছে বিষাদ। বিশ্বরাষ্ট্রের সনাতন সাম্য ও মৈত্রী হতে চলেছে অতীত। বিশ্বাস, আত্মবল ও ধর্ম্মের সাহচর্য্যই এযুগের একমাত্র শক্তি। এস, আজ আমরা মানুষকেই মহীয়ান জেনে করজোড়ে একস্বরে প্রার্থনা জানাই—যে শ্রেষ্ঠ কারিগরী, কলাকৌশলী বিজ্ঞানকর্ত্রী মা, আমাদের জন্যে সৃষ্টির আনন্দ সঞ্চারিত কর; মা, আমাদের অজ্ঞান ও মৈত্রীবোধ দুর্বলতা দূর কর, দাও প্রেমের প্রাচুর্য্য, প্রকাশের প্রচুরতা, আর বিশ্ব-বিকুণ্ঠিত সরল সৌন্দর্য্য।"

রস তাল জিনিষ, কিন্তু রস যে পচে, বিকৃত হয়, সেই বিকৃত রস যে মানুষকে রসের সত্যিকারের আস্বাদন দিতে পারে না, তাই রসময়ী জ্ঞানময়ী সরস্বতীদেবীর নিকট আমরা আরও প্রার্থনা জানাই, মা, রসের বিকৃতি হইতে আত্মরক্ষা করিবার মত জ্ঞান আমাদের দাও। জ্ঞানযুক্ত না হইলে, বিশ্লেষণ করিতে না পারিলেই রস বিকৃত হয়, তাহার চলার পথে ছন্দপতন ঘটে আমরা যেন রস-আস্বাদনকে জ্ঞানযুক্ত বিজ্ঞানময়ী করিয়া লইবার যোগ্যতা ও দীক্ষা লাভ করি

নরনারায়ণ শিল্পকেন্দ্রের বাৎসরিক—নরনারায়ণ শিল্পবিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠান প্রতিবারের মত এবারও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ছেলেগুলির প্রদর্শনী গত সপ্তাহে খোলা ছিল। অনেকেই প্রদর্শনী দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, বেচা-কিনাও হইয়াছে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী রবিবার এক সভায় ছেলেদের পুরস্কার দেওয়া হয়। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ডেপুটী চীফ ইন্‌স্পেক্টার শ্রীপ্রবোধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুরস্কারগুলি বিতরণ করেন। লেডী ব্রাবোর্ণ ডিপ্লোমাগুলিও এই সময় বিতরণ করা হয়। এই সঙ্গে তিনি নরনারায়ণে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পুরস্কারগুলিও বিতরণ করেন। নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ও খেলাধূলার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। বন্ধুবর শ্রীমাধবচন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রীহেরম্বলাল মিশ্র মহাশয়দ্বয় খাতা পেনসিল ও বই ছেলেমেয়েদের পুরস্কারের জন্য দান করিয়া সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সহযোগিতা পাইয়া নিজেদিগকে ধন্য মনে করিতেছি। শ্রদ্ধেয় প্রবোধ বাবুও তাঁহার উপস্থিতি ও সহযোগিতাদ্বারা আমাদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। সকলের সহযোগিতায় এবং আশ্রম-দেবতা শ্রীনিত্যগোপালের আশীর্ব্বাদে বিদ্যালয়গুলি দিনের পর দিন আগাইয়া যাইবে, ইহা আমরা ভরসা রাখি।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

চৈত্র-বৈশাখ, ১৮৮৯ শকাব্দ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বিংশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

॥ সম্পাদিকা ॥

নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল! সুন্দর নাম, সুন্দর মানুষ!

শ্রীনিত্যগোপাল একজন মানুষ বটে—কিন্তু শত শত হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষের মত তিনি নন। বলা যাইতে পারে জাগ্রত জগতের সীমাকে মানিয়া তিনি একজন পরিপূর্ণ মানুষ। মানুষত্ব-এর একটী সর্বজনীন রূপ তাঁহার মধ্যে আছে। মানুষের অন্তর্নিহিত এই সর্বজনীন রূপ সুন্দর, সুসংবদ্ধ, সমষ্টি-চেতনার প্রবাহ-সম্ভারের পথের খবর রাখিয়া তিনি একজন সুন্দর মানুষ। জীবন-চেতনাকে একদেশদর্শিতা হইতে মুক্ত করিয়া ও মুক্ত রাখিয়া তিনি একজন সুন্দরতর মানুষ। বস্তু-জগতকে ব্রহ্মমূল্যে দেখিয়া এবং ব্রহ্মকে বস্তুজগতের মধ্য হইতে বাহির করিয়া আনিবার সাধনার কথা বলিয়া তিনি সুন্দরতম মানুষ। আজ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ৪ঠা বৈশাখ বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে তাঁহার শুভ জন্মদিন ক্ষণে আমরা সুন্দরতম পরিপূর্ণ মানুষ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের চরণে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম নিবেদন করিতেছি—তাঁহার আশীর্বাদে ও আমাদের প্রচেষ্টায় আমাদের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে তিনি প্রকাশিত হইবেন—তাঁহার জীবনকে আমরা ধরিয়া করিব—ইহাই প্রার্থনা করি।

বর্তমান যুগে আমরা কেমন মানুষ হইব তাহারই আদর্শ শ্রীনিত্যগোপাল। আজ যখন অতীতের সকল বাসনাও ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, অতীতের সকল আদর্শ বাসী বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে ও হইতেছে, সেখানে আমরা কোন্ লক্ষ্য ধরিয়া চলিব? শ্রীনিত্যগোপাল বর্তমান যুগের ঘন জটিলতার পথ দেখাইবেন। তিনি অতীত ভারতবর্ষ ও বর্তমান যুগের যোগসূত্র। আজ আমরা অতীত ভারতবর্ষের আদর্শ হইতে সরিয়া আসিয়াছি, আমরা ভারতবর্ষের মাটিতে বাস করি বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন চিত্তের সঙ্গে সাধারণভাবে আজ দেশের কাহারো সেরূপ যোগ নাই। সরিয়া আসিয়া আমরা কি পাইয়াছি, আমরা কি চাই তাহাও আমরা প্রায় জানি না বলিলেই হয়। আমার প্রাচীন ভারতবর্ষকে যাহারা ধরিয়া রাখিতে চান, তাঁহারা বর্তমান যুগ-চেতনাকে সম্পূর্ণ এড়াইয়া চলিতে চান, যাহা খুবই অবাস্তব। উভয়েই একদেশদর্শী। শ্রীনিত্যগোপাল এই দুইয়ের মাঝখানে রহিয়াছেন। তিনি অতীত ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত সত্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বর্তমান ভারতের জীবন-চেতনার মধ্যে তাহাকে রূপ দিবার ও রসে ও গন্ধে তাঁহার জীবনে রাখিয়া গিয়াছেন তাই শ্রীনিত্যগোপাল এই দুইয়ের যোগসূত্র, তাই তিনি বর্তমান যুগ-চেতনার আদর্শ হইতে পারিয়া আমরা যাইতে বলিয়া আগাইয়া চলিব!

অতীত ভারত বলিতে সাধারণভাবে প্রচলিত যাহা তাহাকে বুঝাইতেছি। উহা বস্তু-জগতের অতীত হওয়ার সাধনা, যাহা দৃশ্যমান জগতের অতীত যে সত্তা—নাম তাহার যাহাই হউক, সাধারণভাবে তিনি অজড় অমর শুদ্ধ চৈতন্য নামে অভিহিত—সেই সত্তার সন্ধানে যাওয়া জাগ্রত জীবনকে অস্বীকার করা, হেয় মনে করা, সমাধিকেই পরম ও চরম সত্য বলিয়া বোঝা। ইহাই সাধারণভাবে

ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্মিকতা হইতেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবনকে ঘিরিয়া যে জীবন-চেতনা সেই সুপ্রাচীন কালেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—গীতা-ভাগবতে তাহাই তত্ত্ব ও জীবন আছে, সেই জীবন-চেতনার মধ্যে বর্তমান কালকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। কিন্তু বাস্তব ও ব্যবহারীত এই উভয়ের স্বীকৃতিদ্বারা আমাদের প্রচলিত ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনাদর্শ গঠিত হয় নাই; আমরা either-or-এর সাধনাই চালাইয়াছি—হয় সংসারী হইয়াছি, বিষয়ের পাকচক্রে ডুবিয়াছি, নয় সংসারকে হেয় জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবার সাধনা লইয়াছি। তাই আমার শ্রীনিত্যগোপালকে আসিতে হইল বাস্তবকে ব্রহ্মমূল্যে দেখিবার জীবনাদর্শ প্রচার করিতে।

শ্রীনিত্যগোপাল আসিয়াছিলেন—চব্বিশ পরগণা জেলায় পানিহাটী গ্রামের মাতুলগৃহে জন্মিয়া আট বৎসর বয়স সেখানে হাসিয়া খেলিয়া কাটাইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার মায়ের মৃত্যু হওয়ায় কলিকাতার বেলেঘাটা পল্লীর নিকট থাকিয়া বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃগৃহ কলিকাতার আহিরীটোলায়। কিন্তু সেখানে তাঁহার কোন দিনই থাকা ঘটে নাই। যাহাহউক, দীর্ঘদিন ধরাবাঁধা লেখাপড়া করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। একটা তীব্র অন্তর্মুখীনতা তাঁহাকে শিশুবেলা হইতেই থাকিয়া থাকিয়া অভিভূত করিয়া দিত। আড়াই বৎসর বয়সেও তাঁহার একবার নিবিকল্প সমাধি হইয়াছিল। তীব্র বুদ্ধিশক্তি যেমন ছিল তাঁহার তেমনি লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ থাকায় অনেক লেখাপড়াই তিনি করিয়াছিলেন। সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থাদি তিনি পাঠ করিয়াছিলেন কেবল পড়া, বলা যায় প্রায় সবকিছুই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। চাকুরীও তিনি কিছুদিন করিয়াছিলেন। শেষে সমস্ত ভারতবর্ষ পর্যটন করিয়া প্রথমে কিছুদিন কাশীতে, পরে কলিকাতা নবদ্বীপ ও হুগলীতে তাঁহার অল্পদিনের জীবন কাটাইয়াছিলেন। এই সময়টাতেই তিনি অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহ-ধারণের প্রয়োজনীয়তা তখন বুঝিতে পারা না গেলেও তাঁহার সেই সব রচনার মধ্যে যুগান্তকারী চিন্তাবীজ রহিয়া গিয়াছে এবং তাহারই আলোকে তাঁহার জীবনের আচরণ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার বহু মেয়াদী জীবনের অধিকাংশ সময়ই বলা যায় সমাধি অবস্থায় কাটিয়াছিল—তবু তিনিই লিখিয়া গিয়াছেন—এই বিশ্ব সত্য, এই বিশ্ব আমার মহাযজ্ঞ। এই জন্যই তিনি বর্তমানে যুগের পথ প্রদর্শক।

শ্রীনিত্যগোপাল আসিয়াছিলেন, চলিয়াও গিয়াছেন। যতদিন ছিলেন নিজেকে গোপন রাখিয়া ছিলেন। তাঁহার বিশিষ্টতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রকাশ করিতে উৎসুক হইয়া উঠিলেও সময়োপযোগী নয় বলিয়া শ্রীনিত্যগোপালে তাঁহাকে বিরত রাখিয়াছিলেন। সেদিন হইতে প্রায় পঞ্চাশ ষাট বৎসর পরে আজ বাহিরের ঘটনাবলী শ্রীনিত্যগোপালকে বুঝিতে সহায়তা করিবে। এই সময়ের অপেক্ষা করা প্রয়োজন ছিল বলিয়াই সেদিন নিজেকে গোপন রাখিয়াও ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাই অত বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাই লিখিয়া গিয়াছেন যে তিনি যেখানেই দেহ-রক্ষা করুন না কেন কলিকাতাস্থিত বালীগঞ্জের মহানির্বাণ ঘাটেই তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিতে হইবে এবং কোন সময়ে প্রয়োজন বোধে তাঁহার হুগলী নবদ্বীপের মঠ বিক্রী করিলেও কলিকাতার মঠ কোনমতেই বিক্রীত হইতে পারিবে না। তাই বলিতে হয় সেদিন শ্রীনিত্যগোপালকে কেহ জানিত না, আজও প্রায় কেহ জানে না, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতার ক্রমপরিণতি শ্রীনিত্যগোপাল তত্ত্ব ও জীবনকেই ইঙ্গিত করিতেছে—ক্রমেই তিনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের একটী বাণীই শ্রীনিত্যগোপাল-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছে—"ট্যাকে টাকা আর সমাধি একমাত্র নিত্যগোপালেই সম্ভব"। ট্যাকে টাকা মানে আগ্রত জীবন, বাস্তব জীবন, বস্তু জগৎ; আর সমাধি মানে প্রত্যক্ষাতীত যে চৈতন্য-সত্তা সমস্ত কিছুর ভিতরে বাহিরে ওতপ্রোত হইয়া আছে তাহা। আগ্রত জীবনকে এই চৈতন্য সত্তার অবতরণ-দ্বারা মধুময় করিয়া তোলাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথিত শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধীয় উক্তির তাৎপর্য। শ্রীনিত্য-গোপালে আগ্রত জীবন বা সংসার তাঁহার সমাধি-জীবন

না সন্ন্যাসকে নষ্ট করিয়া যেমন দিতে পারে না, তাঁর সন্ন্যাস বা সমাধিও প্রত্যক্ষের বাস্তবিকতাকে অস্বীকার করে না। প্রত্যেককে যথাযথ রূপে পূর্ণ স্বীকার করিয়া শ্রীনিত্যগোপাল উভয়ের সম্মিলনে এক বৃহত্তর জীবন-চেতনার কথা বলিয়া গিয়াছেন।

আজিকার দিনে ইহারই প্রয়োজন।

প্রতি ব্যক্তি কি রকম করিয়া বিশ্বরূপ সামগ্রিক জীবন যাপন করিলে অপর ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হইতে পারে এবং এই সমষ্টিভাবময় ব্যক্তিগুলির মিলনে প্রাণপূর্ণ সঙ্ঘ গঠিত হইয়া মানুষকে দুর্যোগপূর্ণ অথচ আনন্দময় জীবনের অধিকারী করিতে পারে শ্রীনিত্যগোপাল সেই রকম জীবনের তত্ত্ব ও আচরণ বলিয়া গিয়াছেন। ব্যক্তি নির্ব্যক্তিক হইলে সমষ্টিভাবের হওয়া সম্ভব হয়, তখনই তাহার নিজের সার্থকতা, তখনই অপর ব্যক্তির সঙ্গে সে মিলিতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি যখন নিজের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-সত্তার উপরে উঠিতে পারে, তখনই সে মুক্ত, তখনই সে আনন্দের অধিকারী, অপরের সঙ্গে সত্যিকারের মিলনও একমাত্র তখনই হইতে পারে। এই পথে জাগ্রত জীবনও যায়, ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন সত্তার উত্তরণদ্বারা তাহার অতীতে থাকার শক্তিও যায়। এইজন্যই শ্রীনিত্যগোপাল আজিকার মানুষের আদর্শ

শ্রীনিত্যগোপাল প্রায় সময়েই সমাধিস্থ হইয়া থাকিতেন অথচ বিশ্বকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—সে কথা বলিয়াছি। এই সত্য বিশ্বে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন তিনি কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া? কোন রকম সম্পর্ক স্থাপনেই তিনি কোনরকম কৌলীন্যকেই স্বীকার করিয়া চলেন নাই; প্রাণের আকর্ষণ আবেষ্টন-গত বিচারে যে রূপ নেয়, সেই প্রাণের আকর্ষণই তাঁহার সম্পর্কের মানদণ্ড হইত—সে প্রাণ-সম্পর্ককে সকলের মধ্যে বিস্তার করিয়া দিবার গভীর আনন্দের সংবাদ রাখিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীনিত্যগোপাল আজিকার দিনের আদর্শ। তাঁহার 'জাতি-দর্পণ' নামক গ্রন্থে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের এই প্রাণের মানদণ্ডকে যে ভারতবর্ষের প্রচলিত সামাজিক কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করা সম্ভব, বেদব্যাসের সিঁড়িভঙ্গের ছোট বড় উঁচু নীচু ব্যবস্থাদ্বারা তাহাকে কলুষিত করিবার প্রয়োজন যে নাই—তাহা শ্রীনিত্যগোপাল প্রমাণিত করিয়াছেন। জাতিভেদের পাপকে যে উদার প্রসারতা ও তীক্ষ্ণ যুক্তি দিয়া তিনি আক্রমণ করিয়াছেন, আজিকার ভারতবর্ষের তাহা বিশেষ প্রয়োজন। রাজনৈতিক বিধানদ্বারাই শুধু এ জাতিভেদ দূর করা সম্ভব নয়—আধ্যাত্মিক যুক্তিদ্বারা ইহা ভারতবর্ষের সমাজ-চেতনায় শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল, সেই আধ্যাত্মিক যুক্তিদ্বারাই তাঁহার 'জাতিদর্পণ' গ্রন্থে শ্রীনিত্যগোপাল ঐ বেদব্যাসকে খণ্ডন করিয়া একটী সামগ্রিক মতনের সংবাদ রাখিয়াছেন।

সর্ব মানুষের সঙ্গে এই প্রাণের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া শ্রীনিত্যগোপাল তাহাদের সুখদুঃখের অংশীদার হইতেন, সাধ্যমত তাহাদের অভাব অভিযোগ মিটাইতেন, সকলের সঙ্গেই বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন, ছোটর সঙ্গেও অভাবনীয় মর্যাদা দিয়া ব্যবহার করিতেন আবার পরক্ষণেই সমাধিস্থ হইতেন। মানুষের সুখদুঃখে প্রাণের সম্পর্ক স্থাপন করিলেও যে মানুষ আসক্তিবাধা বিমর্ষ না হইয়া পারে—এই অভিনব ও অদ্ভুতপূর্ব দৃষ্টান্ত তিনি বর্তমানের বুকে রাখিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতির ক্ষেত্রে দৈনন্দিন দিন যাপনের নানা খুঁটিনাটি লক্ষ্য রাখিয়া মানুষকে শিখাইতে চাহিয়াছেন কত নিপুণতা ও মনোযোগের সঙ্গে মানুষের চলা উচিত—কত উদ্যম ও নিপুণতা তাহার থাকা চাই। ভারতবর্ষের কাছে কর্ম বন্ধনের কারণ বলিয়া অত্যন্ত ভীতিপ্রদ বস্তু—ইহা বিষয়ীর ব্যাপার—সাধক কর্মকে সর্বদা দূরে রাখিয়া চলেন, তাঁহারা গোড়াতেই ইহাকে অস্বীকার করিয়া বসিয়া থাকেন। আর শ্রীনিত্যগোপাল অত্যন্ত ছোট কর্মও কত নিপুণতার সঙ্গে করিয়াছেন! কর্মনিষ্ঠ, কর্ম-ভীরু ভারত বাসীকে তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে কর্ম বন্ধনের কারণ নয়—বন্ধনের কারণ মানুষের আসক্তি বিবেকশূন্য মন। একজন সমাধিস্থ পুরুষ, একজন সন্ন্যাসী হইয়াও মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে ভোট দান করিয়া তিনি বুঝাইয়া গিয়াছেন যে রাষ্ট্রের মধ্যে থাকিয়া তাহার সুযোগ

সুবিধা তোষ করিয়া একজন সন্ন্যাসীরও রাষ্ট্রক্ষেত্রে কিছু কর্তব্য আছে। অথচ তিনিই আবার সমাধিস্থ হইতেছেন! কী অপরূপ। মানুষকে ভূতে ধরিতে, সামনে ঘুরে, কর্মে নৈষ্কর্ম্যে, জ্ঞানে ভক্তিতে আনন্দের পথের সন্ধান করিয়াই তিনি রাখিয়া গিয়াছেন! তাই তিনি অপরোনীয়ান্, মহতো মহীয়ান্; তাই তিনি বর্তমান যুগ-দেবতা!

এইভাবে বহু ঘটনায় ও রচনায় দেখা যাইবে শ্রীনিত্যগোপাল কি ভাবে সত্যকে কোন এক রকম করিয়া দেখেন নাই—সামগ্রিক ভাবে দেখিয়াছেন—যাহাই বর্তমান সমন্বয়ের যুগ-ভাবনা! আমরা শ্রীনিত্য গোপালের কয়েকটী কথা এইখানে উদ্ধৃত করিলাম—

"ভগবান সম্বন্ধে সমস্ত উপদেশই ভাগবত। যে সমস্ত উপদেশদ্বারা তাঁহাকে জানা যায় সে সমস্তই বেদ। ভগবানকে যিনি জানেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। সমস্ত-ভাবেই তাঁহার অর্চনা করা যায়। আমরা বুঝিতে পারি না, সমস্ত সম্বন্ধই তাঁহার সহিত আছে। যে কোন দেশে যে কোন ভাবে, যে কোন ব্যক্তি তাঁহার অর্চনা করেন, তিনিই ভক্ত। তাঁহার যে কোন নামে যে কোন রূপে যে কোন ব্যক্তি যে কোন প্রকারে তাঁহার অর্চনা করেন, সে সমস্ত নাম ও রূপ তাঁহারই। তাঁহারই অনন্ত রূপ, অনন্ত নাম, অনন্ত গুণ, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দ, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম।"

"সর্ব দেশীয় মহাপুরুষদিগের ভিতর থেকেই পরম জ্ঞানের স্ফুরণ হইয়া থাকে। ইংরাজ মুসলমানের মুখের সঙ্গে একজন আর্যের মুখের কোন প্রভেদ নাই। জগতের সকল ভাষাদ্বারাই পরমজ্ঞান স্ফুরিত হইতে পারে। যে সকল ভাষায় যে সকল কথাদ্বারা পরম জ্ঞান স্ফুরিত হইয়াছে, সেই সকল কথাই সংস্কৃত কথা। জগতের সকল ধর্মশাস্ত্রের ভাষাই সংস্কৃত ভাষা, জগতের সকল ধর্মশাস্ত্রের কথাই সংস্কৃত কথা! যখন যে সকল ভাষা, যখন সে সকল কথা পরম জ্ঞান ব্যক্ত করে না তখন সে সকলকে অসংস্কৃত বলি।"

"ইংরেজদের মতে ঈশ্বর ব্রহ্ম, কিন্তু আমাদের ব্রহ্মের আবির্ভাব বলা হয় নাই। অতএব শ্রীক্ষেত্রের কাষ্ঠের জগন্নাথ ব্রহ্মের প্রতিমূর্তি নন, কিন্তু তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ ব্রহ্ম।"

"বীজ বৃক্ষ হয় বৃক্ষ থেকে বীজ হয়। নারায়ণ নর হন। আবার নর থেকে নারায়ণ বিকশিত হন। নারায়ণের রূপ নর; নরের মধ্যে নারায়ণ কখন অব্যক্ত-ভাবে থাকেন আর কখন বা নর থেকে ব্যক্ত হন। যেমন বীজের রূপ বৃক্ষ। বৃক্ষের মধ্যে বীজ কখন অব্যক্ত থাকে আর কখন বা বৃক্ষ থেকে বীজ ব্যক্ত হয়।"

"জগতের কোন ধর্মমতেই চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেহই ধার্মিক ও সাধু হইতে পারে না।..."

"অন্নশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি ও বস্ত্রশুদ্ধি অপেক্ষা চিত্তশুদ্ধি ও বুদ্ধিশুদ্ধিই প্রধান। চিত্তশুদ্ধি ও বুদ্ধিশুদ্ধি অনেক সাধনাসাপেক্ষ।"

"ঐ আম্রবীজ খণ্ডবিখণ্ড করিলে উহা থেকে আম্রবৃক্ষ দেখিতে পাইবে না, ঐ আম্রবীজ পেষণ করিলে উহা থেকে আম্রবৃক্ষ নিষ্কাসিত করিতে পারিবে না অথচ উহার মধ্যেই অব্যক্তভাবে আম্রবৃক্ষ আছে। অব্যক্তভাবে যখন আম্রবৃক্ষ থাকে তখন তাহা নিরাকার। যখন তাহা ব্যক্ত হয় তখন তাহা আকার। প্রত্যেক বৃক্ষই আকার নিরাকার। প্রত্যেক বৃক্ষের প্রত্যেক ফলই আকার নিরাকার। প্রত্যেক বৃক্ষের প্রত্যেক ফল প্রত্যেক বৃক্ষে যখন অব্যক্তভাবে থাকে, তখন তাহা নিরাকার। ব্যক্ত হইলে তাহাই আকার। কাশীর ঐ মন্দিরের পাষাণমূর্তি ভগ্ন কর, চূর্ণবিচূর্ণ কর তুমি বিশ্বনাথ দেখিতে পাইবে না। যাঁহার দিব্য জ্ঞান হইয়াছে, যাঁহার পরাভক্তি হইয়াছে, যাঁহার ভাগবতপ্রেম হইয়াছে, তিনিই ঐ পাষাণ-মূর্তিকেই চিন্ময়ী মূর্তি দেখিয়া কৃতার্থ হন। যেমন বীজই বৃক্ষ হয় তদ্রূপ ঐ পাষাণই ভক্তের ভক্তিতে চিন্ময় বিশ্বনাথ হন। ঐ পাষাণ দিব্য পাষাণ। ঐ পাষাণের মধ্যে নিরাকার বিশ্বনাথ রহিয়াছেন। তিনি ভক্তের ভক্তিতে চিন্নাকার হন। ভক্তের ভক্তিতে তিনি চিন্ময় সাকার হন।"

"দুয়ে মিলিয়া পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অথচ উভয়ই

একাধারে থাকিতে দেখা যায়। ব্রহ্মে সগুণত্ব নির্গুণত্ব উভয়ই থাকিতে পারে।"

"চুম্বকের পাথরের বিষয়ে যখন আকর্ষণ থাকে তখন তাহার গুণ প্রকাশিত থাকে না, তখন তাহা কোন কার্যও করে না। সে অবস্থায় সে অগ্নিকে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলা যাইতে পারে। ব্রহ্ম যখন কোন কার্য করেন না, তখন তাঁহা থেকে কোন গুণের প্রকাশ হয় না। তখন তাঁহাকে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলা যাইতে পারে।"

"ব্রহ্ম যখন অতি ক্ষুদ্র, যখন অতি বৃহৎ হন উভয় অবস্থাতেই তাঁহার সমান ক্ষমতা থাকে এই জানিও।"
—সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার

"উৎপত্তির কেবল একটী কারণ স্বীকার করিলে হয় না। কারণ উৎপত্তি শক্তি ও শক্তিমানদ্বারা হইয়া থাকে। কেবল শক্তি দ্বারাও উৎপত্তি হইতে পারে না। কেবল শক্তিমানদ্বারাও উৎপত্তি হইতে পারে না। উভয়ের সংযোগে উৎপত্তি হয়। আমার শক্তি না থাকিলে আমি শক্তিমান কিছুই করিতে পারিতাম না।"

"সত্য হইতে অসত্যের বিকাশ হয় বলিতে পারে না। ...এক বস্তু হইতে অপর যাহা হয় তাহাও সেই বস্তুর অংশ সেই বস্তু। সত্য ব্রহ্ম হইতে অসত্য জীব বিকশিত বলিতে পার না ..."

"বৃক্ষ হইতে যে ফল বিকাশিত হয়, নিশ্চয়ই সে ফলও সেই বৃক্ষের অংশ সেই বৃক্ষ। মানবকুলের আদি পুরুষ যাহা হইতে বিকাশিত, মানবকুলের আদিপুরুষ অবশ্যই তাঁহার অংশ তিনি। নিত্য ব্রহ্ম হইতে যাহা যা যে সকল বস্তু বিকাশিত, সে সকল অবশ্যই সেই নিত্যব্রহ্মের অংশ নিত্যব্রহ্ম।"

"শাস্ত্রীয় এক পদ্ধতিকে মিথ্যা বলিলে শাস্ত্রীয় সর্ব্ব পদ্ধতিকেই প্রতিবেদীয়ের মিথ্যা বলিবার অধিকার আছে। শাস্ত্রীয় সকলপদ্ধতিই মিথ্যা প্রমাণীকৃত হইলে জাতিহয় একেবারে অস্বীকারই করিতে হয়।"

"...মহাভারত ইতিহাসকৌস্তুভ প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ শাস্ত্রসকলানুসারে গুণকর্ম্মানুসারে জাতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।"

..."বেদব্যাস, নারদ, গৌতম, ভরদ্বাজ, অগস্ত্য, মাণ্ডব্য, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি এবং অত্রি প্রভৃতি মহাত্মাগণ জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ নহেন উঁহাদের মতে প্রত্যেকেই গুণ কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ।"—জাতিধর্ম্ম

'মানুষের জন্য ধর্ম এবং ধর্মের জন্য মানুষ—দুই-ই সত্য হইতে পারিত যদি ধর্ম বলিতে বিশেষ কোন ধর্ম না বুঝাইয়া সর্বধর্মসমন্বয়ই বুঝাইত। সর্বধর্মসমন্বয়ই মানুষের স্বধর্ম। প্রতি মানুষ এই হিসাবে স্বধর্মী, সর্বধর্মী। .....ইহাও সত্য যে প্রত্যেকটি ধর্মই স্বয়ংপূর্ণ, উহা ঐ সম্প্রদায়ের সকল স্তরেরই আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও তুল্যভাবেই সত্য যে, কোনও বিশেষ দেশ-কাল-পাত্র বা বিশেষ দৃষ্টিকোণের মধ্যে সমগ্র মানবসমাজকে, এমন কি কোনও বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানুষকেও আটকাইয়া রাখা যাইবে না। সব বিশেষত্বকে ছাপাইয়া অখণ্ড বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানব ও মানবসমাজ আগাইয়াই চলিয়াছে, চলিবেও।'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-কৃত মহাত্মাজীর গঠনকর্ম পদ্ধতি

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৬৮)

১, ১২, ৫৬। শ্রীনিত্যগোপাল শ্রীগুরু নিজ পরিচয় লিখে গেছেন—...ব্রহ্মজ্ঞানের সমর্পিকমনে...অন্যথা তাঁর কিছু নাই। সবই সত্য...। তিনি এমনি আসেন নাই—তাঁর আসার একটা তত্ত্ব আছে। গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন—আমার এই জন্মকর্ম যিনি তত্ত্বতঃ জানেন তিনি মুক্তি লাভ করেন।...শ্রীনিত্যগোপালের জন্ম তত্ত্বজন্ম...সেই জন্য তাঁকে আমি তত্ত্বমূর্ত্তরূপে বলে প্রণাম করি—তিনি তত্ত্বমূর্ত্তি—একটা তত্ত্ব incarnate—জড় তত্ত্ব, চৈতন্য তত্ত্ব, চৈতন্য তত্ত্ব..সবই তত্ত্ব তাঁর থেকে সব ভাব নিয়ে হয়...। ভগবানের সাধ্য অনেক থাকে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের জন্য, জগতের জন্য কিছু তিনি করতে পারেন না।...যারা আশীর্বাদ পেয়েও গ্রহণ করতে পারে না...কলিধর্মে নিপীড়িত...হতে হবে,...ঘটনার ঘাতে ঘাত খেতে খেতে শেষে হয়তো চৈতন্য লাভ ...শরণাগত হলেই তো তিনি যেন...; ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা দিয়ে সর্ব-শক্তিমানও কিছু করতে পারবেন না...। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের একটা ঘাতের সৃষ্টি হয়ে যায়, সেই ঘাতগুলিকে সচেতনভাবে তাঁর আদির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারাই সাধনা, তাতেই ঘাতগুলি সার্থিকতা লাভ করবে।...নিত্যগোপালই এই জগৎটাকে গড়ে তুলতে এসেছেন...। প্রত্যক্ষ এই বিশ্ব দেখছি...সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থে শ্রীনিত্যগোপাল অনেক যুক্তি দিয়েই বিশ্বের সত্যতা প্রমাণ করেছেন...তাই জগতের আশা-আকাঙ্ক্ষা সত্য...কিন্তু ছন্দ আছে তার—যে কোন রকম আশা-আকাঙ্ক্ষা যে কোন ভাবে চালাতে গেলেই তা সত্য হয় না...যে চিন্তা-প্রণালীতে সংসার জগৎ মিথ্যা, সে চিন্তাপ্রণালীতে আশা আকাঙ্ক্ষা সত্য নয়...। উজ্জ্বল ভাবে শ্রীনিত্যগোপালের এই চিন্তাধারা গ্রহণ করা ও ছড়িয়ে দেওয়ার ব্রত নিয়েছে।...কি রকম করে ভাবলে ও চললে নর নারীর সম্পর্ক সত্য হয় সেটা শিখতে পারবে এখানে।...প্রত্যেক মানুষের সম্পর্ক যদি ব্রহ্মের সম্পর্ক হয়...সংসারটাকে যদি ব্রহ্মানন্দের মধ্যে আস্বাদন করতে হয় তাহলে একটা সামঞ্জস্য বিধান দরকার...। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখে অর্জুন বললেন তোমাকে সখা মনে করে প্রাণের জোরে তোমাকে সখা ডাকা ভুল হয়েছে...তোমার মহিমা না জেনে তোমাকে শুধু সখা মনে করা ভুল... তোমার সখা রূপের সঙ্গে তোমার বিশ্বরূপ রয়েছে—সখা ডাকতে হলে সেই সঙ্গে তোমার বিশ্বরূপ সম্পর্কে যদি আমি না জানি তাহলে ভুল হবে আমার। প্রত্যেক মানুষ বিশ্বরূপ...তোমার বিশ্বরূপের ধারণা না জেনে ভুল যা করেছি এজন্য তুমি আমায় ক্ষমা কর তা নয়—এত-দিনের আকাঙ্ক্ষা—যা গড়তে তোমায় ভেঙেছি, তাকে শক্তি সম্পন্ন করে নেব তোমাকে দিয়ে—যাকে বিশ্বরূপের ভেতর টানতে পারি নাই, তার সঙ্গে যে সম্পর্ক হয় তা 'যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে'...(গীতা ৫ম অঃ ২২ শ্লোঃ)। স্বামীকে বিশ্বরূপ হতে হবে, স্ত্রীকে বিশ্বরূপ হতে হবে—তা না হলে সে ভোগ শুধু মাত্র সংস্পর্শজ হয়ে দুঃখযোনির হবেই। গোপীরা তাই বলছেন কৃষ্ণকে, তুমি শুধু গোপিকানন্দনও নও, তুমি অখিলাত্মার আত্মা...। Impersonal relation সঙ্গে সঙ্গে না থাকলে personal relation মিথ্যা হয়ে যাবে...এই impersonal relation রাখাই সাধকীয় কথা—প্রত্যেকের সঙ্গে সম্পর্ককেই স্বকীয় করার সঙ্গে সঙ্গে সাধকীয় করে নিতে হবে—ভিতরে রাখতে হবে, বাইরে রাখতে হবে—বিশ্বই

ভিতরে যেমন আছে, বাইরেও আছে—immanent, transcendent—দুইভাবে আস্বাদন করতে না পারলে বস্তু বা সম্পর্ক মিথ্যা হয়ে যাবে, তার সত্যরূপের সন্ধান পাওয়া যাবে না। বিশ্বরূপের দিক জীবনে প্রত্যেককে আস্বাদন করতে হয়। ভারতবর্ষের শাস্ত্রপুরাণের বহু কাহিনীতে দেখা যাবে এই বিশ্বজনীনতা এনে দেবার ঘটনা বড় বড় মানুষের জীবনে...। রামলীলা...এটা বিশ্বজনীনতার মধ্যে ডুবলে হারিয়ে গেছে...তদ্ভবে তদ্ভিন্নে—বিশ্বরূপের স্তরে না উঠলে আমাদের সম্পর্ক মায়া হয়ে যাবে—তখন we sit light কবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে সাহস্ত বলে লেখা পড়ে দেখো সংযমের দুই রূপ—সঙ্কোচ ও বিস্তার কৃষ্ণ সৎ অসৎ—সদসচ্চাহমর্জুন—কৃষ্ণ-জীবনে সংযম সার্থক। পারিবারিক সম্পর্ক ছাড়িয়ে যেতে হবে...আমি মহানির্বাণ মঠে গেলে আমার শিক্ষেদো খাই কি না-খাই দেখে খোঁজ আমি নেই না -এই যে না নিয়ে পারি এইখানে আমি আসক্তির বাইরে আছি... বিশ্বের সাধনা দুপদ।—'Complete objectivity can only be regained by treating the observer and the observed as parts of a single system'...। পুরুষ প্রকৃতি বিশ্বরূপের ভিতরে, বিরাটের সেবায়, ভগবানের সেবায় মিলতে পারে।...সকাল থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত নারীর বিশ্বরূপ—সেখানে স্বামী সমগ্র সংসারের, সমাজের একজন সত্য মাত্র—তারপরে তাদের স্বকীয় জীবন...। সংসারের সকল দায়িত্ব পূর্ণ না করে সন্ন্যাস হয় না, আবার দায়িত্ব পূর্ণ করতে গিয়েও মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলে—(Ref চিন্তুবাবু পরিমল) ...।... পুত্রো সেই কবে হয়ে গেছে বড় ছেলে বা তার স্ত্রী আসে নি ...। তোমাকে প্রেম যে সবার বাড়া তাই তোমারি নূতন ধারা, বাঁধ নাকি লুকিয়ে থাক, ছেড়েই রাখ দাসে...। স্বাধীনভাবে মানতে পারলেই মানা সার্থক হয়... মুক্তি দাও, তাহলেই মুক্তি পেতে পার।...আমি সকলকে মুক্তি দিয়াছি..., আমি ভালোবাসি কিন্তু চাপ নেই না...। ঘটনা নিয়ে চাপাচাপি করলে ঘটনা বিকৃত হয়ে যাবেই...। প্রকৃতি নিত্য—তাই কারো সঙ্গে কোন মীমাংসা হবে না... ঘটনাকে স্বাধীনভাবে চলতে দেবার যে ধর্ম আছে সেই অবকাশ দৌরভ...সংসারটাকে সন্ন্যাস করেছি বলে কত সম্পর্ক loose করে রেখেছি... স্বাধীনভাবে যেদিন আসবে, সে আসাই সার্থক হতে পারে ...ঘরে বাইরের নির্বিশেষ বুঝতে পেরে ছিল মুক্তি দিয়েও ভালোবাসা যায়...। সেই বৃন্দাবন হারিয়ে গেছে? হারায় না তো কিন্তু ...তাদের প্রকৃতিগত স্বভাব... assertive নয়... প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের থেকে দূরেও আছে, কাছেও আছে—তদ্ভবে তদ্ভিন্নে। পুরুষ-কৌলীন্যের দেশে আজ পুরুষকে নূতন করে ভাবতে হবে—না সো রহম না হাম রহী—পুরুষত্বের উপরে উঠতে না পারলে পুরুষোত্তম স্তরের খোঁজ পাওয়া যাবে না রাজা-প্রজা, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, নেতা-নেতা—এই সব ক্ষেত্রে দুইয়ের সম্পর্ক কি রকম হবে? কেউ-ই কারোর অধীন নয়, আবার কারোকে ছাড়াও কারোর চলবে না—প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র আবার প্রত্যেকেই পরতন্ত্র, প্রত্যেকে প্রত্যেকের মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলবে। ঘটনাকে স্বাধীনভাবে চলতে দাও। মুক্তি দাও—মুক্তি দিতে কৃষ্ণ পেরেছিলেন বলেই সকলে কৃষ্ণের দাস... ইংরেজ মানে মানে ভারতবর্ষ ছেড়ে দিয়েছিল বলে আজও ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের একটা সম্পর্ক আছে...। (গান)—এ সংসারে আর যারারা আমায় ভালোবাসে তারা সবাই ঘরে রাখে বেঁধে কঠিন পাশে।...যেদিন ব্রজগোপীদের ফেলে কৃষ্ণ চলে গিয়েছিলেন—কেন গিয়েছিলেন? কৃষ্ণ বলেছিলেন, বন্ধনহীন গ্রন্থি চাই বলেই তিরোহিত হয়ে গিয়েছিলাম—এক চেটিয়া অধিকার করে নিতে পারবে না...।...ভারতবর্ষে পুরুষের অত্যাচার...। অভাবের সাধনা প্রত্যেককে আস্বাদন করতে হয়—পুরুষোত্তমানন্দ আছেন, পুরুষোত্তমানন্দ নাই—এই দুই ভাবেই ভাবতে হবে।...যদি সত্যি প্রেমের বাঁশী বাজাতে পারি তবেই তাঁর সেবা হবে...বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলে দেয়...সব সময় কাছে টানলে সংস্পর্শে ভোগ হয়ে দাঁড়ায়...রাধাকৃষ্ণের যিলন সংস্পর্শে ভোগ নয়...

ব্রহ্মময় ব্রহ্মময়ীর নিকট না মানবের অধিকার যে দেব তাকে কেউ না মেনে চলে? দাবী ছেড়ে দাও, দাবী পূর্ণ হবে···প্রাণ খুলে চল, আনন্দ মনে বিলোবিলে থাক—নইলে থাকতে পারবে কেন তিন দিন?...ঠাকুর করুন সকলের সম্পর্ক সখে হউক, ঘরে হবে না। কি সাধনা করবে?···ছুয়ার খুলে রাখ—বিশ্বকে, নিজের মানুষকে ভিতরে ঢুকতে দাও···দুর্যোধনকে জীবনে ঢুকতে দাও—কিন্তু আসক্তি নিজের নিকট থেকে নিজেকে রক্ষা করো। প্রত্যেকের সঙ্গে নিজের সম্পর্কটুকুতে দুর্যোধনের সম্পর্ক হয়। আপনজন ভুল করলে আগে আগে বাহিরে সেই... ভুল একলার নয়... ছেলের হয়েছে নিত্যগোপাল, আর কাউকে অপরাধী করব না···সবাইকে মুক্তি দিয়ে যাব···এক হয় পুরুষোত্তমের সঙ্গে... সংসারে সকলকে আজ autonomy দিতে হবে... যখন কেউ বিদ্রোহ করবে, তখন ব্যক্তিগত সাধনা করে দূরে থেকে এমন ভাবে ভালবেসে চলতে হবে যাতে তার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে...। নিত্যগোপাল-কে বলেছিলেন, ছেলে এল, তারপরে মানুষ হবি...আমার দুয়ার খোলা রইল...। জোর জুলুম করে কাউকে দিয়ে কিছু করান যায় না, তাতে ফাঁকি আরও বাড়বে···। স্বাধীনে স্বাধীনে প্রেমই পরকীয় প্রেম: অপরের মর্যাদা, অপরের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলেই স্বাধীনে স্বাধীনে প্রেম হতে পারে।··· সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে সংসার সন্ন্যাস এক করা যায়, কিন্তু তার ছন্দ শিখতে হবে খুব!...আফিং-ফুল-শীল ছাড়া অর্থ আফিং বন্ধন, ফুলের বন্ধন ইত্যাদির বাইরে এসে দাঁড়ানো...। আমি ছিটকে পড়েছি কেন? আমি সংসার ত্যাগ করি নি···সংসার আমায় ত্যাগ করেছে—সংসার আজ পর্যন্ত এমন হয় নি যার মধ্যে ব্রহ্মের সম্পর্ক আস্বাদন করা যায়...। আমার বাবা মৃত্যুর আগে বললেন যে-ই কালোচাঁদ সে-ই নিত্যগোপাল...। নিত্যগোপাল, সংসারের সম্পর্ককে তোমার সম্পর্কে গড়ে তুলবার চেষ্টা সারা জীবন করে এলাম···বিশ্বরূপের আস্বাদন এ পথের প্রধান কথা...। আমি বাঙালী বাঙালীতে আছি, বাংলায় আছি, ভারতবর্ষে আছি, বিশ্বে আছি...। বিশ্বাতীতের সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ করতে হয়। পিতা-মাতার পরিচয়েই আমার সবটুকু পরিচয় নয়...নিজের জীবন দিয়েও বিশ্বকে আস্বাদন করতে হবে। আমার ভিতরেই কুরুক্ষেত্রকুরুক্ষেত্র-এর পর আছে, সেই সব ভাবকে ফুটিয়ে তুলে বিশ্বরূপ হয়ে আমার পরিচয় স্থাপন করতে হবে।...বিশ্বরূপ না হয়ে বিশ্বে ব্যক্তিগত স্বার্থের অধিকার নাই।...কৃষ্ণের মত করে করলে সংসার সত্য—কৃষ্ণের মত হলে সংসার সত্য···বিশ্বহীন সংসার সত্য নয়। World aspect না রেখে সংসার সন্ন্যাস সত্য নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমার কিছু চাইবার নেই···নিত্য-গোপালের এই জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠিত করতেই আমার যা কিছু চাওয়া···। শিব নীলকণ্ঠ—আমার উপর যে অন্যায় অত্যাচার হয়েছে, মানুষ যে সব চরম ঘাত দিয়েছে তাকেও নীলকণ্ঠের মতই বুকে করে রেখেছি—মানুষের উপর প্রতিশোধ কোন কালে নাই···। আমি মানুষকে একান্ত করে চেয়েই আবার একান্ত ছেড়ে যেতে পারার যে সন্ন্যাস তাও বজায় রেখে চলেছি—এ দুয়ের মিলে যেমনটী হয় তেমনটীই আমার জীবনের চলার ছন্দ ছিলিনি।...ভাল খাই নাই, ভাল পরি নাই···কত বড় উন্মাদ আমি তার যদি খবর রাখতে—জীবনে দুঃখ বরণ করে নেওয়াটাতে যেন একটা নেশা লাগত! রবীন্দ্রনাথের সেই যে কথা আমরা সকলে মনা করে দুঃখ সহ্য করব সেই কথাটা আমার জীবনে কত যে সত্য—মনা করে দুঃখ সহ্য করেছি···। সংসারের static love-কে dynamic love এ পরিণত করতে হবে।···নিজস্বতা অনেক পেয়েছি জীবনের চলার পথে···তবু অবিশ্বাস যেন না করি—বিশ্বাস করতে পারাতেই জীবনের যাত্রা—ছোট্ট সেকড়ার পুঁটুলী তুই মোর—(গান)

ও, ১২, ৫৬। ওঁ নমঃ ভগবদ্মূর্ত্তয়ে...ওঁ॥

আমেরিকার কাছ থেকে পাকিস্তান অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি পেয়েছে। পাকিস্তান দুর্বল—সে আমেরিকার বলে বলীয়ান হয়ে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করবে কিংবা কিছু করবে।...সে সব অস্ত্রশস্ত্রে নাকি মরচে ধরেছে—আমেরিকা বলেছে পাকিস্তান অপরাধী। এমনি ছল—

পায় অনেকে অনেক কিছু—কিন্তু রক্ষা করতে পারে কয়জন? যারা আমাদের দিচ্ছে, ভালো আমাদের দিচ্ছে... কিন্তু নেয় কে?...নিজের জানতে হয়—পেলেও মানুষ নিতে পারে না।...তখার আছে বাটিয়া দিলে কাটিয়া পড়ে।...নিত্যগোপাল নিজের গানে যা লিখেছেন তা অনুধাবনযোগ্য।...মাতৃস্নেহকে যদি তুমি সমালোচনা করতে বস, গুরুকে যদি সমালোচনা করতে বস—তার অবধি পাবে কি? তোমার পরিধি দিয়ে মাতৃস্নেহ, গুরুস্নেহকে মাপতে পারবে?...মা স্বভাব বশে স্নেহ করেন, গুরু স্বভাব বশে স্নেহ করেন সেই স্নেহকে বুঝতে চেষ্টা কর।...অহংকারের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অযোগ্যতায় পরিণত হয়েছে।...নদীর যোগ্যতা ছুটবে কিসে? সাগরের অনুগত হলে..। অনুগত বিনা ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন হলেও নাহিস পায়...। লঘুও গুরু হয় যদি গুরুকে স্পর্শ করে থাকে,...তুমি নারীর মত ভগবানের দীর্ঘ দাড়ি ধরে গঙ্গাকে শির ধারণ করেছিলেন...। কৃপা আছে—ধারণ কর, অনুগত হও ...বলতে পেরে আমি তোমার মত হব, আমার বুদ্ধি দিয়ে তোমাকে বিচার করব না...। গুরুর কাছে বসে নিজের সাফাই গাইবার অধিকার শিষ্যের নাই...। গুরু ভুল করেছ বললে আমাকে বিশ্বাস করতেই হবে যে আমি ভুল করেছি নিত্যগোপালকে একদিন অবিশ্বাস করি নি—সেই টুকুর জন্যেই আজ এতদূর আসতে পেরেছি...কৃষ্ণকেও কত লোক ভুল বুঝেছেন...। বোঝে না কৃষ্ণের স্বরে সেটা সত্য, তোমার স্বরে সেটা সত্য না হতে পারে...। গুরুর ভুল দেখতে চাইলে মুক্তি দিয়ে যাওয়া ভাল।...ক্ষুদ্র আমিত্বের প্রসার কতটুকু? আমিত্বের যখন লয় হয়, তখনই সে-আমি হাজার ক্ষেত্রে বিচরণ করতে পারি।...রামদেবের পুরুষোত্তম-আমিই মত্ত হয়েছিল, দুর্বে হয়েছিল...যে-আমি গুরু থেকে বিচ্ছিন্ন—তার দুটি ক্ষুদ্র, জীবনের সব ক্ষেত্রে বিচরণ করার যোগ্যতা কোথায় তার? এত ছোট আমি নিয়ে কি বড়স্বকে পাওয়া যায়?...সেইজন্য যদি শরণং ব্রহ্ম...তিনি যখন আমার মধ্যে প্রবেশ করবেন, তখনই আমি বিরাট হব।...নিত্যগোপাল, আমি তোমার বুদ্ধি নিয়ে আমাকে বিচার করব...আমার বুদ্ধি তুমি লও, আমার অহংকারের ভিতর তোমার অহংকার অবতীর্ণ হউক...। তুমি পুরুষ, আমি প্রকৃতি...। যেদিন তোমারই মত আমি বিশ্ব নাগরিক হব, সেই দিনই আমি নিরহংকার হব...। ঠাকুর, বিশ্বে নিরহংকার কর তাহলে ধরার ধূলি ব্রহ্ম-ধূলি হবে; ধরার মানুষ ব্রহ্ম মানুষ হবে। জগন্নাথ নিত্যগোপাল...।

৫, ১২, ৫৬। ওঁ নমো ভগবতে শ্রী নিত্যগোপালায়...। শ্রীনিত্যগোপাল নিজের যে পরিচয় দিয়ে গেছেন, ঠিক তার সঙ্গে যদি জীবনে যুক্ত থাকতে পারি, তবে ঐ সমস্ত যোগ্যতাই হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। দাঁড়াও আমার আঁখির আগে—এই তো গান...। আমার সামনে তাঁকে দাঁড় করাতে পারলেই তাঁর চরণ স্পর্শ করে, কিন্তু আমার অহংকার নিয়ে দাঁড়ানো মানে তাঁর দিকে পিছন দিয়ে দাঁড়ানো এটা বিমুখ হওয়া—সামনে দাঁড়ানো মানে উন্মুখ হওয়া...তাঁর সামনে দাঁড়াতে হলে অহংকার নিয়ে দাঁড়ানো হবে না...। চোখে যদি তাঁকে ধরতে পারি · হৃদয়ে তাঁকে ধরতে হয় · হৃদয় দিয়ে না পেলে কিছুই বোঝা যাবে না ...প্রার্থনা কর হৃদয় দিয়ে যেন তাঁকে ধরতে পার...তাহলে সকল কাজে তাঁর প্রকাশ উপলব্ধি করতে পারবে... তখন দেহ তাঁর, প্রাণও বুঝি তাঁর...এর জন্যই তো একদিন পথে বেরিয়েছিলাম...। ভগবানের কাছে নিজেকে দেওয়া সহজ, সেখানে তাঁকে দেওয়া যায়...কিন্তু একজন মানুষের কাছে নিজেকে দেওয়া অনেক কঠিন...। সেখানে নিজের অহংকারকে ত্যাগ করা সহজ হয় না...উপনিষৎ অহং ব্রহ্মাস্মি বলেছেন; সে অহং এ আমি নয়—শরণাগত আমিই ব্রহ্ম হতে পারি—বিচ্ছিন্ন আমি তাঁর দাস মাত্র। শক্তির ক্ষেত্রে তিনি আর আমি পৃথক—প্রেমে বলা যায় তিনি আর আমি এক।...ভক্তির পরীক্ষা সংসারে, জ্ঞানের পরীক্ষা কর্মে...। নিত্যগোপাল, সারা জীবন মানুষকে বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে তুলবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে গেলাম... কতজনকে পেলাম? নিত্যগোপাল, দাঁড়াও আমার আঁখির আগে—জীবের প্রার্থনা ছিল দাঁড়াও আমার

আঁখির আগে, তোমায় শুধু দেখব···; জীবনের বাকি কয়টা দিন···তোমায় দেখব, তোমায় ছড়িয়ে ধরব, তোমায় বরণ করব—আমার তোমার অহং বলে স্বীকার করব।

৬, ১২, ৫৬—ওঁ নমোঃ···ওঁ॥ জীবন-বল্লভ ভগবানের একটী বিশেষত্ব—তাঁকে পেতে হলে জীবন দিয়ে পেতে হয়—বুদ্ধি কর্ম বা আর কিছু দিয়েই নয়। এরা জীবনের এক একটা প্রকাশ, তেমনি বুঝি দর্শনও জীবনের এক একটা প্রকাশ। আগে ভগবানকে কোনো এক দিক দিয়া পাওয়ার প্রয়াস ছিল—কিন্তু আমার চক্ষু আমার যতটুকু প্রকাশ···চক্ষু আমাকে যতটুকু আনতে পারে—হাতের জানা, পায়ের জানা, চোখের জানায় সমন্বয় করতে হবে—কোন একটা ইন্দ্রিয় দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায় না। আমি চক্ষুর অতীত—তাই আমি কানে শুনি, আমি কানের অতীত, তাই চোখে দেখি···সকল ইন্দ্রিয় যখন সমন্বিত হয়, তখন আমাকে ধরতে পারে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিচ্ছিন্ন ভাবটা কাটাবার জন্যে ইন্দ্রিয়ের পিছনে যেতে হয়। যুনে ইন্দ্রিয় থাকে না, মন থাকে, আরও পিছনে গেলে মন এবং আত্মিও থাকে না···। প্রত্যেক শিশু যদি পেছনে গিয়ে ওকয় মধ্যে যেতে পারত, তাহলে সেখানে শুকতাইবোনদের সঙ্গে দেখা হত···। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সর্বেন্দ্রিয়···অন্ধের চক্ষু নেই—ছুঁয়ে দেখার কাজ সারে।···দেখাটার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে—চেয়ে দেখ, শুনে দেখ, করে দেখ···সব কিছু দিয়েই দেখা হয়···। সকল ইন্দ্রিয় উঠিয়ে নিয়ে···মিলিত হওয়া যায়, তখন···একটা ইন্দ্রিয় কম হলে অন্যে তার কাজ সেরে নেয়।···তিনি জীবন-বল্লভ—তাই বলতে পারেন যা কিছু কর আমায় দাও—আমার কিন্তরে না এলে এই পরস্পর বিরুদ্ধ বৃত্তিগুলি তো মিলবে না···। আমার দুর্ভাগ্য তোমাদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে চাইছি···কিন্তু পরস্পরে-না মিললে যে আমাকে পাবে না: এটা স্পষ্ট জেনো।··· ব্রজগোপীদের যেমনি অহংকার এল অমনি কৃষ্ণ অন্তর্ধান, আবার রাধারাণীর যেমনি আমিত্বের প্রলাপ হল, অমনি কৃষ্ণ আর সেখানে নাই···তাঁর আমিই চলবে—আর কোনি আমি চলবে না···সেই জন্য কৃষ্ণ তাঁকে সে যত চতুর···অর্থাৎ সে জানে আমি নিয়ে চলবে না—কৃষ্ণকে যে সত্যিকারের ভজনা করতে পারে, সে নিজের আমি ছেড়ে দিতে পারে···। আমার থেকে যেই দূরে গেছ আর আমার কাছে থাকতে পারার সম্ভাবনা নেই। পরমহংসদেব বলতেন—কেরোসিন নামবার সময় বোঝা যায় না—১০০ গজ নেমে গেছেন কিরে দেখলে দেখা যায় অনেক দূর এসে ফেলা গেছে—এই তো মায়া···· প্রত্যাহার সাধনা কর—পিছনে যাও—বাইরের পরিচ্ছিন্ন সত্তা থেকে সরে গিয়ে ভূমার মধ্যে যাও···· মায়া অতিক্রম করা সহজ নয়—কিন্তু আমাকে যে পরপারের···তখন তার সমস্ত কর্ম ভগবানকে প্রতিফলিত করে, সমস্ত চিন্তা ভগবানকে প্রতিফলিত করে—সমস্ত দিকে হুঁশ থাকবে হবে—এরই নাম কৃষ্ণকামিনী, কৃষ্ণতারিনী···কৃষ্ণগতপ্রাণ··· তখনই ধরার ধূলি হয় ব্রজ-ধূলি, ধরার মানুষ হয় ব্রজ-মানুষ।···

৮, ১২, ৫৬ ওঁ নমো ভগবতে···। বৈকালে একটী ছেলে এসে বলল, সত্যনারায়ণের পূজোর এত ফুল দিন। কথাটা শুনে মনে হল পূজোকে মানুষ বাইরের ব্যাপার করে রেখেছে—পূজাকে জীবনের ব্যাপার কে করল? 'জীবনে তোমারে পূজিতে'—যাকে পূজা করি তিনি তো আমার আত্মা—তাঁকে আমার সব বৃত্তি দিয়ে পূজা করতে হয়—কিন্তু মানুষ কর্ম দিয়ে করে তো জ্ঞান দিয়ে করে না, জ্ঞান দিয়ে করে তো ভক্তি দিয়ে করে না··· তিনটী একত্র করে পূজা করা চাই—কর্ম জ্ঞান ভক্তি··· Knowing, Feeling, Willing। জীবনের সমস্ত ঘটনাই যেন এমন ভাবে করা হয় যে সেই করাই পূজা···।

ক্রমশঃ

গীতা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ

॥ শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার রায় ॥

[উত্তরপাড়া ও নয়নারায়ণ আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রীবিষ্ণাগোপালদেবের জড়-অজড়, স্থিতি-গতি ইত্যাদি সমন্বয়রূপ সর্ব সমন্বয়ের ভিত্তিতে ১৯৩৮-৫ খৃষ্টাব্দের কারাবাসে থাকাকালীন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, আজও তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া বিদ্বজ্জন সমাজের নিকট পৌঁছায় নাই। ঐ ভাষ্য ভূমিকায় তিনি লিখিতেছেন, "...গীতার প্রয়োজন বলিতে সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম-কর্মযোগে, পুরুষোত্তম-লোকে প্রতিষ্ঠা। কর্মক্ষেত্র এই মাটির বুকেই হইবে জড়-অজড় দ্বন্দ্বের চরম অবসান কর্মের বুকে নৈষ্কর্ম্যের আবাহনই গীতার কর্মযোগ।...গীতার স্থিতিগতি এক অদ্বৈত, কর্মজ্ঞান এক অদ্বৈত, মনোবুদ্ধি এক অদ্বৈত।..." আমরা বর্তমান প্রবন্ধের শেষাংশে প্রাচীন উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত এই ভাষ্যখানির সহিত পরিচিত হইতে প্রার্থনা জানাই।—স, উ কা:]

'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'—ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব গহন গুহায় সমাহিত সাধারণ মানুষের পক্ষে সেখানে প্রবেশ করা সম্ভবপর নহে। আচার্য শ্রীধরস্বামী এজন্যই বলিয়াছেন—

সর্বোপনিষদো গাবো, দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা, দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।

সমস্ত উপনিষদরূপ গাভী দোহন করিয়া স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতারূপ দুগ্ধামৃত সুধীদের আস্বাদনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, অর্থাৎ গীতা যেন উপনিষদ বা ধর্মতত্ত্ব made easy।

কাল, মতবাদ ও বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে নানাভাবে গীতার আলোচনা চলিয়া আসিয়াছে। আচার্য শঙ্কর হইতে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত স্বদেশে ও বিদেশে বহু মনীষী বহু ভাবে গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপলব্ধি ও মনীষার বিভিন্ন স্তর হইতেও ইহার আলোচনা চলিয়াছে বর্তমান ভারতের যে দুই মনীষী গীতার আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে

স্বামী বিবেকানন্দ সার্বভৌম ভ্রাতৃত্বের অনুভব স্বরূপ এক সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ গীতার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দের মতে সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ মূলতঃ সমগ্র দেশ কাল, ধর্ম ও জাতির গবিষ্ঠাদপিগুণের মধ্যে যে সাম্যসংরক্ষিত চিরন্তন মানবমনের অস্তিত্ব অনুস্যূত রহিয়াছে তাহারই প্রশস্ত ভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে এই ঐক্যানুভূতির উপরেই আধার অনিবার্যরূপে মনোবৃত্তির বৈচিত্র্যের অবিসংবাদিত অস্তিত্বও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে সর্বজনীন ধর্ম এই বিভিন্ন ও বিচিত্র মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানবমনের বিশেষ বিশেষ অবাধ্যে খুশীর অনুযায়ী বেড়িয়া উঠিবে এবং প্রত্যেক মানুষকেই আপনার সার্থকতা ও পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর করিয়া দিবে। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—Just as we have recognised unity by our very nature so we must also recognise variety. A religion to satisfy the largest portion of mankind must be able to supply food for all the various minds (Ideal of a Universal Religion)। মানুষের মনোবৃত্তিকে বিশ্লেষণ করিয়া বিবেকানন্দ তদনুযায়ী মানুষকে সাধারণভাবে চারিটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—কর্মী, মরমী (mystic), জ্ঞানী ও ভক্ত। ঐ বৃত্তিগুলির সহায়তায় এবং ঐগুলি অবলম্বন করিয়া মানুষ যখন পরমাত্মার সহিত নিগূঢ়

যোগ স্থাপন করিতে চেষ্টা করে তখন সে আসলার পথে অগ্রসর হইয়া চলে। বিবেকানন্দের মতে, গীতা মানব মনের এই বিভিন্ন ভাব ও বৃত্তিগুলিকে স্বীকার করিয়া কর্ম-যোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগে ও ভক্তিযোগের দ্বারা বিভিন্ন মানবের স্বভাব-বৈচিত্র্যকে আপন আপন পরিণতি ও পূর্ণতার পথে চালিত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং সকলের জন্য উন্মোচিত করিয়াছেন। তাহার কর্মযোগ, জ্ঞানীর জ্ঞানযোগ, মরমীর রাজযোগ ও ভক্তের ভক্তি-যোগ মানুষের স্বকীয় বিশিষ্ট স্বভাবের স্বরূপোপলব্ধির উপায় মাত্র। এই ভাবে মানুষের চিত্তবৃত্তির প্রকৃষ্ট বিশ্লেষণ নির্দেশ দিয়া গীতা সর্বজনীন ধর্মের একমাত্র শাস্ত্রগ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত। অন্য কোনও একখানি ধর্মগ্রন্থে সম্ভবতঃ এরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির প্রণালীবদ্ধ আলোচনা এবং তাহার জন্য পথের সুস্পষ্ট সন্ধান দেওয়া হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা মূলতঃ বুদ্ধিদীপ্ত; অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত হইতে তিনি বুদ্ধির সন্ধানী আলোকরশ্মির পরিধির মধ্যে আনিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্পষ্ট অনালোকিত ও ছায়াময় রহস্যের আবেদন তাঁহার মনে সাড়া জাগায় নাই। ধর্মতত্ত্ব ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কয়েকটি অধ্যায়ে তিনি গীতার আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহাকে মানবধর্মের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র গীতার আধ্যাত্মিকতা লইয়া বিশেষ আলোচনা করেন নাই। 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থেও শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অপেক্ষা তাঁহার মানবচরিত্রেরই আলোচনা করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের মনোবৃত্তিকে কর্মপ্রবণী, ভাবার্জনী ও জ্ঞানার্জনী এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে এই বৃত্তিত্রয়ের পূর্ণ বিকাশ ও সামঞ্জস্য সাধিত হওয়ায় তিনি আদর্শ মানব। গীতার আলোচনার মধ্যেও এই বিভিন্ন বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ও সমন্বয় সাধনের কথাই যেন মিলিতেছে।

বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্র গীতায় অন্তর্নিহিত তত্ত্বগুলির আলোচনা করিলেও ইহাতে যুগোপযোগী নিষ্কাম কর্মবাদের কথা অনিবার্যরূপে আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইলেও বিচার পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য রহিয়াছে। গীতার আলোচনা, ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র রচনাকালে বঙ্কিম ফরাসী দার্শনিক অগষ্ট কোম্‌তের পুষ্টিবাদ (Positivism) ও ইংরাজ দার্শনিক বেন্থাম ও মিলের ইহলোকবাদের (Utilitarianism) কথা চিন্তা করিয়াছেন। তখন কোম্‌তের নূতন ধর্ম Religion of humanity ইংরেজদের বিশেষ উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছিল। বঙ্কিমের সংবেদনশীল ও গ্রহণশীল মনও ইহাকে অভিনন্দিত করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অনুকারক মাত্র ছিলেন না, তাই 'ইয়োরোপীয় পুষ্টিবাদ' ও 'হিন্দুবাদ' এবং বঙ্কিমের মানবপ্রীতি এক শ্রেণীর নহে। পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন (meta-physics) ভাকইনের অভিব্যক্তিবাদে প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নবযুগের নূতন মানসিকতার নিকট শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিল। অথচ নূতন ধর্ম ও দর্শন না পাইলে মানুষের উচ্চতর মার্গের খুধা নিবৃত্ত হয় না। অপর দিকে ভাকইনের অভিব্যক্তিবাদের আনুষঙ্গিক নীতি, যোগ্যতমের উদ্বর্তনের মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার নৈরাজ্যের যে ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা মানব চিত্তে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটাইতে পারে। আবার বিজ্ঞানও নিত্য নূতন আবিষ্ক্রিয়া ও উদ্ভাবনাগুলিদ্বারা প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণাগুলির ভিত্তি-ভূমি টলাইয়া দিতেছিল। এই সকল বিভিন্ন প্রকারের চিন্তাধারার সংঘাতে সংশয়াকুল মানুষ কোম্‌তের নূতন মতবাদে সান্ত্বনে বরণ করিয়া লইল। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের এই মানবধর্ম নিরীশ্বরবাদী, অন্ততঃ অজ্ঞেয়বাদী।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতীয় মানসের নিকট অবশ্য এই মানবধর্মের আবেদন ভিন্নধর্মী। ইহা একটি ব্যবহারিক ধর্মের যুক্তি ও বিচারবাদী প্রতিষ্ঠাশীল মনের নিকট আবেদন। তথাকথিত নিষ্ক্রিয় অধ্যাত্মবাদের মুখোশিকা ও জড়তা হইতে ইহা একটি বাস্তব সামাজিক কর্তব্যের সর্বজনীন ও সর্বজন-বোধ্য কর্মশীলতার আহ্বান। এই কর্ম হইবে নিঃস্বার্থ বুদ্ধি প্রণোদিত, অনাসক্ত এবং অধ্যাত্ম-বুদ্ধির অন্তর্গতনিবিষ্ট। সীতারাম, আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসগুলিতেও এই ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে।

বিবেকানন্দও মানবপ্রীতিকে ধর্মের স্তরে উন্নীত

করিয়াছেন—"This Humanity is what you call God'; যেমন বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'প্রীতিই সর্বব্যাপিনী, প্রীতিই ঈশ্বর'। কিন্তু বিবেকানন্দের মানবপ্রীতি কোঁতের নিরীশ্বরবাদীর মানব-প্রীতি অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের শুষ্ক ও শুষ্ক বুদ্ধিগ্রাহ্য মানবপ্রীতি নহে; ইহা নিছক বৈদান্তিকের মানবপ্রীতি যাহা নিখিল বিশ্বের সহিত উর্ধ্বদৃষ্টির এক-প্রান্ত হইতে সন্তাত, অনুভূতির স্তরে এবং জ্ঞানের গভীরে। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' হইতে উপলব্ধি 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর' এবং practical ধর্মের উপদেশ হইতেছে—'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'। গীতা ও ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় অনাসক্ত কর্ম ও সেবাধর্মের উপর স্বভাবতঃ এতখানি জোর আসিয়া পড়িয়াছে।

কর্মযোগের এই আবেদন সে যুগে অনিবার্য ও স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল; শতাব্দীর পর শতাব্দী নির্বীর্য ও নিষ্ক্রিয় ভারতবাসীকে তাঁহারা কর্মমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। ভারতের যে উচ্চ সাত্ত্বিকতা তখন ব্যর্থ তামসিকতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। তুমা যে ভূমিতে কর্মের মধ্যে উপলব্ধি করিতে হয়, এ সত্য তখন বিস্মৃত। বিবেকানন্দের উদাত্তকণ্ঠে ত্যাগ ও কর্মের জয়ধ্বনি ধ্বনিত হইল—'National ideas of India are renunciation and service. Intensify her in these'। মহাভারতে অনেক বেদান্ত যেমন গীতায় পরিণত হইল গীতার মধ্যে, বিবেকানন্দ আবার গীতার মধ্যে বেদান্তকে দর্শের ও সংসারের বেদান্তে পরিণত করিলেন। সমসাময়িক যুগ এ আহ্বানে মাতিয়া উঠিল, গীতার অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রতি তখন দৃষ্টি পাত করিবার অবসর রহিল না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাষ্ট্র সাধনার ক্ষেত্রে কর্মের যে উজ্জ্বল জোয়ার আসিয়াছিল তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষ উদ্বেল প্রাচুর্যে ভরপুর হইয়া গিয়াছিল।

সেই সময়ে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব। বিবেকানন্দ যেমন সন্ন্যাস ও জ্ঞানযোগ হইতে কর্ম-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু কর্মসাধনা হইতে সন্ন্যাস ও জ্ঞান পর্যন্ত ক্রমে আসিয়াছিলেন। অধুনালুপ্ত 'ধর্ম' ও 'আর্য' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে, গীতার ভূমিকা'র ভূমিকা স্বরূপ তাঁর Essays on the Gita-র দুই খণ্ডে সবিস্তার ভাবে তিনি গীতার আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাকে একটি উদ্ধৃতি দ্বারা তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী বুঝা যাইতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন—'গীতার গ্রায় মহাগ্রন্থ খণ্ডভাবে লইলে বুঝা যায় না; গীতায় যেমন করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহার শিক্ষার ক্রম-বিকাশ হইয়াছে, 'তাহা সংক্ষেপে অনুধাবন করা প্রয়োজন' সমসাময়িক যুগে অনাসক্ত কর্মযোগ গীতার চরম শিক্ষা বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছিল এই উক্তি তাহার পরিপন্থী অবশ্য ইহাতে শিক্ষার ক্রম-বিকাশের ধারার কথা বলা হইয়াছে। তাঁহার মতে যদি অনাসক্ত কর্মযোগ গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় হইত তবে চারিটি অধ্যায়ে গীতা সমাপ্ত হইত, 'অষ্টাদশাধ্যায়িনী' হওয়ার সার্থকতা থাকিত না। তিনি আরও আশ্চর্য বলিয়াছেন, 'গীতা যে সমস্ত শিক্ষা দেয় তাহা নিঃস্বার্থ-পরতা নহে'। কারণ অনাসক্ত কর্মযোগে আত্মোপলব্ধির ভিত্তি স্থাপনা করিবার পর অর্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইল—

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধং।

শাঙ্করভাষ্যে 'সমৃদ্ধং' শব্দটির ব্যাখ্যায় আছে 'সমৃদ্ধমনপত্যকণ্টকম্') অর্থাৎ একচ্ছত্র ও নিষ্কণ্টক। শ্রীঅরবিন্দের মতে ইহা তো অনাসক্ত কর্মের শিক্ষা নহে। তবে কি এতটা আড়ম্বরের সহিত যে অনাসক্তি ও ধর্মের শিক্ষা দেওয়া হইল তাহা কি ভাবে প্রত্যাহার করা হইল? আসল কথা হইতেছে গীতার শিক্ষার ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী ইহা ঠিকই। সাধনার প্রথম স্তরে অনাসক্ত কর্মের শিক্ষা প্রয়োজন। ক্রমে জ্ঞানমার্গে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রবুদ্ধ মানবাত্মা বুঝিয়াছে,

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।

প্রকৃতিই যখন গুণত্রয়ের সাহায্যে কর্মানুষ্ঠান করে সে প্রসঙ্গে আসক্তি-অনাসক্তির প্রশ্নই অবান্তর। কর্মে

অনাসক্তির কথা আসিয়া পড়ে তখনই যখন মানুষ নিজেকে কর্তা বলিয়া মনে করে। শ্রীঅরবিন্দের মতে, নীতিধর্ম অভিব্যক্তির একটি বিশেষ স্তরেই প্রযোজ্য—Ethics is a stage in evolution সাধারণ মানুষ রহিয়াছে ethical স্তরে, মানবেতর প্রাণী infra ethical ও প্রবুদ্ধ মানুষ supra ethical স্তরে। জ্ঞানযোগে মানুষের মন যখন প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে সে তখন নীতিধর্মের গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া যায়

অর্থ যেমন জ্ঞান হইতে নূতন আলোক পায়, জ্ঞানও তেমনি কর্মনিরপেক্ষ হইয়া নিছক সূত্রাকারে পর্যবসিত হইল না। প্রত্যেক স্তর যেমন উর্ধ্বতর স্তরের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তেমনি তাহার বৈশিষ্ট্যও উর্ধ্বতন স্তরের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া উহার গভীরতা ও ব্যাপ্তি উভয়কে বর্ধিত করিয়া যায়। তাহার পর ভক্তি আসিয়া উভয়কেই প্রেমদান করিয়া সার্থক করিয়া তোলে অপরদিকে কর্ম ও জ্ঞানের দুই বিপরীত উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভক্তি নিজে অমল ও সহজ ভাবমূর্তি ও অধীর উচ্ছ্বাসের বাষ্পীভূত অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া হইয়া উঠে রসঘন পরিণামে এ তিনের সার্থক সমন্বয় ও তাহাও অতিক্রম করিয়া প্রবুদ্ধ মানবাত্মা অকুণ্ঠ আত্মনিবেদনের পূর্ণবিকশিত রূপে বিকশিত হইয়া উঠে এবং গীতার শেষ শিক্ষা হইতেছে তাহাই—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

গীতার শিক্ষায় অনাসক্ত কর্মে যাহার আরম্ভ, অসংকোচ আত্মনিবেদনে তাহারই পরিসমাপ্তি।

শ্রীঅরবিন্দ এক বিশিষ্ট সমন্বয়ী দর্শনের প্রবক্তা। গীতার আলোচনায় তাঁহার সৃষ্টিকল্পী তাঁহার নিজস্ব দর্শনের সহিত সাযুজ্যপূর্ণ। তাঁহার দর্শনের মূলসূত্র হইতেছে বিবর্তন ও সমন্বয়। তাঁহার মতে যে মহাসত্তা সচ্চিদানন্দ জগৎরূপে অভিব্যক্ত করিয়া বিরাজমান, বিশ্বজগতে তাহার আবার সার্থক সাধনায় ও বহু বিচিত্র প্রকাশ বিবর্তনের ধারা বাহিয়া চলিয়াছে। এই পরম সত্তা প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে জড় বিশ্বে, তাহার পর প্রাণিক (vital), মানসিক (mental), উচ্চতর মানসিক (over mental) ও অতিমানসিক (supramental) স্তরের মধ্য দিয়া চলিয়াছে প্রত্যেক স্তরটিকে প্রথমে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে হইবে কিন্তু তাহার পূর্ণ পরিণতি নিজেকে অতিক্রম করিয়া সকল স্তরের সমন্বয় পূর্ণ সামগ্রিক পূর্ণতার মধ্যে উচ্চতর স্তরটির মধ্যে নিজের সমস্ত অভিজ্ঞতা মিলাইয়া দিয়া যেমন তাহা নিম্নতর গভীরতর ও মহত্তর হইতেছে, তেমনি উর্ধ্বতন স্তরটিরও বিস্তার ও ব্যাপ্তি দিতেছে। এই দেওয়া নেওয়া আছে বলিয়া বিশ্বে কিছুই নিরর্থক ও পরিত্যাজ্য নয়, কিছুই ব্যর্থ হইয়া যায় না। প্রত্যেক স্তরটিই প্রবুদ্ধ মানবাত্মার নিকট সমগ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে অনুযাত্র সার্থকই নয়—নিতান্তই প্রয়োজনীয়। মানুষ বুদ্ধির স্তর হইতে প্রত্যেকটিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখে এবং তাহাতে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয় যাহা আপাতদৃষ্টিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইলেও স্বাভাবিক ভাবেই সমগ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে একদেশদর্শী ও অসম্পূর্ণ। ইহারই এক প্রান্তে অধ্যাত্ম বোধহীন কর্ম, অপর প্রান্তে কর্মহীন অধ্যাত্ম। ঈশোপনিষদে তিনি সামঞ্জস্যের মূল-সূত্রের সন্ধান পাইয়াছেন,

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে

রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে

[পূর্বানুবৃত্তি]

।। শ্রীধীরেন চৌধুরী ।।

বিদেশী ভাষা ইংরাজিকে যে আমাদের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নহে সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করিয়াছি পূর্ব্ব অধ্যায়ে নানা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সহযোগে। এখন বিবেচ্য বিষয়, আমাদের রাষ্ট্রভাষা হইবে একটি, না একাধিক এবং তাহাই বা কি।

এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কয়েকটি বিষয় স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। স্বাধীনতা লাভের বহু পূর্ব্বেই নেতৃবৃন্দ বিশদভাবে আলোচনা করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির করিয়াছিলেন যে হিন্দুস্থানীই হইবে স্বাধীন ভারতে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তাই দেখিতে পাই সুভাষচন্দ্রের আজাদহিন্দ ফৌজের ভাষাও হিন্দুস্থানী হইতে আরম্ভ করিয়া আজাদনামা পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছিল হিন্দীভাষায়।

তারপর স্বাধীনতা লাভের পরে ১৯৪৯ সনের ১৩ই এপ্রিল তারিখে হিন্দীকে স্থায়ী রাষ্ট্রভাষা এবং ইংরাজিকে সহকারী রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা হয় সংবিধানে তাহাও সর্ব্বসম্মতিক্রমে। কিন্তু তখন ইহাও নির্দ্ধারিত হয় যে ১৯৬৫ সনের পরে ইংরাজি আর রাষ্ট্রভাষা থাকিবে না, একমাত্র হিন্দীভাষাই হইবে রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার যখন সংবিধানের ঐ নির্দ্দেশ যথাসময়ে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উদ্যত হইলেন তখনই দাক্ষিণাত্যে আরম্ভ হইল চরম বর্ব্বরতা ইংরাজিকে রাষ্ট্রভাষার আসনে বহাল রাখিবার জন্য হিন্দীবিরোধী আন্দোলনের নামে এবং ঐ আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া পৌঁছিল পশ্চিম বাংলায়। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে মাদ্রাজ ও পশ্চিম বাংলা ভিন্ন ভারতের অন্য কোন প্রদেশেই এই সংবিধানবিরোধী আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয় নাই। ইহার কারণ এই যে মাদ্রাজ ও বাংলাই সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজ ও ইংরাজিনবীশের হাতে মার খাইয়া কবিয়া বের এবং ইংরাজের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়া ও ইংরাজি ভাষার দৌলতে ঐ প্রদেশদ্বয় ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা ও প্রভুত্ব অর্জ্জন করে। সুতরাং পরাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা ইংরাজির প্রাধান্য বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি হারাইবার ভয়ে ঐ প্রদেশদ্বয় যে বিচলিত হইয়া উঠিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

সে যাহাই হউক, হিন্দীবিরোধী হিংস্র আন্দোলনে ভীত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার থমকিয়া দাঁড়ান এবং মাদ্রাজ ও পশ্চিমবাংলাকে বাদ রাখিবার জন্য গোঁজামিল দিয়া এই সমস্যার সমাধানে ব্রতী হন। এখন প্রকৃতপক্ষে যুগে যুগে দেশদ্রোহী মুসলমান নেতাদের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে তুষ্ট রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা আছে। সে যাহাই হউক, কেহ বলিলেন ১৪টি হইবে রাষ্ট্রভাষা, কেহ বলিলেন পাঁচটি, আবার ঐ সংখ্যা এখন আসিয়া ঠেকিয়াছে তিনটিতে যাহারা একাধিক রাষ্ট্রভাষার কথা বলেন তাঁহারা দৃষ্টান্ত দেখান সুইজারল্যাণ্ড ও পাকিস্তানের; কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে ভারতের তুলনায় ঐ দেশদ্বয় আকারে অতি ক্ষুদ্র এবং তথাকার লোক সংখ্যাও অতি কম; অধিকন্তু সুইজারল্যাণ্ডের সকল অধিবাসীই ধর্ম্মে এক খৃষ্টান এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সকলেই ধর্ম্মে মুসলমান। সুতরাং ধর্ম্মের ভিত্তিতেই একতা ও জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠিয়াছে ঐ সব দেশে; অধিকন্তু আয়তন ক্ষুদ্র ও লোক সংখ্যাও কমবিধায় একাধিক রাষ্ট্রভাষা থাকা সত্ত্বেও ওখানে সরকারী কাজ পরিচালনে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতবর্ষ আকারে অতি বৃহৎ এবং এখানকার লোকসংখ্যাও অগণিত।

তা ছাড়া এখানে আছে বহু প্রদেশ, বহু জাতি, বহু ভাষা ও সর্বোপরি বহুধর্ম। সুতরাং এখানে একাধিক রাষ্ট্রভাষা হইলে একদিকে যেমন হইবে সরকারী কাজ পরিচালনা অত্যন্ত জটিল, যাহা ও সময় সাপেক্ষ, তেমনই অপরদিকে একজাতীয়তা-বোধ ও ঐক্য গড়িয়া উঠা হইবে অসম্ভব। কারণ রাষ্ট্রভাষাই হইবে জাতিকে একসূত্রে যোগসূত্র। এই সমস্যা সমাধানে বিদেশে আমরা যে অনুসরণ করিতে পারি রাশিয়াকে। আমাদের দেশের মতই ঐ দেশটিও অতি বৃহৎ, এবং এখানে আছে বহু প্রদেশ বহু জাতি এবং বহু ভাষা। রাশিয়াতে প্রত্যেকটি প্রদেশ সমমর্যাদায় মণ্ডিত বটে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারী কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য এবং বিভিন্ন জাতি ও ভাষাভাষীর মধ্যে একজাতীয়তাবোধ ও ঐক্যের ভাব গড়িয়া তুলিবার জন্য একমাত্র রুশভাষাকেই দেওয়া হইয়াছে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। ঐ রুশ ভাষার মাধ্যমেই চলে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সকল প্রকার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। অতএব যুক্তি ও দেশের প্রকৃত কল্যাণের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে আমাদের দেশেও একটি মাত্র জাতীয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য। এখন ঐ ভাষাটি হইবে কোন্‌টি?

হিন্দীই আমাদের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিৎ তবে অহিন্দীভাষী ছাত্রছাত্রীদিগের সঙ্গে প্রমের সমতা রক্ষা করিবার জন্য হিন্দী ভাষী ছাত্রছাত্রীদিগকে অন্য যে কোন একটি প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে এই ব্যবস্থা করা অযৌক্তিক নহে। বিশেষতঃ যে সব হিন্দী-ভাষী ছাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কোন প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে চাহে তাহাদিগের পক্ষে ঐ ব্যবস্থা অবশ্যই রাখিতে হইবে, এমন কি তাহারা অন্য প্রাদেশিক ভাষার বুৎপত্তি লাভ করিয়াছে কিনা তাহাও যাচাই করিয়া দেখিবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। রাষ্ট্রভাষা যাহাই হউক, প্রত্যেকটি প্রাদেশিক ভাষাকেই দিতে হইবে সমমর্যাদা এবং ঐ ভাষাতেই চলিবে প্রাদেশিক সরকারী কাজকর্ম এমন কি উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত। রাষ্ট্রভাষায় চলিবে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ এবং আন্তঃপ্রাদেশিকভাবে বিনিময়; তবে রাষ্ট্রভাষা ইচ্ছা হইলে ঐ ভাষাতেও চলিতে পারে সকল প্রদেশের উচ্চশিক্ষা। পূর্বেও বলিয়াছি এখন আবারও বলি রাষ্ট্রভাষাকে যে একটি উন্নত ভাষা হইতেই হইবে এমন কোন নজির নাই। হইলে ভাল, না হইলেও ক্ষতি নাই তবে ঐ ভাষাকে যে অবশ্যই হইতে হইবে সর্বাধিক সংখ্যক জনগণের কথ্য ভাষা তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা স্মরণ রাখিয়াই তবে অগ্রসর হইতে হইবে রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনে। কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন সংস্কৃত ভাষার কথা, কিন্তু দেখা যায় ঐ ভাষা যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল তখনও জনসাধারণের ভাষা ছিল পালি, সংস্কৃত নহে সুতরাং সংস্কৃতকে জনসাধারণের ভাষায় পরিণত করিয়া তাহাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় মণ্ডিত করা আর সম্ভব নহে। তাছাড়া পালি-ভাষার কথা বলে এমন একটি লোকও বর্তমানে ভারতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। কথা উঠিতে পারে হিব্রুভাষার কথা। হিব্রুভাষা একটা বিকৃত রূপ নিয়া চিরকালই প্রচলিত ছিল জনসাধারণের মধ্যে; সুতরাং মাত্র কয়েক লক্ষ লোকের বাসভূমি ইস্রায়েলে তাহার পুনরুদ্ধার ও প্রচলন সম্ভব হইয়াছে। অতএব সকল দিক বিবেচনা করিয়া যদি দেখি তবে বলিতে হয় যে, মহাত্মা গান্ধী বর্ণিত একমাত্র হিন্দুস্থানী ভাষাকেই গ্রহণ করা উচিত রাষ্ট্রভাষারূপে এবং ঐ ভাষা লিখিত হইবে দেবনাগরী অক্ষরে; কারণ ভারতীয় সভ্যতা ঐ অক্ষরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেহ কেহ বলিয়াছেন রোমান অক্ষরের কথা, কারণ এই ক্ষেত্রে মাত্র ২৬টি অক্ষর লিখিলেই চলে। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে ভারতীয় আত্মার সঙ্গে ঐ রোমান অক্ষরের কোন যোগ নাই অধিকন্তু রোমান অক্ষরে লেখা হিন্দীর উচ্চারণ কখনই নিভুল হইতে পারে না।

হিন্দুস্থানী ভাষার মূল সংস্কৃতে প্রোথিত এবং তাহার শাখায় হিন্দী ও উর্দু। ঐ ভাষার ব্যাকরণ একটু পরিবর্তিত করিয়া নিলে এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষা ও

প্রয়োজনবোধে বৈদেশিক ভাষা হইতে উপযুক্ত শব্দ সংযোজনা করিয়া এই ভাষাকেই অধিকতর উন্নত করা বা সর্বভারতীয় রূপ দেওয়া মোটেই অসম্ভব নহে। বর্তমানেই আমাদের দেশে হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা শতকরা চল্লিশ জন এবং উর্দু ভাষার কথা বলিতে পারেন এমন লোকের সংখ্যাও প্রায় ৮ কোটী। তাহা ব্যতীত এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের প্রায় প্রত্যেকেই হিন্দীভাষার কথা বলিতে পারেন। অহিন্দীভাষী অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক আছেন যাহারা (অন্তত পক্ষেও) মোটামুটিভাবে হিন্দীভাষার ভাব বিনিময় করিতে পারেন। যে সব বিদেশী কিছুকাল অবস্থান করিবার জন্য এই দেশে আসেন তাঁহারাও প্রথমেই শিক্ষা করেন হিন্দীভাষা, কারণ তাঁহারা জানেন যে একমাত্র এই ভাষার মাধ্যমেই ভারতের সর্বত্র ভাববিনিময় করা সম্ভব। এমন কি ইহাও দেখা গিয়াছে যে হিন্দীভাষা জানা থাকিলে প্রাচ্য মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার অনেক দেশেই ভ্রমণ করিতে তেমন অসুবিধা হয় না কারণ ঐ সব দেশেও হিন্দী জানে এমন লোকের সাক্ষাৎ প্রায়ই মিলে। সুতরাং ভারতীয় ভাষার মধ্যে হিন্দীভাষার প্রচলনই যে সর্বাধিক তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং তার পরেই প্রচলন উর্দু ভাষার। হিন্দীভাষার বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি (?) দেখান হয় তাহা মোটামুটি এই—(১) হিন্দী উন্নত ভাষা নহে, (২) দেশে শতকরা মাত্র ৪০ জন লোক হিন্দী ভাষাভাষী, (৩) ঐ ভাষায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গৃহীত হইলে অহিন্দী ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীরা প্রতিযোগিতায় হিন্দী ভাষী ছাত্রদিগের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে না। এবং সর্বোপরি আপত্তি এই যে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গৃহীত হইলে মাত্র হিন্দীভাষীদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে অর্থাৎ হিন্দীবিদ্বেষী বাঙালীদিগের ভাষায় "হিন্দীরাজ" প্রতিষ্ঠিত হইবে।

রাষ্ট্র ভাষাকে যে একটি উন্নত ভাষা হইতেই হইবে তেমন কোন নিগড়ন জগতের কুত্রাপি নাই। তবে বাঙালী ও অন্যদেশীয়গণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য হিন্দীভাষাকে যত তুচ্ছ বলিয়া প্রচার করেন বাস্তবপক্ষে হিন্দীভাষা তত অনুন্নত নহে। যদি তাহাই না হইবে তবে বর্গত অন্যান্য অনুবাদকের মধ্যে কেহ কেহ এতজন হিন্দী করিতে এই বৎসর নোবেল পুরস্কার দিবার জন্য সুপারিশ করিতে অগ্রসর হইতেন না। তারপর মুষ্টিমেয় ইংরাজি শিক্ষিত লোক যদি রাষ্ট্রী করিতে পারে ইংরাজিকে রাষ্ট্রভাষারূপে বহাল রাখিবার জন্য তবে যে তাহার অন্যূন শতকরা ৪০ জন লোক কথা বলে, সেই ভাষার দাবী কি অধিকতর যুক্তিযুক্ত নহে? মাদ্রাজী বাঙালী ছেলেমেয়েরা যদি ইংলণ্ডে যাইয়া ইংরাজিকায়দার মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় ইংরাজ ছাত্রছাত্রীকে পরাস্ত করিতে পারে তবে উপযুক্ত হইলে তাহারা হিন্দীভাষী ছাত্রদিগের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করিতে পারিবে না কেন? এই ভাবনার মূলে কোন যুক্তি নাই, আছে মানসিক হীনতা মাত্র আমার হিন্দী রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হইলে 'হিন্দীরাজ' প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া যাহারা প্রচার করেন তাহারাও একটা ভ্রান্তধারণাই সৃষ্টি করিতেছেন মাত্র হিন্দীভাষীরা যদি বিশেষ কোন সুবিধা ভোগ করে তবে তাহা করিবে তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে, ভাষার জন্য নহে। এই অবাস্তব এবং সর্বনাশকর ভাবধারার বশবর্তী হইয়া যদি আমরা চলি তবে তো দেখিতেছি কোন ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গ্রহণ করা চলিবে না কারণ যাহাদের ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হইবে না তাহারাই তো ঐ ধ্বনি তুলিবে যাহার ফলে বিদেশ বাড়িয়াই চলিবে এবং গণতন্ত্রও হইবে অচল। অতএব দেখা যাইতেছে হিন্দীর বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি দেখান হয় তাহার কোনটাই যুক্তিসঙ্গত নহে।

এখন এই হিন্দুস্থানী ভাষা যদি সকল প্রদেশে অবশ্যপাঠ্যরূপে বাল্যকাল হইতেই আন্তরিকতার সহিত পড়ান হয় এবং বিশেষ যাহাদের বয়সদিগকেও ঐ ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় তবে ১০।১৫ বৎসর পরেই দেখা

যাইবে দেশের বাহিরে ভবিষ্যৎ তাঁহারা তো বটেই এমন কি বয়স্কদিগের মধ্যেও অনেকেই এই ভাষায় বেশ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। তখন আর এই ভাষাকে প্রদেশ বিশেষের ভাষা বলিয়া মনে হইবে না, বরং ঐ ভাষার মাধ্যমেই আসিয়া উঠিবে একটা সর্বভারতীয় ধারণা সকলের মনে এবং ক্রমে ক্রমে ঐ ভাবেই রূপায়িত হইয়া উঠিবে "এক জাতি এক প্রাণ" এই বোধে।

অমিল্য

উজ্জ্বল ভারত

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

সে এক ভারতবর্ষ আমার অন্তর ভরে আছে,
ঐশ্বর্যময় তার রূপ আমি দেখি মাঝে মাঝে ;
বিলাস ব্যসনাসক্ত রূপ নয়, সে ঐশ্বর্য তার
অন্তরে, সে আলোকের দীপ্তিতে ভাস্বর চারিদিক।

আমার ভারতবর্ষ সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আগার ;
সেখানে নেইকো কোন হিংসা দ্বেষ, রাজ্যলোলুপতা ;
প্রেম সবার উপরে, নেই তাই কোন বৈরীভাব,
মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত সবাই এখানে।

আমার ভারতবর্ষ উজ্জ্বল আনন্দে উদ্ভাসিত,
মিলনের মহামন্ত্রে দীক্ষিত সে ; সেই মন্ত্র নিয়ে
সে চলে সবার মন জয় করে প্রীতির প্রসাদে,
যে আসে আতিথ্য পেয়ে মুগ্ধ হয় দাক্ষিণ্যে তাহার।

প্রজ্ঞার আলোকে দীপ্ত আমার সে মহিমমণ্ডিতা
ভারতজননী আজো, স্বপ্ন মাঝে দেখি তাঁর রূপ ;
সেই রূপ খুঁজে ফিরি বাহিরে, কোথাও পাইনাকো,
মনের গহনে আমি ধ্যানে করি সেই জননীরে।

আমার ভারতবর্ষ রূপ নেবে, উজ্জ্বল ভারত
দেখা দেবে একদিন, বিশ্বে হবে পুনঃ বরণীয়,
প্রজ্ঞায় আলোক হবে সেবে তার উদ্ভাসিত অঞ্চলি
সর্বজন, দীক্ষা নেবে সেই মন্ত্র ভারতের কাছে ;

মিলনের মহামন্ত্র এ ভারতবর্ষে একদিন
উঠেছিল, উঠবে উদাত্ত কণ্ঠে এখানে আবার ;
সেদিন আসবে কবে, জানি না তো, তবু আসবে সে,
আমার অন্তর মাঝে এ প্রত্যয় আজো অনির্বাণ।

ঔপন্যাসিক ফকনার

॥ শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ॥

সমকালীন আমেরিকান সাহিত্যে ঔপন্যাসিক হিসেবে উইলিয়াম ফকনারের স্থান অনন্য। হেমিংওয়ে মূলতঃ ছোট গল্পের স্রষ্টা। অন্যান্য লেখকদের মতে জন স্টাইনবেক ও ডস্ পাসোজ (Dos Passos, Steinbeck ও Dos Passos) নূইস্ স্ব স্ব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম। তবুও ফকনারের উপন্যাস আজ ক্লাসিক পর্যায়ে উন্নীত। তাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী।

১৯৪৬ সনে ফকনারের সাহিত্য প্রতিভা প্রথম সমালোচকের স্বীকৃতি পায়। Robert Penn Warren সেই সমালোচক। ফকনার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি লিখলেন : William Faulkner has written books which for range of effect, philosophical weight, originality of style, variety of characterisation humour and tragic intensity are without equal in our time and country.

ফকনারের রচনাশৈলীর প্রশস্তি গাওয়া যে কোন সমালোচকের পক্ষেই শক্তসাধ্য ব্যাপার। কারণ তাঁর উপন্যাসগুলির কাহিনীকথনে প্রবাহমানতার অভাব। তিনি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ এবং সময় সময় দুর্বোধ্য। গল্পরচনার কাঠামো প্রায়শঃ দুর্বল। তাঁর দার্শনিকতাও সর্বত্র সুস্পষ্ট রূপ নিতে পারে নি। তা সত্ত্বেও ফকনার অনন্য। কারণ তাঁর মানবিকতাবোধ। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, অবনতের জন্য সহানুভূতি ও আধুনিকতার তাঁর বিতৃষ্ণা তাঁর রচনাকে এক নতুন মূল্য দিয়েছে। তাছাড়া কথাসাহিত্যে রচনার রীতিতে এক স্বতন্ত্রপথ এনেছেন তিনি। কনরাড আইকেন-এর ভাষায়— What sets him above all his American contemporaries, is his continuous preoccupation with the novel as a form.

অনেকে শুনে কৌতুক বোধ করবেন যে ফকনার কবিতা লিখে তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু করেছিলেন। ১৯২৪ সালে তাঁর একটি কবিতা সংকলন The marble Faun ছাপা হয় এক বন্ধুর অর্থসাহায্যে। যদিবাহুল্য তাঁর কাব্য সাধারণে গ্রহণ করেনি। কিছুটা বিফল ফকনার ব্যবসার দিকে ঝুঁকেছেন। যেতে চেয়েছেন অন্য কোন উপনিবেশে নিউঅর্লিন্সে এই সময়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কিছু কিছু লিখছিলেন। জীবনে প্রতিষ্ঠা যার অনিবার্য সে পথ ভুল করে না। ফকনারও করেননি। কিন্তু তাঁর বিধাগ্রস্ত মনে দৃঢ়তা এনে দিয়েছিলেন যিনি, তিনি নিজেও একজন সাহিত্যিক শেরউড্ এ্যাণ্ডারসনই যোগাযোগ করে ফকনারের প্রথম উপন্যাস ছাপার ব্যবস্থা করেন। ১৯২৬ সালে ছাপা হল Soldier's pay। সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়লো পাঠকরা। সমালোচকরা একবার চোখ তুলে চাইলেন। তখনও কেউ ভাবতে পারছিল না যে ফকনার আমেরিকার দিগন্তে এক বৃহৎ আবির্ভাব।

ফকনার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি পেলেন ১৯২৯ সালে। সার্টোরিস (Sartoris) এক ক্ষয়িষ্ণু বনেদী পরিবারের কাহিনী। ঐ কাহিনী তাঁর নিজের জীবনেরও। ১৮৯৭ সালে মিসিসিপির নিউআলবেনিতে ফকনারের জন্ম। প্রপিতামহ W.C. Falkner উত্তর মিসিসিপির এক বিখ্যাত পুরুষ ছিলেন। অত্যন্ত দরিদ্র জীবন থেকে এই বৃদ্ধ ফকনার ক্ষমতার শিখরে আরোহণ করেন। তাঁকে বারবার তাঁর উপন্যাসে ও গল্পে প্রতিফলিত করেছেন উইলিয়ম ফকনার। পিতামহ J. W. T. Falkner

ছিলেন আইনজ্ঞ ও ব্যাঙ্কার। স্কুল থেকে বেরিয়ে ফকনার পিতামহের ব্যাঙ্কে চাকরি শুরু করেন। এই সময়ে তিনি পড়াশোনা করবার সুযোগ পান। অবসর পেলে ছবিও আঁকতেন। মধ্যে আমেরিকোর সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল হন নি।

The Sound and the Fury গ্রন্থকে ফকনারের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে অভিহিত করা হয়। ১৯২৯ সালে এই গ্রন্থ লিখে ফকনার তাঁর খ্যাতিকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করেছেন একটি ক্ষয়িষ্ণু বনেদী পরিবারের করুণ কাহিনীকে তিনি উন্মোচন করে দেখেছেন এই উপন্যাসে। কিছুটা দুর্বোধ্য অভিযোগ হলেও এই উপন্যাসের আবেদন সম্পূর্ণ অভিনব। যে পরিবারে বাপ মাতাল, মা অসুস্থ, অথচ ভাই ও বোনের মধ্যে নিবিড় ভালোবাসা। প্রত্যুষপার ক্রুর অথচ মহত্বে গভীর এই কাহিনী পাঠকের হৃদয়কে বেদনায় অভিভূত করে। এই বইয়ের আলোচনা করতে গিয়েই ডাঃ পল মান্জে লিখলেন—Most of his contemporary writers —Proust, Joyce, Doss Pessos, Gide and Wolf—have tried each in his own way, to mutilate time।

ফকনারের নায়কের কাছে বর্তমান এক দুঃসহ যন্ত্রণার বোঝা। ভবিষ্যতে তার বিশ্বাস নেই। এমনকি ভবিষ্যৎ শব্দটিও ফকনারের কাছে মূল্যহীন। সময়ের সঙ্গে লড়াই করে' মানুষ বেঁচে থাকে কিন্তু সময় তার জীবনকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে দেয়।

The Sound and the Fury-র পর তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস—'As I lay dying' ও 'The Wild Palms'। ১৯৩১ লেখা Sanctuary বইখানি প্রচুর বিক্রী হলেও খুব রুচিসম্মত নয়। ফকনার নিজেই স্বীকার করেছেন যে Sanctuary টাকার জন্যে লেখা। এই বইটি খুব যৌন আবেদনে ভরা। কিন্তু তাঁর Light in August (1932), Absalom Absalom (1936) ও Requiem for a Nun (1951) রসবোধের সূক্ষ্মতা ও রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। ১৯৪০ সালে উইলিয়ম ফকনারকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, ১৯৪৭ তে Pulitzer প্রাইজ। ১৯৫৭ সালেই তিনি আমেরিকা ইউনিভার্সিটিতে এক বিশেষ অধিবেশনে সম্মানিত হন।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর একটি বিবৃতিতে ফকনার বলেছিলেন—The function of literature is to uplift men's hearts। এই অনুভব সব সময়ে তাঁর মধ্যে কার্যকরী ছিল। তাঁর আর একটি বিখ্যাত উপন্যাস A Fable প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় একটি নীতিমূলক আখ্যান। এই উপন্যাসে যেন নৈতিক চেতনার ও বিশুদ্ধ মূল্যবোধের পুনরুত্থান ঘটেছে। এই উপন্যাসে যুদ্ধকালীন ইউরোপের বর্ণনা রোমাঞ্চকর। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে ফকনারের লেখায় ঘটনার বিবৃতি অত্যন্ত দীর্ঘ হ'লেও চিত্তাকর্ষক।

আর একটি কথা—হেমিংওয়ের মত ফকনারের মনেও আদিম ও অরণ্যের প্রতি একটি সহজাত আকর্ষণ ছিল। সভ্যতার অতি আধুনিক বিবর্তনকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। বরং তথাকথিত নাগরিক কৃত্রিমতার প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল। তাঁর বর্ণনাভঙ্গি মাঝে মাঝে অস্পষ্টতার সৃষ্টি করলেও সাবলীলতা তাঁর বড় অলংকার। তাঁর ভাষার গুরুগম্ভীর গাম্ভীর্য এবং অনুভব কৃত্রিমতাহীন। আমেরিকার দক্ষিণাংশের মানুষের জীবনের ইতিহাসকে তিনি নিবিড়ভাবে অনুভব করেছেন। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই এই আঞ্চলিক ঘটনা গুলিকে কেন্দ্র করে লেখা। অবহেলিত ইণ্ডিয়ান ও নিগ্রো সম্প্রদায়ের নির্যাতন ও নিপীড়নের কাহিনীকে তিনি সাহিত্যে প্রতিফলিত করেছেন। সেই সব মানুষ যারা দিনের পর দিন নীরবে অত্যাচার ও অবহেলাকে সহ্য করে চলেছে তাদের মধ্যে তিনি দেখেছেন প্রেম আত্মোৎসর্জন ও পরম সহিষ্ণুতার দীপ্তি। Hicks-এর ভাষায় The world of William Faulkner echoes with the hideous trampling march of lust and disease, brutality and death। অথচ "That is the central fact in Faulkner's work, the recognition of the common human bond, a profound respect for the human."

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৪—

(৬০)

ঠাকুর, আমার পায়ের নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত তোমার চরণে বিকানো। আমি সর্বতোভাবে তোমারই। কতদিন হইয়াছে লুকাইয়াছ, আড়ালে গিয়াছ। তোমার যাওয়ার পর কেহ তো আর তেমন করিয়া ডাকে না। দেখা দেও, আদর করিয়া ডাক। আমি যে তোমার আদরের ধন মোহাগের ধন ছিলাম। শত অনাদরে আজ আছি। কোথায় তুমি? তোমার চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার আদরের ডাক উঠিয়া গিয়াছে। আমি কেমন করিয়া এই নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিব? ঠাকুর, আবার দেখা দেও। সকালে জয়ার ওখান হইতে চাউলের গুড়ি পাঠাইয়া দেয়। বৈকালে তাহা দিয়া পিঠা তৈয়ারী হয়। নীচে নিজদের খাওয়ানো হয়, উপরে বেশ কিছু পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বেলু ১২টার পর বাহির হইয়া ফেরে আমার মঠে যাইবার পর, ৫টার পর। বিজ্ঞাপনের চেষ্টায় বাহির হয়। মঠে তারিণীবাবু, ক্ষিতীশ, রমাপতি, নীলরতন, সুধাংশু, রেণুপদ প্রভৃতির সামনে ঠাকুরের দর্শন ও জীবন আলোচনা করি। ঠাকুর যে একটী নূতন সৃষ্টি বিশ্বের বুকে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, যাহা আজি হউক কালি হউক বিশ্ব-মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং ঐ দর্শন যে প্রচলিত সকল দর্শনের সারের কথা বলিয়া গিয়াছে, তাহাই খুব জোর দিয়া বলি। সকালে সুশীলা মঠে চলিয়া যায়। বৈকালে মঠে একটু বিচুরী প্রসাদ পাই। তারিণীবাবু ট্রামে তুলিয়া দেয়। সত্যব্রত বৈকালে আসিয়াছিল। আমার আধার কাল মিলিয়া গিয়াছে, আমি আসিয়াই নকুলেশ্বরবাবু ও বীরেন ব্যানার্জীকে পাই। তাহাদের কাছেও প্রায় ২৪টী ঠাকুরের দর্শন ও বর্তমান যুগের সমস্যার আলোচনা করি। ওখে ফাল্গুনীর প্রীতি সম্মেলনের নিমন্ত্রণ কার্ড দেই। মঠ হইতে আসিবার পথে শিবালয়ের রাধানাথ সেন পুত্র অমূল্যর সঙ্গে দেখা। সে সঙ্গে সঙ্গে আসে। নিত্য আজ পিঠার যোগাড় করিয়াছিল। আমি নেই বলিয়া সে দুঃখ পাইয়াছে। তাহার শরীর এত খারাপ, তাহার এ সব কিছুই করা উচিত নয়। গোপার জন্য বই কিনিয়া আনা হয়। আজ তাহার রামায়ণ পড়া একবার শেষ।

১৩ই জানুয়ারী

ঠাকুর, তুমি আমার সারা জীবন মথন করিয়া প্রকাশিত হও।...আমার ধন জন সুখ সম্পদ সম্বল পরম অর্থ তুমি। তোমার অর্থে আমি অর্থবান তুমিই আমায় সার্থক কর, সফল কর। আমি তোমার হাতেই সার্থক। তুমিই তো সেদিন গৌরাঙ্গের দুগাল লোটাইয়া ধূলির মহিমা ও মাধুর্য আস্বাদন করিলে, ধরার মাটি মুখে করিলে, ধরার স্বাধীন ভর্তৃকা রূপ ফুটাইয়া তুলিলে। তোমার জয় হউক ...বেলু ৯টার পর বাহির হইয়া গেলে ওখান হইতে ব্লক লইয়া প্রেসে যায়। আবার ফিরিয়া ডাকেশ্বরী হইতে কাগজ কিনিয়া নীলিমা বোসের গাড়ীতে উহা দিয়া সেফ ডিপোজিট, এম বি সরকার, এস্ সরকার প্রভৃতি ঘুরিয়া আসে।... মিনিট আধে।...-র সম্বন্ধে আলোচনা হয়।...সে তাহার standard বাড়াইয়া দিয়াছে। কোনও আদর্শ আজ আর তাহার সামনে নাই। পড়াশুনা করিয়া দাঁড়াইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল, আজ আর তাহা নাই।...কিছুতেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়।

১৫ই জানুয়ারী

ঠাকুর, আমি দীন হীন, আর তুমি দীননাথ। আমার

যন জন সহায় সম্বল কিছু নাই তুমিই আমার সব। ভিখারীর সম্বল তুমি। তোমাকে সব হারাইয়া পাইয়াছি। তোমার মুখের দিকে চাহিয়াই চলিয়াছি। সবাই আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, তুমি আমার আছ। ইহাই আমার সান্ত্বনা। আমার জীবন-বল্লভ, আমার জীবন তুমি কাণায় কাণায় ভরিয়া রাখ। আমি তোমারই মূর্তিমতী ইচ্ছা রূপে বাঁচিয়া থাকিতে চাই, তোমারই মূর্তিমতী সেবারূপে আমি সার্থক হইতে চাই আমার সব বেচাল, সব হিসাব তোমাতে মহানির্বাণ লাভ করুক।...শতবার্ষিকীর তেমন কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কাহারও সঙ্গে দেখা করা হইল না প্রেসেও তেমন কিছু বাকির হইল না। বীরানন্দ তেমন কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না টাকা জোগাড়ের অবস্থাও ভাল নয়।...বিশ্বভারতী বার্ষিক উদ্বোধনে কিছু বিজ্ঞাপন দিবে না...অথচ উদ্বোধনই বর্তমান যুগের দর্শনের ছাঁচে ঢালিয়া রবীন্দ্রনাথকে পরিবেশন করিতেছে। নইলে রবীন্দ্রনাথ লাইব্রেরীর অন্ধকারীতে ও যখন বৈশাখের বাহাড়ম্বরপূর্ণ হৈ চৈ-এর মধ্যেই থাকিয়া যাইতেন। কলিকাতা ৩০ ডিগ্রি গরম।

১৬ই জানুয়ারী

রাধারাণী আমার, পরাণপুতলী আমার, সারা জীবনের সাধনা তুমি, পথ-চলার সম্বল তুমি, আমার আশা-উৎসাহ তুমি, তুমিই আমার শক্তি সামর্থ্য।...বিশ্বকে তোমার জীবন ও আদর্শের ছাঁচে গড়িয়া তুলিব। বিশ্বের হৃদয়ে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার মন্ত্র বল দেও।...মঠে আজ শতবার্ষিকীর এক্সিকিউটিভ কমিটীর সভা।...শিশির আসে সকালে।...

১৭ই জানুয়ারী

রাধারাণী আমার, বিশ্ব সংস্কৃতির ঘন বিগ্রহ তুমি। তোমাকে বুকে লইয়াই বিশ্ব আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। তুমিই organic nature, যান্ত্রিক প্রকৃতির ক্রম বিবর্তিত রূপই তুমি। সেই তুমি আমার জীবনে অযাচিত করুণায় আসিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছ। আমি ভবিষ্যৎ বিশ্বের দিব্য ছবি তোমার মাঝে দেখিয়াছি। তুমি বিশ্ব-মথন ধন। আমি কৃতার্থ তোমাকে পাইয়া। এখন কোন্ উপায়ে তোমাকে বিশ্ব সংস্কৃতির বুকে জমাইয়া তুলিতে পারি, তাহাই আমার একমাত্র ধ্যানের বিষয়। না পাওয়ার ব্যথা আমার নাই। পাওয়ার মত করিয়া পাইলাম না, পাওয়াকে সার্থক করিতে পারিলাম না ইহাই বেদনা।...রেণু সকালে লেক মার্কেট ১০টায় হরদয়ালবাবু, প্রিয়রঞ্জনবাবু, প্রিয়দারঞ্জনবাবু, অতুল সেনের বাড়ী যায়, কার্ড দিয়া আসে। দুপুরে আর বাহির হয় না। ৩টার পর রেণুকে আনে মিঠু ও রেণু কিছু জল চাউল। ৪টায় মঠে যাই। পরশুদিন মঠের এক্সিকিউটিভ কমিটীতে স্থির হইয়াছে যে টাকা নাই বলিয়া 'ভক্তিযোগ দর্শন' ছাপা হইবে না। শত বার্ষিকীতে ঠাকুরের 'ভক্তিযোগ দর্শন' ছাপা থাকিবে না, মানুষ চাহিয়া পাইবে না—ইহা হইতেই পারে না। টাকা নাই অতএব মেয়ের বিবাহ হইবে না, ইহা যেমন হয় না, তেমনি ইহাও হইতে পারে না। ছাপাইতেই হইবে, যেমন করিয়া পারি টাকা সংগ্রহ করা। এতদিন বই বিক্রীর যে টাকা এস্টেট খরচ করিয়াছে, তাহা কেন দিবে না? আমি ১০০ টাকা ধার দিবার কথা বলি। ছাপাইতেই হইবে। ৭টায় পর আসি।...তারিণীবাবু গৌরাঙ্গদাস সহ আসে। গৌরাঙ্গ তখনই চলিয়া যায়। ভক্তিযোগ ছাপানোর কথা হয়। তিনিও ১০০টাকা ধার দিতে প্রস্তুত হন। চেকে দস্তখত করিয়া টাকা তুলিবার সুযোগ না পাইয়া — মর্মাহত হইয়াছে। কী দুঃখী ইহারা!...

১৮ই জানুয়ারী

ঠাকুর, তোমার জীবন ও দর্শন লইয়া কেউ নাই, যে যার নিজের ধান্ধায় আছে। আমায় তোমার করিয়া লও। তোমার জীবনের ছাঁচে গড়িয়া তোল। সুকাইয়া আসিয়াছিলে, সুকাইয়া চলিয়া গেলে। কেউ তোমাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তুমি যে বুদ্ধির অগম্য, তুমি প্রাণের ঠাকুর। প্রাণের মাঝেই তুমি ধরা দেও। প্রাণ লইয়াই তোমার কারবার। আমাকে সর্বস্বরি প্রাণ দেও। মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীরাধাই আজ সর্বভাব সমন্বয় মূরতি শ্রীনিতাগোপালরূপে আসিয়াছ। তুমি

আমার প্রাণের ঠাকুর। আমাকে তোমার সহচর বা সহচরী হইবার যোগ্য করিয়ো লও।...সন্ধ্যার পর ভক্তি-যোগ দর্শন ছাপানো সম্বন্ধে বলেন্দ্রবাবু, পবেনবাবু, নীলরতনবাবুদের সঙ্গে আলোচনা হয়। স্থির হয় মঠ হইতেই ৫০০ টাকা দেওয়া হইবে। যে কাজ করিতেই হইবে, তাহা আরম্ভ করা দরকার, টাকা সংগ্রহ পরে হইবে—ইহাই আমার জীবনের নীতি। টাকার জন্য অবশ্য কর্মীর কর্ম ফেলিয়া রাখিতে নাই—টাকা আসে দেখিয়াছি। শতসাহিকীতে ভক্তিযোগদর্শন ছাপা হইবে না ইহা হয় না, হইতে পারে না। ছাপাইতেই হইবে জোর দিয়া বলায় স্বীকৃত হয়।...মঠকে একটি দার্শনিক কাঠামোর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে কেহ আর উচ্ছৃঙ্খল হইবার সাহস পাইবে না। হত সঙ্ঘবদ্ধতা বাড়িবে, ততই মঠ গোলমাল থামিয়া যাইবে। ওখানের আবহাওয়া অনেকটা শুদ্ধ হইয়াছে মনে হয়। একটা বাঁধ পড়িয়াছে।...

১৯শে জানুয়ারী

ঠাকুর, তুমি বিবাদ-ভঞ্জন, তাই বিপদভঞ্জন। আজ বিশ্ব মতবাদ লইয়া বিবাদে মগ্ন, বিপন্ন—জড়বাদ ও অজড়বাদ নিজ নিজ দাবী লইয়া পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত। তুমি ইহাদের সমন্বয় করিয়া বিশ্বের সামনে এক নূতন জীবনাদর্শ স্থাপন করিয়া দেও। তুমি জাগো বিশ্বজীবনে। তোমার পথ ধরিয়া না চলিলে বিশ্ব আজ বাঁচিবে কেমন করিয়া? সে যে আজ পথ-হারা। তাহার সামনে হইতে সকল পথ মুছিয়া গিয়াছে। ওগো নূতন পথের প্রবর্তক, তুমি জাগ।...তোমার মঠে তোমার স্নেহ রহিয়াছে। তাহা আমার পক্ষে কত আদরের। তাহার মুষ্টি মর্যাদা রক্ষা করিবার মত শক্তি যদি জীবন আমাকে দান কর। আমার সামনে তোমার মঠের যেন দুর্গতি না হয়। কোন অভিসন্ধি আমার নাই তোমার সেবা করা ছাড়া।...

২০শে জানুয়ারী

ঠাকুর, আমার জীবনের সকল লাঞ্ছনার সাক্ষী ছিলে তুমি, নইলে কি তাহা সহ্য করিতে পারিতাম? কিছুই তো গায়ে লাগিতে দেও নাই—ভালর বা অনাদর, উপেক্ষা বা অপেক্ষা। সবই ঝাড়িয়া ফেলিয়া আগাইয়া চলিয়া আসিতে পারিয়াছি। যে সব আঘাত পাইয়াছি, তাহা কি সামলাইতে পারিতাম যদি না তুমি আবরণ করিয়া রাখিতে! আজই যে আবার নূতন করিয়া তোমার সেবা করিবার কথা ভাবি তাহা কি সম্ভব হইত যদি না তোমার স্পর্শ থাকিত? আমার যেন সাহস উৎসাহের অন্ত নাই কত কিছু যে করিতে ইচ্ছা হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। অথচ বয়স আমার ৭১। এত বয়স যে আমার হইয়াছে তাহা ভুলিয়া যাই। তোমার জয় হউক আমার জীবনে।...ব্রহ্মানন্দজীর আশুতোষ দত্ত, ইউনিভারসিটি হল প্রভৃতি স্থানে ঠাকুরের সম্বন্ধে আলোচনা করার কথা বলে। ইহা তো আমার পূর্ব্ব পরিকল্পনা রহিয়াছেই। ঠাকুরের একটি বড় ছবি বা oil painting দরকার সভা সমিতিতে উপস্থিত করিবার জন্য।...নগেন বিশ্বাস আজ M. O. যোগে ৫ টাকা 'আপনার সেবায় ব্যয়িত হউক' লিখিয়া পাঠাইয়াছে।...যেদের সঙ্গে কথা হয়—মানুষের সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক আগে, তাই তাহাদের অনন্ত ত্রুটিও আমাকে উদ্বিগ্ন বা বিচলিত করিতে পারে না। প্রেমই তো মানুষের বরণ।...আমি ভালবাসিয়া যাইব,...শত আঘাতেও আমি কাহারও উপর অবিচার করি নাই। তাই আমার দুয়ার সকলের জন্য আজিও উন্মুক্ত। মানুষ অনেক আঘাতন করিয়াছে, আমি কাহাকেও ছাড়িয়া দেই নাই আঘাত আমাকে কে না দিয়াছে?...

২১শে জানুয়ারী

ঠাকুর, এইবার তোমাকে লইয়া কলিকাতার বুকে দাঁড়াইতে চাই। বল দেও, সুযোগ করিয়া দেও। সারা জীবন তোমার কথাই বলিয়াছি। কিন্তু তোমার ক্ষেত্র হইতে তোমার নাম করিয়া বলি নাই। এইবার তোমার ক্ষেত্র হইতে তোমার নাম করিয়া একবার ঝড়ের মত কলিকাতাকে নাড়াচাড়া দিতে চাই। তুমি তো কোন দিন আমাকে পিছনে ফেলিয়া রাখ নাই। এক টান দিয়া বাংলার বুকে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছিলে। একবার

যদি অনধিকারের [illegible] হইয়া তোমার দর্শন বলিতে পারি, পত্রিকাগুলি আপনা হইতেই তোমাকে স্বীকার করিবে। ভিখারীর মত তোমাকে লইয়া পত্রিকা-ওয়ালাদের কাছে যাইতে সঙ্কোচ বোধ করি। আমার মান রক্ষা কর। তোমার জয় হউক! সুবোধ মুখার্জী সকালে আসেন। তিনি ৪ খানা নিত্যগোপাল বিক্রয় করিয়া চারি টাকা আনিয়াছেন। এঁহাকে ৪ টাকা দিয়া যান। গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য (দর্শনের এম, এ, হাওড়া জোড়ে বাড়ী) মঠে সন্ধ্যায় আসেন তাঁহার সঙ্গে ঠাকুরের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তিনি অনেক সদ্গুরুর কথা জিজ্ঞাসা করেন। এতদিন আমার activity ছিল মঠের বাহিরে। আজি ও মঠ হিসাবে কিছুর জন্য কি ধীরে ধীরে ঠাকুর এক করিয়া নিতেছেন? আমার জীবন-ভর সকল ছুটাছুটি, সকল কাজের ফল সফলতা কি এইবার মিলিবে? তোমার সাক্ষাৎ সেবায় তো আমার জীবন লাগিল না। আমার সেবা তুমি লও—আমার স্নেহের সেবা, প্রাণের সেবা, মনের সেবা। আমাকে সার্থক কর, সফল কর। বাঙ্গলায় ঘুরিয়া তোমাকে পেয়ে পাইব? বাঙ্গলায়, কলিকাতায় কেহের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। সেই পরিচয়ের সুযোগ কি তোমার সেবায় লাগিবে? তাহাই হউক, আমি ধন্য হই। সন্ধ্যার পর হেমেন্দ্রবাবু আসেন।

২২শে জানুয়ারী

ঠাকুর, তুমি কত বড়, অথচ ছোট আমাদের কাছে কত ছোট হইয়া ধরা দিয়াছিলে। আমরা কি তোমার এই ছোট হওয়ার গৌরব মাধুর্য বুঝিতে পারিয়াছি? আমরা যখন তখন ব্যর্থ অভিমান করিয়া তোমাকে জ্বালাইয়াছি। আমরা যেন তোমার সন্তান আর কি! এমন দুষ্ট আমরা! অথচ তুমি ক্ষমা করিয়াছ। অনন্ত করুণার সাগর, আর কাহার শরণ লইব তুমি ছাড়া? আজ তোমার দর্শন ও জীবন লইয়া আমি যে বিপন্ন ঠাকুর! সাধনে যে আগাইতে পারিতেছি না। কেহ তো তেমন করিয়া আমার সঙ্গে মিলিত হইল না? যাহাদের জন্য খুন হইয়া যাইলাম, তাহাদেরই কি [illegible] আমাদের পাইলাম? তোমাকে দর্শন তো হইল তো তুমি পাও নাই, তবুও তো এত ভরসা ভালবাসিয়া গিয়াছ।

২৩শে জানুয়ারী

ঠাকুর, তোমাকে লইয়া কাড়াকাড়ির কি অবসান নাই? 'কেড়ে নিতে চায় কেহ কেলে দিতে বলে, পাগলী বাঁচিবে কেন ও ধন না হলে'! তোমারই দর্শন ও জীবন-আদর্শ লইয়া পত্রিকা আরম্ভ করিয়াছি; কেবল তাহার বোঝা বহিতেছে। মানুষ তাহাকে সেই পথ হইতে বিচ্যুত করিতে কি কম চেষ্টা করে? তাহার শরীর ভাল নয়—তাই তাহারা পত্রিকা চালিয়া দিবার জন্য জোর জুলুম করে। তোমার দর্শন কি চলার মত নয়?—যেমুকে বলে, 'Reader সৃষ্টি করিতে পারেন নাই, কিছুতেই এ পত্রিকা চলিবে না' সত্যই কি চলিবে না? বিজয় দাস কয়েকদিন পূর্বেও এই কথা বলিয়াছিল যেদি তোমার কি ইচ্ছা। বেণু মল্লিকবাবু, জ্যোতীন্দ্রবাবু, বিমল গুহ, নলিনী ঘোষ, সুরেন কর, নলিনী ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে দেখা করিয়া নিমন্ত্রণ পত্র দিয়া যেতে ১০টার পর।...মঠে যাই ৪টার পর। ৬-৩০এ বক্তৃতা আরম্ভ করি। লোক তেমন হয় নাই। 'গিরীধারী' প্রসঙ্গ তুলিয়া জড় অজড় সমন্বয় বিশদভাবে বলি। বক্তৃতার পর ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার এক বন্ধু আসেন। তাহাদের সঙ্গে রমাপতি, ক্ষিতীশ ও আমি ঠাকুর সম্বন্ধে কিছু বলি। ইহার পর বীরেন্দ্র কৃষ্ণ বসু আসেন। তাহার সঙ্গেও কিছু কথা হয়। এখানে আসিবেন, তাহার কি কথা আছে। প্রায় ৮টায় এখানে পৌঁছি।...

২৪শে জানুয়ারী

ঠাকুর, আমার বিশ্ব আর তোমার বিশ্ব দুই। এই দুই বিশ্ব যাহাতে এক বিশ্বে গড়িয়া উঠিতে পারে আমাকে তেমন করিয়া লও। আমার পরিবার সমাজ রাষ্ট্রও তোমার। কিন্তু তবুও পার্থক্য আছে। তুমি দুইকে এক করিয়া লও। আমাকে এমন কৌশলে চলিতে শিখাও, যাহাতে আমি তুমি, আমার তোমার কিছুই দুই না থাকে। আমি সর্বক্ষেত্রে তোমার অদ্বৈত রস

আস্বাদন করিতে চাই। আসক্তি-অনাসক্তির সামঞ্জস্য করিয়া যেন জীবনে চলিতে পারি। তাহারও সঙ্গে জড়াইয়া পড়িয়া যেন তোমার বিশ্বকে পরিত্যাগ না করি। আবার তোমার বিশ্বের উপর অতিমাত্রায় ঝোঁক দিয়া আমার বিশ্বকে যেন ভাসাইয়া না দেই রেণু সকালে বাহির হইয়া পোষ্টাফিস, নিখিল রায়, ভাবেশবাবু, ওয়ালটার টম্পসনের পি সি সেন প্রভৃতির নামে বেশ কয়েক ও কার্ড দেয়, ফেরে ২টায়।...পরে ভাত খায়। বড় শীত পড়িতেছে, আজ আর মঠে যাই না। উমা এখানেই আছে। ৩টার পর উপরের আলমারির বইগুলি গুছায়। সন্ধ্যায় গাড়ী ভেকোরেটারের দেবীদাসবাবু আসেন। তাহাকে ৩১শে জানুয়ারী ছাদের উপর সামিয়ানার জন্য ঠিকা করিয়া দেওয়া হয়। উমা খোপাগুলি ঠিক করে। প্রতিভার পোষ্টকার্ড আসে। অরু সেইরূপ। বৃহস্পতিবার আসিবে।...প্রেমাবের উদ্বেগটা কম বলিয়া মনে হয়।...উজ্জ্বলতার ভিতর হইতে সত্যই তো আমাদের যাওয়া জোটেনা। এইভাবে পরের সাহায্যের উপর কতদিন নির্ভর করা চলিতে পারে? এইবার গ্রাহকের উপর বিশেষ জোর দেওয়া উচিত। আজ সুরেশ দাস ও পূর্ণিমা মজুমদারের ওখানে রেণু যায় ও নিমন্ত্রণ কার্ড দেয়

২৫শে জানুয়ারী

রাধারাণী, সারা জীবনের ধ্যানের ধন তুমি। কি জানি কি ক্ষণে বা শুভক্ষণে তুমি আমার জীবনে আসিয়াছিলে, আমি তোমাকে নিয়া পথের বাহির হইয়া পড়িলাম, এক নূতন দর্শন ও নূতন বিশ্বের সন্ধান পাইলাম, উন্মাদ সাজিলাম, জাতি কুল শীলের বালাই ঘুচিয়া গেল, কাহারও সঙ্গে আর আমার বনিল না অথচ সকলকেই তো চাই। কাহাকেও ছাড়িতেও পারিলাম না। তুমি আমার জীবন-মরণ ধন। আমার সব তুমি—দেহ প্রাণ মন তুমি আমার মহানির্বাণ, ওগো নৈর্ঋতী, কবে আমি তুমি মিলিয়া যাইব? তুমি যবিবে, আমি নিকিয়া যাইব, ঘুচিয়া যাইব। রেণু সকালে মন্মথ দাসের বাড়ী যায়, গ্রাহকের টাকা আনে, নিমন্ত্রণ পত্র দিয়া আসে...। আসিয়া শৈলেন রায়, সুবোধবাবু, ডাক্তারদের নিমন্ত্রণ পত্র দিয়া আসে।...৪টার পর মঠে যায়। ৫টার পর ভাইঝীদের রেণু মঠে গিয়া...।

২৬শে জানুয়ারী

ঠাকুর, তোমার বিশ্ব স্বরূপে এক-বিশ্ব হইলেও আমি তাহা বহু বিশ্বে পরিণত। এই বহু বিশ্বকে তুমি এক বিশ্বে, বহু জাতিকে এক জাতিতে, বহু ধর্মকে এক নিত্যধর্মে গড়িয়া তুলিবার উপযোগী জীবন ও দর্শন লইয়া আসিয়াছ। তুমিই মূর্তিমান এক-বিশ্ব, এক-জাতি, এক-ধর্ম। তোমাকে বুকে লইয়াই আজ জাতি-কুল-শীল ছাড়িয়া, সব distil করিয়া, অবধূত হইয়া বিরাট বিশ্বের বুকে দাঁড়াইয়াছি। Life is a process of distillation; তাই সকলের সঙ্গে সব সম্বন্ধকে drag করিয়া লইয়া চলিয়াছি। সব সম্পর্ক drag করার ভিতর রহিয়াছে তাহাদের স্বরূপের প্রতি প্রেম, অনন্ত তিতিক্ষা, অনন্ত ধৈর্য। বৃন্তি-প্রকৃতি তো পরিণামধর্মী, যাহা বদলানো যায়, তাহার নিষ্কৃতির জন্য কাহাকেও পরিত্যাগ করা যায় না। Dragged হইতে হইতে যদি বদলায়, সেই আশায় চলিতে হইবে। তোমার জয় হউক। রেণু ভালহৌসী যায়...ফেরে ৬টায়

২৭শে জানুয়ারী

নিত্যগোপাল, দেখা দাও আমার স্বরূপে সর্বরূপে—আমার জীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে আমার বিশ্বে। আমার দেহমনপ্রাণ নিংড়াইয়া দেখা দেও রসঘনরূপে, ওগো আমার আত্মিরস—'রং অস্যানাং রসঃ'। দুধ মথন করিয়া যেমন মাখন দেখা দেয়, তিল মথন করিয়া যেমন তেল দেখা দেয়, আমার জীবন মথন করিয়া তুমি তেমনি দেখা দেও। শুদ্ধং বুদ্ধং নিত্যগোপালম্ শরণং গচ্ছামি, নিত্যধর্মং শরণং গচ্ছামি, নিত্যসঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, বিশ্বসঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। তোমাকে সঙ্ঘরূপে পাইবার জন্য সারা জীবন ছুটিলাম। দেখা দেও, দেখা দেও, তোমার সঙ্ঘরূপ প্রতিষ্ঠিত কর। ১০টায় রাধুসহ প্রতিভা আসিয়া পৌঁছে...। ১২টায় পর বিনয় ঘোষ আসিয়া 'অভিযোগদর্শন' নিয়া যায় ছাপাইবার জন্য।...

২৮শে জানুয়ারী

"বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের গুরু বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন। সখী বলে আমার রাধা যাদে যতক্ষণ। নইলে শুধুই মদন।" "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ।" কি আশ্চর্য ছবি ব্রহ্মধামে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যে নারী-প্রকৃতি ছিলেন 'দিনকা মোহিনী রাতকা যামিনী' সে-ই আজ মদনমোহিনী। তাঁহার চরণ তলে সর্বমোহনশক্তি মূর্ছিতা, নির্বাসিতা। নারীর এই মর্যাদা প্রতিষ্ঠাই ছিল ব্রহ্মধামের মাধুর্য। এই নারী-রূপের উপাসনাই সারা জীবন করিলাম। কী যে এক নেশা কুসুম সম্ভোগের রাধারাণীর সেই ছবি সৃষ্টি করিয়াছিল! আজও তাহা বহন করিয়া চলিয়াছি। ...ঘাটের পর আমি ও নিত্যব্রত মঠে যাই—নিত্যব্রতকে আজও ওষুধ দেওয়া হয় নাই। ৮। টার পর পর্যন্ত আলোচনা হয় ঠাকুরের দর্শন, আমার চক্ষুদান দেওয়া, হাতের মাথা কাটিয়া রক্ত পড়া, বৃন্দাবনে কৃষ্ণানন্দদাস ব্রহ্মচারীর দ্বারা মাতাজীদের পা টিপিয়া মাথায় ঘুম লাগানোর কথা, গো মাংস বিক্রয় নিয়া আন্দোলন, বৃন্দাবনে কুষ্ঠাশ্রম অধিকার দানের কাহিনী সম্বন্ধে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন নগেনদাদা, ক্ষিতীশ, শান্তিদীদি, বনবাসিনী ঘোষ, বেণুকুমার, সুধাংশু ডাক্তার, নিত্যপ্রকাশানন্দ প্রভৃতি। বিবেকানন্দ সোসাইটীতে বক্তৃতা দান, ধীরেন মহারাজের মন্তব্য বিষয়েও আলোচনা হয়। আমার দেরী দেখিয়া বেণু মঠে যায়। ১টার পূর্বে এখানে বেণু সহ ফিরি।

২৯শে জানুয়ারী

ঠাকুর, কত কত ঠেলিয়া চলিলাম সারাজীবন। কোথায় পুত্র কন্যাদের কাছ হইতে সেবা পাইব, আজ তাহাদের জন্য আমার কত দুর্ভাবনা ভাবিতে হয়। সত্যব্রতকে তোমার আশীর্বাদ বলিয়া পাইয়াছিলাম। তুমি বলিয়াছিলে, 'শরৎবাবুর একটী সুপুত্র হইয়াছে'। তোমার মুখের অন্নপ্রাশন করাইয়াছিলাম আশা ছিল তোমার সেবা করিবে, যে ভার আমি পাইয়াছিলাম। আজ তাহার খাওয়া-পরারও কষ্ট। আজ তো তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কষ্ট পাই। ইহাদের নিয়া অভিমান করিয়াছিলাম। আজ কোথায় ইহারা আর কোথায় আমি? তুমিই আমার আজ সব। তোমার পাদপদ্ম বুকে লইয়া চলিয়াছি, চলিব—ইহাই আমার আকুতি।... আজও মঠে আলোচনা বেশ জমে—বাবার বাড়ি ১টা হইতে ফোর্ট পর্যন্ত নারিকেলের প্রসঙ্গ, গুরুভ্রাতাগণের সহজের নিত্যতার কথা, মনে মনে অমিল হইলেও সম্পর্কের শুদ্ধত্বের কথা, গুরুভাইদের মধ্যে বিরোধ মিটাইবার পরার অভিনয়ত্বের কথা, আমার মঠে আসিবার মূলে শুধুই নিত্যসিদ্ধি সেবাবুদ্ধির কথা, আগামী এক বৎসর আমাদের বিরাট তপস্যারত থাকিবার কথা, ঠাকুরের স্নেহের আদরের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বেশী প্রকাশ করার কথা, একটি বিশুদ্ধ আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া এখানের সমস্ত মলিনতা দূর করার কথা, নিজেদের concentrated হওয়ার কথা আলোচনা হয়। ৩টার পর বেণু যায়, চলিয়া আসি। ২টা বাজে ও ১টী ফুল কপি আনা হয়। বেণু সঙ্গে আনে পথে। কালকের অনুষ্ঠানের জন্য ২পাউণ্ড চা কেনা হয়। ধীরেন সন্ধ্যার পর আসিয়াছিল। প্রতিভার রক্ত পরীক্ষায় Huskin টের পায় না। কিছুই ঠিক করিতে পারে না।...

৩০শে জানুয়ারী

আজ ৩১শে জানুয়ারী উদ্বোধনের জন্মোৎসব—প্রীতি সম্মেলন।

ঠাকুর, উদ্বোধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমার, তোমার জীবন ও দর্শন বুকে লইয়া উদ্বোধন বিশ্বিজয়ে বাহির হইয়াছে। ৭৫ বর্ষ তাহার আরম্ভ হইল। আজ তাহার জন্মোৎসব। তাহার অগ্রযাত্রা তোমার চরণ পরশে সার্থক হউক। তাহার প্রচার প্রাণবান হউক। বিশ্ব তোমার জীবনের ছাঁচে জীবন লাভ করুক। বিশ্ব অর্পিত হইয়া তোমার জীবনে জীবন্ত হউক। উদ্বোধনের বিজয় ছড়াইয়া পড়ুক। বেণু সকালে মঠ হইতে ফুল ও নেকবাবার হইতে ১০০টী ফুলের মালা ও ১টী বড় মালা আনে। রহুনা রাঁধে খিচুরী। উমা বেলা আসে ৮টার পর। তাহারা গান গাহে। সকালে ছাদের উপর বিছিয়া দেওয়া হয় decorator দ্বারা। ব

আসে। বড় দৌ আসে ২টার পর। তুলসীর জন্য বলিয়া আসিতে পারে নাই। ১টার পর লক্ষ্মীনারায়ণ হইতে ১০০টী এক আনা দামের রসগোল্লা, ১২০টী এক আনা দামের সিঙ্গারা, ১০০টী এক আনা দামের নিমকী নিয়া আসে। নিত্যব্রত আলো ঠিক করিয়া দেয়। মঠ হইতে তাঁবু আনা হয়। সত্যব্রত আসে। নিশির আসে ৩টার একটু আগে। যমুনা-রাধু-উমা-রেখা খুব খাটিয়াছে। ৪টার পর আমি স্নানে যাই। ঠিক ৪॥টায় সভার কাজ আরম্ভ হয়। রবীন গঙ্গোপাধ্যায় 'স্বরূপ নামিয়া এল ধূলির আঙ্গিনায়' গানের পর যায়। ইহার পূর্বে ভক্টর সুহৃৎ মিত্রকে সভাপতি বরণ করা হয়। সোণা ফুলের মালা তাঁহার গলায় দেয়। রেণু মাঘ মাসের উজ্জলভারত হইতে 'নববর্ষের প্রণতি' ও 'আমাদের কথা' পাঠ করে। পরে সভাপতি ভাষণ পাঠ করেন। সভাপতি চলিয়া গেলে প্রিয়রঞ্জন রায় সভাপতির কাজ করেন। সুহৃৎবাবু 'লালচে পকৃবর্ণাণি রণ বর্ণাণি তাড়য়ে' বলিয়া 'উজ্জলভারত'কে আরও প্রসারিত করিতে হইলে তাহা সহজ করা দরকার বলেন, কেননা মানুষ পড়িয়া আনন্দও চায়। কোথায়ও কোথায়ও দুর্বোধ্য হয়, সেখানে যেন লেখকদের অনুভূতি অস্পষ্ট। ইহার পর জিতেশ গুহ, সুরেন নিয়োগী, জগন্নাথ সাহা, নলিনী ঘোষ, রবীন গঙ্গোপাধ্যায় ও সর্বশেষে আমার বক্তৃতা হয়। তারও শেষে সভাপতি বলেন। নলিনীবাবু বলেন উজ্জলভারত দ্বৈতবাদের সমর্থক, অদ্বৈতবাদের মূল্য স্বীকৃত হয় নাই। তাই দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় হয় নাই উল্লেখ করেন। আমাকে বাধ্য হইয়া তাঁহার ও সুহৃৎবাবুর কথার উত্তর দিতে হয়। —'আত্মানকাদুশোচামি' শ্লোক, 'গিরিধারী' নামের ব্যাখ্যা, এই সিদ্ধান্ত-দর্শনে দ্বৈতবাদের, অদ্বৈতবাদের খণ্ডন ও সমর্থন আছে, উজ্জলভারত চিন্তাশীলদের চিন্তাধারা বদলাইবার জন্য, এখনও উহাকে জনসাধারণের স্তরে নিয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই।—

অতঃপর সভায় নিজেরা শুদ্ধ ১০০এর বেশী লোক হয় নাই। জিতেশ পত্রিকার uniqueness-এর কথা বলে; ১০খানি পত্রিকাতেই পড়ার মত কিছু থাকে না, উজ্জল-ভারত মনের খোরাক জোগায়। সুরেন নিয়োগীও বলেন—আমি একজন পত্রিকা পরিচালক। ছয় বৎসর পত্রিকা চালানোর কৃতিত্ব কম নয়। ইহাতে নূতনত্ব আছে। নলিনী ঘোষ বলেন, পত্রিকায় অদ্বৈতবাদের চেয়ে দ্বৈতবাদের উপরে জোর দেওয়া হয়—তাই সমন্বয় হয় না। রবীন উহার কিছুটা উত্তর দেয়। আমি সুহৃৎবাবুর সমালোচনা ও নলিনীবাবুর অভিযোগের উত্তর দেই। উজ্জলভারতের লেখা অস্পষ্ট—ইহা কতকটা ঠিক। প্রায়ই অস্পষ্ট বুদ্ধির কাছে। উজ্জলভারত প্রাণের ভাষায় লেখা—তাই ইহা অনেক সময় বুদ্ধিমানদের কাছে অস্পষ্ট। সহজ করিবার চেষ্টা প্রাণপণ করি; কিন্তু ইহা এখন সহজ করা সম্ভব নয় উজ্জলভারত শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য। জনসাধারণকে পৌঁছাইয়া দিতে অনেক সময় লাগিবে। আমরা প্রাণপণ করিব সহজ করিতে। উজ্জল-ভারতে লিখিবার বেশী লোক নাই। আমরা তো খুঁজি। সর্ব ক্ষেত্রে প্রাণধর্মন প্রতিষ্ঠাই তো চাই। কিন্তু লেখক কোথায়? সভায় উপস্থিত সভ্যবৃন্দ—ধীরেন-সুবোধ ডাক্তার, সুরেন রায়, উপেন ধর, নলিনী ভট্টাচার্য্য, পুণ্ডরীক বাবু, অনিল ঘোষ সস্ত্রীক, চিত্তরঞ্জনবাবু (Orient), দুর্গাদাস দত্ত, আশুতোষবাবু, নকুলেশ্বরবাবু (সভার অন্তে), জগন্নাথ সাহা সস্ত্রীক, বিমলা মিত্র, সুধাংশু ঘোষ, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, তারিণী নন্দী, রমাপতি, নীলরতন, কিতীশ চক্র, চিদানন্দ, নগেন্দ্র প্রামাণিক, দেবীদাস মতিলাল, শান্তিলাল হালদার, সুরেন নিয়োগী, জিতেশ গুহ, মনোমোহন-বাবু (Writers Building), বিমল মিত্র, নিশির বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

৩১শে জানুয়ারী

ঠাকুর, 'যায় যেন মোর সকল ভালবাসা তোমার পানে তোমার পানে তোমার পানে। যায় যেন মোর সকল গভীর আশা তোমার কানে তোমার কানে তোমার কানে। চিত্ত মম যখন যেথায় থাকে, সাড়া যেন সে তোমায় ডাকে। যত বাধা সব টুটে যায় যেন তোমার টানে তোমার টানে তোমার টানে॥ আহিরের

এই ভিক্ষাভরা থালি এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি, অন্তর মোর গোপনে থাক ভরে তোমার দানে তোমার দানে তোমার দানে। হে প্রিয়, হে অন্তরতম, এ জীবনে যা কিছু সুন্দর সকলি আজ বেজে উঠুক সুরে তোমার গানে তোমার গানে তোমার গানে।" আমার সব ভাল সব মন্দ, সব প্রবৃত্তি সব নিবৃত্তি তোমার গানে বাজিয়া উঠুক ;...৪টা আসে ৮টায়...। বন্ধুর সঙ্গে যাবার পূর্বে ঠাকুরের জীবন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়।—বলিয়াছে, 'ঠাকুর 'ভোগ' করিতে দিয়াছেন, কেন ভোগ করিব না?' সন্ন্যাসী লোক-শিক্ষক। ভোগে অধিকার থাকিলেও সন্ন্যাসী ভোগ করেন না। দৃষ্টান্ত ইহার ঠাকুর। সন্ন্যাসী ভোগ-সুখে ভোগেই হয় স্বাধিনীকাকন যোগীর কাছে মায়ার ছলনাকলে আসে। শিব দিগম্বর, কালী দিগম্বরী কেন? Centralisation-এর যুগ আর নাই। কোটি কোটি টাকা লইয়া মোহান্তগিরি করিবার যুগ চলিয়া গিয়াছে। কর্মিরাজী যেমন অচল, মোহান্তগিরি, গুরুগিরি, সন্ন্যাসী গিরিও অচল। উপরে নারায়ণ, নীচে নর, মাঝে শুধু মায়ভোগার (bearer)। শ্রীনিত্যগোপালই গুরু; আমরা শুধু মায়ভোগার। ৪টায় মঠে যাই...। প্রতিমার deep X-Ray করার পূর্বে হোমিওপ্যাথি খাওয়াই স্থির হইল।...

১লা ফেব্রুয়ারী

মাধায়ী আমার, বিশ্বের সব-কিছুতে এমন আসন বলিয়াছে যে এখানে দাঁড়াইবার মত এতটুকু জায়গাও নাই। সর্বত্র দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা, কর্ম-বিমুখতা, শ্রদ্ধাহীনতা ও শোষণ। কে রক্ষা করিবে এই বিশ্ব হইতে বিশ্বকে? কাহার চরণস্পর্শে এই বিশ্ব নবীনরূপে গড়িয়া উঠিবে? তুমিই বিশ্বের সংগঠনী শক্তি, তুমিই দিব্য বিশ্বরূপিণী। তুমিই নিত্যগোপাল-সাজে আসিয়াছ। বিশ্ব সর্বসংস্কার-মুক্ত হউক, অবধূত হউক, বিশ্বের মানুষ সহজ মানুষ হউক, শোষণ দূর হউক, পোষণের রসে সঞ্জীবিত হউক।...মঠে তুলসী মোর আসিয়া বলিয়াছে...। অনঙ্গন বাবু দরকার, বীরানন্দ আপনে যাইবার কথা বলে, চিদানন্দ ধমকায়—সকলেই কাজ ছাড়িতে চায়। আমি জানি, ঠাকুর, তোমার কে আছে? সকলকে তোষামোদী করিয়া সেবা করাইলে কি সেবা হয়? 'বৈকুণ্ঠ হৈয়া যেবা করে পরাপেক্ষা। কার্য সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা। কাহারও কি সেবার উপর কোনও আকর্ষণ আছে? যে যাহার পদ, অর্থের ও সুবিধার খোঁজে আছে...অনিল ঘোষ মেয়েকে বলিয়াছেন, স্বামিজী যদি ১০ বৎসর বাঁচিয়া থাকেন এবং এইভাবে intellectually নিত্যগোপালকে প্রচার করেন তবে নিত্যগোপাল নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হইবেন সন্দেহ নাই।

২রা ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, আশে পাশে চারিদিকে শুধু কাজনের ছবিই ফুটিয়া উঠিতেছে কোথায় দাঁড়াই? কেমন করিয়া কাজ করিব, আগাইব কি না কিছু মানুষ লইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে পারি? আমার আবেষ্টন যে বড় প্রতিকূল। আবেষ্টন অনুকূল না হইলে কি কাজ হয়? কৈবল্যের সাধনা হইতে পারে কিন্তু লীলা-কৈবল্যকে জীবনে জমাইয়া তুলিতে হইলে তো আবেষ্টনের অনুকূল হইবার প্রয়োজন আছে। তুমি শক্তির উৎস, সামর্থ্যের উৎস। স্বামিজীর মধ্যে আমি wine-এর মত সেই শক্তিকে আমার আবেষ্টনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ করিয়া তুলিব, সংহত করিয়া তুলিব। তাই হউক তোমার আমার জীবনে।...উৎসবের একটি কর্মসূচী লেখা হয়।...খাওয়া প্রস্তুত হইবে বাগানের ঐ দিকে এবং ১২টার মধ্যে তাহা শেষ হইবে। ঠাকুরের মন্দিরের সঙ্গে সংস্রব থাকিবে না। সেখানে পৃথকভাবে ভোগ দেওয়া হইবে।...উদ্বোধনের রাত্রি ৯টার পর আসে।...এত দেরী এই ৩ বৎসরে আর হয় নাই।

৩রা ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, আমার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, পুত্রকন্যার প্রতি ভালবাসা, ধনজনের প্রতি ভালবাসা, মান প্রতিপত্তির প্রতি ভালবাসা—সর্বোপরি আমার প্রতি ভালবাসা তোমার প্রতি ধাবিত হউক, তোমাতে অর্পিত হউক। আমার সকল আশা তোমার কানে গিয়া পৌঁছুক। যখন যেখানে আমার চিত্ত থাকে, 'সর্বথা বর্তমান' আমার চিত্ত সদা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমার ডাকে যেন সাড়া দেয়। আমার

যাত্রাপথ তোমার টানে অবাধ হউক। সব ভাঙিয়া চুরিয়া যেন আমার সব-কিছু তোমার জীবনের মাঝে ঝাঁপ দেয়। তোমার জীবন হইতে বাহিরে আসিয়া আমার মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার যাহা-কিছু ভিক্ষার ঝুলিতে সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা নিঃশেষ হউক, খালি হউক। তোমার গোপন প্রাণে, যাহা কেউ জানে না, আমার অন্তর-বাহির সব পূর্ণ হউক। প্রিয়তম আমার, আমার জীবনের ভাল মন্দ সব তোমার গানে মাতিয়া উঠুক, গানময় হউক, তোমার সুরে সুরময় হউক ....তারিণীবাবু মঠের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 'no ray of hope' দেখেন। ঠাকুরের জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নাই বলিয়াই ইহাদের এই দুর্দশা।...মিনু দক্ষিণেশ্বর হইতে সকালে আসে। মেয়ের জন্য তাহার মন খারাপ। আমার উপর নির্ভর তাহার নাই। নিজের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত করিবার কোন প্রেরণাও তাহার নাই। সে তাই মন-মরা হইয়া থাকে। আমি যতদূর পারি করিব। অন্যেরা নিজের বুদ্ধির দোষে নিজেরা দুঃখ পায়। আমি কি করিয়া দুঃখ ঘুচাইব? আজ নারীকে স্বাধীন করিয়া দিবার দিন আসিয়াছে। স্বাধীনতা ও সমতা—ইহাই শ্রীনিত্য-গোপালের অবদান।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী

আমার জীবনের চরম সার্থকতা তুমি রাধারাণী। আমি তোমার মাঝে আমাকে পাইয়াছি। তোমার 'আমি'-র মাঝেই আমার 'আমি' সার্থক। তোমার 'আমি'-রই একটী প্রকাশ আমার 'আমি'। আমার আবেষ্টন তোমার হউক। তোমার আবেষ্টন আমার হউক। সকল ক্ষেত্রের বিগ্রহস্বরূপ তুমি। তুমিই মূর্তিমতী স্বাধীনতা—নর-নারীর স্বাধীনতা, ইহকাল-পরকালের স্বাধীনতা, ধনিক-শ্রমিকের স্বাধীনতা। তুমিই মূর্তিমতী সাম্য। নর-নারী, ধনিক-শ্রমিক সমভাগী, সম সুখদুঃখ। তোমার জীবনে সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর পরিপূরক। তোমার জয় হউক। ১২টার ভিতর খাওয়া শেষ করিতেই হইবে। তাহার পর যাহার যাহা কাজ ও বিশ্রাম। ১টা ২টা পর্যন্ত খাওয়ার হাঙ্গামা চলিতে দেওয়া উচিত না....তারিণীবাবু বড় বাজারে বাহির হইয়া গিয়াছেন আবেদনটার হিন্দী করাইবার জন্য। সন্ধ্যার পর ফেরেন। হাটার পর হঠাৎ দেখেন সহ ঈশ্বর প্রামাণিক মঠে গিয়া উপস্থিত। তাহার সঙ্গে আমার ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সে ৪।৫টী স্বেচ্ছাসেবক সহ মঠ সাফাই-এর ভার নিতে প্রস্তুত উৎসবের সময়ে। ফেব্রুয়ারীর শেষে আসিবে। কয়েকটী নাম দিল যাহাদের নামে চিঠি দিলে কিছু চাউল পাওয়া যাইতে পারে। চাউল আনার বন্দোবস্ত সে করিবে। একখানি অর্থ আবেদন পত্রও এই তাহাকে দেওয়া হয়। এখানে যতীন চট্টোপাধ্যায় আসেন। তখন আমি ছিলাম না। 'গ্রন্থসাহেব' পাঠ করার লোক তিনি ঠিক করিয়াছেন। কোরাস-এ গান হইলে তাহাদের যাতায়াতের খরচ দিতে তিনি পারেন। তিনি পত্রব্যবিকীতে ২৲ টাকা দেন। আমাকে মঠের লোকেরা আসিয় করিয়া ডাকিয়াছে, ইহাতে তিনি খুসী। ধীরানন্দ আপনি যাইবে কোন্ সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য।...প্রতিদিন অন্ন আসে ১০০ হয়।...আজ 'মনের নিমন্ত্রণ'-র জন্য হৃষীকেশবাবুর কাছে এবং ম্যাজিক লণ্ঠনে গৌরলীলা কীর্তনের জন্য অনাথবন্ধুর কাছে চিঠি দেওয়া হয়।

৫ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, তোমাকেই প্রাণের আশা করিব। সর্বাবস্থায় সুখে দুঃখে শোকে তোমার চরণ চাহিয়া রহিব। তোমার কোন্ প্রয়োজন আমার জীবনে সাধিবার জন্য তুমি আমাকে 'পরং, সংসারে যাও, কাজ আছে' বলিয়া পাঠাইয়া ছিলে তাহা তুমি জান। আমাকে জানিতে দেও। সারা জীবন যাহা ঠেলিয়া চলিলাম। পথ-চলার মাঝে সুখ দুঃখ যাহা দিবে তোমার হাতের দেওয়া দান বলিয়া যেন মাথা পাতিয়া নিতে পারি। এই সংসার অরণ্যে যদি কখনও পথ হারাই, 'কোথায় নিত্যগোপাল' বলিয়া কাঁদিব। প্রাণ যখন আকুল হইবে, আমার হৃদয়ে তোমার ঐ রাঙ্গা চরণ চাপিয়া ধরিব। তোমার জগতে তোমার প্রেম বিলাইব। তোমার কার্য্য সাধিব। শেষ হইয়া গেলে কোলে তুলিয়া লইও। আমি কোথায় আছ

বিশ্রাম লাভ করিবে ?···সুরেশ দেবের কাছে চিঠি দেওয়া হয়—'তিনিই আসুন বা আমিই যাই, দেখা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া'। আমি ও রবীন একত্র বাহির হই।···

৬ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, তোমায় আমায় অদ্বৈত মিলনের মাঝে, দিব্য দৈখুনের মাঝে তোমার-আমার, অপরিচ্ছিন্ন পরিচ্ছিন্নের, সমষ্টি-ব্যষ্টির, তোমার সম্প্রদায়ের ও আমার পরিবারের সকল সমস্যার সমাধান হউক, হ'য়ে যাউক। তুমি আমার সঙ্গে একীভূত হইয়া বিশ্ব-সমস্যা-সমাধানে মূর্তি রূপে উদ্ভাসিত হও। তোমার আশ্রিতেরা কেহ তোমার সম্প্রদায়ের ভাবচ্যুত সম্বন্ধে লেশমাত্র আশা পোষণ করেন না। অতএব আমার ক্ষুদ্র বিশ্বাস যে তোমার সম্প্রদায় মরিতে পারে না। টিকিয়া থাকাতে তুমি, তোমার সম্প্রদায় সঙ্কটের পরে। সর্ব-উচ্চের culmination, চরম পরিণতি তুমি সর্ব উচ্চের চরম পরিণতি, পরা গতি তুমি। সব সম্প্রদায়ের পরা গতি, চরম পরিণতি তোমার সম্প্রদায়। প্রাণ-মূর্তি তোমার জয় অনিবার্য। তিনটার পর আমি প্রতিভা বেণু ও গোপা মঠে যাই। ৪টার পর সপ্তাহিকীর সাধারণ সভার কাজ আরম্ভ হয়···প্রতিটি সমস্যার দুইটি দিক আছে—ভাবের দিক ও রূপের দিক। প্রজ্ঞা স্পর্শ করিতে পারে ভাবের দিক। সে রূপের দিক স্পর্শ করিতে পারে না। কাজেই রূপের দিক প্রজ্ঞা সমাধান করিতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রাণ ভাবের দিক স্পর্শ করিতে পারে না। প্রজ্ঞা-প্রাণ যখন সমন্বিত হয়, তখনই সমস্যার পূর্ণ সমাধান হয়। মঠে যখনবাবুরা প্রজ্ঞার দিক হইতে ঘটনাকে দেখে। সেইজন্য তাহারা টাকা হাতে না পাইলে এক পা'ও চলিতে চান না। সামনের দিক, সম্ভাবনার দিক তাহাদের কাছে একেবারে closed। প্রাণ কিন্তু আবার নির্বিচারে যাহা কিছুর মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বিপন্ন হয়। ঠাকুর সমস্যার সব সমস্যা প্রজ্ঞা-প্রাণের সমন্বয়ে বিচার করিতে হইবে। মঠ হইতে আসিতে মোড়ে রাখেন কুপাময়ী নামে এক ছাত্রের সঙ্গে দেখা। সে সঙ্গে সঙ্গে আসে। শ্রীনিত্য-গোপাল ও মাসের সংখ্যা উদ্বোধনের দেই। গ্রাহক হইবে বলিল গোপাল দাস অধিকারীর কাছে এক পোষ্ট কার্ড দেই দেখা করিবার জন্য।

৭ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, বিদ্যাপতি আমার, তুমি মহাবিদ্যার প্রকাশ ঐ মহামিলনের মূর্তি। বিশ্বময় যে ক্রন্দন চলিতেছে, সর্বত্র যে অনৈক্য, সেখানে তুমিই একমাত্র যোগসূত্র, বন্ধনরজ্জু। বিশ্বত্রাণ তুমি। কে এই বিশ্বকে এই মহা সঙ্কটের মধ্য হইতে রক্ষা করিবে, গড়িয়া তুলিবে ? তোমার সম্প্রদায়ের মাঝে যে অনৈক্য, কাহারও সঙ্গে কাহারও মিল না-থাকা তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, যাহা দেখিয়া সকলেই ভীত, কে তাহাকে ঠেকাইবে ? তোমার আশীর্বাদে ব্রহ্ম-বিদ্যাস্বরূপিণী সব উপনিষদের যে ব্যাখ্যা পাইয়াছি, তাহাকে কেমন করিয়া ছড়াইয়া দিব ? সরস্বতী পূজার অধিকার তো আমাদের দিয়াছ। মহাসপ্তমীর এক প্রহরে সরস্বতীর পাতি তোমার ঘরে বসিয়া আছি। তোমার জয় হউক। বেণু চা'টার পর মাখনবাবুর নির্দেশে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পার্ক ষ্ট্রীটে উদ্বোধনের প্রবন্ধের জন্য দেখা করিতে যায়। ইতিমধ্যে যতীনবাবু ইন্দ্রসিং মহাজন সহ এখানে আসেন তাহার সঙ্গে কথা হয়। সামনের শুক্রবার হইতে প্রার্থনার জন্য লোক দেওয়া হইবে। আর ঈশ্বর দাস নামক এক সাধু ভদ্রলোক গুরুগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন।··· —আজ একটী গানের করিয়া ভজনের মত কিছুটা রসগোল্লা প্রভৃতি যাদবপুর নিয়া গিয়াছে। কি রুচি ইহাদের ! ঠাকুর, রক্ষা কর তোমার সম্প্রদায়। তুমি যাহা দিয়ে গিয়াছ, তাহা কি বুঝিবার চেষ্টা করিলাম আমরা ? তোমা হইতে আমরা কত দূরে ? তুমি একাই আসিয়াছিলে, একাই চলিয়া গেলে। তোমার মনোমত হইবার জন্য বড় লোভ। তাই করিয়া লও।...

৮ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। এ উত্তাল তরঙ্গায়িত সমুদ্রে আর যেন কখনও পথ-হারা হই না। জীবনের যখন যে অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থায় থাকি না কেন, তুমি তাহাদের সঙ্গে সদয় ও সাক্ষাৎ

নরম করার রাখিয়া প্রকাশিত হ'ত। যখন চোখের জলে ভাসি, তুমি সেখানে কিরণ-রেখা টানিয়া দেও। তুমি যেমন করিয়া চলিতে, কথা কহিতে, আদর করিতে, কল্প বলনে চাহিতে, এত দিন পরেও তাহা ভুলিতে পারি নাই। সবলোই আসিতেছে। আমরা তোমার কেহ ছিলাম না, তুমি ছিলে নিতান্ত একা তোমার অনন্ত জ্ঞান অনন্ত প্রেম লইয়া। আমরা কাছে থাকিয়াও কাছে ছিলাম না। তুমি কত বড় অসহায় ছিলে, আজ তাহা ভাবিয়া বেদনা বোধ করিতেছি। যেমন করিয়া তোমার কাছে থাকিলে সত্য কাছে থাকা হয়, তেমনি করিয়া থাকিতে বড় সাধ হয়। আমার তেমন করিয়া লও। রেণু ১১টার পর 'নারদ ভক্তি সূত্র' -র জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় আমি রাত ৭।। টার পর মঠ হইতে ফিরি। কি উচ্ছৃঙ্খলতা চলিতেছে সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করিয়া। এইখানে তিন দিকে ৩টী মাইক, পাশে ঢাকের বাদ্য, অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে! উৎপাত করাই কি বর্তমানের ছেলেদের প্রয়োজন?...

৯ই ফেব্রুয়ারী

ওগো বাণীবাণী, তুমি বিশ্বের পরা প্রকৃতি, পরকীয়া প্রকৃতি, পরা শক্তি, পরকীয়া শক্তি। তোমার জন্ম গ্রহণের পর শক্তি শক্তিমান, প্রকৃতি পুরুষ পরকীয়া সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়াছে। সম্বন্ধ পরকীয় হইলে প্রকৃতি হন পুরুষের দাসী, পুরুষার্থ সাধনের যন্ত্র মাত্র। প্রকৃতির নিজস্ব কোন মূল্য থাকে না। কিন্তু তুমি যে স্বাধীন কর্তৃত্বময়ী পুরুষ-নিরপেক্ষ একটী সত্তা প্রকৃতির আছে, তাহা তোমার জীবনে সর্বদা দেদীপ্যমান। তুমি কেবলা, শ্রীকৃষ্ণ কেবল। এই বিশ্ব কেবল কেবলার দিব্য মৈথুনে উচ্ছল রহিয়াছে। তুমি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানের ধন, উপাসনার বস্তু। তোমার ধ্যানেই শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বস্রষ্টা। তোমার জয় হউক। সকালে খলিসাকোঠার যতীন্দ্র দাস (নরেন দাসের ভাই) আসিয়াছিল। ইহার পূর্বে সে একদিন আসিয়া আমার গীতাভাষ্যের ১ম খণ্ড (বাঁধান) নিয়া গিয়াছিল। আজ পড়িয়া ফেরত দিয়া পত্রিকা নিয়া গিয়াছে। রেণু সকালে ইন্দ্র সিং-এর সঙ্গে দেখা করে। ঈশ্বর দাসের সঙ্গে দেখা হয় নাই। আগামী সোমবার দেখা করিতে হইবে। সেখান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া এলাহাবাদের 'নারদ ভক্তি সূত্র' নিয়া আসে। উহার reading-এর সঙ্গে ঠাকুরের উদ্ধৃত সূত্রের সঙ্গে মিল নাই। কেমন করিয়া ইহার পাঠোদ্ধার সম্ভবপর? এক উপনিষদের পাথা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ আছে নারদ সূত্রের নাই, কে বলিবে? আমি ৪।০টার পর মঠে যাই। মন্দির সারানোর ব্যাপারে এখনও ট্রাস্টীদের ঐকমত্য হইল না। আজ বার বার মনে হইতেছিল ১৩৩১ সনে ছাপানো ঠাকুরের 'ভক্তিযোগ দর্শন' (১০০০ কপি) নিঃশেষ হইতে ৪৯ বৎসর লাগিল! অথচ বিজ্ঞ-প্রবিজ্ঞ চারদিকে ছড়াছড়ি আছে। কেহ কি ঠাকুরের বই পড়ে? উহা তো বেদতুল্য আদৃত হওয়া উচিত ছিল দর্শন শাস্ত্রে এমন সমন্বয় তো কেহ করেন নাই। নিতাগোপাল তো সমন্বয়-বেদ রাখিয়া গিয়াছেন, অথচ কাহারও পড়িবার আগ্রহ নাই। এ না হইলে এদের এমন দুর্গতি হইবে কেন?...

১০ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, তুমি কাহারও অপেক্ষা করিলে না? একা চলিয়াছ, একা লিখিয়াছ—কাহাকেও পড়াইবার বা পড়িয়া বুঝিয়া লইবার অপেক্ষা তুমি কর নাই। এতদিন যত আচার্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের দেখা। তোমার লেখা 'ভক্তিযোগদর্শনে' দেখিতেছি প্রচলিত নারদ ভক্তিসূত্র হইতে কিছু স্বতন্ত্র পাঠ। উহা কি তোমার স্বপ্ন কোন মূল পুস্তক হইতে লেখা, না তোমার সমাধি-আবেশে লেখার সময় কিছু কিছু শব্দ dropped হইয়া পড়িয়াছে? এলাহাবাদের সংস্করণে দেখিতেছি 'তীর্ণ তুর্কাস্ত তীর্ণাপি মুক্তাপী তুর্কাস্ত কর্ণধারি' ইত্যাদি, কিন্তু তোমার বইয়ে আছে অন্যরূপ। আমার কাছে তুমি স্পষ্ট করিয়া দেও। তুমি এমন অনাপেক্ষ! কি করিয়া তোমার লেখার পাঠোদ্ধার হইবে? কৃপা কর, কৃপা কর। রেণু বাহির হইয়া নরেন লাইব্রেরী হইতে পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দের 'ভক্তি ও ভক্ত' বই কিনিয়া আনে যাহার মধ্যে নারদ ভক্তিসূত্র ও শাণ্ডিল্যসূত্র আছে। এই বইয়ে ঠাকুর যে পাঠ দিয়াছেন,

এড়াইয়া আছে—'তীর্থী কুর্বন্তি তীর্থানি সুকর্মী কর্মাণি (?)'। মঠ হইতে সৌম্যানন্দজী একটায় আসিয়া খবর দিল যে, পরমহংস পরমানন্দ আসিয়াছেন, আমাকে এখনই যাইতে হইবে। সে আমার সঙ্গে কথা বলিবে'। যাইয়াই গেলাম। আমার সঙ্গে পূর্বে আলাপ হইয়া ছিল। ইনি 'Federal Institute of culture' স্থাপন করার একটা পরিকল্পনা লইয়া ঘুরিতেছেন। আমি বলিলাম, সর্ব প্রথমে একটা philosophical revolution দরকার, এবং তাহা করিতে হইবে ভারতীয় দর্শনের নূতন ভাষ্য রচনার দ্বারা দিয়া। পরে কাজে নামিতে হইবে। নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইলে তবে স্টেট মানিয়া লইবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পাইয়াছিলেন, রামদাস স্বামী শিবাজীকে পাইয়াছিলেন। State-এর সাহায্য না পাইলে হয় না, ইহাও যেমন সত্য, stateকে পাইতে হইলেও শ্রীকৃষ্ণ বা রামদাসকে হইতে হয়—এটায় ফিরি।

১১ই ফেব্রুয়ারী

যাদুযাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মোহন মন্ত্র দিয়া চরি আমার, তোমার দিয়া কিরণে বিশ্ব উদ্ভাসিত, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তোমার কায় ও দ্যুতি গায়ে মাখিয়া নিজ কালরূপ আবরণ করিয়া গৌররূপে ধরার বুকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই গৌরই আজ আবার সর্ব ভাব, সর্ব রস, সর্ব ধর্ম, সর্ব সম্প্রদায়ের মিলন ভূমি রচনার জন্য মহামিলনক্ষেত্র রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনিই নিত্যগোপাল। শ্রীনিত্য-গোপাল-জীবনে তোমাদের পাইয়াছি—জ্ঞানে ভক্তিতে কর্মে। তোমার চরণতলে কি বিশ্বশান্তি রচিত হইবে না ঠাকুর আমার? তোমাকে লইয়া তো আমি বিপন্ন। কে তোমায় আছে? তোমার কথা বলিবার জন্য কাহার দুয়ারে যাইব। কে তোমার জন্য বসিয়া আছে? ঠাকুর, পথ খুঁজিয়া নেও, সুযোগ গড়িয়া তোল। চিরদিন আমার মান তুমি রক্ষা করিয়াছ। তোমার জয় হউক।...আমি একটার পূর্বে মঠে যাই। যোগানন্দের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। নগেনবাবুকে একবার কাশী যাইতেই হইবে। তিনি বলেন, সকলে non-cooperation করিলে কেমন করিয়া কাজ হইবে? কেমন করিয়া কাজ হইবে জানিনা। কিন্তু রাখিতেও তো পারিব না। করিয়া যাইব, যাহা হয় হইবে। এলাহাবাদের ও এখানের edition 'নারদভক্তিসূত্র' লইয়া মঠে যাই। 'নারদ লিখিয়াছেন' এই পাঠ তো ঠিক বলিয়া মনে হয় না। ইহার কি করিব তাহা আলোচনা করি। ঠাকুরের manuscript দেখা হইবে বলিল। একাকী তত্ত্ব কে আছে? এক ও বহুর সমন্বয়ে যে ঐক্য, সেই 'এক'-এর পিছনেই তো সারা জীবন ছুটিয়াছি। আজিও এক আমার সার্বভৌম নিত্যগোপাল, সার্বজনীন নিত্যগোপাল। সব মিলাইয়া যে এক, সেই একের উপাসনাই তো করিয়াছি। মঠ হইতে ফিরিয়া দেখি সুরেশ দেবের এক পোষ্টকার্ড আসিয়াছে। আজ বৈকালে আবার এক চিঠি দিয়াছি তাহার পত্র না পাইয়া। 'ভক্তিযোগধর্মনের' প্রথম কর্মার অর্ডার দেওয়া হয়। বিনয় ঘোষকে ১৫টাকা দেওয়া হয়। রেণু বিনয় ঘোষকে লইয়া মঠে যায়। সেখান হইতে চাওলাও কিছু টাকা দেওয়া হয়। আমি দিয়া দিব বলিয়াছি।

১২ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, আমার সকল স্নেহ, সকল মায়া-মমতা, সকল আসক্তি যেন তোমাকে জড়াইয়া থাকে। সারা জীবন যে গভীর আশা বুকে লইয়া চলিয়াছি, তাহা যেন তোমার কানে পৌঁছায়। তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া যে ভিক্ষা ভরা থালি আমি এতদিন বহন করিয়া চলিয়াছি, তাহা নিঃশেষে খালি হউক। সন্তান যেমন মাতৃ-শরীরের গোপন স্থানে পুষ্ট হয়—দুনিয়ায় কেহ জানে না—আমিও তোমার গোপন স্থানে তেমন করিয়া ভরিয়া উঠিব। আমি জীবন্ত মানুষ হইব। চিত্ত আমার যেখানেই থাকে—সত্ত্বগুণের ক্ষেত্রে, রজোগুণের বা তমোগুণের ক্ষেত্রে—তোমার ডাকে যেন সাড়া দেয়।

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ

॥ শ্রীকৃষ্ণদাস সাহা ॥

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে চীনে আজ যা ঘটছে তাতে এই নাটকের প্রধান নায়ক মাও সে তুং আজ পৃথিবীর সর্বশ্রেণী মানুষের বিরূপ সমালোচনার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কার্ল মার্কস-এর ঐতদ্দেশিক জড়বাদ বর্তমান চীন-প্রধানের নেতৃত্বে আরও উৎকট রূপে দেখা দিয়েছে। এর পরিণতিতে চীন আজ পৃথিবীর সঙ্গে এবং পৃথিবীর স্বাধীন দেশগুলোর সঙ্গে এর হৃদয়ের যোগাযোগের একান্ত অভাব। আজ চীনের যে পরিণতি সে পরিণতি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ বহু বছর পূর্বে। মার্কস-এর সাম্যবাদ তাঁকে আকর্ষণ করলেও এর ঐতদ্দেশিক জড়বাদে আত্মসমর্পণ করতে পারেন নি তিনি। হাজার হাজার বছরের ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে মার্কস-এর জড়বাদকে ভারত যদি গ্রহণ করে তবে ভারতের সমস্যার সমাধান যে সম্ভব নয় তা তিনি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। ভারতের উৎকট অজড়বাদও তাঁকে কিন্তু সন্তুষ্ট করতে পারেনি। পরস্পর-বিরুদ্ধ এই দুই দর্শনের মাঝে সমস্যাভারাক্রান্ত ভারতের মরল হবে কিসে, অর্ধাহার অনাহার জর্জরিত ভারতবাসীর মুখমণ্ডল হাসিতে হবে আনন্দোজ্জ্বল—এ সব গভীরভাবে ভেবেছিলেন স্বামীজী। সেই ভাবনাসমুদ্র মন্থিত করে তিনি যে সমাধানের পথ আবিষ্কার করেছিলেন তাতে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা কীর্তিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন—'শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে বুকে লইয়াই বাঙালী আজ বিশ্বের জড়বাদ ও অজড়বাদের টানাটানির মধ্যে জড়বাদের উৎকটরূপ ঐ কমিউনিজম এবং অজড়বাদের উৎকটরূপ এদেশের অধ্যাত্মবাদকে সমন্বিত করিয়া ধরার আলা দূর করিতে পারিবে'। পৃথিবীর বহু সমস্যার সমাধান যে গৌরাঙ্গ-প্রদর্শিত পথে সম্ভব এ উক্তি যেন তারই নির্দেশিকা। শ্রীগৌরাঙ্গের মতবাদকে অস্বীকার করেন নি কখনও, দূরের দর্শন থেকে পালিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা নেই তাঁর প্রদর্শিত পথে, বরং 'যথাযোগ্য বিষয় ভুক্ত অনাসক্ত হইয়া' নির্দেশ করেছে তাঁর বাস্তবধর্মী মর্মে। স্বামীজীর ভাষায় বলতে হয়—'শ্রীগৌরসুন্দর মূর্তিমান Marxism বলিয়াই 'Ideal' সমাজী হইয়াও গর্ভধারিণী মা সচীর জন্য কাঁদেন।'

আজকের পৃথিবীর দুই বিরোধমান শিবিরের মাঝে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রদর্শিত পথে যে সমন্বয় সম্ভব একথাও স্বামীজী স্বীকার করেছেন অকপটে। তিনি প্রশ্ন করেছেন—'বেদ্রীকরণ ও বিদ্বেদ্রীকরণ এই দুই বিভীষিকার মাঝখানে দাঁড়াইয়া কে ইহার মধ্য হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সক্ষম'? তিনিই আবার অতি সহজে এর উত্তর দিয়েছেন—'একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের ঈশ্বরপুত বাণীই তাহা পারিবে।' এ সকল উক্তি থেকে ইহাই সুস্পষ্ট যে গৌরাঙ্গ-জীবন-দর্শন তিনি ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করেছেন। শুধু তাই নয়, সে উপলব্ধ সত্য নিজের জীবনে প্রতিফলিত করেছেন এবং সে কারণেই ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথকভাবে না দেখে স্বীয় জীবনে উভয়ের সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের ব্যাপক জীবন কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে নি। স্বাধীনতা যুদ্ধে আর্ত ভারত জননীর মুক্তিসংগ্রামে তিনি একনিষ্ঠ সৈনিক, সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে বজ্রকঠোর মনোভাব তাঁর, ধার্মিক জগতে মতন্ত্র প্রহরী তিনি। একমাত্র ধর্মকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ না করে সমাজসেবায় ও দেশ-মাতৃকার পূজায়ও তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বকে। সর্বক্ষেত্রেই গৌরাঙ্গ-মহাজীবন তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং সে কারণেই তিনি পরমোৎসাহে লিখেছেন—'মহাপ্রভুই আমার রাষ্ট্রগুরু, ধর্মগুরু, সমাজ-গুরু।'

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অনুভময় জীবন কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর আদর্শস্থানীয় নয়, তাঁর মহাজীবনের মহামন্ত্র কোন গণ্ডীবদ্ধ মানুষের জন্যে নয়—এ জীবন সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের জন্যে। শ্রীগৌরাঙ্গকে বিশেষ শ্রেণীর মুক্তি-দাতারূপে কল্পনা করলে তাঁর প্রতি অমর্যাদা করা হবে বলে স্বামীজী সতর্ক করে দিয়েছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্তিত পথ সাম্যের পথ, বিভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ। শ্রীগৌরাঙ্গ সর্বকালের অধম পতিত নিপীড়িত নির্যাতীত মানুষের প্রাণের দেবতা। তাই স্বামীজীর কথার মতন বলতে পারি—'শ্রীগৌর সব সম্প্রদায়ের; কারও একচেটে সম্পত্তি নন'।

মানুষের উপর মানুষের সর্বপ্রকার শোষণের বিরোধী ছিলেন স্বামীজী। শোষিত মানুষের অন্তরের বেদনা তাঁর প্রাণে বিষাদের সুর তুলেছে। তাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় যা'দের হৃদয় ভরে উঠেছে তিনি, শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে তাঁর প্রাণ পথের সন্ধান করেছে। সে সন্ধান সার্থকও হয়েছে—গৌরাঙ্গ-জীবন-দর্শনেই তিনি প্রকৃত মুক্তির নিশানা পেয়েছেন। তাই বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছেন তিনি—'গৃহে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, অর্থনীতিতে, ধর্মনীতিতে চলেছে যে শোষণের তাণ্ডব লীলা, শ্রীগৌরাঙ্গ সেখানে মূর্তিমান যম'। আজ শোষণপিষ্ট মানুষের মর্মভেদী নির্বাক কান্না আকাশে বাতাসে বিষাদের সুর তুলেছে। মানব-সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে সাম্যবাদের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ এক শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলতে হবে—এবং তা সম্ভব হবে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্তিত পথে। তাতেই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে এবং শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের আশীর্বাদ বর্ষিত হবে আমাদের উপরে

জয়তু শ্রীনিত্যগোপাল

॥ শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ, কাব্যরত্ন ॥

মত অবতার এল গেল এই ধরার ধূলির পথে
মন-মুকুরেতে ভাসিয়া উঠেছে কত না দিব্য ছবি;
তাদের বাণীর অমৃতের ধারা আজিও নিয়ত ক্ষরে
ধন্য হয়েছে ধীরা বসুমতী লভি সে যজ্ঞ-হবি:

পানিহাটি-মাটি করি পবিত্র তুমি দিয়েছিলে দেখা
পাতালে বিতাড়ি দিনে দিনে কত মর্ত্যমানব মনে।
অরূপ রতন তব তপস্যা নির্জনে একা একা
সমন্বয়-গুরু, গড় মহামঠ সমাগত এ ভুবনে।

কলাবীন শুধু নহে গোবিন্দ তমালে দলিত বাণী
অতন্দ্র স্বরে শুন্য মন তার হয় নিতি ঝঙ্কৃতিত;
কল্পাদপ তপ্ত শুভতে অমিয় পরশ দানি
পাপী তাপী জনে বক্ষে ধরিয়া করিলে উজ্জীবিত।

অপাংক্তেয় তাদেরপানে কত বরাভে আপন পাশে
টেনে নিলে স্নেহ মন্দাকিনীর পূত পরিমল ধারা;
পতিতা গোলাপ দিবস যামিনী ধরি তব নাম ত্রাসে
চরণরজ রেণু লভি হয় হইল আপন হারা।

জগৎ সত্য ব্রহ্ম সত্য সত্য ব্রহ্মবৎ যারা
তোদের মাঝারে হেরেছ অরূপ তু নয়নে অনিমিখ;
এ জড় জগৎ নহে আর কিছু অজড় ব্রহ্মধারা
শুনালে তত্ত্ব তত্ত্বমূর্তিরে হে বিশ্ব-নাগরিক।

এক-জাতি এক-ধর্ম জীবনে ধরা হোক মধুময়
জয়তু শ্রীনিত্যগোপাল হে যুগ-সূর্য জয়।

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

যে সময় ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকার হইতে থাকেন, তখন অবশ্যই কার্য্য বিদ্যমান থাকে। উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে প্রপঞ্চ-গঠন সমাপ্ত হইলে আর কার্য্য বিদ্যমান থাকে না বলিতে হয়, অথচ জগৎ-প্রপঞ্চে কার্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে প্রত্যক্ষ করা হইতেছে। শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্মই জগদাকার। অথচ তাঁহারই মতে জগৎ অনিত্য। যখন জগৎ হয়, অবশ্যই সে সময় কার্য্য ও কারণেরও প্রয়োজন হয়। শঙ্করাচার্য্যের মতে 'সর্ব্বমাত্মেতি' বলা হইয়াছে বলিয়া কার্য্য এবং কারণও আত্মা বলিতে হয়। যদি অবিদ্যাই কার্য্যকারণ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আত্মা-ব্রহ্ম জগদাকার হইবার কার্য্য ও কারণ, অবশ্যই অবিদ্যা বলিতে হয়। তাহা হইলে আত্মা-ব্রহ্মও অবিদ্যার অধীন অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। আর যদি বলা হয় অবিদ্যাও ব্রহ্মের বিকাশ, তাহা হইলে অবিদ্যাও ব্রহ্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় অবিদ্যাও ব্রহ্ম স্বীকার করিলে ব্রহ্মও বিকার স্বীকার করিতে হয়। কারণ বেদান্তমতে অবিদ্যাই অজ্ঞান সেই অবিদ্যা-অজ্ঞানই বিশ্ব বিকার। বেদান্ত মতানুসারে সেই বিশ্ব বিকারস্বরূপ আত্মা জীব।

একোনচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের সপ্তম শ্লোকে বলা হইয়াছে—

'মৃদ্ভাণ্ডে ঘটে বহ্বন্নদেব যাতি তৈ বদাৎ।
তীক্ষ্ণাগ্রে প্রপঞ্চেপি ব্রহ্মৈব ভাতি তাদৃশম্।'

কিন্তু ঘটাকার থাকিতে কেবল মৃত্তিকাই কি দর্শন করা হয়? মৃত্তিকা ঘটাকার থাকিতে মৃত্তিকা ও ঘট উভয়ই দর্শন করা হয়। ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকার থাকিতে কেবল ব্রহ্মই দর্শন কি করা হয়? ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকার থাকিতে ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চ উভয়ই দর্শন করা হয়।

চত্বারিংশ সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থে অষ্টমী শ্লোকে বলিয়াছেন,

'স জৈবাত্মা বিভক্তোঽপি ন ভবেদ্ ভাক্তি বৈ সদা।
যথৈব বিবিধা রজ্জুর্নিমোঢ়ভ্রান্তিনিমোঢ়নিষ্ঠ্।।

শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মনামাবলী মালার একচত্বারিংশ শ্লোকে আছে—'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। বেদান্ত-মতের বিবেক গ্রন্থানুসারে আত্মা-ব্রহ্ম নির্বিকার ও নিরঞ্জন। বেদান্তমতে সেই নির্বিকার নিরঞ্জন আত্মারই অজ্ঞানে আছে। সেই আত্মা নির্বিকার নিরঞ্জন বলিয়া তিনি অজ্ঞানীও নহেন বলিতে হয়। সুতরাং তাঁহার ভ্রম আছে ইহাও বলা যায় না। শঙ্করাচার্যের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ বলিয়া সেই ব্রহ্ম-জীবাত্মাও অজ্ঞানী নহেন সেইজন্য সেই ব্রহ্ম-জীবাত্মার ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে সর্প-ধর্শনও হইতে পারে না তাঁহার রজ্জুকে সর্প-বোধও হইতে পারে না। সেইজন্যই তিনি আত্মাকে সর্বদাই বিশুদ্ধ বোধ করেন বলিতে হয়। সেইজন্যই তিনি আত্মাকে কখনই অশুদ্ধ বোধ করেন নাও বলিতে হয় শঙ্করাচার্য ত বলিয়াছেন, 'সর্বমাত্মেতি'। শঙ্করাচার্যই ত বলিয়াছেন

'ব্রহ্মণঃ সর্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব তৎসত্যমিতি ধারয়েৎ।৪৯'

শঙ্করাচার্যই ত তাঁহার ব্রহ্মনামাবলী মালার একোনচত্বারিংশ শ্লোকে বলিয়াছেন, 'ব্রহ্ম জগৎ সর্বমিতি'। তাহা হইলে রজ্জুও সেই আত্মা-ব্রহ্ম, সর্পও সেই আত্মা-ব্রহ্ম কারণ পূর্বেই 'ব্রহ্ম জগৎ সর্বমিতি' বলা হইয়াছে। সুতরাং রজ্জুকে রজ্জ্বাকার ব্রহ্মাত্মা ও সর্পকে সর্পাকার ব্রহ্মাত্মা বলা যায়। কারণ সর্পের শরীরও পঞ্চভূতের বিকার। শঙ্করাচার্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকে ব্রহ্ম ও সর্বভূত অভেদ বলা হইয়াছে বলিয়া সর্পের পঞ্চভূতের বিকার যে শরীর তাহাও ব্রহ্ম। 'সর্বমাত্মেতি' বলা হইয়াছে বলিয়া সর্পও আত্মা। আত্মাই ত ব্রহ্ম, সুতরাং সর্পও ব্রহ্ম। আত্মা-ব্রহ্ম রজ্জুও নহেন, আর তিনি সর্পও নহেন। পূর্ব-কথিত শঙ্করাচার্য-রচিত প্রমাণাবলী অনুসারে বিশুদ্ধ এবং অশুদ্ধ উভয়কেই সেই 'এক' আত্মা-ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে।

একচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত

অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকে

'যথৈব মৃন্ময়ং কুম্ভমন্তর্বহির্যোঽপি চিন্ময়ঃ।
আত্মানাত্মবিভাগোঽয়ং মৃষৈব ক্রিয়তে বুধৈঃ।'

বলায় আত্ম ও অনাত্মার বিভাগ অস্বীকার করা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মা এবং অনাত্মা যে অভেদ ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সেইজন্য ঐ শ্লোকে আত্মানাত্ম বিভাগ রাখিবার প্রয়োজন নাই বলা হইয়াছে। ঐ শ্লোকের প্রথমাংশে কুম্ভ মৃন্ময় ও দেহ চিন্ময় স্বীকার করা হইয়াছে। যে প্রকারে আনন্দ ও আনন্দময় অভেদ নয়, সেই প্রকারেই মৃৎ এবং মৃন্ময় অভেদ নয় বলা যাইতে পারে। যাঁহার আনন্দ আছে, অথবা যাঁহাতে আনন্দ ব্যাপ্ত, তাঁহাকেই আনন্দময় বলা যায়। কিন্তু আনন্দ অর্থে যাঁহার আনন্দ আছে অথবা যাঁহাতে আনন্দ ব্যাপ্ত বলা যায় না। মৃন্ময় অর্থে মৃৎ বা মৃত্তিকা বলা যাইতে পারে। কিন্তু মৃৎ অর্থে যাহাতে মৃৎ ব্যাপ্ত বলা অতি অসঙ্গত। কুম্ভ যে নিজে মৃৎ, সেই জন্যই তাহাকে মৃন্ময় বলা সঙ্গত নহে শঙ্করাচার্য তাঁহার গ্রন্থাবলীর অনেক স্থলেই আত্মা বা চিৎ ব্যতীত দেহের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নির্দেশ করেন নাই। তাঁহার মতানুসারে বুঝিতে হয় দেহও আত্মা বা চিৎ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। শঙ্করাচার্য কুম্ভকে যেভাবে মৃন্ময় বলিয়াছেন, তিনি সেইভাবেই দেহকে চিন্ময় বলিয়াছেন, তাঁহার একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারেই অবগত হওয়া যায়। শঙ্করাচার্য কুম্ভকে মৃন্ময় বলিয়াছেন বটে, কিন্তু কুম্ভ কি মৃৎ নয়? শঙ্করাচার্য দেহকে চিন্ময় বলিয়াছেন বটে, কিন্তু দেহ কি চিৎ নয়? শঙ্করাচার্যের নির্দেশিত মৃন্ময়-কুম্ভকে যে কারণে মৃন্নাকার বলা যায়, সেই কারণেই তাঁহার নির্দেশিত চিন্ময়-দেহকেও চিন্নাকার বলা যাইতে পারে। কোন কোন পুরাণমতে চিন্ময় আকার ও চিন্নাকার অনিত্য নয়। শঙ্করাচার্যের মতেই চিন্ময়-দেহ বা আকার যে অনিত্য।

দ্বিচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত

শঙ্করাচার্য্যেরই আত্মানাত্মবিবেক নামে এক গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে তিনি তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের একোনসপ্ততি শ্লোকে আত্মানাত্ম-বিচারের প্রয়োজন নাই কি প্রকারে বলিয়াছেন? তাঁহার অনেক গ্রন্থের অনেক স্থলে পৃথক্ ভাবে আত্মা এবং অনাত্মা-অবিদ্যা স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের একোনসপ্ততি শ্লোকানুসারে আত্মা এবং অনাত্মা অর্থেরও বুঝিতে হয়। শঙ্করাচার্য্যের আত্মানাত্মবিবেক নামক গ্রন্থানুসারে নিত্য সত্য আত্মার ন্যায় অনাত্মা অবিদ্যাও নিত্য সত্য প্রতিপন্ন করা যায়। সেই মতে অবিদ্যাকে অনাদি বলা হইয়াছে। সে মতে বলা হইয়াছে,

অবিদ্যা কেনাপি ভবতীতি চেৎ।
অবিদ্যা ন কেনাপি ভবতীতি চেৎ।

সুতরাং উক্ত দুই প্রমাণানুসারে অনাত্মা-অবিদ্যাও নিত্য সত্য প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

ত্রিচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত

শঙ্করাচার্য্য অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

সর্পত্বেন যথা রজ্জু রজতত্বেন শুক্তিকা।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা॥ ১০॥
ঘটত্বেন যথা মৃত্স্নী পটত্বেনৈব তন্তবঃ।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা॥ ১১॥
বনত্বং কুড্যত্বেন তয়ত্বেন বৈজলম্।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা॥ ১২॥
পুরুষত্বেন বৈ স্থাণুর্জলত্বেন মরীচিকা।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা॥ ১৩॥
গৃহত্বেনৈব কাষ্ঠানি বস্ত্রত্বেনৈব তূলকা।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা॥ ১৪
যথা মৃক্ষিকবিষ্ঠাসৌ জলাশ্রবতি কস্যচিৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ১৫॥
পোতেন গচ্ছতঃ পুংসঃ সর্ব্বং বিচলনং ভবেৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ১৬॥
পীতত্বং হি যথা শুভ্রে দোষাদ্ভবতি কস্যচিৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ১৭
চক্ষুর্ভ্রান্তেন ভ্রমতীবাগাং সর্ব্বং ভাতি ভ্রমাত্মকম্।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ১৮
অনাদ্যং ভ্রমণেনৈব পৃথ্বাদি ভাতি সর্ব্বদা।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ১৯
মহত্বে সর্ব্ববস্তূনামণুত্বমতিদূরতঃ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ২০
সূক্ষ্মত্বে সর্ব্বভাবানাং স্থূলতা চোপলেক্ষতঃ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ২১
কাচভূমৌ জলত্বং বা জলভূমৌ হি কাচতা।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ২২
রজতত্বে মণিত্বং হি মণৌ বা বহ্নিতা পুনঃ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ২৩
যথৈব বিবিধাভাসো মোহাদ্ভবতি কস্যচিৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ২৪
অন্যেষু সৎসু ধাবৎসু সোমো ধাবতি ভাতি বৈ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ২৫॥
যথা নদী জলে ভাতি চঞ্চলত্বেন কস্যচিৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ২৬॥"

ঐ সকল শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী একোনসপ্ততি শ্লোকে দেহকে চিন্ময় বলা হইয়াছে এবং কুম্ভকে মৃন্ময় বলিয়া সেই উপমাদ্বারা দেহকে চিন্ময় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে উক্ত একোনসপ্ততি শ্লোকের আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে, বাস্তবিক কুম্ভ মৃন্ময় নহে, কিন্তু উহা সৎ। ঐ শ্লোকেরই আলোচনায় দেহ চিৎ ইহাও প্রমাণ করা হইয়াছে। দেহ চিৎ। সুতরাং উক্ত শ্লোকাবলীদ্বারা দেহকে অনিত্য বলা সঙ্গত হয় নাই। চিদ্দেহকে নিত্য বলাই উচিত। শঙ্করাচার্য্যের মতে চিৎ আত্মা। আত্মা শ্রুতি ও বেদান্তমতে নিত্য। নিত্যই সৎ, অতএব আত্মাও সৎ। সদাত্মা-চিৎ ও দেহ অভিন্ন প্রতিপন্ন করা হইয়াছে বলিয়া দেহকেও সদাকার বলা যায়। অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের ত্রিংশ শ্লোকানুসারে আত্মা 'সদাকারং'। শঙ্করাচার্য্যের অনেক শ্লোকানুসারে আত্মা আকাশও

নহেন, এবং আত্মার আকার নাই বলিয়া সদাকার অর্থে সৎই আকার বলাও যায় না। সদাকার অর্থে যাহার আকার সৎ বলাও যায় না। কিন্তু ঐ ত্রিংশ শ্লোকে আত্মাকেই সদাকার বলা হইয়াছে বলিয়া সদাকার অর্থে সৎই আকার ইহাও বলা যায়। ঐ শ্লোকানুসারে সদাকার অর্থে যাহার আকার সৎ এ অর্থও করা যায়। শ্রুতি বেদান্ত এবং অন্যান্য অনেক শাস্ত্রেই আত্মাকে সৎ বলা হইয়াছে বলিয়া উক্ত ত্রিংশ শ্লোকে আত্মাকে 'সদাকারঃ' বলায় আত্মা সদাকারই প্রতিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু আত্মা সৎ সাকার প্রতিপন্ন হয় নাই। ঐ ত্রিংশ শ্লোকে আত্মাকে 'সদাকারঃ' বলায় আত্মার আকার সৎ অথবা আত্মা সদাকার বলিলেই এই অর্থ করিলে আত্মা সৎ সাকারও প্রতিপন্ন করা হইতে পারে। বেদান্ত মতে অদ্বৈতবাদ। সেইজন্য আত্মা সৎ এবং তাঁহার আকারও

প্রতিপন্ন হইলে সদাত্মা সাকার ও সদাকার অভেদই প্রতিপন্ন করা হয়। ফল ও তাহার রস যেভাবে অভেদ, সেইভাবেই সদাত্মা-সাকার ও সদাকার অভেদই প্রতিপন্ন করা হয়। ফল ও তাহার রস যেভাবে অভেদ, সেইভাবেই সদাত্মা সাকার ও সদাকার অভেদ বলা যাইতে পারে। শঙ্করাচার্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের একবিংশ শ্লোকানুসারে 'আত্মা নিত্য হি সত্ত্বরূপো', সৎ অর্থে নিত্য। সৎ অর্থে সত্য। সত্ত্বরূপঃ অর্থে নিত্য সত্য রূপ। শঙ্করাচার্যের মতেই যে যেখিতেছি আত্মা নিত্য সত্য রূপ। সুতরাং আত্মা অদেহ কিম্বা অনাকার বলা যায় না। উক্ত শঙ্করীয় প্রমাণানুসারেই আত্মা সদ্দেহ এবং সদাকার বলা যাইতে পারে। সুতরাং পৌরাণিক মতে শঙ্করের শ্রীকৃষ্ণ যে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ইহাও স্বীকার করিতে হয়। বেদান্তমতে আত্মা সৎ চিৎ এবং আনন্দ এই তিনই বটেন। শঙ্করাচার্যের অপরোক্ষানুভূতি অনুসারে আত্মা সৎ এবং চিৎ। তাঁহার আত্ম-পূজা অনুসারে আত্মাই আনন্দ। তিনি আত্ম-পূজায় বলিয়াছেন—

"আনন্দে সচ্চিদানন্দে নিবিকল্পৈকরূপিণি।
স্থিত্বোদ্বিতীয়ভাবেন ত্বৈ কথং পূজা বিধিয়তে॥" ১

পরমহংস গোবিন্দ পাদাচার্যের অদ্বৈতানুভূতি নামক গ্রন্থানুসারে আমি-আত্মাই আনন্দ। ঐ গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোকে আছে—'অহমানন্দসত্তাদিলক্ষণঃ কেবলঃ শিবঃ'।

শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মনামাবলী-মালা নাম্নী পুস্তিকা অনুসারেও আমি আত্মা সচ্চিদানন্দ রূপ ঐ গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

অসঙ্গোঽহমসঙ্গোঽহমসঙ্গোঽহং পুনঃ পুনঃ।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহমহমেবাঽহমব্যয়ঃ॥ ২

উক্ত শ্লোক সকল পর্যালোচনা করিলে আত্মাই যে আনন্দ ইহা নিশ্চয় করা যাইতে পারে। আবার শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মনামাবলীমালাতে আত্মা 'সচ্চিদানন্দরূপঃ' পর্যন্ত। শঙ্করাচার্যের মতানুসারে ব্রহ্মনামাবলীমালা গ্রন্থের দ্বিতীয় শ্লোকে আমি আত্মাই ত 'সচ্চিদানন্দরূপোঽহং' বলিয়াছে। ঐ গ্রন্থানুসারে আমি-আত্মাই সচ্চিদানন্দরূপ বলিয়া আমি-আত্মাই সত্ত্বরূপ বা সদাকার, আমি আত্মাই চিদ্রূপ বা চিদাকার, আমি-আত্মাই আনন্দরূপ বা আনন্দাকার। আমি-আত্মা নিত্য বলিয়া আমি নিত্য চিদ্রূপ, আমি নিত্য-চিদাকার, আমি নিত্যানন্দ রূপ, আমি নিত্যানন্দাকার। শঙ্করাচার্যের নির্বাণ-ষট্কম্ নামক গ্রন্থ ষষ্ঠ শ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি ঐ গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোকের শেষাংশেই 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্' বলিয়াছেন। তাঁহার ঐ গ্রন্থে 'অহং' শব্দ আত্মবোধক। সুতরাং আমি-আত্মা 'চিদানন্দরূপঃ' বলায় আমি-আত্মা চিদ্রূপও বটে, আমি-আত্মা আনন্দরূপও বটে। রূপ ও আকার অভিন্ন বলিয়া, রূপ ও দেহ অভিন্ন বলিয়া আমি আত্মাই চিদাকার, আমি-আত্মাই চিদ্দেহ, আমি-আত্মাই আনন্দাকার, আমি-আত্মাই আনন্দ-দেহ।

ক্রমশঃ

সাময়িকী

শ্রীশ্রীদোলপূর্ণিমা : শ্রীমন্মহাপ্রভু : ফাল্গুনী পূর্ণিমা ভারতবর্ষের বিশেষ বাংলাদেশের অতি প্রিয় দিন, অতি বিখ্যাত দিন। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়, তিনি সকল সময়েই সকলকে তাঁহার প্রাণের স্পর্শ দিয়া মুগ্ধ করিয়া চলেন, তথাপি এই বিশেষ দিনটীতে বৃন্দাবনের আকাশে বাতাসে তিনি প্রেমের জোয়ার বহাইয়াছিলেন। বহু মানুষের সঙ্গে—সর্ব মানুষের সঙ্গে—একটা প্রাণখোলা পারস্পরিক প্রীতির বিনিময়—জানিতেই কত ভাল লাগে—আচরণ করা সম্ভব হইলে সে যে কী মধুময় আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবে জানিতে পুলক লাগে। মানুষ মানুষকে ভালবাসিবে ইহা যেমন মানুষের স্বভাব, আবার মানুষ নিজেকে একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়া তাহারই মধ্যে নিজেকে কেন্দ্র করিয়া রাখিতে চায়, তাহারই মধ্যে আসক্তি হইতে ভালবাসে, বিরাট জগৎ হইতে নিজের জন্য একটা ছোট জগৎ আলাদা করিয়া লইতে চায়, ইহাও মানুষের স্বভাব। বুদ্ধিমান মানুষ নিজের কেন্দ্রত্ব কিছুতেই ছাড়িতে পারে না, সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত হইতে হইলে যে নিজেকে যেমন একবার কেন্দ্র করিতে হয়, তেমনি আর একবার অপরকে কেন্দ্র করিয়া নিজেকে পরিধিও করিতে হয়—ইহা বুদ্ধিমান কিছুতেই ভাবিতে পারে না। নিজের জগতের ছোট গণ্ডীটুকুতেই তাহার কেন্দ্রত্ব জাঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিয়া সে মনে করে খুব হইয়াছে। ইহাতে আর যাহাই থাকুক, প্রাণ খোলা মুক্তির উদার আকাশের স্বচ্ছ বিচরণ ইহাতে পাওয়া যায় না এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবন এই ধারণার বিপরীত। অখিলাত্মার আত্মা হইয়া, সকলের প্রাণ-স্বরূপ হইয়া তিনি যেমন কেন্দ্র, আবার প্রীতির জোয়ারে সে কেন্দ্রত্ব ভাসাইয়া দিয়া সকলে কেন্দ্র করিয়া নিজেকে পরিধির মাঝে চড়াইয়া দিতেও তিনি সমান পারদর্শী। তাই ঐশ্বর্যের পা ধরিয়া 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' বলিতে বা রাজসূয় যজ্ঞে সকলের পা ধোয়াইবার মুখ্য কর্ম গ্রহণ করিতে তাঁহার এতটুকু দ্বিধা নাই। বহুকে নয় সর্বকে নিজের প্রীতির গভীর আন্তরিকতায় আস্বাদন করা এই গুণই তাঁহার পক্ষে এত সহজ। দোললীলার দিন এই সুগভীর আন্তরিক প্রীতিরই এক ব্যাপক প্রসারের আনন্দোৎসব করিয়া গিয়াছিলেন সেই পাঁচ হাজার বছরও আগের সেই মানুষটী। সবাইকে ভালবাসিব—প্রাণ ভরিয়া আনন্দ করিব—ইহাই দোললীলা। আজিকার দিনে সবাইকে ভালবাসিতে আমরা পারিলাম না—ঈর্ষার, বিকৃত ব্যক্তি স্বার্থের তুচ্ছ মান-অভিমান আমাদিগকে সকলের প্রীতির আলিঙ্গনে আনিবার স্বতঃ আস্বাদন করিবার ক্ষমতা দেয় নাই—তবু আমরা এ উৎসব পালন করি। উৎসব-অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত অর্থ না জানিয়া ও না মানিয়া অনুষ্ঠানাদি পালন করার মধ্যে খানিকটা তামসিকতা আছে, জাতীয় চরিত্রে সেটা মোটেই স্বাস্থ্যপ্রদ হয় না—এ কথাটা স্মরণ রাখিয়া যেন আমরা অনুষ্ঠানাদি পালন করি যাহা হউক, এই দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে আমরা বারবার স্মরণ করি সেই মানুষটীর সেই মনোবৃত্তি যাহা সব মানুষকে আনন্দিত করিতে পারে, অথচ যাহার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার বিকৃতি নাই। আমরা যেন এই দিনে সেই মনোবৃত্তি লাভ করিবার, আয়ত্ত করিবার মন ও সংকল্প লইয়াই এই দোললীলা অনুষ্ঠান পালন করি।

এই দিনেই—এই ফাল্গুনী পূর্ণিমার শুভলগ্নেই আরও বর্তমান একটী আনন্দ-উৎসব আমাদের জন্য আছে। বাংলার স্রষ্টা, বর্তমান বাংলার কাব্যের প্রাণক শ্রীচৈতন্য

দেব প্রায় পাঁচশ বৎসর আগে এই দিনে নবদ্বীপ মাটিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যেই পরিসমাপ্ত হইয়া যায় নাই—জাতির জীবনে তাঁহার প্রচারিত ও আচরিত চিন্তাধারার বিশেষ প্রভাব রহিয়া গিয়াছে। তাই ষোলপূর্ণিমার এই দিনটীতে তাঁহাকে স্মরণ করি, মনন করি। শ্রীচৈতন্যদেব যে-জীবন-চেতনা রাখিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে একদিকে যেমন আছে নিজেকে একটা বৃত্তের মধ্যে আত্মাহুতির প্রেরণা, তেমনি আর এক দিকে আছে সঙ্ঘচেতনাদ্বারা সামাজিক জীবনকে উন্নীত করার প্রয়াস। আবার আছে সেই সঙ্গে—ভক্তিবাদের আত্মাহুতি যেমন জীবনে বিনয় নম্রতা অপরের দীনতা প্রভৃতি মনোবৃত্তির জন্ম দিয়া মানুষকে সুন্দর করে, তেমনি ঐ নম্রতা যে মানুষকে অপমান সহ্য করিয়া লইতে শেখায় না, উহা যে মানুষকে ঠিক কাপুরুষ বানায় না, নিজের ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য গর্জন করিবার শক্তিও দেয়—তাহাও শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে আছে। তাই কাজীর অন্যায় হোষণার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ করিয়া তিনি হরিনাম করিবার অধিকার স্থাপন করিয়া ছিলেন। ব্যক্তিগত মুক্তিতেই শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-চেতনা সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি সঙ্ঘ-চেতনার মধ্যে আত্মাবসানের পথ রাখিয়া গিয়াছেন—তাই যেখানে ভারতবর্ষ আজিও 'ধ্যানে করছি মনে মনে কোণে', সেখানে তিনি সঙ্ঘবদ্ধ হরিনাম, সঙ্ঘবদ্ধ মহোৎসবের প্রচলন করিয়া সামাজিক জীবনের পরিশুদ্ধি আনয়ন করিয়াছেন। জাতিভেদের বিভেদ-কলুষ হইতে মানুষকে তিনি উর্দ্ধে রাখিয়াছিলেন—তাই আচণ্ডালে প্রেমধনে কোলাকুলি দিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সম্ভব করিতে বলিয়া ছিলেন যে মনোবৃত্তিতে—'যদি কৃষ্ণ ভজে'—সেই কৃষ্ণ-ভজন বাদ দেওয়ার ফলে মানুষের মানসিকতার উত্তরণ সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, আজ এই ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিনে পাঁচ হাজার বৎসর আগের শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সত্তাকে যিনি বর্ত্তমান যুগ-চেতনায় স্থান দিতে প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে আমাদের প্রণতি নিবেদন করিয়া বলি, গভীর ও তীব্র পাণ্ডিত্যের সঙ্গে চোখের জল মিশিয়া তাঁহার জীবনকে যে কৌশল অপরূপ করিয়া তুলিয়াছিল, সে কৌশল আমাদের তিনি ব্যক্তি ও জাতির জীবনে শিখাইয়া দিন—আমরা মানুষের মত মানুষ হই।

পঁচিশে বৈশাখ—ঘরের চেহারায় দুই হাত দুই পা ও নাকচোখমুখ লইয়া সকলেই মানুষ হইলেও মানসিকতায় কিংবা সচেতন ব্যক্তিত্বে মানুষে মানুষে তফাৎ হয় কেন, বিধাতার সঙ্গে ইহা লইয়া বিতণ্ডা করিয়া লাভ নাই—মানুষে মানুষে তফাৎ হয়। পঁচিশে বৈশাখ তারিখটীর সঙ্গে বাংলাদেশের যে মানুষটির নাম জড়িত হইয়া আছে সেই রবীন্দ্রনাথ বিধাতার এমনই সৃষ্টি—পনের আনা মানুষেরই যাহা চেতনার বৃত্ত। অনেক কিছু যোগ্যতা দিয়া বিধাতা রবীন্দ্রনাথকে পাঠাইয়া ছিলেন—তিনি কবি, তিনি সাহিত্যিক, তিনি শিল্পী, তিনি গায়ক—তিনি অনেক কিছু। কিন্তু সর্বোপরি তিনি একটী চিন্তাধারার সাহিত্যিক রূপদাতা—যেটী কেবল মনস্তত্ত্ব-সম্মত নয়, যেটী বর্ত্তমান যুগ-চেতনাকে ভারতীয় চিরন্তন জীবন-চেতনার সঙ্গে সম্মিলিত করিয়া দিয়াছে। এইখানেই সর্ব মানুষের কাছে তাঁহার সার্থকতা—এই খানেই তিনি চিরন্তন। তাঁহার কবিত্ব, সাহিত্য, শিল্প, গান প্রভৃতি সম্বন্ধে কালোপযোগী রুচির পরিবর্তন যদি বা হয়ও, কিন্তু তাঁহার সমস্ত সাহিত্যের মধ্য দিয়া মনুষ্যত্বের যে একটী মুক্ত রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার আবেদন চিরকালের। এ আবেদন বোধ হয় চির কালের নয় কেবল, বুঝি বা ইহা দেশ-নিরপেক্ষও। যে কোন দেশের লোকই মানুষত্বের এই মুক্ত রূপ আয়ত্ত করার প্রচেষ্টা করিতে পারে এবং তাহা করিলে সর্বত্রভাবেই বিশ্বজনীনতা উন্নীত হইবে সন্দেহ নাই। তাই রবীন্দ্র জন্মদিনের এই শুভ ক্ষণে আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে মানুষ-হওয়ার সেই রূপটী খুঁজিয়া লইয়া জীবনে চলার সংকল্প লইতে চাই। মানুষত্বের সেই রূপটী প্রকাশ করে যখন তাঁর চরিত্রগুলি বলে—

'জগৎটা কেবল পাব পাব বলছে না—সঙ্গে সঙ্গেই বলছে ছাড়ব, ছাড়ব'।

'কাকে ঘরে আনবার জন্ত বেরিয়েছিলুম, কিন্তু ঘরে দেবার জন্তই মন আকুল হল'।

'চোখ দিয়ে তো দেখিনি...আমাকে দর দিয়ে দেকে-ছিলুম'। 'বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে, আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা।...(প্রাণ) অনায়াসে আপনাকে ঢেলে দিতে দিতেই আপনাকে পায়।...(প্রাণ) আনন্দে বয়ে চলে, তাই তো সে আপনার ভার লাঘব করেছে বলেই বিশ্বের ভার লাঘব করে'।

'অপর্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েছে বলেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, জয় করে তারা, ত্যাগ করেও তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতেও জানে তারা, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায়, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে, সৃষ্টি করে তারাই, কেননা তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সব চেয়ে বড় বৈরাগ্যের মন্ত্র।'

'আজকের দিনের আধুনিকেরা উপার্জন করতে চায়, উপলব্ধি করতে চায় না। ওরা বুদ্ধিমান।...তারা কারা শুনেও তর্ক করে। নূতন শিংওঠা হরিণশিশুর মতো মূলের গাছকেও গুঁতো মেরে মেরে বেড়ায়।'

'তাতে (ভালবাসায়) একজন মানুষকেই আমাদের হারা বিশ্বে নিবিড় ব্যাপ্তিতে অধিকৃত করে। রক্তের মধ্যে ঢেলে দেয় দেহের পাত্রে, তাতে যে মাদকতা তীব্র হয়ে ওঠে তাকে অপ্রমত্ত সত্যবোধের চেয়ে বেশি সত্য বলে ভুল হয়।...কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যে চিন্‌তে যদি চাও তবে বিচার করে দেখো কোন্‌টাতে ছাড়া দেয় আর কোন্‌টা রাখে বেঁধে।'

'মানুষের ইতিহাসটাই এই রকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ঝাঁকানিতে, ধ্রুবকে ঘুমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় বাঁশিতালের লয়ে।'

'যেখানে খুব করে মিল সেইখানেই মস্ত বিরুদ্ধতা। তাই ভাবছি আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো যে-পাওনা সে মিলনে নয়, সে মুক্তি'।

৬

'সহজকে সহজ রাখতে হলে শক্ত হতে হয়। দুঃখকে সহজ করতে চাও তো মনটিকে ঠিক জায়গায় বসে আটতে হবে। লোভ বেশি, তাই জীবনের কাছে কোথাও বস্তি দিতে মন সরে না, দুঃখ জেগে গিয়ে জীবনটা হয় গীতহীন বন্ধন।'

'...দেখিয়ে দেব তাকে কাকে বলে,—জীবিকায় দরকারে নয়, জীবনের দরবারে। আমের আঁটিখানটাতে থাকে আঁঠি, সেটা মিষ্টিও নয়, নরমও নয়, খাদ্যও নয়; কিন্তু এই শক্তটাই সমস্ত আমের আশ্রয়, ওইটেতেই সে আকার পায়। কলকাতার পাথুরে আঁটিটাকে কিসের জন্ত দরকার বুঝেছ তো? মধুরের মাঝখানে একটা কঠিনকে রাখবার জন্তে।'

'একঘড়ি বলে কোন পদার্থ হিন্দুনে নেই, টাকঘড়ি আছে, টাঁক অনুসারে তার চাল। আইনটাইনের এই মত।'

'গোরা কহিল, আমি যা দিনরাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আজ আমি ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টান কোন সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন। আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আমার আর অপবিত্রতার ভয় রইল না। আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনদিন অবরুদ্ধ হয় না। যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।'

'হিন্দু সমাজে প্রবেশের কোন পথ নেই। অন্ততঃ সদর রাস্তা নেই, খিড়কির দরজা থাকতেও পারে। এ সমাজে সমস্ত মানুষের সমাজে নয়—দৈবক্রমে যারা হিন্দু ঘরে জন্মায়ে—এ সমাজ কেবলমাত্র তাদের।...অভিমন্যু ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতে জানত, বেরতে জানতো না; হিন্দু ঠিক তার উলটো। তার সমাজে প্রবেশ করবার পথ একেবারে বন্ধ, বেরোবার পথ শত সহস্র।'

'কিছুকাল থেকে কেবলই দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে হিন্দু কমছে, মুসলমান বাড়ছে—এ রকমভাবে চললে ক্রমে একদিন মুসলমান প্রধান হয়ে উঠবে—তখন একে হিন্দুস্থান বলাই অন্যায় হবে।'

'...হিন্দুসমাজ মানুষকে অপমান করে বর্জন করে; এইজন্যে এখনকার দিনে আত্মরক্ষা করা তার পক্ষে প্রত্যহই কঠিন হয়ে উঠছে।...

'অন্যান্য দেশে ঈশ্বরকে জ্ঞানাদির পরিবর্তে কোনো একটি মাত্র বিশেষের মধ্যে বাঁধতে চেষ্টা করেছে—ভারতবর্ষেও ঈশ্বরকে বিশেষের মধ্যে দেখবার চেষ্টা আছে বটে কিন্তু সেই বিশেষেই ভারতবর্ষ একমাত্র ও চূড়ান্ত বলে গণ্য করে না। ঈশ্বর যে সেই বিশেষকেও অনন্ত গুণে অতিক্রম করে আছেন এ কথা ভারতবর্ষের কোন ভক্ত কোনদিন অস্বীকার করেন না।...ধর্মের মূল ও সত্য, অন্তর ও বাহির, শরীর ও আত্মা এই দুটো অঙ্গকেই ভারতবর্ষ পূর্ণ ভাবে স্বীকার করতে চায়।...কিন্তু যিনি রূপেও সত্য অরূপেও সত্য, মূর্তিতেও সত্য মূর্তিতেও সত্য, ধ্যানেও সত্য প্রত্যক্ষেও সত্য, তাঁকে ভারতবর্ষ সর্বতোভাবে দেহে মনে কর্মে উপলব্ধি করবার যে আদর্শ, বিচিত্র ও প্রকাণ্ড চেষ্টা করেছে তাকে আমরা মূঢ়ের মত অশ্রদ্ধা করে য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীয় নাস্তিকতায় মিশ্রিত একটা সঙ্কীর্ণ নীরস অন্ধহীন ধর্মকেই একমাত্র ধর্ম বলে গ্রহণ করব—এ হতেই পারে না।'

'বুদ্ধি জীবনের সব কাজ করিতে পারে না। আর রসের তলা বলে জিনিষটাই নাই।'

'তিনি রূপ ভালবাসেন, তাই কেবল রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়।... একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর একজন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে, তবে তো দুই পক্ষের মিল হয়।...এতদিন আমি তাঁকে আপনার মতো করিয়া বানাইতে গিয়া কেবল ঠকিলাম। ওগো আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে চুরমার করিতে থাকিব—চিরকাল ধরিয়া। যখন তোমার নাম বলিয়াই অনন্ত কালে স্বীয় বাঁধন ছাড়াইতে পারিলে না। থাকো, আমার রূপ লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুব মারিলাম।'

'ঐকান্তিক জ্ঞানের সাধনা যেমন শুষ্ক বৈরাগ্য আনে, ঐকান্তিক রসের সাধনাও তেমনি তামসিকতার বৈরাগ্য নিয়ে আসে।...মনুষ্যত্বের কেবল একটিমাত্র দিক অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে অন্য সমস্ত দিক একেবারে রিক্ত হয়ে যায়, তখন আমরা ভগবানের উপাসনাকে কেবলই একটিমাত্র অংশে অত্যুগ্র করে তুলি এবং অন্য সকল দিক থেকেই তাকে শূন্য করে রাখি।'

'যা নিত্য সত্যের মধ্যে এই প্রবেশের প্রয়াস ও প্রণালী হচ্ছে যোগ। এই যে যোগ এ মনের কর্ম নয়। মন আপনার সঙ্গে সবের যোগ ঘটিয়ে সংসার যাত্রার কাজ চালায়। যোগ সাধনের প্রধান কর্মই হচ্ছে মনকে ভোলা।'

—এই রবীন্দ্রনাথ সর্ব দেশের সর্ব কালের আজকের দিনে তাঁহাকে আমাদের প্রণতি নিবেদন করি।

ভগবান বুদ্ধ—সাধারণভাবে ভারতবর্ষে যে চিন্তাধারা প্রচলিত, ভগবান বুদ্ধ তাহার বিপরীত দিকটা প্রকাশ করিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আচার্য শঙ্কর যে ভাবে ভাবিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব তাহার উল্টা করিয়া ভাবিয়াছেন। শঙ্করাচার্য প্রত্যক্ষ বিষয়টিকে যেমন মিথ্যা বলিয়া প্রত্যক্ষাতীত সত্য ব্রহ্মকেই সত্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন; বুদ্ধদেব বলিলেন ভগবান আছেন কি নাই তাহা লইয়া মাথা ঘামাইব না—প্রত্যক্ষ এই বিশ্ব আছে, মানুষ আছে; এইখানেই এই মানুষেরা কি ভাবে সুখে শান্তিতে থাকিতে পারে—তাহারই পথের কথা বাহির করিতে হইবে। এই চিন্তা দিয়াই বুদ্ধদেব আরম্ভ করিয়া ছিলেন। মানুষকে স্বীকার করিলে, মানুষের জ্ঞানমন্দ লইয়া জাগিতে গেলেই সঙ্ঘ-চেতনা ছাড়া উপায়ই নাই—তাই বুদ্ধদেবের প্রবর্তিত ধর্ম-সাধনায় 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' মন্ত্র বড় কথা। আর শঙ্করাচার্যের সাধনায় 'ধ্যান করবি মনে মনে কোথে'—সেখানে ব্যক্তিগত মুক্তিই একমাত্র কথা—মানুষের সঙ্গে সম্পর্কটাই সেখানে মিথ্যা, বিপজ্জনক, বন্ধনের কারণ। শঙ্করাচার্যের চিন্তাধারা ভারতবর্ষের চিত্তে যাহার

হাজার বছর ধরিয়া এত শক্ত শিকড় গাড়িয়া বসিয়া আছে যে এদেশে অন্যগ্রহণ করিলেও এদেশে বুদ্ধদেবের স্থান হয় নাই। ভারতবর্ষের উত্তরে নেপাল সিকিম ভুটান তিব্বত, পূর্বে আসাম চীন শ্যামদেশ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আজ পর্যন্ত বুদ্ধদেব রহিয়াছেন—কিন্তু ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত প্রায়। অধুনা রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে বৌদ্ধধর্মকে স্বীকৃতি দিবার চেষ্টা চলিলেও ভারতবর্ষ এমনই একটী স্থান যেখানে ধর্মকে ধর্মের ক্ষেত্র হইতে সার্বজনিকভাবে প্রত্যাহার না করিলে তাহাকে স্বীকার করান সম্ভব হইয়া উঠিবে না। শঙ্কর-চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য—কিন্তু সত্যের তাহাই সবটুকু কথা নয়; আবার বুদ্ধ-চিন্তাধারার যৌক্তিকতা ও জীবনগত প্রয়োজনও তেমনই অপরিহার্য অথচ উহাও আংশিক মাত্র। সমগ্র জীবনধর্ম এই দুইয়ের সম্মিলনে—ইহাই দেখাইয়া শ্রীচৈতন্যগোপাল ও তাঁহার ভাস্যকার শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ শঙ্করাচার্য ও বুদ্ধদেবের মিলন সংঘটন করিয়া ভারতবর্ষের সামনে এক বিরাটতর অতএব বিপদভঞ্জন জীবন-চেতনা তুলিয়া ধরিয়াছেন। রাষ্ট্রক্ষেত্রে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার চিন্তাধারা আমাদের রক্তের মধ্যে নাই বলিয়াই যেমন আমাদের মধ্যে সেদিন বুদ্ধদেবের স্থান হয় নাই, তেমনই স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে আজ যে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হইয়া যাইতে বসিয়াছে তাহারও গোড়াতে ঐ মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার মনোবৃত্তির অভাব। সঙ্ঘ-চেতনা আমাদের একেবারে নাই বলিয়াই আজ এত দুর্নীতি, এত লোভ; আর তাহারই জন্য এত সুযোগ পরেও ভারতবর্ষ পরের ভিক্ষায় জীবন ধারণ করিতেছে। সকলে মিলিয়া সকলের প্রচেষ্টায় একটা গোটা ভারতবর্ষ বাঁচিয়া থাকিবে সুস্থ থাকিবে—এ কথা কেহই ভাবিতে পারে না—যাহারা শাসন করে তাহারাও নয়, যাহারা শাসিত হয়, তাহারাও নয়। তাহা হইলে সকলে মিলিয়া বাঁচা যায় কি করিয়া তাহারই কথা চিন্তা করিত—খাদ্য সৃষ্টি করিত ব্যক্তিগত ভাবে, ব্যাপকভাবে; তাহা হইলে খাদ্যে ওষুধে ভেজাল দিত না, তাহা হইলে নিজের লাভটাকেই বাড়াইয়া তুলিবার প্রবৃত্তিই বেশী করিয়া চলিত না। আজ সঙ্ঘ-চেতনা দরকার—অত্যন্ত দরকার; তুমি না হইলে আমি বাঁচি না, আমি না হইলে তুমি বাঁচ না—এই বোধই বাঁচিবার পথ। তাই বুদ্ধদেবের পূজা বুদ্ধদেবের সাধনা আমরা করিব। কেমন করিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে সঙ্ঘ-চেতনা ছাড়া রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কিছুতেই আমরা জয়ী হইতে পারিব না—এমনকি বাঁচিতেই পারিব না—আমরা সকলে মিলিয়া বাঁচিতে চাহিলেই শুধু বাঁচিতে পারব—এই কথাটা গোড়ায় বুঝিতে হইবে, মেনে করিতে হইবে। এই বোধ আসিলেই শুধু দুর্নীতি দূর করিবে—নাহলে আইনের চাপে বা রাজনীতির চাপে তাহা করে তাহার মূল্য খুব নয়। তাই ভগবান বুদ্ধের এই জন্মভূমি ক্ষণে আমরা ভারতবর্ষে সঙ্ঘ-চেতনার জনককে বার বার প্রণতি জানাই—তিনি আমাদের সঙ্ঘ-প্রেরণা দান করুন।

ভগবান বুদ্ধ সম্বন্ধে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার ১৩৬০ বৈশাখ সংখ্যা 'উদ্বোধনে' পত্রিকায় লিখিতেছেন, 'বেদ ঈশ্বর ও অদৃষ্ট সম্বন্ধে pre existing knowledge or ever cherished prejudice লইয়া বিশ্বের মানুষ যখন একদিকে নিজ জীবন ও বিশ্ব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যে গড়িয়া তুলিয়াছিল, যখন সেই বিধির অনুসরণ করিয়া মানুষ বেদ ঈশ্বর অদৃষ্টের ক্রীড়নকরূপে পরিণত হইয়াছিল, যখন মানুষ 'আত্মানং বিজানীহি' এই উপনিষৎ-মন্ত্রের ও 'আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ' গীতোক্ত এই বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য অবধারণ করিতে অক্ষম হইল, মানুষ যখন নিজের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হইল, প্রতিটি মানুষের যে শক্তি আছে বেদ ঈশ্বর অদৃষ্টকে গড়িয়া তুলিবার, ইহা জানিবার সাহসও যখন বেদ ঈশ্বর অদৃষ্টের চাপে অন্তর্হিত হইল, যখন মানুষ নিজকে অস্বীকার করিয়া, বিশ্বকে অস্বীকার করিয়া গতিধর্মকে বিসর্জন করিল, এবং স্থিতির সঙ্গে জীবনকে বাঁচিবার জন্য সাধন করিল, তখন আর এক দিকে বেদ-বিরোধী, ঈশ্বর-বিরোধী বিষময় এক

আলোড়ন তুলিবার উপযোগী সব-কিছু লইয়া একদল মানুষ নাস্তিক-আখ্যা পাইয়া, বিপুল গতিবেগ লইয়া সমাজের বুকে পড়িয়া উঠিয়াছিল। ভগবান তাহাদের এই নাস্তিকতাকে দিব্যরূপে ফুটাইয়া তুলিবার মহৎ ব্রত লইয়াই বুদ্ধরূপে প্রকট হইলেন, নাস্তিকরূপে বেদ ঈশ্বর অদৃষ্ট সম্বন্ধে উদাসীন রহিয়া মানুষের উপর, মানুষের শক্তির উপর, গতিধর্মের উপর জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিবার মন্ত্র দিয়া গেলেন। ঈশ্বর-শাসিত সমাজে সর্বপ্রথমে মানুষের পূজা তিনিই প্রবর্তন করিয়াছেন, তিনিই Father of Dynamism তিনিই বেদ নামক পুস্তকখানির বুকে জীবনবেদের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। তিনিই নিষ্ঠুর অদৃষ্টকে গড়িয়া তুলিবার দুর্জয় সাহস লইয়া কর্মবাদের প্রতিষ্ঠা দিলেন, ঈশ্বর নিরপেক্ষ মানুষের মূল্য নির্ধারণ করিলেন, পুরুষ-বেদ লইয়া অনন্ত শাখাযুক্ত বৈদিক মতবাদের বাড়াবাড়ির মধ্য হইতে জীবনকে উদ্ধার করিয়া জীবনের পায়ে গড়িয়া তুলিলেন, অথচ বেদ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়া দিলেন, জ্ঞান-নিরপেক্ষ কর্মের নাধারণ্য কীর্তন করিয়া গেলেন। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবার উপযোগী গৌরব এই ধরাকে তিনি প্রদান করিলেন

—বর্তমান সময়ে বুদ্ধদেবকে এইভাবে বুঝিতে হইবে—বুদ্ধদেবের চিন্তাধারাকে এই ভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে আমাদের জাগ্রত জীবনের দায়িত্ব দূর হইবে, অথচ তাহা আসক্তি বিহীন হইয়া নিষ্কৃতির জন্য দিবে না। কেবল জাগ্রত জীবন নয়, পরিশুদ্ধ জাগ্রত জীবন আজ প্রয়োজন। ভগবান বুদ্ধ তাহার নিশানা দিবেন। তাঁহার জয় হউক॥

"সবার উপরে মানুষ সত্য। হিন্দু তখনই সত্যকার হিন্দু, যখন সে 'মানুষ'; মুসলমানও তখনই সত্যিকার মুসলমান যখন সে মানুষ। মানুষ একান্ত হিন্দুরও 'উপর', একান্ত মুসলমানেরও 'উপর'। হিন্দু যখন সঙ্কীর্ণ হিন্দু-উপাধি ডিঙাইয়া মানুষের স্তরে আসীন হইবে, তখনই সে সত্য বাস্তব হিন্দু; মুসলমানও যখন সঙ্কীর্ণ মুসলমান-উপাধি পরিত্যাগ করিয়া মানুষের স্তরে উন্নীত হইবে, তখনই সে সত্য বাস্তব মুসলমান। দুই দুই থাকিয়া, দুই-এর বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া এবং তিন তিন থাকিয়া, তিন-এর বিশেষত্ব অটুট রাখিয়াও যেমন ছয়-এর মাঝে এক হইতে পারে, ঠিক তেমনি মানুষের মাঝেই হিন্দু-মুসলমান স্ব স্ব পারিবারিক সামাজিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া এক হইতে পারে। হিন্দু-মুসলমান যদি এই কৌশলের খোঁজ না রাখে, বুকে বুক মিলাইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য প্রাণপণ না করে, তবে হিন্দু মানুষও নয়, হিন্দুও নয়, মুসলমান মানুষও নয়, মুসলমানও নয়। সহজ মানুষকে জানিয়া, সহজ মানুষ বনিয়া গিয়া হিন্দু-মুসলমান নিজকে জানো, আত্মস্থ হও। * * মানুষ-রাজ প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের ধ্যানের বস্তু—হিন্দু-রাজও নয়, মুসলমান-রাজও নয়। * * *"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

উদ্বোধন

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৮৮৯ শকাব্দ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

বিংশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৬৯)

কথার পিছনে যদি জীবন না থাকে তবে তো কথা সঙ্গে একাত্ম না হয়ে যা' কিছু করা হোক তা সেবা নয়; বিকার···প্রাণহীন কথায় ঝগড়া বাড়ে—বাচোয়তণং বিকারঃ—কথা নিয়েই তো ঝগড়া—বেকার কথা, টাকার কথা, জ্ঞেয়বুদ্ধির কথা···। সেইজন্য প্রাণস্পর্শ না হওয়া পর্যন্ত কথা কইতে নাই—লক্ষ্মী না হয়ে লক্ষ্মীপূজা করতে নাই···এই এই গুণ থাকলে ভগবান হয়, এই এই গুণ নিয়ে লক্ষ্মী হয়···। যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং···তাঁকে নিজেকে দিতে পারলে তাঁর গুণ লাভ হয়, এমন কি ভূমা পর্যন্ত লাভ হয়···সামীপ্য এমন কি সারূপ্য লাভ হয়···অসতী স্ত্রী স্বামীর খুব কাজ করে—কিন্তু আসলে তাঁকে দিচ্ছে···আমি যার সেবা করি তিনি ভালবাসেন কাকে, আমি সেই পোলাও এটা তো আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি··· আমার বুদ্ধি দিয়েই যদি তাঁকে বুঝবো তবে তিনি গুরু হলেন কেন?...পিঁপড়ে যদি চিনির পাহাড় মাপতে যায়···?...তোমার পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে বুঝবে কেন?...কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি মেলানই জীবন... নিত্যগোপাল তিনটা মেলাতে এসেছেন। ···অহংকারী জীবের কর্ম-বুদ্ধি-ভক্তি কিছুই ভগবানে পৌঁছায় না। ভগবানে পৌঁছায় জীবন—নিরহংকারীর সেবা...। চব্বিশ ঘণ্টা জীবনে পূজা চলছে, জীবনে আরতি চলছে...। যে কর্মের জ্ঞানের বা বুদ্ধির পিছনে জীবন নাই, প্রাণ নাই—তাতে ভগবান নাই···। রান্না করে বা পা টিপে বা কিছু দিয়েই তাঁর সেবা হয় না—তাঁর আমি একাত্ম হলে সব কর্মই সেবা।... সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল সব কিছু তোমার পূজা, সেবা, যজ্ঞ...। কেউ ভালবাসে আদর করবার জন্য..., কেউ ভালবাসে, কিন্তু নিজের বুদ্ধি ছাড়তে পারে না···। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলছেন প্রয়োজনহীন ভালবাসার কথা, প্রয়োজনহীন কাজের কথা···ভালবাসি বলেই ভালবাসি, কাজ করি কাজ করতে ভাল লাগে বলে···প্রয়োজনাভাবাৎ...। তাঁকে খুশী করবার জন্য ভালবেসো, কাজ করো···। মালকে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, আমরা সকলে মিলে আজ যজ্ঞ করে নষ্ট করব যজ্ঞ করে সব কাজ করা যায় যদি আমিটাকে গোবিন্দে বলি দেওয়া যায়...। বসলি সংসার মজাদার, আমরা আমাদের পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি দিয়ে, অহংকার দিয়ে এটাকে আর রসাল রাখি না···। আমি জীবনের কর্ম করব—জীবন দিয়ে ভালবাসব··· তুমি জীবনস্বরূপ...আমার সকল দেহ মন প্রাণ দিয়ে তোমার আরতি করব...ধরার ধূলি হউক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম-মানুষ। জগন্নাথ নিত্যগোপাল, জগন্নাথ নিত্যগোপাল...।

৯, ২, ৫৬। ওঁ ··ওঁ ॥ নিত্যগোপাল আমার জীবন-স্বরূপ। ১৯১৯-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী প্রচলিত পথ ছাড়িয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়া ছিলাম। ···কত কষ্ট, কত কষ্ট...। তুমি বলিয়াছিলে, 'যখন যেখানে আছ

সঙ্গে সঙ্গে আছি...তবু কি, টেনে তুলবে।' ...তুমি সত্য ব্রহ্ম, যা বলেছিলে তা করেছ...তোমায় ডুবে যেতে দাওনি...। সেদিন তোমার নাম আমি গোপন করেছি...অথচ তুমিই ছিলে মূলাধার। গোপন করেছি এইজন্য যে আগে চিন্তাধারাটা ঘিরে যাই তারপরে মানুষ-জগৎখানাকে তুলে ধরব ...। কংগ্রেস আন্দোলনে ২৩ ঘণ্টা তোমার কথাই আলোচনা করেছি অথচ সেদিন কেউ জানে নি যে আমি তোমায়...। আজ তোমার নামে তোমার নরনারায়ণ আশ্রমে তোমার কথা কইছি। —আমার জীবনের ধ্রুবতারা তুমি ... এতে তো সংসার জটিল...। সংসারে আমার কেউ নাই, সন্ন্যাসেও আমার কেউ নাই—আছ শুধু তুমি...। নরনারায়ণ আশ্রমের জমি রিফিউজী হলে থেকে তুমি রক্ষা করেছ। আজ আবার এক দিগরে পড়া গেছে রাস্তা বানাতে জমি নেবে,...। সেই নলচিটীতে প্রেমের হওয়ার দিন ছিল জমি নকুলেশ্বর গাঙ্গুলী (Land acquisition serveyor) সে এসেছে আজ, তাকে স্বাগত জানাই—২৬ বৎসর পরে দেখা ...। যা ভাল বোঝ করো...নিত্যগোপাল, ক্ষুদ্র গ্রামে নিরিবিলি বসে আছি—কারো অমঙ্গল আমি চাই না...। আশ্রম তোমার, আমি সেবক...আজও দিনরাত্রি খাটবার জন্য প্রাণ আকুপাকু করে...দেহ ক্লান্ত.. কত দিন আর থাকব কে জানে ...? নকুলের সঙ্গে ২৬ বৎসর পরে দেখা—সে যে আমায় ঘৃণা থেকেও ভালবাসত তা কি আমি জানি? নবম আইন অমান্য করতে নলচিড়া গ্রাম থেকে কাপুর স্টেশন পর্য্যন্ত পুলিশ যখন আমায় নিয়ে যায়—নকুল তখন সেই গোরুগাড়ীতে ছিল ...। নিত্যগোপাল আমার রাজের দেবতা, জীবনের উপর কত ঝড়ই যে এ পর্য্যন্ত গেল...। মানুষকে ভালবাসি সেই অপরাধে মানুষ আমায় ত্যাগ করেছে...মানুষকে আমি অপ্রয়োজনে ভালবাসি...ভালবাসার জন্য ভালবাসি...। জানব বলে জানি—জানতে ভাল লাগে; কর্ম সম্বন্ধেও তাই।... এরই নাম কৃষ্ণের জন্য কর্ম করি ..তাই আমার কর্ম অনন্ত, জ্ঞান অনন্ত, ভালবাসা অনন্ত...। নিত্যগোপাল, জায়গাও তোমার, কাজও তোমার, দিন তোমার, দর্শন তোমার...যা হয় করো...। গোড়াদিল দিয়ে আর সংসার চলবে না—সমস্ত সংসারটা নূতন করে দেখা দিচ্ছে...বিপ্লব এসে পড়েছে...নূতন স্বামী নূতন স্ত্রী, নূতন মাথা, নূতন প্রজ্ঞা...এই সব নূতনের দেবতা শ্রীনিত্যগোপাল...। নিত্যগোপাল, তুমি সত্য। তুমিই আছ, আমি নাই...তোমার জয় হোক...। সারা জীবন আমায় কোলে করে এনেছ... আঘাতে আঘাতে চূর্ণ হই নি। জগন্নাথ নিত্যগোপাল, বিশ্বনাথ নিত্যগোপাল...।

১০, ১২, ৫৬। ও · ও একটী বীজের মধ্যে যেমন করে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ ঘুমিয়ে থাকে, সেই বীজ যখন মোহ জন মানুষ মধ্যে নিহিত হতে থাকে, তখন নিজের ভিতরকার গাছটে ফুটিয়ে তোলে, তেমনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পুরুষোত্তম ঘুমিয়ে আছেন ...শঙ্কর বললেন, জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ.... আকাশের ব্রহ্ম নয়, মাটির ব্রহ্ম পুরুষোত্তম...। পুরুষোত্তম হওয়া জীবের ভাগ্য-লিপি বীজের অনুকূল অবস্থা হলেই গাছ হবে...মানুষকে পুরুষোত্তম হওয়ার ধ্যান করতেই হবে। আমের বীজ যদি আম গাছ না হয় সে ব্যর্থ হল...পুরুষোত্তম না হলেও মানুষ ব্যর্থ হল। প্রত্যেক জীবের মধ্যে এই হওয়ার খোঁজা রয়েছে ...। সকল ক্ষেত্রে বিচরণ করা, নিরপেক্ষ ভাবে আস্বাদন করা হইতেছে পুরুষোত্তম-পথ-রেখা...। এ সাধন কে শেখাবে ..? সূর্যের আলো দিয়ে সূর্যকে চিনতে হয়—ব্রহ্মের কৃপা দিয়ে ব্রহ্মকে চিনতে হবে...। নিত্যগোপাল কৃষ্ণই—যিনি যে বস্তু তাঁকে পেতে হলে তাঁকেই আমার ভক্ত হয়ে আসতে হয়—মহাপ্রভুর শক্তিশ্রী তাই নিত্যগোপালের আস্তানায়—যিনি পানিহাটীতে, তিনিই বৃন্দাবনে—নিত্যগোপাল না এলে কৃষ্ণকে বোঝা যেত না। মহাপ্রভু নিশ্চাই কৃষ্ণকে প্রচার করে গেছেন—কিন্তু সেখানেও তো সাম্প্রদায়িকতা এসে গেছে...বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বড়,...বৃন্দাবন ছেড়ে কৃষ্ণ আসেন নি ইত্যাদি। নিত্যগোপালের কৃষ্ণ ঐ সাম্প্রদায়িক কৃষ্ণ থেকে পৃথক—একই কৃষ্ণ বৃন্দাবনে দ্বারকায়...। একজন বিশ্বরূপ, একজন স্বরূপ...। নিত্যগোপাল এক সার্বজনীন

কৃষ্ণ বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন···· আমি কোন্ প্রেরণায় ঘরবাড়ী ছেড়েছি, কোন্ প্রেরণায় পথকে আপন করি,ে কোন্ প্রেরণায় বেড়া বাঁধা দেখতে ঘণ্টায় পরম কষ্ট। দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, কোন্ প্রেরণায় কেউ গেলে দুঃখে নিষ্পন্দ হই, আবার অবশ না হয়ে পারি—আবার বেদান্তের উচ্চতম জ্ঞানে আরোহণ করতে পারি—কাজ করতে করতে তো ফুরিয়ে যাই নি—ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করেও জ্ঞানের সাধনা আমার ব্যর্থায় নি—দুঃখ জীবনে কম পাইনি—দুঃখা যেদিন গেল সেদিন এত বড় দুঃখ পেয়েছিলাম যে যা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না...সেই দুঃখ নিয়েও হুগলী জেলায় সভা করতে ঠিক গেছি সাগরের মত ডুব দিয়েও উঠে আসতে পারি···এই যে পারি এ শুধু যতটুকু নিজেকে নিত্যগোপালে দিয়েছি, তাঁর স্পর্শ যতটুকু ধরে রাখতে পেরেছি—তারই জন্য···। এই আমাকে জানতে হলে, পেতে হলে আমার মধ্যে তো ডুব দিতে হবে·· গভীরে যেতে হবে···। জীবন্ত কর্ম, জীবন্ত আসক্তি, জীবন্ত জ্ঞান চাই...বৃন্দাবনের কৃষ্ণ যেদিন ফুটে উঠবে সেইদিন আমার চরম হওয়া হবে... বিশ্বের গুরুর পীঠ মহানির্বাণ মঠ—সকল গুরুর সমন্বয়ের যে শিক্ষা তাই মহানির্বাণ মঠে···। নিত্যগোপালের প্রত্যেককে এমনই হওয়া হতে হবে।...যিনি সাধক, তিনিই সাধ্য...। স্বভক্তিশ্রী—আমারই অন্তরের পুরুষোত্তম স্বরূপকে ভক্তি করার যোগ্যতা যেন থাকে আমার··· পুরুষোত্তম-স্বরূপ ফুটলেই আমি সার্থক...। ৩ দিন-রাত্রি একটা ধ্যানের মধ্যে থেকো—কোথা আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি এ কথা সর্বদা মনের মধ্যে জাগ্রত রেখো··। বিশ্বের সকল হওয়ার মন আস্বাদন পুরুষোত্তম হওয়া...সব সম্প্রদায়ের শিক্ষাই আমাকে নিতে হবে নিত্যগোপালের হতে গেলে—সব শিক্ষা নিতে পারলে বিশ্বের সম্প্রদায় থেকে তো বড় সত্যই···। যখনই দেখি তোমরা বুঝে যাও কি হতে হবে, যেমনা বোধ করি ...।

২১, ১২, ৫৬।—ওঁ নমোঃ ওঁ। ঘটনার পর ঘটনা মানুষের জীবনে আসে—কিন্তু অনেকে সে সব ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে, ঘটনা থেকে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না—আমার কারো কারো জীবনে সে সব ঘটনা সহজ হয়ে যায়। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বিপদে ফেলার অনেক চেষ্টা করেছেন—কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না—কেমন সব অন্য রকম হয়ে যায়···। প্রকৃতিই কারো কাছে রুদ্রাণী, কারো কাছে কল্যাণী...। কেন? সত্যিকারের শরণাগত যে তার কাছে প্রকৃতি পথ ছেড়ে দিয়ে যায়...। আজ যা ঘটল (রাস্তার জন্য আশ্রমের জমি দেখতে আসে—কেউ কেউ সরদারকে বানিয়েছিল যে রাস্তার জমি আশ্রম নিয়েছে—ম্যাজিস্ট্রেট আসে নকুলেশ্বর গাঙ্গুলী সার্ভেয়ার সহ) তা এমনি একটা ঘটনা ···। আমি কিছুই করি নি...। জীবনে এমনি কত ঘটনা ঘটেছে। কত আগুন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, কত বড় রোষ শান্ত হয়ে গেছে, কত আপন জনের তিরস্কার নরম হয়েছে, কত গুরুতর আধিক দৈন্য পার হয়ে এসেছি···। এই রকম কত কত ঘটনা—কেমন শেষ সময়ে ঘটনার প্যাঁচ খুলে যায়...। কে কোথায় কেমন করে প্যাঁচ খুলিয়ে দিল—কে জানত এমনি হবে? নকুলেশ্বরকে চিনি না···। ২৬ বৎসর আগে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় নলচিড়া থেকে পুলিশ আমাকে নিয়ে খালের মধ্য দিয়ে বাজে সীমারে তুলবে—খালের পাড় দিয়ে সহস্র সহস্র লোক—তারি মধ্যে নকুল ছিল। আমাকে সে মনে করে রেখেছিল। সেই নকুল ছিল আজ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। ·· বাঁচতে যদি চাও, জীবনে ঘটনার চাপে নিষ্পেষিত হতে যদি না চাও তাহলে নিজের পরিচ্ছিন্ন আমিকে বিসর্জন দিয়ে সঙ্ঘের সাথে, বিশ্বের সাথে আর বিশ্বেশ্বরের সাথে আনন্দের যোগ স্থাপন কর। ঘটনার চাপ থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার দৃষ্টান্ত আমি···। তাই বলি নিত্যগোপালের শরণাগত হও ···। কোন ঘটনাই আজ পর্যন্ত আমাকে জেরবার করতে পারে নি···। তাঁর সেই বাণী 'ভয় কি, টেনে তুলব' আর 'সঙ্গে সঙ্গে আছি'—এই-ই আমাকে রক্ষা করে এসেছে। ···এক একবার অন্ধকার এমন ঘনীভূত হয়ে ওঠে যে ভাবি এইবার বুঝি গেলাম··· আবার দেখি আলো জ্বলে উঠল। ...অহংকারের একটা বিকৃতি আছে···নিজের বিচ্ছিন্ন অহংকারটাকেই যে

সর্বদা সবল করে না, যে শরণাগত—তার ভিতরে বাহির ভিতরে সর্বসংশয়···। সমস্ত পুরুষ একজন আছেন—পুরুষোত্তম···। কে এসে খুলে দিয়ে যাবে দুয়ার!··· সমস্ত বন্ধন কে খুলে দিয়ে যায়···। আগুনেই ফেল, হাতীর পায়ের নীচেই ফেল, বিষই খাওয়াও, পাহাড় থেকে সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দাও—সবখানেই তুমি আমার আছ—তোমার কোল বিছানো আছে। আমার জীবনের ক্লান্ততায় —তুমি শান্ত—তাই তোমার স্পর্শে সব শান্ত হয়ে যায়···। তুমি কত খেলাই আমায় নিয়ে খেললে—তুমি সত্য ব্রত সত্য সংকল্প—তুমি সর্ব শক্তিমান—সর্ব শক্তি তোমার দাস···। তোমার জয় হোক, আমার জীবনে তোমার জয় হোক···।

এরা (প্রতিবেশীরা) হয়তো হাসবে, এতদিন আমাকে যে পাগলে ফেলতে চেয়েছিল তা তো হল না—আমি কি করব ...? আমি তো এর মধ্যে কিছু করিনি তুমি তো জান···। ঠাকুর, আমি যেন নিজের স্বার্থে কিছু না করি—আমার দ্বারা যেন তোমার কলঙ্ক না হয়···। আমি তোমার চিহ্নিত দাস—এই যেন আমার একমাত্র পরিচয় হয়···। জয়, তাঁরই জয়··· আমি তোমার শরণাগত···সমুদ্র-স্নানে ঢেউয়ের কাছে মাথা নীচু করে থাকতে হয়, ঢেউ মাথার উপর দিয়ে পিঠের উপর দিয়ে চলে যায়···। সংসারে বিচিত্র বহু ঘটনার সামনে মাথা নীচু করে ভগবানের শরণাগত হতে হয়—সংসারের শত ঘটনায় ঢেউ মাথার উপর দিয়ে পিঠের উপর দিয়ে চলে যাবে···। আমার অনুরোধ বা আদেশ—শরণাগত হও, মুখ বিষ্ণু কর, কর্কশ ভাবে কথা বলো না, পরস্পরকে সহ্য কর, সত্য-চৈতন্যকে সর্বদা জাগ্রত রাখ। নিত্য-গোপালের শরণাপন্ন হলে ইহ পরকালের জন্য ভাবনা নেই···।

১২, ১২, ৫৬। ঐ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নিত্য-গোপালায় জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় তুরীয়াতীতায় ব্রহ্ম পরমাত্ম ভগবৎ পুরুষোত্তমায়···।

নারায়ণকে পাওয়া সহজ, নরকে পাওয়া খুব কঠিন! নারায়ণকে পেতে যোগ্যতা লাগে না, কিন্তু মানুষকে পেতে প্রচুর যোগ্যতা প্রয়োজন। বাপ মাকে পেতে যোগ্য হতে হয় না, তাঁদের পেয়েই আছে মানুষ—অন্যায় করলেও তাঁরা ত্যাগ করেন না—শাসন করেও আমার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই তাঁদের রাগ জল হয়ে যায়··· কোন যোগ্যতা না থাকলেও তাঁরা সমান স্নেহ করেন, বরং বেশী স্নেহ করেন—কিন্তু ভাই বোন সংসারকে পাওয়া খুব কষ্ট। সন্তানের কাছ থেকে একটু ইঙ্গিত পেলেই বাপমা তাকে কোলে তুলে নেন···দুর্বলতা দিয়ে বাবামাকে বাঁধা যায়···, পঙ্গু ব্যভিচারী চোর পুত্র বাবা মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় না, কিন্তু ভাইয়ের কাছে, সমান পর্যায়ের মানুষের কাছে যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হয়···। ভগবান এতটুকুও ভালবাসেন যারা যায় মত, কিন্তু মানুষকে ভাল না বাসলে সে ভাল বাসবে না, তেমনি তোমার যোগ্যতা দিয়ে তার ভালবাসা আদায় করতে হবে। আমাদের দেশে একে তো সঙ্ঘ-চেতনা একেবারে নেই, তার উপর একটা বিকৃত আত্ম-আভিজাত্যের ঢেউ এসে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনটাকে অসম্ভব করে তুলেছে। এমনিতেই মানুষ অপরকে হিংসা বিদ্বেষ করে, অপরের ভাল দেখতে পারে না, তার উপর মান অপমান বোধের বিকৃতিতে সঙ্ঘ গড়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। অহং-প্রধান আজ বর্তমানের মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে খুব বাধা দিচ্ছে। অথচ আজকের দিনেই ডিমোক্রাসি, আজকের দিনেই কম্যুনিজম—। স্ত্রীর পরামর্শে ছেলে মাকে বনবাস দিয়েছে, ছেলে ফিরে যাচ্ছে—রাজ উঠেছে; মা বলছেন—ভগবান, আর একটু পরে রাজ উঠুক—আমার খোকা ঘরে ফিরে যাক।—এ ব্যবহার কি ভাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া যাবে ...? নারায়ণ নিত্যগোপাল আমার ঘরে বসে আছেন, কিন্তু মানুষকে পাওয়ার জন্য দায়া জীবন ছুটলাম। বিশ্বকে না পেলে নারায়ণকে পাওয়ার পরিপূর্ণতা নেই ···। জাত্যাভিমান কুলাভিমান পাণ্ডিত্যাভিমান, পরস্পরের হিংসাবিদ্বেষ নিয়ে, কালী-পূজা হয়, কিন্তু জাত্যাভিমান প্রভৃতি নিয়ে মানুষকে পাওয়া যায় না। আজকে নিত্যগোপালের সাধনা—মা

এবং নারায়ণকে একসঙ্গে পেতে হবে—নয়নারায়ণ আশ্রম সেই কথাটা কইতে চাইছে···। পিতা এবং পিতার প্রকাশ সংসারে, গুরু এবং গুরুর প্রকাশ গুরু-ভ্রাতা-ভগ্নি—অর্থাৎ সঙ্ঘ একসঙ্গে পেতে হবে—পুরুষ প্রকৃতিকে এক সঙ্গে পেতে হবে ··। আমাকে ভালবাসা ভক্তি করা সহজ, আমি এক স্তর উপরে, আমার ছোটকেও মানুষ ভালবাসতে পারে—পারে না সমান অধিকার সম্পন্ন সম পর্যায়ের মানুষকে। সেখানে হিংসা বিদ্বেষ, মান অপমান বোধ, নিজের পাওনা বুঝি কম পড়ে গেল এই ভাব প্রচণ্ড হয়ে দেখা দেয়। অন্যের পারস্পরিক প্রীতি দিয়ে যদি প্রকৃতি বদল না হয়, যদি হিংসাদ্বেষ মান অপমান বোধের উপরে উঠতে না পার, তাহলে তোমাদের দিয়ে কি হবে? শিবানী বিড়ালীকে ডেকে ডেকে কতই তো খাওয়াই, তাতে কি তার মন পেলাম? নামজপ করেও ফাঁকি দেবে, বিনত হবে না, অহংকার যাবে না? লেখাপড়া বা যে যোগ্যতাই অর্জন কর—বিনয় শ্রদ্ধা না আসলে কিছুরই কোন মূল্য নেই, প্রকৃতি বদল না হলে কিছুই হবে না। নারায়ণে পূর্ণ প্রকৃতি বদল না হলেও করা যায়, কিন্তু বিশ্বকে, নরকে পেতে ফাঁকি দেওয়া চলে না—পরীক্ষা দিয়ে বিশ্বকে পেতে হয়...। পাওয়ার পথ এই—সকল দুঃখকে বরণ করে নিতে হবে, স্বার্থপরতা ক্ষুদ্রতা অহংকার ত্যাগ করে মানুষকে প্রাণের স্বচ্ছতার মধ্যে ভালবাসতে হবে, সকলে মিলে একজন—এই বোধ আনতে হবে—হিংসা বিদ্বেষ দিয়ে পাবে না···। দুর্বলতা দিয়ে যে-ভগবানকে পাওয়া যায়, সেটা ভগবানের এক দিক—কিন্তু ভগবানের আর একদিক যে বিশ্ব সেই বিশ্বকে পেতে অনেক যোগ্যতা দরকার, বিশ্বকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে হবে। বিশ্বকে বাদ দিয়ে যে ভগবান সে ভগবান খোঁড়া ভগবান। এক-পায়ে সে ভগবানকে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপন সম্ভব নয়। গুরু এবং গুরুর সঙ্ঘ এই দুই প্রকাশকে পাওয়ার সাধনা করে নয়নারায়ণ আশ্রম...যতদিন আছি মানুষকে পাওয়ার, মানুষের সেবা করবার চেষ্টা করব। নয়নারায়ণ নিত্যগোপাল, নয়নারায়ণ নিত্যগোপাল.....আমি নয়-নারায়ণের সেবক—আমি খোঁড়া ভগবান চাই না—আমি পরিপূর্ণ সুস্থ ভগবান চাই... আজ কবির মিস্ত্রী ও যোগেন এসেছে···। জগন্নাথে আমি অভিমান নাই, আমার অশুচি নাই...জগন্নাথ নিত্যগোপাল...জগতের হরিঃ হরিবোল জগৎ...ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল গলাগলি ধরে বসবে··আমার নিত্যগোপাল সর্ব ধর্ম সংগ্রহ, সর্ব আশ্রম সমন্বয়···তাই নিত্যগোপালের সেবায় ধরার ধূলি হবে ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হবে ব্রহ্ম-মানব

১৩, ১২, ৫৬। ওঁ...।

নারদের শ্লোক—

আরাধিতঃ যদি হরিঃ তপসা ততঃ কিম্
নারাধিতঃ যদি হরিঃ তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহিঃ যদি হরিঃ তপসা ততঃ কিম্
অন্তর্বহিঃ যদি হরিঃ তপসা ততঃ কিম্॥

—অপূর্ব শ্লোক। যদি জীবনে হরি-আরাধনা চলে তাহা হইলে তপস্যার কোন দরকার থাকে না—আরাধনাই তপস্যা। আরাধনা অর্থ একান্ততা—রাধাভাব বিনা হয় না আরাধনা, সে তাহের...আত্মনিবেদন···। অহংকার-পূর্বক তপস্যায় কিছু ফল হয় না...শরীর শুকিয়ে ফেলতে পার, মনের উপর অনেক অত্যাচার করতে পার·· তা হলেও আনন্দের মুক্তি বা ভগবান লাভ হয় না।... শ্রীক্ষেত্রে একাদশী নাই।···ভগবানকে সেবা যখন করব তখন শরীর সুস্থ না থাকলে চলবে কি করে? শুদ্ধভাই নিতাই পাল জন্মাষ্টমীর দিন উপবাসী, গায়ক শ্রোতারাও অভিষ্ট, আর প্রসাদ খেয়ে আমি সুস্থ মনে বেহে গান শুনি।···মুক্তাহার, মুক্তবিহার ..—ভোগ নয়···। মনের অন্তরে এমনি তপস্যায় শরীর শুকিয়ে যায়—ভালবাসার তপস্যায় শরীর স্নিগ্ধ হয়। ভালবাসার পরাকাষ্ঠা একান্ততায় —নিজেকে লয় করে দেওয়ায়—পৃথক থাকা মানে কামুকতা —আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা কাম—কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা প্রেম...। তোমার সঙ্গে আমার বুদ্ধি মেলাব—এইটে আমার সাধনা...ভালবাসি কিনা তার পরীক্ষা তাঁর বুদ্ধিমত চলতে পারি কিনা—আমার মেজাজ আমার খেয়াল বিসর্জন দিতে পারি কিনা—। শান্তিরাম দুই

বগল বাজা, গোলোকে তোর কিসের গাজা!···শাস্ত্রিয়াস গাজা টানে, আর এক তপস্বী কঠিন তপস্যা করে...। নারদ বৈকুণ্ঠে যাচ্ছেন—ওরা দুজনেই বলে দিল ওদের জন্য কি ব্যবস্থা হল জিজ্ঞেস করতে।...তপস্বীর তপস্যা আছে, কিন্তু বুদ্ধি শুদ্ধি হয় নি...। নারদ ওদের জানালেন, বৈকুণ্ঠের ঠাকুর ছুঁচের ছেঁদায় হাতী ঢোকাচ্ছেন আর বের করছেন। শুনে বিজ্ঞ তপস্বী হেসে বলল নারদ মোটে বৈকুণ্ঠে যানই নি—কেননা ছুঁচের ছেঁদা দিয়ে তো আর হাতী ঢোকানো যায় না···। বৈকুণ্ঠের ঠাকুর ছুঁচের ছেঁদা-মধ্যি দিয়ে হাতী ঢোকাতে পারেন এ বিশ্বাস তার নেই, আর গাঁজাখোর শাস্ত্রিয়াস বিশ্বাস করে বৈকুণ্ঠের ঠাকুর হাতী কেন বিশ্ব ঢোকাতে পারেন। এই বিশ্বাস তার মুক্ত এনে দেবে ছিল ···এ রকম একটা বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে ...কুসংস্কারী ভিতরে বাইরে কুসংস্কার করছে...। অন্তরে বাইরে হরি যদি না-ই রইলেন—তপস্যা করে কি হবে? হরি যদি রইলেনই, তবেই বা তপস্যার দরকার কি?...অহংকার নিয়ে দুয়ারে ঢোকা যায় না...। আমার অহং বলে, মমতা বলে কিছু নেই ··তোমার যা কিছু তাই আমার—আমার আপনার বলে স্বতন্ত্র কিছু রাখব না...আমি তিনের গৃহিণী হব।···অগ্রহায়ণের শুক্লা একাদশীতে গীতা জয়ন্তী··· এই দিন গীতামুখে বরণ করেছিলেন ভগবান।...গোপীর জন্য এই দিনে···গোপী, মানুষ হও, গীতা-জীবন যাপন কর···। ঠাকুর, এই গীতা-জয়ন্তীর অধিবাস উপলক্ষে আমি শরণাগতির সাধনা নেই...তোমার মন, তোমার বুদ্ধিই আমার বুদ্ধি; আমার অহংকারে নিয়ে আমি ছুটব না···। গীতা অমৃত...তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবি-ভিরিড়িতং...(গীতাজয়ন্তী পুস্তিকা দ্রষ্টব্য)। নিত্যগোপাল কাদাচোর, নিত্যগোপাল···ধরার ধূলি হউক ব্রজ-ধূলি, ধরার মানুষ ব্রজ-মানুষ।...আমি শরণাগত, আমি শরণাগত।

১৫, ১২, ৫৬। ওঁ নমো···ওঁ। আজ গীতা-জয়ন্তী—অগ্রহায়ণের শুক্লা একাদশীতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মাঝে যখন দুই দল মুখোমুখি হয়ে সমবেত হয়েছিলেন, তখন এই দিনে শ্রীকৃষ্ণ গীতা বলেছেন। সহস্র সহস্র বৎসর ধরে গীতা চলে আসছে···গীতার ব্যাখ্যাও চলে আসছে। কিন্তু নিত্যগোপাল আমার জীবনে গীতার যে ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছেন তা বর্তমান যুগে বিশেষ উপযোগী···। অহৈতুকী কৃপা তাঁর—আমার মত সকল দিকে অযোগ্য এক জনের কাছে এই ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছেন।...আমি শংকরাচার্য নই···আমাকে দিয়ে নিত্যগোপাল সাধন করেছেন...এ পর্যন্তও বুঝি—কিন্তু পরের ঘটনাগুলি আর ব্যাখ্যা করতে পারছি না—এ গীতার ব্যাখ্যা কি আমারই জন্য? এ জিনিষ ছড়িয়ে দেবার জন্য প্রাণপণ করছি—কিন্তু কিছুতেই অনুকূলতা পাচ্ছি না।···ঠাকুর লিখেছেন, তুমি ও মা নিয়ে গীতা।...গীতা বুঝতে পাণ্ডিত্য দরকার নেই...আমি জীবনের মধ্যে গীতা পেয়েছি—বুদ্ধির মধ্যে নয়...। বই পড়ে কিছু হয় না—বইতে ধরে রাখবার সুবিধা হয়...তাদের রূপ তাদের, তাদেরকে ধরে রাখতে তাদের দরকার...কিন্তু তাদেরকে জীবনে সত্য করে তুলতে হবে আগে ··ঠাকুর লিখছেন, 'পরম জ্ঞান গীতার মহাকাব্য···গীতা আমার সারাৎসার'। এই গীতা-জীবন দেবার জন্য মানুষকে বুকে পুষেছি ..যে যখন এসেছে তুলে নিয়েছি...রাজেন এসেছিল...। বুকে তুলে না নিলে তো জ্ঞান দেওয়া যায় না···সেই খানে এক হিসেবে আমি ব্যর্থ...। বুকের রক্ত দিয়ে আমার গীতা লেখা—আমাকে যারা ভালবাসবে তারা যদি গীতা ভাল না বাসে...। আমার গীতা আমার ব্রহ্মসূত্র ভক্তের নিত্য পাঠ্য হোক।···এ পড়বার জন্য কার যায়? আমার নিত্যগোপালকে পেতে হলে পড়তে তো হবে...।

ক্রমশঃ

সাহিত্যে লোক-সাহিত্যের স্থান

॥ শ্রীবিভা সরকার ॥

আমরা তাকেই সাহিত্য বলি যা এগিয়ে নিয়ে যায়, দান করে জীবনের গতিবেগ, যা চির পুরাতনের আবেষ্টনীতেও আপন মহিমায় চির নূতন। যুগান্তের জীবনের ধারা সেই যুগের সাহিত্যের বুকে প্রতিফলিত হয়ে আছে ভাবীকালের বংশধরগণের প্রতীক্ষায়।

সাহিত্য শুধু সত্যই নয় আরও কিছু অধিক। আমাদের সাহিত্যে ওতপ্রোত হয়ে মিশে আছে এক একটা যুগের ছবি।

জীবনে যা সত্য অথচ সব সময় পাওয়া যায় না সেই সব ছবি ও জীবনের আদর্শকে আমরা সাহিত্যে রূপায়িত দেখতে চাই। কাম্য রূপের আরাধনা জীবনে করি, তারই সার্থক রূপটি কাব্যে প্রস্ফুটিত দেখে মুগ্ধ হই তৃপ্তি লাভ করি।

সাহিত্যিক হবেন সত্যান্বেষী। তাঁর থাকবে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি। প্রতিদিনের ছোট ছোট ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় আমরা যারা সাধারণ তারা কিছুই দেখি না, কিন্তু যিনি সাহিত্যিক তিনি তাঁর দিব্যদৃষ্টি দৃষ্টি দিয়ে তারই মাঝে দেখতে পান একটা অপূর্ব ছবি—কোনও এক অজানা অমৃতের সন্ধান। তিনি শুধু দেখেই তৃপ্ত হন না, তিনি তাঁর আপন অনুভূতি দিয়ে বিশ্বের দরবারে তাকে ফুটিয়ে তুলতে চান। কবির ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে সেই সামান্য সত্যটুকু যখন আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে তার ঐশ্বরীক অপূর্ব রূপ নিয়ে—আমরা সাধারণেরা তখন অবাক বিস্ময়ে সেই দিকে চেয়ে থাকি, আর মুগ্ধ কণ্ঠে বলতে চেষ্টা করি—ধন্য তুমি, সার্থক তোমার লেখনি।

সাহিত্যিক জীবন-শিল্পী, সাহিত্যিক নিপুণ কারিগর। জীবনের বাস্তবতার প্রতিমূর্তি নিয়ে নানা সূক্ষ্ম কারুশিল্পে তাকে সুন্দর করা, মনোহর করা, আকর্ষণীয় করাই তাঁর কাজ।

জাতির সাহিত্যই তাহার সভ্যতার প্রতীক। একটী জাতির উত্থান পতন, তার সভ্যতা, তার কৃষ্টি, তাদের সামাজিক রীতি নীতির একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা সেই জাতির সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই। সাহিত্যিকের কর্তব্য বড় কঠিন। তাঁর দায়িত্ব সামান্য নয়। তিনি একটি জাতির গৌরব রচনে অংশ নেন, তাঁরই লেখনির মধ্য দিয়ে সমস্ত জগৎ দেখতে পায় সেই জাতির ঐতিহ্য—তাই সাহিত্যিক গভীর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, স্বাধীন চেতা ও সত্যকার পাণ্ডিত্যের অধিকারী হবেন।

আমাদের জীবন কেবল মাত্র সুখের সমষ্টি নয়। আমাদের আছে নানা জটিলতা, নানা অন্তর্দ্বন্দ্ব। প্রভাত-পদ্মে একবিন্দু শিশিরের মতই আমাদের জীবন-পদ্মে বেদনার একবিন্দু অশ্রু সদাই বিরাজমান—জীবনের মধুরতম মুহূর্তের মধ্যেও বেদনার সঙ্গীত নিহিত হয়ে থাকে। মহাকবি শেলি একটী অমর পংক্তি লিখেই চিরন্তন হয়ে গেছেন এবং সে লাইনটী তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা স্কাইলার্ক এর একটি পংক্তি। Our sweetest songs are those that tell us sadest thought. অর্থাৎ আমাদের মধুরতম সঙ্গীত সেইগুলিই যেগুলি চরমতম দুঃখের ভাবনার ওতপ্রোত। বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমাদের এগিয়ে চলতে হয়। এক হিসাবে আমরা প্রত্যেকেই সৈনিক। এই সংসার রণ-ভূমে আমাদের জয়ী হওয়া চাই সত্যের জন্য হাসি মুখে মৃত্যুকে বরণ করাই আমাদের ধর্ম; সে শুধু দুর্ভাগা নয়, সে দুঃখী যে সামান্য লৌকিক সুখের জন্য সত্যকে জীবনে অস্বীকার করে যায়।

একটি জাতির উত্থানের জন্য সাহিত্যিক যেমন গৌরবের ভাগী হবেন তেমনি তার পতনের জন্যও তাঁরাই কিছুটা দায়ী। সাহিত্যিকের কর্ম জনতার মন জাগিয়ে তোলা। সাধারণ ধারা তাদের মধ্যে জ্ঞানের পরিবেষণ করা।

সাহিত্যিক ভরসেন তাঁর আলোর পরশ-বুলির ছোঁয়ায় সাধারণ চিত্তকে আলোকিত—তিনি-খাবরেন তুচ্ছ খাথের হানাহানি দলাদলির বহু উর্ধ্বে এক মানস তপস্যার ক্ষেত্রে।

একটা জাতিকে জাগিয়ে তুলতে হলে সর্বাগ্রে গড়ে তুলতে হবে লোক-সাহিত্য। লোক-সাহিত্য আমরা তাকেই বলি যা সর্ব সাধারণে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারবে। আমরা তাদের মধ্যেও আভিজাত্য দেখতে পাই—এরও মূল্য কম নয় তবে এ জাতীয় সাহিত্য বোঝে কেবল মাত্র মুষ্টিমেয় কয়জন শিক্ষিত মাত্র। সর্ব সাধারণের দরবারে এর স্থান হয় না। আমরা রবীন্দ্র সাহিত্যকে এই জাতীয় বলতে পারি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দার্শনিক কবি, রাজর্ষি পুরুষ। তাঁকে উপলব্ধি করা সহজ-সাধ্য নয়। সাধারণ জনসমাজ সেই মহামানবের আভাষ পেয়েছে কিন্তু আজও নাগাল পায়নি। তিনি সবার মাঝে থেকেও সবা হতে দূরে এক উচ্চ মানস লোকে বাস করতেন। তিনি জাতীয় জীবনে সংস্কারের হোতা। তাঁর কাব্য শিক্ষিত মনকে অপূর্ব রসালোকে নিয়ে যায় এ কথা সত্য, কিন্তু জনমন আজও তাঁকে উপলব্ধি করেনি। তিনি ছিলেন আভিজাত্য সংস্কৃতি আভিজাত্যের প্রতীক। তাঁর কাব্য তাঁর কবিতা তাঁর লেখনীর ছত্রে ছত্রে সেই মহামানবের বিরাটত্বই ফুটে ওঠে।

আমরা শরৎচন্দ্রকে বরং জনতার মাঝখানে দেখতে পাই। তিনি জনতার কবি। দারিদ্র্যের মধ্য থেকেই তাঁর আগমন আর সমাজের অতি সাধারণ এমন কি নিম্ন-মধ্যবিত্তের একান্ত নিকট হবার সুযোগ লাভ করেছিলেন তিনি। তাই সাধারণ জনতার সম্বন্ধে তাঁর যা উপলব্ধি তা দূর থেকে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণে নয়, তা তাঁর প্রত্যক্ষ জীবন-উপলব্ধি সত্যের সমুখীন অভিজ্ঞতা। তাঁর জীবন তালবন্ধ নানা অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। মাটির ধূলাকে তিনি দুই হাতে গ্রহণ করেছিলেন, সে অভিজ্ঞতা তাঁর ঝাড়িয়ে ফেলবার জো নয়। তাঁর লেখনি বারবার জনতার সূক্ষ্ম তারে ঝঙ্কার দিয়ে যায়। তিনি দুঃখীর জন্য কেঁদে-ছেন। তাঁর সে ক্রন্দনে কোনও ফাঁকি ছিল না। তিনি সত্যই দরিদ্রের বেদনা, পতিতের গ্লানি আপন অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন। তাই আজও আমরা তাঁর দুঃখী নায়ক নায়িকার ব্যথায় না কেঁদে পারি না। তাঁর নায়ক নায়িকারা আমাদের চির চেনা, একান্তই ঘরের মানুষ। তারা সাধারণ রক্ত মাংসের প্রাণী বোধে ওঠে। জীবনের দৈনন্দিন ঘাত প্রতিঘাতে তারা জীবন্ত। তারা আমাদের চেনা একান্তই পরিচিত কিন্তু তারা কেউ ছোট নয়। আমাদের আপাত দৃষ্টিতে যারা ঘৃণ্য, যারা পতিত, তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও গভীর দরদ-বোধ তাদের মধ্যেও মানবতার চরম বিকাশ দেখেছে। তাই তিনি সাবিত্রীকে খুঁজে পেয়েছিলেন। সাধারণ একটী মেয়ের মধ্যে এত বড় নারী-চরিত্র বোধহয় খুবই কম সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর লেখনির যাদুকরী স্পর্শে সাবিত্রীর নারীত্বকে মহত্বকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই বিনা দ্বিধায়, শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি ধনীর দুঃখে ও দরিদ্রের কুটিরে সমভাবে বিচরণ করেছে। যেমন তিনি দরিদ্রের ঘরে প্রাণ-স্পর্শ রেখেছেন তেমনি তাঁরই লেখনি সৃষ্টি করেছে অভিজাত কুলগৌরব বিপ্রদাস বন্ধনাকেও, পার্বতীর মত মেয়েকেও। তাঁর কাছে অর্থগৌরবে কেউ ছোট নয়, কেউ হীন নয়। মনুষ্যত্বের বিচারে ছোট বড়র বিচার করে গেছেন তিনি।

লোক-সাহিত্যের কথা বলতে গেলে আমাদের রামায়ণ মহাভারত এক একটি মহান দৃষ্টান্ত। আমরা দেখতে পাই এই মহাকাব্য দুইখানি ধনী দরিদ্রের কুটিরে আজও বছরের পর বছর সমভাবে আদৃত হয়ে আসছে। এই কাব্য দুটি আমাদের জাতীয় সত্যতার প্রতীক। এখন দেখতে হবে কেন এরা কালের অক্ষয় সম্পদ হয়ে এই মর্ত্যলোকে অমরত্ব লাভ করেছে। আমরা আপাত দৃষ্টিতে দেখি এই মহাকাব্য দুটি রচনা কথা—এর আছে দুটি দিক, একটি অতি সূক্ষ্ম যার স্থান জ্ঞানীজনের মানস-লোকে আর একটি অতি স্থূল যা অতি সাধারণ-গ্রাহ্য, যা পণ্ডিত মূর্খ নির্বিশেষে সমান মনোহারী। রামায়ণের কবি দেবতা মানবের দ্বন্দ্ব নিয়ে তাঁর কাব্যের গোড়া পত্তন করেছেন। তাঁর নায়ক রামচন্দ্র সাধারণ মানবের উর্দ্ধে। তাঁর আচরণ উপলব্ধি করা সবার পক্ষে সহজ সাধ্য নয়। তিনি ধরার অবতার, বিনয়ের পরাকাষ্ঠা,

জ্ঞান ও ভক্তির দৃষ্টিদানে প্রতীক। অথচ তিনি কর্তব্যে কঠোর, ন্যায়নিষ্ঠুর বিচারক। তাঁর ন্যায় দণ্ড কখনো বা পক্ষপাতের কলুষে কালিমা-লিপ্ত হয় নি। সৌর্যে তিনি কালান্তক অথচ তিনি মনমনহারী সীতাপতি রামচন্দ্র।

এই কাব্যের ছত্রে ছত্রে আমরা দেখি নাটকীয় পরিণতি। সাধারণ যারা তারা দেখছে রামচন্দ্রের যুদ্ধ হল রাক্ষসরাজ রাবণের সঙ্গে—উদ্দেশ্য সীতার উদ্ধার। তারা এর মারামারি হানাহানি হৈ হৈ নিয়েই ব্যস্ত। সীতার বনবাসে তারা ব্যথিত হয় তবু তারা রাঘবরামের সামাজিক বুদ্ধিকে প্রশংসা না করে থাকতে পারে না—তারা সীতানির্বাসনকারী রামচন্দ্রকে চেনে উপলব্ধি করে; কিন্তু বিস্ময়ে অবাক না হয়ে পারে না যখন সেই রামচন্দ্রই স্বর্ণসীতার সন্ধান করেন। এই যে স্বর্ণসীতার কল্পনা এটা ঠিক সাধারণের বুদ্ধির বিচার্য নয়—এ গভীরতা, এ জ্ঞানদৃষ্টি সাধারণের কোথায়?

তখনকার মত যুগে যখন বহুবিবাহ রাজাদের নিয়ে কাব্য, সেই যুগেও তাঁর নায়কের এক পত্নীত্বে নিষ্ঠা বাল্মীকির চিত্তের মহত্বই ঘোষণা করে। তখনকার কালে এ কল্পনা বিরাট ও আত্মদৃঢ়তার পরিচায়ক যেখানে কবি রামচন্দ্রকে সাধারণ মানুষ রূপে ফুটিয়েছেন সেখানেই দেখি তিনি ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী। অতি আধুনিক যুগের মানুষও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ত্রুটি আবিষ্কার করতে পারবে না। স্বাধীন মানব রামচন্দ্র শবরীর এঁটো ফল খেয়েছিলেন পরম আনন্দে পরম সন্তোষভরে তার ভক্তির, তার সরলতার, তার প্রেমের মান রক্ষার ইচ্ছায়। আবার এই রামচন্দ্রই রাজারূপে শূদ্ররাজাকে বধ করতে দ্বিধা করেননি কেন না অপরাধে যেহেতু সে যুগের সামাজিক মানদণ্ডে শূদ্রের যজ্ঞ করার কঠিন অপরাধ।

সাধারণ লোকে রাজা রামকে সব সময়ই উপলব্ধি করে, কিন্তু মানব রামকে সব সময় উপলব্ধি করে না। বাল্মীকির বিশেষত্ব এই খানেই তিনি একাধারে সাধারণের ও পণ্ডিতের উপলব্ধ বিষয় তাঁর কাব্যে পাশাপাশি স্থান করে গেছেন। আমরা দেখতে পাই নারীত্বের মহিমা, একনিষ্ঠতার পরাকাষ্ঠা, মূর্তিমতী ক্ষমা ও ধৈর্যের প্রতিচ্ছবি আত্মা-রূপিণী সীতায়। তিনি ছায়ার ন্যায় স্বামীর সহচারিণী হয়েছেন—স্বর্ণ-মৃগে রাম-বিরহে তিনি অধৈর্যতা, মনস্তাপ আজ তিনি নীরবে মাথায় তুলে নিয়েছেন, একটি কথাও রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে বলেন নি। শুধু বলা নয় তাঁর মনেও আসেনি এইটাই আমরা কাব্যে দেখি। এই নায়কার এই চরিত্র আমরা সাধারণের মধ্যে কল্পনা করতে পারি না—এ চরিত্র দশ সময় বুদ্ধির গোচরে আসে না তবু শ্রদ্ধায় মাথা নত না করে পারি না। কবি আমাদের সামনে এই সীতার আর এক মূর্তি দেখিয়েছেন সীতা হরণের সময়ে রাবণের প্রতি তাঁর ব্যবহারে সেখানে দেখি তিনি তীক্ষ্ণ অগ্নির ন্যায় ভীষণা, তিনি বীরাঙ্গনার ক্ষত্রিয় ধর্মী—তাঁর সাধ্য কে মূর্তিকে অপমান করে! শত রাবণও তাঁর তেজোদৃপ্ত মূর্তির সামনে মন্ত্রজিত সর্পের মত নতশির অবনত করে। এই সীতাকেই আবার বিচলিতা হতে দেখেছি রামচন্দ্রের বধ সংবাদে। সেই একটিবার মাত্র রামের প্রতি সীতার সংশয়, সীতার অভিমান—বুঝিবা রামচন্দ্র পুনর্বিবাহ করে তাঁর পত্নীত্বের মহিমায় আঘাত করেছেন। কিন্তু তা ক্ষণিক। পতি-গতপ্রাণা সীতা আনন্দে পুলকাশ্রু নয়নে শুনলেন স্বর্ণসীতার সংবাদ—রামচন্দ্রের পত্নী এক এবং সে সীতা!

সীতার বনবাস আপনার সকলেই উপলব্ধি করেছে। রাজা হিসাবে তাঁর আত্মগতের প্রশংসা সকলেই করেছে কিন্তু কয়জন উপলব্ধি করেছে সীতাপতি রামচন্দ্রের হৃদয়-বিদারক বেদনা এই সীতা-বনবাসে! স্বর্ণসীতার পরিকল্পনায় এর প্রায়শ্চিত্ত যা সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করেনি; তবু আমরা আজও উপলব্ধি করতে পারি না রামচন্দ্রের মত আদর্শ নায়কের দ্বারা এমন নিষ্ঠুর কাজ বাল্মীকির মত স্নেহাতুর কবি কেমন করে করাতে পেরেছিলেন। পতি হিসাবে তাঁর যে কর্তব্য তাকে কি তিনি বিসর্জন দেন নি? সন্তান-সম্ভবা আপন সন্তানের জননীকে মিথ্যা লোকাপবাদের ভয়ে পরিত্যাগ করা শুধু অন্যায়ই নয় পরন্তু পরম কাপুরুষোচিত বলে আমাদের আধুনিক

যুগের মানুষের মনে হয় মানুষের রীতি নীতি ও চিন্তাধারা কত যে বদলে যায়! এক যুগে যা ন্যায় অন্য যুগে তাই একান্ত অন্যায় রূপে প্রতিভাত হয়। কিংবদন্তি নিষ্কলঙ্ক জীবন তারও নয়—এমন কি চাঁদেও কলঙ্ক—তাই রামচন্দ্রের একমাত্র কলঙ্ক এই সীতার বনবাস! জনক-তনয়া ধরিত্রী-দুহিতা সীতা মূর্তিমতী ক্ষমা ও চির ধৈর্যশীলা! তবু তাঁরও ধৈর্য বিচলিত হয়েছিল বারংবার পরীক্ষিত হবার উৎপীড়নে! রাণীর গৌরবে তিনি সভার নিমন্ত্রণ নিয়েছেন। ধনের সামনে রঘুকুলকে কলঙ্ক-মুক্ত করেছেন; তারপর তিনি সবাকার পরিচয় সন্দেহের বুকে পদাঘাত করে চলে গেলেন অপূর্ব মহিমায়। পাতালে প্রবেশ করে তিনি তাঁর সব সমস্যা সমাধান করে নিয়েছেন। তবু সে পথ সমস্যা সমাধানের পথ নয়, এ শুধু বিলুপ্তির অন্ধ অভিমান ঘোষণা। সীতার জীবনে যে সমস্যা মহাকবি তা সমাধান করতে পারেন নি। এখানে তিনি পরাজিত। আজ আবার দেখা দিয়েছে এই সমস্যা সমাজের বুকে নিদারুণ রূপ নিয়ে—কত রাবণ আজ বাহু মেলে কত অভাগিনীকেই না হরণ করেছে, কিন্তু উপায় কি তাদের? পথ কি তাদের? আজ আর হার মানলে চলবে না—খুঁজতে হবে অন্যপথ যা বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের করবে ত্রাণ যোচন—আমাদের করবে সত্যে প্রতিষ্ঠিত মিথ্যার অনন্ত পাষাণ ভার হরণ। সর্বত্র সমন্বয় ও দুই সমাধানের প্রয়োজন হয়েছে এবং চিরদিনই ছিলো—তবে আমাদের এই যুগ-সন্ধি ক্ষণে সে যেন আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।

সমাজের দ্বারে আজ সহস্র সীতা সমাধান চায়—সুবিচার চায়—পথ চায়!

আমাদের শিক্ষা

॥ শ্রীসুনীতি চক্রবর্তী ॥

শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসলে মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের সেই বাণী "Education is the manifestation of the perfection already in man"। মনুষ্য জীবনের বিকাশ লাভের প্রচেষ্টাই শিক্ষার মূল্য উদ্দেশ্য। প্রচলিত কথায় আমরা সর্বদা বলে থাকি লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে হবে। আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি আবার মানুষ হতে হবে। মানুষ জন্ম লাভ করেও যে মানুষ হওয়া আমাদের অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি না শিক্ষা লাভ করি। কবি গাইলেন "শুনরে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"। সবার উপরে যে-মানুষ সত্য সে মানুষ কোন্ মানুষ? সত্য মানুষ সে-ই যে জীবনে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করে বিশ্ব-কল্যাণের জন্য নিজের জীবনকে বিকশিত করতে পেরেছে।

এই জীবনকে বিকশিত করবার শিক্ষা এবং সমাজের, বিশ্বের কল্যাণময় গড়বার শিক্ষায় নারী-পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার এবং সমান কর্তব্য রয়েছে। কয়েক যুগ কেটে গেছে যখন নারী-শিক্ষা সকল ব্যবস্থার অতল জলে ডুবেছিল। নারীর কোন স্বাতন্ত্র্য ভারতীয় সমাজে ছিল না—'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' কিন্তু ধীরে ধীরে কালস্রোতে সে সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার, আজ কর্মক্ষেত্রের সকল স্তরে মানুষ-নারীর সহযোগিতা অপরিহার্য হয়েছে।

কিন্তু আমরা নারীসমাজ আজ বাইরের দিক থেকে খানিকটা শিক্ষিতা হয়েছি বটে কিন্তু সত্যটুকুর দিকে যখন তাকাই মনে হয় আমাদের শিক্ষা যারা manifestation of the perfection না হয়ে শুধু কতকগুলো collection of informations হচ্ছে না ত? আমাদের শিক্ষায় হাওয়া কোন্ দিকে বইছে এ কথা ভাববার সময় হয়েছে।

কোন কিছুকে জানতে হলে, শিক্ষাই তার একমাত্র

যাবেন। আমরা জানব কাকে? আত্মানং বিদ্ধি—জানতে হবে আমাদের আত্ম স্বরূপকে, শিক্ষা দ্বারা জাগ্রত করতে হবে আত্ম শক্তিকে। কেবল মাত্র বাইরের শিক্ষাতেই মানুষকে পূর্ণ করে তোলা যায় না, তাই শিক্ষা আমাদিগকে একদিকে যেমন বাস্তব জগতের তত্ত্বগত বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা দেবে, অপর দিকে তেমনি আমাদের স্বরূপের উপলব্ধির, স্বরূপকে জানবার পথের সন্ধান দেবে।

ভোগ-সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্যের প্রভাবে আমরা ভারতীয় সমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের স্বরূপের ক্ষেত্র থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছি। ভড়ংদার-সর্ব্বস্ব হওয়ার ফলে আমরা সাজে সজ্জায়, চলায় বলায় পাশ্চাত্যের নামে উচ্ছৃঙ্খল, অসুন্দর জীবনেরই পূজারী হয়ে চলেছি অথচ আমাদেরই সত্তার চারদিকে বেদ উপনিষদ্ ভাগবতের মানব-কল্যাণ বাণী আজও তেমনি ধ্বনিত হচ্ছে। তাই আজকের অসুন্দর আমরা আবার সুন্দর হতে পারব এই আশা নিয়েই পথ চলব। মনে পড়ে এই ভারতেরই নারীর উক্তি "যেনাহং নামৃতম্ স্যাম্, কিমহং তেন কুর্য্যাম্"—যা আমাকে অমৃতের সন্ধান দেবে না তা নিয়ে আমি কি করব?' সত্যি কথা, যে শিক্ষা, যে সম্পদ মানুষকে অ-মৃত করবে না, কল্যাণী রূপে গড়বেনা সে শিক্ষা ব্যর্থ শিক্ষা, সে সম্পদ নিরর্থক সম্পদ। তাই শিক্ষা লাভ করে আমরা মানব জীবনে চলার ছন্দ, শিখব মাত্রা জানব, যে ছন্দে, যে মাত্রা জানে জীবন হবে সুন্দরতর, ফুটে উঠবে ভাগবতী সৌন্দর্য্য, ভাগবতী শ্রী।

আমরা ভুলে যেন না যাই, আমরা ভারতীয় নারী। ভারতীয় মনুষ্যত্বের আদর্শ সামনে রেখেই আধুনিক জগতের যা কিছু আমরা গ্রহণ করব বর্জ্জনীয়কে বর্জ্জন করব। তাই আমাদের হতে হবে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, স্নেহে উমা, ত্যাগে সীতা, যোগে যোগমায়া। সব কিছু শিক্ষালাভের মূল্য উদ্দেশ্য হবে এই 'হওয়ার' পথের যাত্রা।

প্রাকৃতিক নিয়মে সাধারণত নারী প্রাণ-প্রধান এবং পুরুষ বুদ্ধি-প্রধান। পুরুষ ও নারীর সহযোগিতায় ভারত তথা সমগ্র বিশ্ব নতুন সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার চোখ ঝলসানো আলোতে দেখতে পাই সর্ব্বত্র একটা প্রাণহীনতার অবস্থা, দেখতে পাই বুদ্ধির ছুরিকাঘাতে মনুষ্য জীবন রক্তাক্ত। মানুষের জীবনে যেন প্রয়োজন যেন হেন প্রকারেণ অর্থলাভ ও একমাত্র ঐহিক সুখ সম্পদ ভোগ। সমাজ-জীবনে এই যে বিকৃত ও অসুস্থ অবস্থা ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছে এর একমাত্র সুষ্ঠু সমাধান তাদের হাতেই যারা উপযুক্ত শিক্ষার নিজেদের প্রাণকে গঠিত করতে পারবেন এবং সেই প্রাণের পরশেই সমাজ-জীবন থেকে সকল সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, অবজ্ঞা, বিদূরিত করবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করবেন। আগেই বলেছি, নিজেকে, স্বরূপকে প্রকাশ করতে শেখাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। অবশ্য এ স্বরূপ মানুষের বিশ্বরূপ সত্তাকে জড়িয়েই, বিশ্বরূপকে বাদ দিয়ে নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :—

"তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
দুই হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই সৃষ্টির আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমায় পরে ভার তোমার স্বর্গটি রচিবার॥"

তাই আমরা এমন শিক্ষাই লাভ করব যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভগবানের গড়া মাটির এই ধরণীকে স্বর্গে পরিণত করতে পারি। The purpose of education is to help us to find out what we are in this world for।

সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা

।। শ্রীঅনিল কুমার সমাজদার ।।

আজ সংবাদ পত্র জীবনের ক্ষেত্রে কেমনভাবে অধিকার করেছে। বর্তমান জগতের সাথে সমতালে চলবার অপরিহার্য অঙ্গ। বিভিন্ন তথ্য অবগত হতে হলে সংবাদ পত্র পাঠ একান্ত প্রয়োজন দেশবিদেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা সবই জানা যায় সংবাদ পত্র দ্বারা।

সংবাদ পত্রে সাধারণতঃ প্রধান দুটি বিভাগ—সম্পাদকীয় এবং সংবাদ। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মতবাদ প্রকাশিত হয়, তার ভিত্তিও সংবাদ। কাজেই সংবাদ বিভাগই প্রধান অঙ্গ। সংবাদ সরবরাহের জন্য নানা প্রতিষ্ঠান আছে। ভারতেও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে। ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া, এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ দুটি ছাড়াও ওরিয়েন্ট প্রেস, ইণ্ডিয়ান প্রেস সার্ভিস, হিন্দু প্রেস প্রভৃতিরাও সংবাদ সরবরাহ করেন। বৈদেশিক সংবাদ সরবরাহে রয়টার্স, এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা, ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকা, এবং হোয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বিশ্বের প্রত্যেক দেশের প্রধান প্রধান সহরে এই সব প্রতিষ্ঠান আছে, যেতার দ্বারা সংবাদ সরবরাহ করেন। এ সব ছাড়াও সংবাদ পত্রের নিজস্ব সংবাদ দাতা আছেন। ওঁরাও নানা দেশ হতে সংবাদ সরবরাহ করেন।

সকল বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করা কম দায়িত্বের নয়। অনেক সময় জীবন বিপন্ন করেও সংবাদ সংগ্রহ করতে হয়। যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক সংবাদ দাতা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। আমার সময় বহু সংবাদ দাতা গুণ্ডাদের তীক্ষ্ণ ছুরীতে জীবন দান করেছেন।

সত্য সংবাদ প্রকাশ করাই সংবাদ দাতার প্রধান কর্তব্য এবং ধর্ম হওয়া উচিত। কিন্তু সংবাদ দাতারা প্রায়ই এ কথা ভুলে যান। কর্তব্য অবহেলা করেন। Scoop News দিয়ে বাহাদুরী নিতেই বেশী দেখা যায় আজকাল। সাধারণ পাঠক প্রতারিত হন এতে। আজ হয়তো পড়লাম অমুক স্থানে অমুক নেতা অমুক কাজ করেছেন; অমুক স্থানে, অমুক ঘটনা ঘটেছে—দু'চার দিন পরের কাগজে দেখা গেল অমুক ঘটনা ঘটেনি, ভ্রমবশতঃ ছাপা হয়েছে। এরূপ অসত্য সংবাদ পরিবেশন করা অত্যন্ত অন্যায়। বিচিত্র এবং নোতুন সংবাদ দ্বারা বাহাদুরী নেওয়া যায় সত্য, কিন্তু পাঠক সমাজের ঘৃণা দৃষ্টি পড়ে। কাগজের (পত্রিকার) সুনাম অন্তর্হিত হয়। সংবাদ দেবার সময় ও সংগ্রহ করবার সময় বিশেষ ভাবে সাবধান হয়ে তবে সংবাদ পত্রিকা কার্যালয়ে পাঠানোই উচিত। কোন বিষয়ে speculative করে সংবাদ দেওয়া অনুচিত।

মনে করুন পাকিস্তান হিন্দুস্থান দুই সরকারের মধ্যে মীমাংসা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে—অথচ ফলাফল নির্ণয়ের পূর্বেই ঐ আলোচনার ফলাফল সম্বন্ধে নানান কাগজে নানান সংবাদ প্রকাশিত হতে লাগলো। কোন কাগজে ভালো আলোচনা বিফল, কোন কাগজে মীমাংসা প্রায় হয়েই গেছে। আমাদের পাঠকদের মতে আলোচনা মীমাংসিত না হওয়া পর্যন্ত কোন সংবাদই প্রকাশ করা উচিত নয়। বৈদেশিক সংবাদপত্রগুলি এ বিষয়ে সচেষ্ট। সেখানে কোন speculation news প্রকাশিত হয় না। মীমাংসার পর প্রকৃত সংবাদ পরিবেশিত হয়। তাই জনসাধারণ প্রতারিত হয় না। সেখানে চুরি ডাকাতি রাহাজানির সংবাদ পুলিশকর্তৃক ধৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত না হয়ে দণ্ডাদেশ ঘোষিত হবার পর প্রকাশিত হয়; এতে দস্যু তস্করেরাও জানতে পারে

চুরি বা ডাকাতির পরিণাম। আমাদের দেশে স্থানীয় সংবাদে প্রত্যেকটির নিজস্ব সংবাদ দাতা। বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশন করেন। একটি কাগজ (পত্রিকা) লিখলেন অমুক দিন রাত দুর্ঘটনায় ১জন মৃত, অন্য কাগজ ২জন; অন্য কাগজ লিখলেন বহু হতাহত ইত্যাদি বিভিন্ন মতবাদ। পাঠকেরা অবশ্য বলুন! কোন্ কাগজের কথা বিশ্বাস করবেন? এর জন্য দায়ী কে? সম্পাদক বলবেন সংবাদ দাতা।

হ্যাঁ, সংবাদ দাতাই। অনুমানের উপর নির্ভর করে অথবা লোক-মুখে শ্রুত হয়ে সংবাদ দেবার রীতি অনুসরণের ফলে এত বিভ্রান্ত হতে হচ্ছে পাঠকদেরকে—তা প্রতিটি পাঠক বোঝেন মর্মে মর্মে।

'ঘটনার বিবরণে প্রকাশ', 'প্রকাশ', 'জানা যায়', 'ওয়াকিবহাল মহলের খবরে প্রকাশ', 'বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল', 'আশা করা যায়', 'নিজস্ব সংবাদদাতা', 'বিশেষ সংবাদদাতা' প্রভৃতি মুখবন্ধের দ্বারা লিখিত সংবাদের ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায় প্রতিদিন সংবাদ পত্র খুললেই। পাঠক মহলের বেশীর ভাগই মধ্যশিক্ষিত সংবাদ দেবার সময় তাদের কথা ভাবা উচিত সর্ব প্রথম।

সাংবাদিকের যে সকল গুণ থাকা দরকার আমাদের দেশের সকল সাংবাদিকের মধ্যে তা নেই। যেমন ধরুন ঘটনার সংবাদ দিল "এলানসিয়ান হতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল সেখানে বিদ্রোহ হয়েছে"। কাঁচা সাংবাদিক হয়তো সংবাদে লিখলেন—বুয়েনস এয়ার্সে বিদ্রোহ। লক্ষ্য করলেন না অমনোযোগিতায় যে বুয়েনস এয়ার্স আর্জেন্টিনার রাজধানী, আর প্যারাগুয়ের রাজধানী এলানসিয়ান।

পাঠকদের কথা এঁরা ভাবেন না। মতামতের পাতায় চিঠি পত্রই এক মাত্র সেতু। অবশ্য পাঠকগণও সাংবাদিকগণের জন্য এতটুকু ভাবেন না। বিভিন্ন সাংবাদিকদের সাব এডিটর এসিষ্ট্যান্ট এডিটর রিপোর্টার প্রভৃতির এতো স্বল্প বেতন ও অস্থায়ী চাকুরী যে ধারণাতীত। বেতনের হারের স্বল্পতার জন্য কাজে গাফিলতি স্বাভাবিক। তা ছাড়া বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকতা কার্যে অযোগ্য আত্মীয় পরিজন নিয়োগও এর প্রধান কারণ ঘটে থাকে। দক্ষ সাংবাদিকের যোগ্যতা অনুসারে প্রমোশন বা পুরস্কার দেবার কোন সদ্ভোষজনক দেখা যায় না। সরকার তো দূরের কথা সরকারী কর্মচারীরা সাংবাদিকদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন না। গভর্নমেন্টের দিক থেকে উৎসাহ তো দূরের কথা, সত্য সংবাদের জন্য অনেক সময় আইনের আশ্রয়ে পড়ে দণ্ডও ভোগ করতে হয়। পাঠক সমাজও এ বিষয়ে অগ্রণী নয়।

বিভিন্ন সংবাদপত্র মহল থেকে মাঝে মাঝে যদি বিদেশী সংবাদপত্রের ন্যায় নতুন বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক দ্বারা মতামত গ্রহণের জন্য বৈঠক করেন, যেমন শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষকদের নিয়ে, রাজনীতি সম্বন্ধে সর্বদলীয় রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় লোক নিয়ে, খেলা ধূলার খেলোয়ার নিয়ে, লেখার সম্বন্ধে লেখক ও পাঠকদের নিয়ে এবং তাঁদের মতামত গ্রহণযোগ্য হলে তা প্রকাশ করে সর্বসমাজের—নিরপেক্ষ সত্য সংবাদ প্রকাশ করতে পারেন। অবশ্য প্রতি বৈঠকে প্রত্যেক বিভাগেই বিভিন্ন লোক নিয়েই হবে। তবেই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

বাংলাদেশে সুযোগ্য সম্পাদক, সংবাদদাতা প্রভৃতির অভাব নেই। ব্যঙ্গ চিত্র, ভালো ছবি প্রভৃতির ব্যবহার প্রশংসনীয়। সাংবাদিকদের ত্রুটিই মুখ্য কারণ নয়। এক শ্রেণীর কাগজের সাংবাদিক নীতির ধার ধারেন না।

ভারতে সাংবাদিকের মধ্যে শ্রীযুক্ত ভূবন বাগচি ঘোষ, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, প্রফুল্ল সরকার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য বহু আইন প্রবর্তিত হয়েছে। ১৯০১ সালে ভারতীয় প্রেস আইন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই জরুরী আইনে গভর্নমেন্ট বা কতিপয় ম্যাজিষ্ট্রেট যে কোন কাগজকে যখন খুশী নিষিদ্ধ করতে পারেন। প্রেসের কীপার ও সংবাদপত্রের প্রকাশক এর নিকট জমানত দাবী বা বাজেয়াপ্তও করতে পারেন। আজকাল পোষ্ট অফিস আইন ও কপিরাইট আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, প্রেস এণ্ড রেজিষ্ট্রেশন অব্ বুকস এই অনুসারে প্রেসকীপার মুদ্রাকর প্রকাশক সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী

উপযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে উপস্থিত হয়ে নাম ঠিকানা দ্বারা প্রকাশিত করতে হয়। টর্টস আইন দ্বারা কুৎসা প্রচারের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়েরও ব্যবস্থা আছে।

বিদেশে সাংবাদিকদের third state বলে গণ্য করা হয়। রাষ্ট্র ও সমাজের কল্যাণে সাংবাদিকগণ কতখানি যে সহায়তা করেন সে সম্বন্ধে আমরা মোটেই মাথা ঘামাই না। সাংবাদিকদের "জাতির দূত" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। Review of Reviews পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ষ্টেডের মন্তব্য হ'লো—

"An ambassador was defined of old time as who was sent to lie abroad for the benefit of the people who remained at home. The new Ambassador who has been evolved by the natural process of the growth of democracy is sent abroad not so much for the purpose of either lying or speaking the truth about the country which he represents, as for keeping his countrymen at home informed as to what is going on abroad."

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্মরণে

॥ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ॥

প্রেমের ঠাকুর তুমি, আজো পঞ্চনদ বহে পায়ে
গৌরগত প্রাণধন গৌড়জন অন্তর্ধান করে
অন্তক্ষণ স্মৃতি তব—এসেছিলে হবে নারী নর
ধর্মহীন তমোলীন ভ্রষ্টাচার বিশিষ্ট অন্তর
সমাজ শৃঙ্খলাহীন।
তুমি জাগাইলে ধর্মবোধ
সংঘবোধ সহযোগে, অন্যায়েরে করি প্রতিরোধ
গড়িলে দুর্জয় কাঙী।
দিলে নাম-ব্রহ্ম উপাসনা
আপামর সাধারণে দিলে প্রেমভক্তির প্রেরণা
নরে নারায়ণ জ্ঞান। হরিনামে সর্বপাপ হরে
দুর্বুদ্ধি খাঁয়েরে তাই শুদ্ধনামে পবিত্রত করে
রাখিলে আশ্রিত পদে।
বেদান্তের ব্যাখ্যা অভিনব
ব্রহ্ম সত্য সৃষ্টি সত্য এ-জগৎ সত্য সম্ভব
স্বপ্ন নহে স্বপ্নবৎ এ-জগৎ ঈশ্বরেরি মায়া
মহাশক্তি জীবধাত্রী প্রতি জীবে দেন পদচ্ছায়া
অন্ন হতে জীবনের পিচ্ছিল কণ্টকাকীর্ণ পথে
চলে তারা যেনেমতে। ভক্তজন চড়ি মনোরথে
যায় সে পরম ধামে, পায় সে শাশ্বত নিকেতন
যে যেমন ভজে তারে সে তেমনে সে তারে তেমন।
ভক্ত যেন দাস নহে প্রভু যেন নিজে ভক্ত-দাস
গোলোক নিলয় ত্যজি ভক্তের হৃদয়ে সদা বাস।
জ্ঞান যোগ ভক্তি এই সাধনার ত্রিবিধ পন্থায়
কর্মযোগে পূজা করি কল অনায়াসে যেন পায়।
প্রিয় তিনি প্রিয়তম প্রিয়তর কেহ নাহি আর
স্মরায় কলির জীব একবার লহ নাম তার।
ত্রিভুবনেশ্বর হরি মানবের প্রেমের ভিখারী
প্রেমে তার বাঁশী বাজে তারে যাচে যত নরনারী
কিছুতে না দেয় সাড়া। তাই তিনি আসিলেন নিজে
প্রেমের পসরা শিরে দ্বারে দ্বারে অশ্রু-নীরে ভিজে।
অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হেরি গৌরচাঁদে
কলঙ্কী পূর্ণিমা চন্দ্র হরিষে বিষাদ ভরি কাঁদে॥

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় তত্ত্বই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

চতুশ্চত্বারিংশ সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্যের মতানুসারে আমি যদি যথার্থই ব্রহ্ম, সৎ ও চিৎ হই, তাহা হইলে আমি-আত্মাতে অবিদ্যার প্রভাব বিস্তার হওয়াই অসম্ভব। কারণ শ্রুতি-বেদান্তমতে আমি-আত্মাও নির্ব্বিকার ও নিরঞ্জন। সুতরাং নিত্য আত্মজ্ঞানী আমি-আত্মা সম্বন্ধে

'এবমাত্মন্যবিদ্যাতো দেহাধ্যাসো হি জায়তে।
স এবাত্মপরিজ্ঞানাৎ দীয়তে চ পরমাত্মনি ॥' ৮৭

বলা সঙ্গত নহে। ঐ শ্লোকানুসারে অবিদ্যা জনিত ভ্রমবশত নির্বিকার নিরঞ্জন-ব্রহ্মাত্মার যদি আপনাকে দেহবোধ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে অজ্ঞান বিশিষ্ট সবিকার পূর্ব্বেই বলিতে হয়। তাহা হইলে তিনি অবিদ্যার অধীন বলিতে হয়। তাহা হইলে ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার না করিয়া অবিদ্যার শ্রেষ্ঠতাই স্বীকার করা উচিত। আমাদের মতে ব্রহ্মাত্মার উপর কখনই অবিদ্যার আধিপত্য হইতে পারে না। অবিদ্যার আধিপত্য যাহার উপর আছে, তিনি নিশ্চয়ই অতত্ত্বজ্ঞ। পরমহংস শঙ্করাচার্যেরই আত্মা-ষট্‌ক, নির্ব্বাণ-ষট্‌ক ও হস্তামলক নামক গ্রন্থ ত্রয় পাঠে আমি-ব্রহ্মাত্মার সহিত অনাত্মা অবিদ্যার কোন সম্বন্ধ নাই অবগত হওয়া যায়। সুতরাং পরমহংস শঙ্করাচার্যের উক্ত তিন গ্রন্থানুসারে আমি-ব্রহ্মাত্মা নির্বিকার ও নিরঞ্জনই প্রতিপন্ন করা যায়।

পঞ্চচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের অষ্টাশীতি শ্লোকে বলিয়াছেন,

'সর্ব্বমাত্মতয়া জ্ঞানং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
অন্যথাৎ সর্ব্বভাবানাং দেহস্য চাস্মতা হৃতঃ ॥'

যাঁহাতে কোন ভাব নাই, তিনি কোন ভাবাত্মক গ্রন্থও রচনা করিতে পারেন না। একখানি গ্রন্থে আমার নানা ভাব থাকে। অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থ এবং অন্যান্য

গ্রন্থ যিনি রচনা করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই ভাব-বিহীন নহেন। তিনি ভাব-বিহীন নহেন বলিয়া বাধের, অথচ জগৎ তাঁহার সম্বন্ধে নাই বলিতে পারে না; তিনি ভাব-বিহীন নহেন বলিয়া তাঁহার দেহ নাই বলিতে পারে না। উক্ত অষ্টাশীতি শ্লোকানুসারে সর্ব ভাবের অভাব ব্যতীত দেহের আত্মতার অভাব হয় না। বাক্য দুরূহের অবলম্বন মূঢ় ও মুখাপ্রিত বচনা। অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থে এবং তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থে তাঁহার মত থাকাই রহিয়াছে। অতএব ঐ সকল গ্রন্থের রচয়িতা শঙ্করাচার্যের কোন দেহ ছিল না বলিতে পারে না। অষ্টাশীতি শ্লোকানুসারে বোধ হয়, সর্ব ভাবের অভাব যতকাল আত্মাবোধ হয়, ততকাল না সর্ব-ভাবের অভাব হয়। সেইজন্য দেহেরও ততকাল আত্মা-বোধ হয়, যতকাল না সর্ব-ভাবের অভাব হয় দেহ বোধ থাকিতে, দেহের আত্মতার অভাব হইতে পারে না। দেহের সহিত সংস্রব থাকিতেও আপনাকে বিদেহী বোধ হয় না।

ষট্‌চত্বারিংশ সিদ্ধান্ত

অপরোক্ষানুভূতির একোন-নবতি শ্লোকে পরমহংস শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন,

'আত্মানং সততং জানন্ কালং নয় মহামতে।
প্রারব্ধমখিলং ভুঞ্জন্ নোদ্বেগং কর্তুমর্হসি ॥'

উক্ত শ্লোকে আত্মাকে অবগত হইয়া অনুদ্বিগ্নভাবে সর্ব প্রারব্ধ ভোগ করিতে বলা হইতেছে। ঐ শ্লোকানুসারে আত্মজ্ঞানের উদয় হইলেও প্রারব্ধ ভোগ হয় বুঝিতে হয়। কিন্তু শঙ্করাচার্যেরই নবতি ও একনবতি শ্লোকে

'উৎপন্নেস্যাত্মবিজ্ঞানে প্রারব্ধং নৈব মুঞ্চতি।
ইতি যৎ শ্রূয়তে শাস্ত্রাৎ তন্নিরাকৃতমেধুনা ॥
তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদূর্ধ্বং প্রারব্ধং নৈব বিদ্যতে।
দেহাদীনামসত্ত্বং, যথা স্বপ্নে বিবোধতঃ।'

বলায় তাঁহার একোন-নবতি শ্লোক খণ্ডন করা হইয়াছে।

সপ্তচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত

প্রারব্ধ কি? অপরোক্ষানুভূতির দ্বি-নবতি শ্লোকে বলা হইয়াছে,

'কর্ম জন্মান্তরীয়ং যৎ প্রারব্ধমিতি কীর্ত্যতে।
তত্ত্বজন্মান্তরাভাবাৎ পুংসো নৈবাস্তি কর্হিচিৎ ॥'

যাহা ছিল এবং যাহা আছে তাহার আবার অন্য হইবে কি প্রকারে? বেদান্তমতে আত্মা নিত্য বলিয়া আত্মা অজ। সুতরাং তাঁহার জন্মান্তর কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? ঐ বেদান্তানুসারেই আত্মা নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলিয়া তাঁহার জন্মান্তরীয় কর্ম বা প্রারব্ধ স্বীকার করা যায় না। যে আত্মার জন্মান্তর বা জন্মান্তরীয় কর্ম বা প্রারব্ধ নাই, তাঁহার জন্মান্তর এবং জন্মান্তরীয় কর্ম বা প্রারব্ধের অভাবই বা হইবে কি প্রকারে? যদি বল, অজ্ঞানবশতঃ আত্মার জন্মান্তর আছে বোধ হয় এবং সেই অজ্ঞানবশতঃই তাঁহার জন্মান্তরীয় কর্ম বা প্রারব্ধ ভোগ হয়, তাহা হইলে বাস্তবিক তাঁহার সেই জন্মান্তরীয় কর্ম বা প্রারব্ধ ভোগ না থাকিলেও কিন্তু সেই আত্মাকে বেদান্ত মতানুসারে নিত্য, নিরঞ্জন, নির্মল, নির্বিকার, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলা উচিত হয় নাই।

অষ্টচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের দ্বি নবতি শ্লোকে বলিয়াছেন,

'স্বপ্নদেহো যথাধাতস্তথৈবায়ং হি দেহকঃ।
অব্যক্ত মূলতো জন্ম জন্মাভাবে হি তৎ কুতঃ।'

স্বপ্ন দর্শন সময়ে কাহারও স্বপ্নকে মিথ্যা বোধ হয় না, তখন স্বপ্নকে সত্যই বোধ হয়। জাগরণে স্বপ্নে যে সকল দর্শন হইয়াছিল সে সকল মিথ্যা বলিয়াই বোধ হয় সত্য, কিন্তু শঙ্করাচার্য

'স্বপ্নদেহো যথাধাতস্তথৈবায়ং হি দেহকঃ।
অব্যক্ত মূলতো জন্ম জন্মাভাবে হি তৎ মৃতঃ ॥'

জাগ্রতাবস্থাতেই ত বলিয়াছিলেন। স্বপ্নাবস্থায় থাকিয়া যেমন স্বপ্ন অসত্য বোধ হয় না, তদ্রূপ জাগরণাবস্থায় থাকিয়াও জাগরণ কাহারও মিথ্যা বোধ হইতে পারে না। সে অবস্থায় যে সকল দর্শন স্পর্শন ও অনুভব করা যায়,

অথবা সে অবস্থায় যে সকল বাধি করা যায়, সে সমস্তকেও মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না।

একোনপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত

অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের চতুর্নবতি শ্লোকে পরমহংস শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন,

'উপাদানং প্রপঞ্চস্য মৃদ্ভাণ্ডস্যেব দৃশ্যতে।
অজ্ঞানমতি বেদান্তৈস্তদ্বিনশ্যতি কা বিশ্বতা॥'

যাহার আদি নাই, তাঁহার অন্তও নাই। যাহার আদি নাই তাঁহাকে অজই বলিতে হয়। অজ যিনি, তিনি নিশ্চয়ই অমর। যিনি অনাদি অজ ও অমর, তিনি নিশ্চয়ই নিত্য। পরমহংস শঙ্করাচার্যই তাঁহার আত্ম-নাত্মবিবেক নামক গ্রন্থে অবিদ্যাকে অনাদি বলিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে অবিদ্যাকে অনাদি বলায় অবিদ্যাকেও সেইজন্য নিত্য বলিতে হয়। নিত্য যাহা তাহা নষ্ট হয় না। সেইজন্য অবিদ্যাও নষ্ট হয় না। বেদান্তমতের অনেক গ্রন্থেই অবিদ্যাকে অজ্ঞান বলা হইয়াছে। সেইজন্য অজ্ঞানও নিত্য বলিয়া তাহাও নষ্ট হয় না। বিশ্বের উপাদান অজ্ঞানও নিত্য প্রমাণ করা হইয়াছে। সুতরাং সেই বিশ্বের উপাদান অজ্ঞান নষ্ট হয় বলিতে পারা যায় না। বিশ্বের উপাদান অজ্ঞান নষ্ট হয় না বলিয়া বিশ্বকে বলিতে পার না; সেইজন্য বিশ্বও রহিয়াছে বলিতে হইতেছে। শঙ্করাচার্যের মতানুসারেই অজ্ঞান নামক বিশ্বের উপাদান সত্য বলিয়া বিশ্বও সত্য বলিতে হইতেছে। যেমন উক্ত চতুর্নবতি শ্লোকানুসারে মৃৎই ভাণ্ডাকার বলা যাইতে পারে, তদ্রূপ ঐ শ্লোকানুসারে অজ্ঞানই বিশ্বাকার বলা যাইতে পারে। অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের চতুর্নবতি শ্লোকের বিপরীত শ্লোক উক্ত গ্রন্থেরই পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোক সেই পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোক এই প্রকার—

'উপাদানং প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণোঽস্তস্য বিদ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চোঽয়ং ব্রহ্মেবেতি ন চেতরৎ॥'

উপরোক্ত শ্লোকের সহিত চতুর্নবতি শ্লোকের ঐক্য করিতে হইলে ব্রহ্ম ও অজ্ঞান অভেদই বলিতে হয়। কারণ চতুর্নবতি শ্লোকে প্রপঞ্চেরই উপাদান অজ্ঞান বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থেরই পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকানুসারে প্রপঞ্চের উপাদান ব্রহ্ম ব্যতীত আর অন্য কিছুই নহে। অতএব পরমহংস শঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম এবং অজ্ঞান অভেদই বলিতে হয়।

পঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্যের মতে

'যথা রজ্জুং পরিত্যজ্য সর্পং গৃহ্ণাতি বৈ ভ্রমাৎ।
তদ্বৎ সত্যাৎপরব্রহ্মণ ভবং পশ্যতি মূঢ়ধীঃ। ৯৫
রজ্জুরূপে পরিত্যাগে সর্পত্বস্য ন স্থিতিঃ।
অধিষ্ঠানে তথা ত্যাগে প্রপঞ্চঃ শূন্যতাং গতঃ॥৯৬'

যে বর্ণালঙ্কার দর্শন করে তাহার কি সেই বর্ণালঙ্কার দর্শনে স্বর্ণ দর্শন করা হয় না? স্বর্ণই অলঙ্কার হইয়াছে বলিয়া অলঙ্কার দর্শন করিলেই স্বর্ণ দর্শন করাও হয়। শঙ্করাচার্য তাঁহার পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকে

'উপাদানং প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণোঽস্তস্য বিদ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চোঽয়ং ব্রহ্মেবেতি ন চেতরৎ॥'

বলায় প্রপঞ্চ জগতের উপাদান ব্রহ্মই বুঝিতে হয়। সুতরাং এই প্রপঞ্চ-জগৎ যিনি দর্শন করেন, তাঁহার কি সেই সত্য-ব্রহ্ম দর্শন করা হয় না? ঐ শ্লোকানুসারে ব্রহ্মোপাদানই কি এই প্রপঞ্চ-জগদাকার হন নাই? শঙ্করাচার্য

'সুবর্ণোদ্ভাসমানস্য সুবর্ণত্বং ন নশ্যতি।
ব্রহ্মণো ভাসমানস্য ব্রহ্মত্বঞ্চ তথা ভবেৎ॥' ৫১

বলায় এই জগদ্দর্শনে সত্য-ব্রহ্মই দর্শন করা হয়। শঙ্করাচার্যের

'ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব তদব্যতিরেকান্নেতরৎ॥৪৯'

শ্লোকানুসারে ব্রহ্মই এই জগৎ। উক্ত শ্লোকে সর্ব্বভূত ব্যতীত এই জগৎ নহে। সুতরাং ঐ শ্লোকানুসারে এই জগৎ ও ব্রহ্ম যে অভেদ, সে বিষয়ে আর সংশয় কি আছে? শঙ্করাচার্য 'সর্ব্বমাত্মেতি' বলায় পঞ্চনবতি শ্লোকোক্ত রজ্জুও আত্মা, সর্পও আত্মা। ভ্রমবশতঃ রজ্জুকে সর্প ও সর্পকে রজ্জু বোধ হইলেও শঙ্করাচার্যের মতানুসারে উভয়কেই আত্মা-বোধ হয়। কারণ তাঁহার মতে সবই

আত্মা। পূর্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে প্রলয় ও অবস্থা-ত্রয় আছে। সুতরাং

'অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।'

কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? স্বর্ণই অলঙ্কার হইয়াছে। তুমি সেই অলঙ্কার দর্শন করিতেছ, তোমার কি সেই অলঙ্কার দর্শনে স্বর্ণ-দর্শনও হইতেছে না? তোমার কি অলঙ্কারকেই স্বর্ণবোধ হইতেছে না? পূর্বেই ত শঙ্করাচার্যের নানা শ্লোকানুসারে প্রমাণ করা হইয়াছে, ব্রহ্মই প্রপঞ্চাকার। সুতরাং ঐ প্রকার প্রপঞ্চ দর্শন করায় কি ব্রহ্ম-দর্শন করা হয় না? সুতরাং তদ্দ্বারা কি প্রপঞ্চই ব্রহ্ম-বোধ করা হয় না?

একপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত

যখন স্বর্ণ অলঙ্কারাকার পরিণত হয়, তখন স্বর্ণ এবং অলঙ্কার উভয়ই স্বীকার করিতে হয়। অপরোক্ষানুভূতির পঞ্চ চত্বারিংশ শ্লোকানুসারে সর্ব-প্রপঞ্চই ব্রহ্ম; শঙ্করাচার্যের উক্ত শ্লোকানুসারে অলঙ্কারের উপাদান যেমন স্বর্ণ, তদ্রূপ সর্ব প্রপঞ্চের উপাদান ব্রহ্ম. অলঙ্কারের উপাদান স্বর্ণই যেমন অলঙ্কার হয়, তদ্রূপ সর্ব-প্রপঞ্চের উপাদান ব্রহ্মই এই প্রপঞ্চ-জগদাকার হন। ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চ জগদাকার হইলে ব্রহ্ম এবং এই প্রপঞ্চ-জগৎ উভয়ই স্বীকার করিতে হয়। তবে পরমহংস শঙ্করাচার্যের

'দেহত্রাপি প্রপঞ্চত্বাৎ প্রারব্ধাবস্থিতিঃ কৃতঃ।
অজ্ঞানজনবোধার্থং প্রারব্ধং বক্তি বৈ শ্রুতিঃ॥' ৯৭

শ্লোকানুসারে প্রপঞ্চ-দেহ ও প্রারব্ধ অস্বীকার করা কখনই সঙ্গত নহে।

দ্বিপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্যের শ্রুতি-সম্মত,

'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।
যস্মাৎ তন্নিষেধার্থং শ্রুত্যা গীতং যতস্ত্বিদম্॥' ৯৮

শ্লোকানুসারে সেই পরাবর-পরমাত্মা দর্শন করা যায় এবং তাঁহাকে দর্শন করিলে সর্ব কর্ম ক্ষয় হয়। নিরাকার দর্শন করা যায় না। নিরাকারের অস্তিত্ব অনুভবদ্বারাই নিশ্চয় করা যায়। আকারের অস্তিত্ব দর্শনদ্বারা নিশ্চয় করা যায় বটে। উক্ত শ্লোকীয় 'পরাবর' কি আকার? তিনি আকার হইলেই কি তাঁহাকে দর্শন করা যায়? শঙ্করাচার্যের অপরোক্ষানুভূতির সপ্তনবতি শ্লোকীয় 'দেহত্রাপি প্রপঞ্চত্বাৎ প্রারব্ধাবস্থিতিঃ কৃতঃ' স্বীকার করিলে, 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে' স্বীকার করা যায় না। কারণ ঐ সপ্তনবতি শ্লোকানুসারে প্রপঞ্চ-দেহ এবং প্রারব্ধ একেবারে অস্বীকার করিলে কোন কর্মই স্বীকার করা যায় না। কিন্তু শঙ্করাচার্যের অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের অষ্ট নবতি শ্লোক স্বীকার করিলে সর্ব কর্মই স্বীকার করা যায়। ঐ শ্লোকের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে, পরাবর-পরমাত্মা দর্শন করিলে সর্ব কর্ম ক্ষয় হয়। সর্ব কর্ম না থাকিলে সর্ব কর্ম ক্ষয় হইবার প্রয়োজনই হয় না। সর্ব কর্ম আছে বলিয়াই পরাবর পরমাত্মা দর্শন করিলে সর্ব কর্ম ক্ষয় হয় বলা হইয়াছে। কথিত অষ্ট নবতি শ্লোকের প্রথমাংশ দ্বারা সর্ব কর্মের বিদ্যমানতা প্রমাণ করায় এই পদেরও বিদ্যমানতা স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ শ্লোকের শেষাংশে 'যস্মাৎ তন্নিষেধার্থং শ্রুত্যা গীতং যতস্ত্বিদম্' বলা সঙ্গত হয় নাই।

ত্রিপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন,

'উচ্যতেঽদ্বৈতসংসিদ্ধৌ তদানর্থক্যমাগমঃ।
বেদান্তমতমাশ্রিত্য ব্রহ্মাত্মৈবেতি শ্রুতিঃ॥' ৯৯

শঙ্করাচার্য 'সর্বমাত্মেতি' বলায় তাঁহার একত্ব এবং ব্রহ্ম স্পষ্টই স্বীকার করা হইয়াছে। তাঁহার কেবল একত্ব স্বীকার করিবার উদ্দেশ্য থাকিলে তাঁহার 'আত্মেতি'র পূর্বে 'সর্বম্' শব্দ ব্যবহার করা উচিত হয় নাই। তাঁহার নিজের কথাতেই তিনি বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের হানি করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে চতুস্ত্রিংশত্তম শ্লোকে 'সর্বং ব্রহ্মেতি' বলিয়াও বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের হানি করিয়াছেন। আর ঐ শঙ্করাচার্য 'সর্বমাত্মেতি', 'সর্বং ব্রহ্মেতি' এবং তাঁহার ব্রহ্মনামাবলী মালার 'ব্রহ্মজগৎ সর্বমিতি' স্বীকার করায় প্রারব্ধও আত্মা এবং প্রারব্ধও ব্রহ্ম স্বীকার করা সম্বন্ধেই বা তাঁহার কি আপত্তি হইতে পারে? তিনি নিজেই ত কয়েকটী বাক্যদ্বারা অদ্বৈতবাদের হানি করিয়াছেন। তবে

তিনি প্রারম্ভ স্বীকার করিলেনই বা? আর তাঁহারও যে প্রারম্ভ স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা ত পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের 'যতো জ্ঞানমিতি শ্রুতিঃ' বলা উচিত হয় নাই। কারণ শ্রুতিও পরিমিত গ্রন্থ। তাহার মধ্যে যে সকল উপদেশ আছে, সে সকলও পরিমিত, সে সকলে কত বাক্য, কত অক্ষর এবং কত উপমাই আছে; সেই সকল উপমাও লৌকিক। সুতরাং বেদান্তানুসারে উক্ত সমস্তই অসত্য বলিতে হয়। ঐ সমস্তের সমষ্টি শ্রুতি। সুতরাং সেই শ্রুতিকেই বা অদ্বৈতবাদানুসারে কি প্রকারে অসত্য না বলা যায়? সুতরাং সেই শ্রুতি অদ্বৈত-আত্মজ্ঞান লাভেরই বা কারণ কি প্রকারে হইতে পারে? শ্রুতিতেই ব্রহ্মকে বাক্য ও মনের অগোচর বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি নিজে ত অবাক্য নহে, শ্রুতি যে বাক্য-সমষ্টির বিকাশ। সুতরাং সেই শ্রুতি অনুসারেই, সেই শ্রুতি অদ্বৈত ব্রহ্ম-জ্ঞানের ও অদ্বৈত আত্মজ্ঞানের কখনও কারণ হইতে পারে না। বেদান্তানুসারেও ব্রহ্ম বাক্য-মনের অগোচর। সুতরাং সে মতেও বাক্য-সমষ্টির বিকাশ যে শ্রুতি, সেই শ্রুতি অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞানের ও অদ্বৈত আত্মজ্ঞানের কখনই কারণ হইতে পারে না। তাহা হইতে পারে যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অপর কিছু মাত্রিকই বা উক্ত জ্ঞানলাভের কারণ হইতে পারিবে না কেন?

চতুঃসপ্তাশৎ সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,

'ত্রিসপ্তাদ্যাস্ততো যত্নো পূর্ব্বোক্তস্ত হি লব্ধয়ে।
তৈস্তু সর্ব্বৈঃ সদা কার্য্যং নিদিধ্যাসনমেব তু॥ ১০০
নিদিধ্যাসাদৃতে প্রাপ্তির্ন ভবেৎ সচ্চিদাত্মনঃ।
তস্মাৎ ব্রহ্ম নিদিধ্যাসেৎ বিজ্ঞাতুঃ শ্রেয়সে চিরম্॥ ১০১
যমো হি নিয়মত্যাগো মৌনং দেশশ্চ কালতা।
আসনং মূলবন্ধশ্চ দেহসাম্যঞ্চ দৃক্স্থিতিঃ॥১০২
প্রাণসংযমনঞ্চৈব প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
আত্মধ্যানং সমাধিশ্চ প্রোক্তান্যঙ্গানি বৈ ক্রমাৎ॥১০৩
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাদ্বিচ্ছিন্নপ্রাণসংযমঃ।
যমোঽয়মিতি সংপ্রোক্তোঽভ্যসনীয়ো মুহুর্মুহুঃ॥১০৪
সত্যাস্তেয়প্রয়োশ্চ ব্রহ্মচর্য্যে স্থিরস্থিতিঃ।
নিয়মো হি পরানন্দো নিয়মাৎ ক্রিয়তে যুধৈঃ॥১০৫
ত্যাগঃ প্রপঞ্চরূপস্ত চিন্মাত্রস্থাবলোকনাৎ।
ত্যাগো হি মহতাং পূজ্যঃ সদ্যো মোক্ষময়ো যতঃ॥১০৬
যস্মাদ্বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
যস্যৌনং যোগিভির্গম্যং তস্মাদেষ সর্ব্বদা যুধঃ॥১০৭
বাচো যস্মান্নিবর্ত্তন্তে তদ্ব্রহ্ম কেন বক্ষ্যতে।
প্রপঞ্চো যদি বক্তব্যঃ সোঽপি শব্দবিবর্জ্জিতঃ॥ ১০৮
ইতি বা তদ্ভবেন্মৌনং সত্যং সহজ সংজ্ঞিতম্।
গিরামৌনন্তু বালানাং প্রযুক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ॥ ১০৯
আত্মাদন্যে ন যো ন মনো ন বুদ্ধিরিষ্যতে।
যেনেদং সততং ব্যাপ্তং স দেশো বিজনঃ স্মৃতঃ॥ ১১০
কলনাং সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং নিমেষতঃ।
কালশব্দেন নির্দ্দিষ্টোঽখণ্ডানন্দস্বরূপধৃক্॥ ১১১
সুখেনৈব ভবেদ্ যস্মিন্নতস্ত্রং ব্রহ্মচিন্তনম্।
আসনং তদ্বিজানীয়াদেতদ্ধি সুখনাশকম্॥ ১১২
সিদ্ধং যৎ সর্ব্বভূতানি বিশ্বাধিষ্ঠানমব্যয়ম্।
যস্মিন্ সিদ্ধাঃ সমাবিষ্টাস্তদ্বৈ সিদ্ধাসনং বিদুঃ॥ ১১৩
মূলং সর্ব্বভূতানাং মূলং চিত্তবন্ধনম্।
মূলবন্ধঃ সদাসেব্যো যোগ্যোসৌ যতযোগিনাম্॥১১৪
অজ্ঞানাং সমতাং বিদ্যাৎ সমে ব্রহ্মণি লীয়তে।
নোচেদ্বৈষম্যমাপন্নং শুষ্ক কাষ্ঠবৎ॥ ১১৫
সৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা পশ্যেদ্ব্রহ্মময়ং জগৎ।
সা দৃষ্টিঃ পরমোদারা ন নাসাগ্রে বিলোকিনী॥ ১১৬
দৃষ্টিদর্শনদৃশ্যানাং বিরামো যত্র বা ভবেৎ।
দৃষ্টিস্তত্রৈব কর্ত্তব্যা ন নাসাগ্রবিলোকিনী॥ ১১৭
চিন্তাদিসর্ব্বভাবেষু ব্রহ্মত্বেনৈব ভাবনাৎ।
নিরোধঃ সর্ব্ববৃত্তীনাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥ ১১৮
নিষেধনং প্রপঞ্চস্ত রেচনাখ্যঃ সমীরণঃ।
ব্রহ্মেবাস্মীতি যা বৃত্তিঃ পূরকো বায়ুরীরিত॥১১৯
তত্তদ্বৃত্তি নৈশ্চল্যাৎ কুম্ভক প্রাণসংযমঃ।
অহঙ্কারাদি প্রবৃত্তানামভ্যাসাৎ প্রাণপীড়নম্॥ ১২০
বিষয়ে স্বাত্মতাং দৃষ্ট্বা মনসশ্চিত্তিমঞ্জনম্।
প্রত্যাহারঃ সবিজ্ঞেয়োঽভ্যসনীয়ো মুমুক্ষুভিঃ॥১২১

যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনাৎ।
মনসো ধারণৈবেহ ধারণা সা পরা মতা ॥ ১২২
ব্রহ্মৈবাস্মীতি সদ্বৃত্ত্যা নিরালম্বতয়া স্থিতিঃ।
জ্ঞানসঙ্ঘেন বিখ্যাতা পরমানন্দদায়িনী ॥ ১২৩
বিক্ষিপ্যমানয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকারতয়া পুনঃ।
বৃত্তিবিস্মরণং সম্যক্ সমাধির্নির্বিকল্পকঃ ॥ ১২৪
যৎকাকৃত্রিমানন্দং তদ্বৈ সাধু সমাভ্যসেৎ।
যতো যাবৎ ক্ষণাৎ পুংসঃ প্রমুক্ত স্তৎক্ষণাৎ স্বয়ম্ ॥ ১২৫
ততঃ সাধননির্মুক্তঃ সিদ্ধো ভবতি যোগিরাট্।
তৎস্বরূপং ন চৈতস্য বিষয়ো মনসো নিজাৎ ॥" ১২৬

বৈদান্তিক কোন গ্রন্থমতেই নিদিধ্যাসন আত্মা-ব্রহ্ম নহে। অপরোক্ষানুভূতির শততম্ শ্লোকে তাহার আকার স্ত্রী-পক্ষাদি স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং তাহা যে অনাত্মা, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কারণ অদ্বৈত ব্রহ্মের কোন প্রকার বিভাগ থাকিতে পারে না। নিদিধ্যাসনের পঞ্চদশ প্রকার বিভাগ স্বীকার করা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের মতেই নিদিধ্যাসন সাধনাত্মক—সাধনা করিতে হয়; সেইজন্য সাধনাকেও ক্রিয়া বলা যায়। বৈদান্তিক অনেক গ্রন্থমতেই নানাপ্রকার ক্রিয়া অর্থাৎ নানাপ্রকার বিকার বলিয়া কোন প্রকার ক্রিয়া দ্বারাই আত্মা-ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। অথচ শঙ্করাচার্য্যের উক্ত শততম্ শ্লোক হইতে অষ্টবিংশাধিকশত শ্লোক পর্য্যন্ত দেখিলে বোঝা যায় যে, ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও সাধনাত্মিকা নানাপ্রকার ক্রিয়ার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

পঞ্চদশকাশং সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতে

সমাধৌ বিলয়াপে তু বিজ্ঞাতাস্মীতি বৈ বলাৎ।
অনুসন্ধানরাহিত্যমালম্বং যোগলালসম্ ॥ ১২৭
লয়স্তম্ভশ্চ বিক্ষেপো রসাস্বাদশ্চ শূন্যতা।
এবং ষড়িধবাহুল্যাৎ ত্যাজ্যাং ব্রহ্মবিদা মনৈঃ ॥" ১২৮

উক্ত দুই শ্লোকানুসারে অবশ্যই সমাধি সম্পাদন কালে নানাপ্রকার বিঘ্ন প্রকাশিত হয়। এবং ঐ শ্লোকদ্বয়ের শেষ শ্লোকানুসারে অবগত হওয়া যায় যে, ঐ সকল বিঘ্ন পরিত্যাগও করা যায়, সুতরাং ঐ সকল বিঘ্ন অবশ্যই সত্য। ঐ সকল সত্য না হইলে ঐ সকল পরিত্যাগেরই প্রয়োজন হইত না। উক্ত অষ্টবিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে অবগত হওয়া যায়, যে ঐ সকল বিঘ্ন ব্রহ্মবিদ্‌গণ কর্তৃকই হেয় পরিত্যাজ্য। তাহা হইলে ঐ সকল বিঘ্নকে মিথ্যা বলা যায় না। যাহা মিথ্যা প্রকৃত কথায় তাহা ত নাই। নাই যাহা, ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাহা নাই-ই জানেন। তাঁহারা তাহা আছে বিবেচনা করিয়া কখন তাহা পরিত্যাগের জন্য উৎসুক হন না। কারণ যাহা নাই, তাহা তাঁহাদের আছে ভ্রান্তি-ক্রমেও বোধ হইতে পারে না। তাঁহাদেরও ভ্রান্তি আছে যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বেদান্ত মতানুসারে তাঁহাদের অব্রহ্মবিদ্‌ই বলা উচিত।

দ্বাত্রিংশকাশং সিদ্ধান্ত

বেদান্ত এবং সেই বেদান্তবাদী শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্মই ত আত্মা। যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তাঁহার আত্মাকে জানা হয় নাই বলা যাইতে পারে না। যাহার ব্রহ্মজ্ঞান আছে, তাঁহার নিশ্চয়ই আত্মজ্ঞান আছে। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম ও আত্মা অভেদ। শ্রুতি ও বেদান্তমতে সেই আত্মা-ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের অষ্টবিংশাধিকশত শ্লোকে 'ব্রহ্মবিদ্' শব্দ ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইয়াছে। 'ব্রহ্মবিদা' শব্দের অর্থ ব্রহ্মবিদ্‌গণ। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে কিংবা আত্মজ্ঞান হইলে কেবল একই বোধ থাকে বলিয়া ব্রহ্মবিদ্ শঙ্করাচার্য্যের 'ব্রহ্মবিদা' শব্দ ব্যবহার করা অনুচিত হইয়াছে। তাঁহার ব্রহ্মবিদ্ এবং আত্মবিদ্ অভেদ বোধই থাকা উচিত ছিল। ঐ প্রকার অভেদ-বোধ থাকিলে একাধিক ব্রহ্ম-বিদ্ স্বীকারই করা যায় না। পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারেই ব্রহ্ম ও আত্মা অভেদ প্রতিপন্ন করায় বহু ব্রহ্মবিদের অস্তিত্ব থাকাই অসম্ভব হয়।

ক্রমশঃ

চিত্ত শুদ্ধি

॥ শ্রীঋষিকেশ দে ॥

দেহের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ও সঞ্চালনে (ব্যায়াম করলে) দেহ সুস্থ থাকে, মনেরও তাই। মনকে পরিচ্ছন্ন ও সচ্চিন্তাশীল করলে মন সুস্থ এবং বলিষ্ঠ হয়। এরকমই নির্মল দর্পণে প্রতিবিম্ব যথাযথ পড়ে, আলোকরশ্মিও প্রখরতম হয়। সেই রকম শুদ্ধ মনে ইষ্টের ধ্যানমূর্তি সহজে প্রতিফলিত হয় এবং শুদ্ধ মনের কল্যাণময় স্পন্দন পারিপার্শ্বিক ব্যক্তি ও স্থানের উপর কল্যাণময় প্রভাব বিস্তার করে।

নিম্ন প্রাণী জগতের জীবন-প্রবাহ লক্ষ্য করে ডারউইন বলেছেন জীবজগৎ প্রতিনিয়ত অল্প আয়ু, অল্প শক্তি, অল্প জ্ঞান এবং নিকৃষ্ট দেহ থেকে দীর্ঘতর আয়ু, মহত্তর জ্ঞান, অধিকতর শক্তি ও উন্নততর দেহের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষে এসে তা দেহের দিক থেকে অতুলনীয় হয়েছে, জ্ঞানের দিক থেকে তার ক্ষেত্র এখনও অনন্ত বিস্তার। আজ পৃথিবী জনসংখ্যার চাপে প্রপীড়িত তার ফলে বস্তুবাদী ও যান্ত্রিক সভ্যতার বিস্তার ঘটেছে মানুষ ভোগবিলাস ও স্বার্থপরতায় ডুবে যাচ্ছে। ফলে জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দ্বন্দ্ব। বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কার ও অগ্রগতি মারণাস্ত্র নির্মাণ ও গুপ্তচর বৃত্তির উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হচ্ছে। সপ্তম কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্র চাঁদে ধীর ভাবে নামাতে গিয়ে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে! পৃথিবীর চারদিকে শতকোটি টাকা মূল্যের স্বয়ংচালিত ও আরোহীচালিত কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে আবহাওয়া পর্য্যবেক্ষণের নামে লক্ষ্যস্থলের ব্যাঘাতের সীমার উর্দ্ধ হতে প্রতিটি দেশের সংবাদ ও চিত্র সংগ্রহ হচ্ছে। যার ফলে চীন দেশের গভীর অভ্যন্তর ভাগে অবস্থিত গুপ্ত আণবিক কারখানার চিত্র আমেরিকার সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হোল। বৈজ্ঞানিক মাত্রই জানেন, প্রতিটী রাষ্ট্র জানে কিং পঁচিশটা হাইড্রোজেন বোমা ফাটলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পঁচিশটি নগর কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, শিল্প জ্ঞান ও সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি হবে, সমগ্র বায়ুমণ্ডল আণবিক রশ্মে কলুষিত হবে, যার ফলে রোগাক্রান্ত ক্ষীণ-প্রাণ বীভৎস-দেহ দানব ও জীবের আবির্ভাব হবে; এমন উদ্ভট সৃষ্টি ভয়ঙ্কর ও বাসের অযোগ্য হবে। অথচ শত শত হাইড্রোজেন ও লক্ষ আণবিক বোমা প্রস্তুত হয়ে শত্রুদের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করছে। এই ধ্বংসাত্মক শক্তিমদমত্ত সভ্যতা কোথায় ছুটেছে? সে নিজে জানে না সে কোথায় ছুটেছে। তার কারণ সে লক্ষ্যহীন। সে কল্যাণ-পথের যাত্রী নয়, এখন শুধু 'লক্ষ্য শূন্য লক্ষ্য বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে'।

এই মৃত্যুমুখী সভ্যতার গতিমুখ ফেরাতে না পেরে ডঃ রমন, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ বিজ্ঞানী ও মনীষীবৃন্দ সতর্কতা বাণী উচ্চারণ করেছেন। ভারতে অধ্যাত্ম জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত অনেক মহাত্মাও বলেছেন ভয়াবহ অনর্থ হবে ভবিষ্যতে বর্ত্তমান সভ্যতা ও পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আজ ধ্বংসের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে—তার সামনে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ব্যাপক সংগ্রামের বিভীষিকা। পরিত্রাণের কোন পথই দেখছে না।

বর্ত্তমান সভ্যতা ধর্মের তোয়াক্কা রাখে না। অধিকাংশ নরনারী ধর্ম ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করেন না। বেশী খাব, ভাল খাব, ভাল পরব; যত রকম সাচ্ছন্দ্য ও সুখভোগের উপকরণ পাওয়া যায় তা আমার চাই—এই চিন্তায় ও বাসনায় বস্তুতায় মানুষ পাগল। জীবনের লক্ষ্য বেশীর ভাগ মানুষের আদি ধনী ও ভোগী হব। তার মধ্যে আর কিছু লোক একটা প্রফেশন বা বৃত্তির উৎকর্ষ লাভের কথা বলবেন—তিনি ডাক্তার, উকিল, স্থপতি,

বণিক, রাজনৈতিক, সেনানায়ক বা নেতা হবেন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই লক্ষ্যগুলির সীমা ইহজীবনের গণ্ডির মধ্যে কোন এক বিন্দুতে প্রতিষ্ঠা ও অর্থাকাঙ্ক্ষা—যার সাহায্যে ভোগ্য বস্তুর অভাব ঘটবে না। অনন্ত জীবন, অনন্ত জগৎ, বিজ্ঞানহীন যন্ত্রে, সর্বতোঃ বর্তমান ঈশ্বর,— এ কারো মনে জাগছে না।

"'আমি' দ্বারাই এই সংসার ঠাসা রয়েছে—কত ধনিল, কত ধনাবেশ, কত কিনি বেচা, কত বাদ বিসম্বাদ। কিন্তু ঈশ্বর কোথায়! কেবল মুখের কথায়"।

অধিকাংশলোকেই বলবেন "হাঁ,হাঁ—ঈশ্বর আছেন। কিন্তু এই আছেন তাঁদের অবচেতন মনে অতীত অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি মাত্র, যা সচেতন সক্রিয় মন উপেক্ষা করছে। তা না হলে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে স্থির বিশ্বাস থাকলে যে আচরণ আমাদের করা উচিত ছোট তা কি আমরা করি? মুখের কথায় কেবল ঈশ্বর স্বীকার করি। কিন্তু মুখের কথায় ঈশ্বর স্বীকার করার মত নিজেকে ফাঁকি দেবার আর কি কিছু আছে?" •

কিন্তু কেন এমন হয়? "ঈশ্বরকে যে আমরা দিন রাত্রি বাদ দিয়ে চলেছি, তাতে আমাদের ক্ষতি যদি কিছু পয়সাও হোত তাহলে তখনই সচকিত হয়ে উঠতুম, কিন্তু সে বিপদ নেই। সূর্য আমাদের আলো দিচ্ছে। পৃথিবী আমাদের অন্ন দিচ্ছে। চতুর দোকানির অভাব পূরণের সন্ধানে আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে।"

"বস্তুতঃ ঈশ্বরকে স্বীকার না করলে এমন কি তিনি আছেন ও তিনি অনন্ত প্রেমময় এ বিশ্বাস না থাকলেও তাঁর দান আমার থেকে ভুলে নিচ্ছেন না। তখন প্রশ্ন তিনি আছেন এ অনুভূতির সার্থকতা কি? (অনুভূতি না থাকলে) ক্ষতি কি?

"ক্ষতি এই—আমার জ্ঞান সংকীর্ণ। সেই পরম প্রেমময়ের ভালবাসার দানটুকু পেয়ে শুধু তাঁর দান ভোগ করছি কিন্তু সেই দানের পশ্চাতে যে পরম প্রেম তাকে অনুভব করছি না। তাঁর প্রেমের স্বাদ কত মধুর, স্পর্শ কত প্রাণারাম সেই বোধের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। কীটদৃষ্টি মানুষ জগৎকে অস্পষ্ট দেখেই চলে, তাতে তার চলেও যায়। কিন্তু হঠাৎ চশমা দিয়ে যখন সে সব কিছু স্পষ্ট দেখে সেই নব আগ্রহ দৃষ্টি পথে সে বৃক্ষের আরো নিকটে চলে যায়। আমরা পাই এক অপূর্ব আনন্দ। ডিমের মধ্যে পক্ষী-শিশু জন্ম নিল, কোন কিছুই অসুবিধা নাই। যখন ফুটে বিন্ন হয়ে পক্ষীশাবক মায়ের পক্ষপুটে আশ্রয় পেল তখনই না তার জন্ম সার্থকতা মায়ের ভালবাসার অনুভূতিতে, ডিমের সীমায় বন্ধন মুক্তিতে। ঈশ্বরকে জানায় আমাদের যে বন্ধনমুক্তি আসে, যে প্রেমের অনুভূতি আসে, সেই প্রেমের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হই, এই বোধ আসে। যেহেতু তিনি সবার, সকলে তাঁর—এই সত্যের মধ্যে প্রেমের পথে আমরাও সর্বত্র যুক্ত হই।" •

আমরা যদি একটু তলিয়ে ভাবি তখন বুঝি আমরা সবাই চাই আনন্দ, ভালবাসা বা প্রেম এবং উদ্বেগহীন শান্তি। এই প্রেম আনন্দ ও শান্তি মিলিত অনুভূতিই অমৃত; অন্যথা মৃত্যুহীন বা পরিবর্তনহীন বলে এ বিশ্ব-সৃষ্টিতে কিছু নাই। ঈশ্বর হচ্ছেন প্রেম, আনন্দ ও শান্তি স্বরূপ—তিনি স্বরূপে অমৃত। সেই অমৃতত্ব লাভ করতে হলে চাই ঈশ্বরানুভূতি; কাজেই ঈশ্বরানুভূতি লাভই সকলের জীবনের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আমাদের মনটিকে করতে হবে নির্মল, শুদ্ধ; সকল পাপ ও সংস্কারের আবর্জনা সেখান থেকে দূরীভূত করতে হবে। "পাপপুণ্যকে আমরা সামাজিক ভালমন্দ সুবিধা অসুবিধার জিনিষ বলেই জানি। নিজেকে এমন করে গড়ি যাতে লোক-সমাজের উপযুক্ত হই, ভদ্রতার আদর্শ রক্ষা হয়। এই টুকুতেই কৃতকার্য হলে আমাদের আর সঙ্কোচ থাকে না। মনে করি চরিত্রনীতির যে উপযোগিতা তা আমার দ্বারা সিদ্ধ হোল। কিন্তু পাপের শিকড় আরো গভীরে। উপরের আগল কেটে যেমন চলবার

• রবীন্দ্রনাথ—শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালা—১০৪ পৃঃ

• রবীন্দ্রনাথ—শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালা ৭-৯

মত রাস্তা করা যায়, সেটা এমন কিছু শক্ত নয়; কিন্তু সেই জঙ্গলকাটা জায়গায় চাষ করে তাকে সফল করতে গেলে দেখা যায় পদে পদে শিকড়ের বাধা। সেই রকম পাপের বহু বিস্তৃত শাখা ও প্রশাখা সমেত মূলগুলি মনের মধ্যে থেকেও উপরে স্বস্থতার আদর্শ রক্ষার মত আপাতার মঙ্গল সাজ করে চলা যায়। যখন আত্মার জাগরণ ঘটে সে পরমাত্মার তথা বিশ্ব জনের আত্মায় যুক্ত হতে চায়, তখন তাকে এই জীবনে সফল করতে হলে প্রতিটি গুপ্ত পাপের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়, তাকে না ওপড়ালে চলবে না"। †

মুখে ভাল কথা ধর্ম কথা বলি, চরিত্রের অন্তরালে গাঁই, শক্তি ও সামর্থ্যের অভাবে নিজের লোভ ও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে পারি না, মনের চিন্তায় সব কিছু উপভোগ করি, আচরণ করি। এতে ব্যবহারিক পরিচ্ছন্নতা ও সামাজিক শিষ্টাচার রক্ষা পায় সত্য কিন্তু সংস্কারে পাপের জড় থেকে যায়; বহুমুখী পাপের শিকড়ের ঘটনা অবচেতন মনকে কলুষিত করে রাখে। গীতায় একেই মিথ্যাচার বলেছে—

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥গীতা ৩.৬

যে মূঢ় ব্যক্তি হস্তপদ ও বাক্যাদি ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া মনে মনে শব্দ স্পর্শ রূপাদি ইন্দ্রিয় বিষয় (ভোগ্য দেহবিষয় ও ভোজ্যাদি) স্মরণ করেন তিনি মিথ্যাচারী।

বল্গা-বিমুক্ত বায়ুকে রোধ করা যেমন শক্ত, পাপ-কলুষিত মনকে নির্মল করা তেমনই কঠিন কিন্তু আদৌ অসাধ্য নয়। মনের এই দুর্গত অবস্থার মূলে সচেতন হতে হবে। যখনই বাসনা কামনার নগ্নরূপ মনের পরদায় চিত্ররূপে ফুটে উঠবে তখনই মনে মনে বলা—"ঠাকুর, এই অসৎ চিন্তা ও বাসনাগুলি তোমারই রূপ, কিন্তু এ রূপে কেন আমার কাছে এলে, তোমার মঙ্গলময় রূপ প্রকাশ কর"। প্রতিনিয়ত সংঘাতশীল এই সব বিপরীত চিন্তায় ও মানস প্রার্থনায় কুচিন্তা ও কুবাসনার প্রাবল্য ও আবির্ভাব সংখ্যা কমতে কমতে তা নিষ্ফল ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সৃজনধর্মী এবং জ্ঞানভক্তির সহায়ক বৈধিক কর্মে নিযুক্ত হওয়াও প্রয়োজন। এই ভাবে পুনঃ পুনঃ শুভ চিন্তা ও কার্যের অভ্যাসে অবচেতন মন কলুষমুক্ত হবে।

চিত্ত শুদ্ধির একটা শক্তিমান সহায় প্রার্থনা। "প্রার্থনা করতে হবে সেই পরম পুণ্যের কাছে 'বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব'। আমার সমস্ত পাপ (বিশ্বানি দুরিতানি) দূর কর। ব্যাকুলতা ও প্রার্থনাদ্বারা প্রেমময়ের স্পর্শ অনুভব হতে না হতে এমন শক্তি দেবেন তিনি, যখন কোন পাপ আর আমাদের চোখকে রাখতে পারবে না। আমাদের অজ্ঞানের অন্ধকারের মধ্যে এসে পৌঁছবে যে বিরাট, তোমার প্রেম ও সত্যের দু একটি আলোক রেখা। সেই আলোকের স্পর্শে নিজের আবদ্ধতার জন্য, কলুষ ও অন্ধকার আর আমাকে স্থবির হতে দেবে না, আমাদের শয্যা আমাকে বদ্ধ করতে পারবে। তখন বলতেই হবে 'যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।"•✦

চিত্তের এই বিগত-কলুষ শুদ্ধ অবস্থায় পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে আনন্দময় ও প্রেমময়রূপে অনুভূতি আসবে। কোন দুঃখই তার তখন দুঃখ বলে কষ্ট দেবে না, কোন সুখই আর অলস মোহে ডুবিয়ে রেখে না। অন্যায় দুঃখ এবং অবিচারও তখন মর্মবেদনা দেবে না, বরং তার যে প্রয়োজন ছিল সে বোধও জন্মাবে। উপনিষৎ বলেন 'নমস্কার ভূয়ো নমস্কার ভূয়ঃ'। "সুখকরকে নমস্কার, কল্যাণ-করকে নমস্কার। আমরা সুখকরকেই নমস্কার করি, কল্যাণ-করকে সব সময় নমস্কার করতে পারি নে। কল্যাণকর ত শুধু সুখকর নন্, তিনি যে দুঃখকর। আমরা সুখকেই তাঁর

† রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালা ১২-১৩

• যা দিয়ে আমি অমৃত হব না তা নিয়ে কি করব।

✦ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালা ১৩-১৪

দান বলে জানি আর দুঃখে কোন দুর্নিবারকে বিচলিত বলে জ্ঞান করি। দুঃখের আঘাত থেকে আমাদের মনকে অন্তরে বাহিরে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে জগতে আমাদের অসম্পূর্ণতাকে বাড়িয়ে তোলা হয়। সুতরাং তাতে কখনই আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শক্তির পরিণতি হয় না। পৃথিবীতে এসে যে ব্যক্তি দুঃখ পেল না, সে লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে তার সব পাওনা পেল না, তার পাথেয় কম পড়ে গেল।

"জগতে এই যে আমাদের দুঃখের পাওনা এ যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত হবেই তা নয়। অন্যায় অবিচারকে আমরা উপযুক্তভাবে গ্রহণ করতে পারি এমন আমাদের সামর্থ্য থাকা চাই। পৃথিবীর নিত্য অবিচারের দুঃখ বইতে যারা অকাতরে প্রস্তুত হতে পারে তারা কেবল বলিষ্ঠ হয় তা নয়, নির্মল হয়। অসংযত জীবনের উপর দিয়ে জগতের পুর্ণ সাজা গেলে তাদের কলুষ ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে।"*

চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সকল ঈশ্বরবাদী এমন কি নিরীশ্বরবাদী ধর্মেও তারস্বরে ঘোষিত হয়েছে। বুদ্ধ, মহাবীর, কনফুসিয়াস আদর্শ নৈতিক জীবনের উপর বার বার জোর দিয়েছেন। তাঁরা দুঃখ-মুক্তির পথ অন্বেষণে যাঁদের যুক্তি বিচার বিশ্লেষণ চালিয়েছেন আর কিছুরই দুঃখ-মুক্তিকে খুব বড় করে দেখেন নি। তাঁরা দুঃখ-মুক্ত, মৃত্যু-মুক্ত, সংস্কার-মুক্ত হয়ে শুদ্ধচিত্ত হয়ে ঋষি, ধীর, প্রাজ্ঞ হতে এবং প্রেমে জগৎ ও জগদীশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছেন—যে অবস্থায় মানুষের বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম বোধ ও সীমাহীন শক্তি লাভ হয়।

শুদ্ধচিত্ত হবার পরই আমাদের সংস্কারের বাঁধনগুলি খসতে থাকে, আমরা অনুভূতির ক্ষেত্রে বন্ধনমুক্ত, বিরাটের সঙ্গে যুক্ত ও সর্বগ হতে থাকি। যেহেতু চিত্তের কোন বিক্ষোভ বা চাঞ্চল্য থাকে না সেজন্য উপনিষদ্ এই অবস্থাকে বলেছেন, 'ধীর'; গীতা বলেছেন 'প্রাজ্ঞ', প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন। উপনিষদ্ বলেন, 'তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি'। "ধীর ব্যক্তিরা সর্বব্যাপীকে সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্বত্র প্রবেশ করেন। এই সর্বত্র প্রবেশ করার ক্ষমতাই শেষ ক্ষমতা। যখন সমস্ত পাপের সমস্ত সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের আত্মা সর্বতই আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়, তখনি সে সর্বত্র প্রবেশ করে।" *

চিত্তশুদ্ধির এই পরবর্তী অবস্থায় মানুষ অন্তরতমে যিনি সকলের মধ্যে প্রকাশমান সেই আনন্দস্বরূপ, রূপস্বরূপ, প্রেমস্বরূপকে দর্শন করে প্রত্যেকটি অন্যায় ও অবিচারের আঘাতকে—আততায়ীকে—আমারই আর এক প্রকাশ বোধে অক্ষুব্ধ চিত্তে ক্ষমা করেন, ন্যায়ীয় শাস্তির বদলে প্রেমকেই উপেক্ষা করেন। যিশু জুডাসকে বিশ্বাসঘাতক জেনে তার সঙ্গে আহার করলেন, জুডাস তাঁকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিলেও তাকে ক্ষমা করলেন, যারা বিচারের ছলনা করে তাঁকে ক্রুশে মৃত্যুদণ্ড দিল তাদের উদ্দেশে তিনি প্রার্থনা করলেন, "পিতা, এরা কি করছে এরা জানে না, তুমি এদের ক্ষমা করো"। মাতাল জগাই মাধাই কলসী-আঘাতে নিত্যানন্দের কপাল কাটিয়ে দিল, দরদর ধারে রক্ত ঝরে পড়ছে, তবু নিতাই বললেন, "মেরেছ কলসীর কানা তা বলে কি প্রেম দিব না"। কবীরকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে দেওয়া হোল, তিনি কোন অভিযোগই করলেন না। যে পিতা তাঁকে যমের বাড়ী পাঠালেন, সেই পিতার পাপমুক্তি প্রার্থনা করলেন নচিকেতা, দেবদত্ত বুদ্ধের জীবন নাশের চেষ্টা করলেন, তিনি তাকে শাস্তি দিতে পারতেন কিন্তু ক্ষমা ও উপেক্ষা করলেন। অনেক জৈন শিল্পী বুদ্ধের একখানি রাজচিত্র অঙ্কন করেন। উপগুপ্ত-শিষ্য একদা চণ্ডাশোক মগধ-সম্রাট অশোক জৈন সাধু ও প্রধান ব্যক্তিদের হত্যা করে তাদের ছিন্ন শির তাঁকে এনে দেখাবার আদেশ দিলেন। এই নিষ্ঠুর আদেশ পালিত হতে লাগল। রাজভ্রাতা সম্রাটের প্রিয় বীতশোক পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা ও অনুরোধ করেও সম্রাটকে এই হিংস্র কঠোর কর্ম থেকে বিরত করতে পারলেন না। পরদিন প্রথমেই যে হতভাগ্য জৈন সন্ন্যাসীর ছিন্ন মস্তক সৈন্যেরা সম্রাটকে এনে দেখালেন, অশোক তা দেখে আর্তনাদ করে উঠলেন "থামাও থামাও হত্যা"। বীতশোকের প্রাণদানে চণ্ডাশোক ধর্মাশোকে পরিণত হন। সম্রাটের হিংসার শক্তি এমনকি তাঁর চরিত্রকেও জয় করল শুদ্ধচিত্ত বীতশোকের প্রেমের শক্তি। মানুষের মধ্যে শক্তির চরম প্রকাশ ঘটে যখন সে অন্যায় ও অবিচারকে অক্ষুব্ধ চিত্তে ক্ষমা করতে পারে। চিত্তশুদ্ধি লাভ না হলে এ শক্তির স্পর্শ মেলে না।

---

* রবীন্দ্রনাথ—শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালা ১৩-১৪

সমারসেট মম্—প্রখ্যাত কাহিনীকার

সমারসেট মম্ সম্প্রতি ৯১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন; তিনি এই শতকের সবচেয়ে লেখকদের অন্যতম ছিলেন। নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পের লেখক হিসাবে এক পুরুষেরও বেশী সময় তিনি প্রায় সকল দেশের পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর এই সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবন শুরু হয় ১৮৯৭ সালে 'লিজা অব ল্যামবেথ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর।

তাঁর বহু রচনাতেই তাঁর বিচিত্র জীবন ও তাঁর ব্যাপক ভ্রমণের কথা নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে—তাঁর এই ভ্রমণ হয়েছে ইওরোপ থেকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে, ভারতে, প্রশান্ত মহাসাগরে এবং চীন মুলুকে। তাঁর নাটকাবলী অনুষ্ঠিত হয়েছে বহু ভাষায় এবং প্রায় সমস্ত প্রধান শহরেই তাঁর এই সব নাটক অভিনীত হয়েছে।

মম্ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ বেধে ওঠার আগে এবং পরে দু'বারই ভারতে এসেছিলেন তাঁর ভারত সম্পর্কে প্রথম অভিজ্ঞতার কথা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে 'এ রাইটার্স নোটবুক'-এ। মম্-এর অপর এক শ্রেষ্ঠ রচনা 'দি রেজর্স এজ'-এ—বইটির চিত্রণও সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করে—লেখকের ভারতীয় মরমীবাদ সম্পর্কে আগ্রহ প্রতিফলিত হয়েছে।

উইলিয়াম সমারসেট মম্ এক বিশিষ্ট আইনজীবী পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন ইন্‌কর্পোরেটেড ল' সোসাইটির একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং বয়েকটি আইন পুস্তকের লেখক। তাঁর পিতা ছিলেন প্যারিসস্থিত ব্রিটিশ দূতাবাসের একজন সলিসিটর এইখানেই উইলিয়াম ১৮৭৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর বড় ভাই এক সময় ছিলেন এক্সচ্যাকেরের ও হাইকোর্টের বিচারপতি।

সমারসেট মম্-এর বয়স যখন ১০, তখন তাঁর বাবার মৃত্যু হয়, এবং তিনি পড়াশুনোর জন্য ফ্রান্স ছেড়ে চলে যান ইংলণ্ডে। তিনি স্কুলের পড়াশুনা কিছুটা আগেই ছেড়ে দেন জার্মানীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার জন্য এইখানেই তিনি প্রথম বইয়ের জাল-বাসতে শেখেন। জীবিকা হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন চিকিৎসাবৃত্তি, কিন্তু নিতান্তই উৎসাহহীন ভাবে।

১৮৯২ সালের শরৎকালে ট্রেনিং-এর জন্য তিনি লণ্ডনের সেণ্ট টমাস হস্পিটালে প্রবেশ করেন, এরই পাঁচ বছর পরে তাঁর প্রথম উপন্যাস (লিজা অব ল্যাম্বেথ) প্রকাশিত হয় ছাত্র হিসাবে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তারই উপর ভিত্তি করে। তিনি ইতাবসরে মেডিকেল ডিগ্রি লাভ করলেও লিজার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে চিকিৎসাবৃত্তি পরিত্যাগ করে এসে লেখক হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন।

মম্ বহু দেশ ভ্রমণ করেছিলেন এবং এই কারণেই বোধ হয় তিনি একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করতে পেরেছিলেন। সাহিত্যের উপকরণের সন্ধানে এমন দেশ কমই আছে যেখানে তিনি একবার যান নি।

প্রথম দিকের কয়েক বছর তাঁকে লেখক হিসাবে কিছুটা সংগ্রাম করতে হয়। তিনি প্রথম নাটক লিখতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তা গ্রন্থে বিবেচিত হতে পারে নি। ছোট গল্প এবং উপন্যাস লিখেও যথেষ্ট পয়সা তিনি পেলেন না। ১৯০৭ সালে অবশ্য অনেকটা আকস্মিক ভাবেই তাঁর ভাগ্য খুলে যায়। লণ্ডনের রোট থিয়েটারে একটি নাটক অভিনীত হচ্ছিল, কিন্তু তা জনপ্রিয় না হওয়ায় বন্ধ করে দিতে হয়। পরিচালন কর্তৃপক্ষ ছয় সপ্তাহের মধ্যে আর একটি নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপার নিয়ে বেশ উদ্বেগ বোধ করছিলেন, কারণ কোন নাটকই তখন তাঁদের ঠিক মনে ধরছিল না। এই সময় মম্-এর 'লেডি ফ্রেডরিক' নাটকটি তাঁদের দৃষ্টি পথে আসে। নাটকটি আশ্চর্যভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়, যার ফলে নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব হয় আরও তিনটি নাটক লণ্ডনের প্রযোজকদের কাছে বিক্রি করার।

তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'অব হিউম্যান বণ্ডেজ' নিয়েও তাঁর জীবনে একটা মজার ব্যাপার ঘটে। ১৯১৫

সালে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়, কিন্তু সে সময় তার কোন সমাদরই হয় নি; এর ২০ বছর পরে যখন একজন আমেরিকান প্রকাশক বইটির পুরোনো একটি কপি দেখে তার প্রশংসা করেন তখন ব্রিটিশ সমালোচকরা হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে ওঠেন বইটির গুণাগুণ সম্বন্ধে, সমালোচকরা বইটিকে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসাবে অভিনন্দিত করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মম্ ফ্রান্সে এক এম্বুলেন্স ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, এবং পরে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে ও রাশিয়ায় যান। এর বেশ কয় বছর পরে তাঁর এই সব জায়গার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তিনি লেখেন তাঁর অতি বিখ্যাত বই 'অ্যাশেনডেন' যুদ্ধের পর তিনি যান চীনে, এবং পরে আরও কয়েকটি দেশ তিনি সফর করে আসেন।

১৯২৭ সালে তিনি দক্ষিণ ফ্রান্সে একটি বাড়ি ক্রয় করেন, এইখানেই তাঁর অধিকাংশ সময় কাটে এইখানে বাস করার সময়ই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে ওঠে এবং তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে সেবা করার ইচ্ছা জানান। গবর্ণমেণ্ট তাঁকে যুদ্ধকালীন ফ্রান্স সম্পর্কে এবং ইঙ্গ-ফরাসী সম্বন্ধগুলি সম্পর্কে লেখার জন্য অনুরোধ করেন।

ফ্রান্সের যুদ্ধের পরে মম্ তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে একটি জাহাজ ক্রয় করেন এবং এই জাহাজে করে তিনি উদ্বাস্তুদের স্বদেশে ফিরে যেতে সাহায্য করেন। 'দ্রিফটিং পার্সোনেল' নামের বইতে তিনি ফ্রান্সী আক্রমণের আগে এবং পরে ফ্রান্সে কি দেখেছিলেন এবং কি ভাবে তিনি পালিয়েছিলেন তারই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। লণ্ডন থেকে তিনি যান যুক্তরাষ্ট্রে, এখানে তিনি বছর দেড়েক বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান।

মম্-এর কতকগুলি নাটক হাল্কা কমেডি ধরণের আবার কতকগুলি বেশ উত্তেজনামূলক, যেমন 'দি লেটার'। কতকগুলি আবার পরীক্ষামূলক, যেমন 'দি সেকরেড ফ্লেম' ও 'সেডি'। তাঁর 'আণ্ডার কোভারস্' নাটকটি শ্রেষ্ঠ আধুনিক নাটক হিসাবে চিহ্নিত হবার দাবি রাখে। গল্প লেখক হিসাবে তাঁর খ্যাতি সম্বন্ধে আজ আর নতুন করে কিছু উল্লেখ করার প্রয়োজন হবে না। উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি সর্বজনপ্রিয় উপন্যাস হল 'রেক্স্ অ্যাণ্ড এল্' প্রচ্ছন্ন ভাবে হিউ ওয়ালপোলের জীবন নিয়ে এটি রচিত। তাঁর বহু উপন্যাসই চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। একটি জনপ্রিয় ছবি হল 'দি মুন অ্যাণ্ড সিক্সপেন্স'—বইটি গগাঁর জীবন নিয়ে লেখা, যদিও নামটি গোপন রাখা হয়েছে।

তাঁর শেষ উপন্যাস 'ক্যাটালিনা' প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। জীবনের বাকী কয় বছর তিনি আত্মজীবনী, প্রবন্ধ এবং সাহিত্য সমালোচনা লেখায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলে তিনি ফ্রান্সে তাঁর নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন, এখান থেকে প্রতি বছর একবার করে তিনি ব্রিটেনে যেতেন।

মম্ তাঁর রচনা থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং অর্থের সদ্ব্যবহারও করেন উদারতার সঙ্গে। তিনি তাঁর পুরোনো স্কুল ক্যাণ্টারবারির কিংস্ কলেজকে বৃত্তি ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য দেন ১০,০০০ পাউণ্ড (১·৩৩ লক্ষ টাকা) এবং ইনকর্পোরেটেড সোসাইটি অব অথরস্, প্লেরাইটস্ অ্যাণ্ড কম্পোজারস্-এর অধীনে একটি ট্রাষ্ট গঠন করে তরুণ ব্রিটিশ লেখকদের জন্য বাৎসরিক পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। এই পুরস্কার লেখকরা কেবল ভ্রমণে ব্যয় করতে পারেন।

১৯৪১ সালে তিনি 'কম্প্যানিয়ন অব অনার' সম্মানে ভূষিত হন। তিনি একজন 'কমাণ্ডার অব দি লিজিয়ন অব অনার'ও হয়েছিলেন এবং দেশী বিদেশী বহু অনরারি ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। তিনি হাইডেলবার্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনরারি সেনেটর ছিলেন। ১৯৬১ সালে মম্ কম্প্যানিয়ন অব দি রয়েল সোসাইটি অব লিটেরেচার নিযুক্ত হন—এই নতুন কম্প্যানিয়নশিপে প্রথম পাঁচজন সাহিত্যিকের একজন হন তিনি।

[ব্রিটিশ ইনফরমেশান সার্ভিস প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি হইতে]

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৪—

(৬১)

তোমার বাণীর গানে আমার ভাল-মন্দ সব ধুইয়া উঠুক। আমার জীবন বিগলিত হউক, উজান বহুক। পোষ্টাফিসে উজলতারাকে V.P. করিয়া, ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এ গিয়া ও ভাউচার কপি দিয়া, প্রেস, অমার বাসা, মন্থর বাসা হইয়া বেণু ফেরে। ৪॥০টার পর ঘরে যাই। আজ বারান্দায় ফরাস বিছাইয়া বসিয়াছিলাম। ওখানে বসিলেই কাজ কাম করার সুবিধা। সময় ২মাসও নাই, অথচ কত কাজ বাকী রহিয়াছে—চাউল সংগ্রহ, সভাপতি ও বক্তা ঠিক করা, নিমন্ত্রণ পত্র ছাপানো ও বিতরণ করা, urinal ও latrine তৈয়ার করা, ভলান্টিয়ার (পুরুষ-মেয়ে) সংগ্রহ করা ইত্যাদি। 'ভক্তিযোগদর্শনে' নারদের স্থানে 'শান্তিদা' বসাইয়া দেওয়াই খগেনবাবু তারিণীবাবু প্রভৃতির মত।...সাময়িকী 'প্রীতি সম্মেলন' কিছুটা লিখি। চশ্মা না থাকায় অল্প লিখিতে বেশ কষ্ট হয়। সন্ধ্যাকালে জ্ঞানবাবু তাঁহার বাগানের ২টী কপি, কিছু সুন্দর ফুল ও টমেটো দিয়া গিয়াছেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী

রাধারাণী আমার, পরাণপুতলী আমার, তোমার পরা প্রকৃতির স্পর্শে আমার প্রকৃতির রূপান্তর হউক, আমার অপরা প্রকৃতি (mechanical nature) পরা আমার জীবভূতা জীবন্ত প্রকৃতিতে গড়িয়া উঠুক। মনও অপরা প্রকৃতি। মনোময় আমার হউক তোমার মনে। আমি তুমি রূপে গড়িয়া উঠি, তুমি বনিয়া যাওয়া ছাড়া আর কিছুতে আমার সার্থকতা নাই। তুমিই আমার সত্যিকার আমি। তোমার মাঝেই আমি সার্থক, সফল। তোমার ছাঁচে, তোমার ভাবে আমার দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি বিভাবিত হউক। আমি কৃষ্ণভাবিনী হইব। বেণু ঠাকুরের 'অন্তালীলা' শেষ করে। ৪টার পর আমি, উষারিণী, প্রতিভা, বেণু, গোপা ও বুলু মহানির্বাণ ঘাটে যাই। ৪॥টার পর সভার কাজ আরম্ভ হয়। আজ আর মেঝেতে ব্ল্যাকবোর্ড লাগানো হয় নাই। কে লাগাইবে? শ্রীনিতাগোপাল কেন ভগবান তাহার আলোচনা হয়। শ্রীনিতাগোপালের জীবন বিস্তীর্ণ ও গভীর—from earth to heaven, from heaven to earth, সমাধি হইতে আগ্রতে, আগ্রৎ হইতে সমাধিতে; তিনি ভাব ও রস-মূর্তি। 'বীর্যাণি তস্যাখিলদেহকাজাম্' এবং 'অন্তঃ পুরুষরূপেণ' এই শ্লোক দুইটী কেমন করিয়া শ্রীনিতাগোপাল জীবনে সার্থক হইয়াছে, তাহা আলোচনা করি। আজ নিতাগোপাল আমাদিগকে কোল হইতে টানিয়া আনিয়া অনসাধারণের মধ্যে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। আজ যোগ্য হইতে হইবে। তাঁহার ভাবের কূল শেষ হয় নাই। আজও তাঁহারই ভাত খাইতেছি।...

১৪ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, জাগো নারায়ণ। রক্ত-প্লাবিত বিশ্ব, সাম্প্রদায়িকতা-জর্জরিত বিশ্ব আজ আর্তনাদ করিয়া তোমাকে ডাকিতেছে এত বেশ মতবাদে মতবাদে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, পরিবারে পরিবারে, মানুষে মানুষে! কে ইহাদিগকে প্রাণরসে জমাইয়া তুলিবে তুমি ছাড়া? তুমিই প্রাণ-মহাপ্রাণ, বিশ্ব-প্রাণ। আমি তোমাকে জীবনে ধারণ করিব, তুমিময় হইব, এক-দেহ এক-প্রাণ এক-মন এক-বুদ্ধি হইব। আমার জীবন লইয়া তুমি বিশ্ব-জয় অভিযান কর। তোমার জন্মোৎসব তুমি কর। সকালে একবার ঘরে যাই—'নদের নিমাই'-এর ওখানে এবং সুরেশ দেবের ওখানে কোনও কথা হইল কিনা তাহা জানিবার জন্য

মঠে যাই। বাসে যাই—কিন্তুর অন্ত সেকরাপাড়ার মোড়ে নামি। হাঁটিয়া আসি।...রেণু ১০ টার আগে বাহির হইয়া প্রেসে আমার চিঠিটা ছাপাইতে দেয়··· থাকায় পর আবার বাহির হয়।...

১৪ই ফেব্রুয়ারী

নিত্যগোপাল, ওগো বিশ্বের মধ্যে প্রাণ, তুমি বিশ্বের সমস্তার এ-কূলে ও-কূলে কোনও দিকেই আটকাইয়া গেলে না, অড়াইয়া পড়িলে না। তুমি দুকূল ভাসিয়া দুকূল রাখিয়া মাঝখান দিয়া বহিয়া চলিয়াছ। মুক্ত তুমি, অয়ি তুমি; কেহ তোমায় ধরিয়া রাখিতে পারিল না ওগো বাঁধন ছেঁড়া অবধূত আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। তুমি এক, কেবল, অসঙ্গ। আমিও এক কেবল অসঙ্গ হইব। আমরা দুই-এ মিলিয়া পরম এক হইব, পরম অদ্বৈত হইব, অভেদ-প্রভেদ দুই-ই আস্বাদন করিব। হাওড়া হইতে হৃষীকেশ যাতায়াত এক টিকিটে এক মাসে। উহারা আসিবার জন্ত প্রস্তুত। ১০০৲ টাকা যাতায়াত, ১০০৲ খুচরা কেনা, চুল ইত্যাদি ভাড়া বাদে। রেণু সেই চিঠি মঠে কিতীশবাবুকে দেখাইয়া প্রেসে যায়। ৪ ঘণ্টা সেখানে থাকিয়া আমার চিঠিটা, হিন্দী আবেদন ঠিক করিয়া প্রায় ৫টার মঠে আসে। আমি ৪॥ টায় মঠে যাই। নগেনদাদা কয়েকদিন পর কাশী যাইবেন। খোঁজ নিয়া জানা গেল ঠাকুর বৈশাখ মাসে কলিকাতায় হইয়া হরিদ্বার আসেন নবদ্বীপ হইতে। সঙ্গে ছিলেন নগেন্দ্র নারায়ণ রায় (বৃন্দাবনে যিনি শেষ বয়সে ছিলেন)। তিনি সাদা পোষাকে ছিলেন। নাম বলিয়াছিলেন, নিত্যগোপাল বসু। ৩ দিন হইতে মাধ্যমিক শিক্ষকদের ধর্মঘটের সামনে অবস্থান-ধর্মঘট চলিতেছে। আজ ১৪৪ ধারা ভাঙিতে গিয়া গোলমাল হয়। বাস পোড়ানো হয়, টিয়ার গ্যাস চলে বলিয়া খবর পাওয়া গেল। মঠ হইতে হাঁটিয়া আসি। ট্রাম-বাস চলে নাই।···শিক্ষকগণ আজ প্রবিক সমাজে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহারা তো বিদ্যা দানের জন্ত সম্মানের অধিকারী ছিলেন। যেদিন তাঁহারা বাসপোড়ানোদের সমর্থন চাহিয়াছেন, সেদিন তাঁহারা বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছেন।··· ১৬ই ফেব্রুয়ারী

রাধারাণী, সর্বত্র চলিয়াছে ধ্বংস, মৃত্যুর গর্জনধ্বনি, ইহার ভিতর ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে তোমার মুখখানি, ভাবের বাণীটী। এ কূলে ও কূলে কেবল মৃত্যু। তুমি মাঝখানে কেবল অমৃত। তোমার মুখশ্রী উদ্ভাসিত হইতে চলিয়াছে সকল ক্ষেত্রে, সকল স্তরে। তোমাকে পথে কুড়াইয়া পাইয়াছি, বুকে তুলিয়া লইয়াছি। অক্ষ অবচেতন, পাশ্চাত্য-প্রাচ্যের মন্থনের ফলে গড়িয়া উঠিতে চলিয়াছে একটী বিশ্ব। তুমি এই মনোভূত আমার নবীন পুতুল। ওগো আমার জীবন-মরণ ধন, তুমিই নিত্যগোপাল। ধ্বংসের ভিতর দিয়া পথ চলার সঙ্গী তুমি আমার সামনে পিছনে দক্ষিণে বামে তুমি। ৬।০ টায় পর তারিণীবাবু আসেন ··৮টায় সুরেশবাবু পাইকপাড়া হইতে আসেন। আমরা একত্র হইয়া... প্রভুর সেনের বাড়ীতে পৌঁছি,...রাজাপালকে (ডঃ হরেন মুখার্জীকে) ফোন করেন আমার পরিচয় দিয়া। ১০ই এপ্রিল শ্রীনিত্যগোপালের জন্মপত্র বাহিকী দিনে তাঁহার অন্ত কোন engagement নাই...। পরে অপেন-দাশগুপ্তের ওখানে যাই। সে অলপাইগুড়ি যাইবার কথা বার বার বলে। আমার প্রচারের প্রয়োজনীতা সে স্বীকার করে। সে উদ্বোধনের গ্রাহক হইল, ৪ টাকা দিল। গোপিকাবিলাস সেনের ওখানে হাঁটিয়া যাই।...সেও গ্রাহক হয়।··

১৭ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর আমার সকল অঙ্গের শোভা তুমি। আমার প্রতিষ্ঠা তুমি, মর্যাদা তুমি, আমার ধন তুমি, জন তুমি, আমার গর্ব তুমি। তোমাকে বুকে লইয়া বিশ্ব জয় করিবার দুঃসাহস আমি রাখি। বিশ্ব যদি তোমার দর্শন ও জীবন প্রতিষ্ঠাদ্বারা জয় করিতে পারি, তাহাতে বিশ্বেরই জয় হইবে, বিশ্বসঙ্ঘ রচিত হইবে। আমার দেহ মন প্রাণ নিঃশেষ করিয়া তোমার চরণে ডালি দিতেছি, সমর্পণ করিতেছি—ওগো আমার জীবন-মরণ, সাধন-দুর্লভ, চিরধীর স্বামী। সকালে 'শিক্ষক ধর্মঘট' এই সামরিকী লিখি। আজও ট্রাম ও সরকারী বাস চলে নাই। নীলুর এক চিঠি আসিয়াছে। রাহু শুভবাহিকীতে

আসিতে পারে। বৈশাখ মাসে নীলু হাবরা আসিতে পারে।... জানেবাবু নীচে আসেন—বেণুকে ১২০ টাকার এক চেক দিয়া যান—মার্চের ২০৲ + পতিবাদিকীর কাজের জন্য বেণুর দেয় হিসাবে ১০০৲।...তারিণীবাবু দিনরাত খাটেন। আমি বলি দুঃখই তো জীবনের তীর্থ। দুঃখ একদিন থাকিবে না। তখন ইহাই হইবে আনন্দের। ছেলে ওবার গিয়াছি। আজ আর যাই না। এই ছেলে যাওয়া আজ কত আনন্দের! ঠাকুরের জন্য কৃচ্ছ্র করার কত আনন্দ! তারিণীবাবু ও নগেনবাবু অফিস ঘরে একটী বিছানায় শোয়। ইহা কি কম তপস্যা!—এই সব কথা ওখানে বলি। এখানেও বলি। সবাই আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার দুয়ার আজিও খোলা রহিয়াছে। আমি কাহারও সঙ্গে এমন কোনও ব্যবহার করি নাই যাহাদের আমার এখানে তাহার আসা ব্যাহত হয়!

১৮ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, তোমারেই আমার জীবনের অপূর্ণ আশা করিব। কত আশা করিয়া ঘর ছাড়িয়াছিলাম, পথে বাহির হইয়াছিলাম যে তোমাকে অন্ততঃ বাঙলার মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করিব। আমার বুকের তাজা রক্ত দিয়া তোমার সেবা করিব। পারিলাম কই? মনে করিয়া আছি যে তোমার প্রতিষ্ঠা-দান প্রয়োজনেই আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছ। সুখ দুঃখ যাহা কিছু পথের মাঝে পাইয়াছি তোমার পদ্ম হস্তের দান বলিয়া তাহা যেন গ্রহণ করিতে পারি। আমার যাওয়াপরা চলাফেরা সকল কাজ দিয়া তোমারই কার্য সাধিব। তোমার শ্রীচরণেই আমার জুড়াইবার স্থান, মাথা রাখিবার স্থান। তোমার জয় হউক। আজ হৃষীকেশ (হাওড়া) ও অনাথবাবুর কাছে পত্র দেই তাহাদের আমাদের উৎসবে যোগদানের সকল আনার সব আনন্দ প্রকাশ করিয়া। সারাদিন বেণু প্রুফ নিয়া ব্যস্ত।...তারিণীবাবু গুপ্তিপাড়া ও নলহাটি উৎসবে যাইবে শুনিয়া খুব বেদনা বোধ করি ও তাহাকে স্নেহপূর্ণ তিরস্কার করি। এ আয়গায় কাজ করিবার বেহ নাই। নলহাটিতে এবার হইতে কীর্তন পার্টি যাইতেছে আর তারিণীবাবু সেখানে যাইতেছেন এখানের কাজ ফেলিয়া? আমি ইহা ভাবিতে পারি না। টাকা আদায় হইল না, প্রোগ্রাম ঠিক করা হইল না, বক্তা ঠিক করা হইল না, আর ইহারা আছেন যে যার উৎসবানন্দে। আমি ইহা বুঝি না। ইহা কি এগাস্টিজমের লক্ষণ? চিদানন্দও যাইবে। বেশ, ঠাকুর, তুমি তুবিয়া যাও। তাহাতে তাহার কি আসিয়া যায়? প্রত্যেকেরই উৎসব আছে। আমার কোন উৎসব নাই। আমি একা, একেবারেই একা।

১৯শে ফেব্রুয়ারী

রাধারাণী আমার, পরাপুরবী আমার, বিশ্বের সকল মর্যাদা, সকল সুষমা, সকল গৌরব, সর্বদেশ মুক্তির ঘন বিগ্রহ তুমি। তোমাতে জীবনেই বিশ্ব-প্রকৃতির মুক্তিঘন জীবন। প্রকৃতিরও যে একটি নিত্য বৃদ্ধ মুক্ত স্বভাব আছে, প্রকৃতির যে ব্রহ্মের ন্যায়পরা অনাদি অনন্ত সত্তা রহিয়াছে, তাহা তোমার জীবনদর্শনেই শুধু সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তুমি পরা প্রকৃতি, পরা শক্তি, আর তুমি পর পুরুষ, পরা শক্তিমান। আমার হৃদয় পুরবী তুমি। সকালে সভাব্রত আসে। আমার ঐ চিঠিটা দেই। ইহারা কেমন যেন হইয়া গিয়াছে। কোনও কিছু constructive কিছু নাই—কেবল সমালোচনা। কংগ্রেসের দোষ আছে—কিন্তু যাহারা শত্রুতা করিবার জন্যই কংগ্রেসের পক্ষে, তাহাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া কংগ্রেসকে সমালোচনা না করিবার কথা বলি। বাম-পন্থীদের কি যোগ্যতা আছে? আর এই সব ট্রাম পোড়ানো, বাস পোড়ানো, গুটা ছাড়া দিয়াই যদি রাজত্ব নেওয়া যায়, তাহা হইলে আর গান্ধীজীর কি প্রয়োজন ছিল? যতীন মুখার্জী প্রভৃতি চরিত্রবান ছিলেন। আর ইহারা?...

২০শে ফেব্রুয়ারী

রাধারাণী, বিশ্বময় যে বেদনার সুর বাজিয়া উঠিতেছে, সকল অন্তসত্তার মধ্যে আত্মপ্রকাশের যে কান্না শুনিয়া উঠিতেছে, তুমি তাহারই মূর্ত বিগ্রহ তুমিই মূর্তিমতী বেদনা, বেদমূর্তি; সকল বেদ তোমারই বেদনার গানে

মুখর। এই বেদনা আত্মনিবেদনের বেদনা, আত্মসমর্পণের বেদনা, লয় নির্বাণের জন্য বেদনা। তুমি বৈরাগী, তুমিই নিস্পৃহী। তবু নির্লিপ্ত হইবার জন্য কি বেদনাই না প্রকাশ করিতেছে। তবের নির্লিপ্ত লাগি বেদনা তবেই তো অপরূপ!...ইহার পর পরমহংস পঙ্কুনাথ আসেন। কিছু কথাবার্তার পর চলিয়া যান। মনটা আমার ভাল নয়। কিছু পরে তাঁহাকে আসিতে বলি...তাহার যাওয়ার কথাও বলি। সুরেশ দেব আসেন,—তিনি এখানে প্রসাদ পান। ধীরেন ও তাহার স্ত্রী আসিয়াছিল।

২১শে ফেব্রুয়ারী

নিত্যগোপাল, তুমিই আমার জীবনের স্মিতি, সকল সমস্যার মধ্যে তুমিই আমার সমাধান। সবই তো আমার সমস্যা। সমস্যাই আমি বিস্তারিত। তুমিই আমার গতি, তাই আমি আগাইয়া আসিতে পারিয়াছি, তুমিই আমার স্থিতিগতি সমন্বয় মূর্তি তোমার প্রকৃতির মধ্যে আমার দাঁড়াইবার মত এতটুকু স্থানও কি আছে? আর বুঝি পারিলাম না! তোমার 'ভয় কি, টেনে তুলব' বাণীই আমার ভরসা। তুমিই আমার আশা-ভরসা, আমার মাথা গুঁজিবার স্থান।...রেণুর নামে যে ঠাকুরের বই শতবার্ষিকী উপলক্ষে ছাপা হইবে, তাহার নাম 'মায়ামানুষ শ্রীনিত্যগোপাল' ভাল বলিয়া মনে হয়। নগেন প্রামাণিক ও রমাপতি ঘোষেরও এই 'মায়া মানুষ' বিশেষণটি পছন্দসই হইয়াছে। 'ব্রহ্মগোপাল', 'পরমহংস মূর্তি' নামেও মানা যাইতে পারে।...ত্রিপুরারিবাবু যখন মহাভারত পাঠ করিবেন তাহা পরে বলা ঠিক হইয়াছে—১৩ই, ১৪ই এপ্রিল।

২২শে ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, আমার একাকীত্বের সঙ্গী তুমি। যে দুর্যোগের ভিতর দিয়া চলিয়াছি, তুমি সঙ্গে ছিলে তাই না থাকিয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয় নাই। ভরতের চক্রবর্তীর কথা জানি। কি সাধনা তিনি শেষ জীবনে পাইয়াছিলেন দু মুঠা অন্নের জন্য। তুমি আমাকে আগলাইয়া রাখিয়াছ। আজও আমার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে। নূতন করিয়া অভিযান করিবার পথও খোলা আছে তোমাকে বুকে লইয়া নূতন বিশ্ব গড়িয়া তুলিবার উপযোগী বল দেও, বুদ্ধি দেও, সুযোগ দেও। আমার আয়োজন সুষ্ঠু হউক, অচ্ছিদ্র হউক। তোমার পরশে আয়োজন সরস হউক। এই মাসে বিজ্ঞাপন যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা পূরা। এইরূপ বোধ হয় ছয় বৎসরেও হয় নাই। ঠাকুর জানেন। রেণু কাজে এত বিব্রত যে বাহির হইবার সময় পায় না। শরীরও তো ভাল নয়। ১২টার পর সাবিত্রীপ্রসন্নবাবুর ওখানে যাই, তিনি বিজ্ঞাপন দেন। আগামী পরশ যাইতে বলিয়াছেন।... রেজাউল করীমের এক পোস্টকার্ড আসে ১০ই এপ্রিল-এর অনুষ্ঠানে যোগদানের সম্মতি জানাইয়া। উদ্বোধনাবস্ত ও ভক্তিযোগদর্শনের প্রুফ দেখিয়া রেণুর আর সময় হয় না।...তবে আর আসিবে না। সে আর আসিবে কি না বুঝি না। সকলেই আমাকে ত্যাগ করে। আমি নিত্য অভিযুক্ত।

২৩শে ফেব্রুয়ারী

নিত্যগোপাল, সাগরের সঙ্গে নদীর যেমন যোগ তোমার বিশ্বদেহের সঙ্গে আমার দেহের সেই রকম যোগ স্থাপিত হউক, তোমার বিশ্ব-প্রাণের সঙ্গে আমার প্রাণের সেইরূপ যোগ স্থাপিত হউক। তোমার দেহ আমার, আমার দেহ তোমার, তোমার প্রাণ মন বুদ্ধি আমার, আমার প্রাণ মন বুদ্ধি তোমার। তোমায় আমায় গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে যেমন ধূলি হউক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম-মানুষ। তুমি আমি, আমি তুমি। ওগো আমার আমি, তোমার জয় হউক। সকালে অবিরাম প্রুফ দেখে রেণু। রেণু স্নানের পূর্বে 'উদ্বোধনাবস্ত' সাইনবোর্ডটা ঠিক করিয়া লেখাইয়া আনিবার জন্য দোকানে দিয়া আসে। খাওয়ার মধ্যে সুধাংশু আসে। ৫টাকা দিয়া যায়।...বেশ বুঝিয়াছে...। আমাকে জানাইবার কথা মনে হয় নাই। অথচ বোনকে জানাইয়াছে, সেফালি ৩।৪ দিন আসিয়াছে! কে আমাকে চায়? জয়াও বোধ হয় ত্যাগ করিল। একাকিত্বই আমার সম্বল। তাহা লইয়াই চলিব। কে এমন হতভাগার সঙ্গে থাকিবে? ৪টায় মঠে যাই। ৭টার পর সুরেশ

দেখা আসেন। সেদিন মনোজ্ঞ নন্দীর বাড়ী হইতে চলিয়া আসার জন্য তিনি এত রাগ করিলেন, আমি অবাক হইয়াছি।...দুর্গাবোলনবাবু, সুরেশ গুপ্ত ও সরল মল্লের নিকট আমার চিঠি আজ পাঠানো হয়।

২৭শে ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, তোমার চরণে আমার এই তপ্ত মাথা গুঁজিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে চাই। আমার চারিদিকে যাহারা, তাহারা শুধু সমস্যাই বাড়াইয়া চলিয়াছে। কে কতটুকু আমাকে আপাইয়া যাইবার পথে সাহায্য করিল তাহা তুমিই জান। অথচ তোমাকে বুকে লইয়া ছুটিবার জন্য প্রাণ তো চঞ্চল। কি করিব আমি? ধন নাই, জন নাই। আর তো পারি না। তোমার কাজ তুমি কর। ...এখানের কাজ তাসিয়া যাউক, সেখানের (নলহাটীর) জন্মোৎসব করিতে যাইতে হইবে? কি রকম বিচার আমি বুঝি না। যাহা হয় কর। আমি দুর্বল, তাই ভয় হয়।... মঠে গিয়া আমি ১০০০ টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে।— -এর উপর সকলেরই গভীর সন্দেহ। টাকা সে-ই নিয়াছে— এইরূপ ধারণা সকলের। খানার খরচ দেওয়া সর্বসম্মত হইল না। সব টাকা দিতে বলা হইল। সে যতদূর পারে দিবে বলিল। শক্তবাড়িকীর এক্সিকিউটিভ কমিটীর সভা হইবার কথা ছিল, স্থগিত হইল, শনিবার ৫টায় হইবে। ইতিপূর্বে শক্তবাড়িকীর সীল খোয়া গিয়াছে— আমি জানি না। ১৪৲ টাকা ও একখানি রসিদ বহি খোয়া গিয়াছে। এই বিশৃঙ্খলা ও উচ্ছৃঙ্খলা হইতে কি করিয়া মঠ উদ্ধার পাইবে ঠাকুর? মঠ যে morally spiritually ও economically তলিয়া চুরিয়া পড়িতেছে। কে রক্ষা করিবে, কে সকলকে আপাইবে?...

২৮শে ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, আমায় শুচি-স্নিগ্ধ জীবন দেও। সর্বত্র অশুচি ছড়াইয়া পড়িয়াছে—ঘরে বাইরে পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে সর্বত্র শুধু তামস। প্রলয়ের হাহাকার চতুর্দিক হইতে ধ্বনিয়া উঠিতেছে। ওগো সৃষ্টির দেবতা সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল, জাগো, জাগো। আমাকে নিষ্কলুষ কর, নির্মল কর। দাঁড়াইবার তিলমাত্র স্থান নাই। কাহার মুখের দিকে তাকাইব? সব তলিয়া চুরিয়া যাইতেছে। দুনিয়ায় চলিতেছে লুট। লোভের দেবতা তুমি, লোভের আলো হইতে বিশ্বকে রক্ষা কর। সকালে মঠে যাই। একা তারিণীবাবুর উপর ১০০০ টাকা চাপানো সঙ্গত হইবে না। আমি কিছু বলিতে প্রস্তুত আছি—বলিয়া আসিলাম। নরেন মাদার সঙ্গেও ঐ কথা হইল।...সেই এখানে আছে। আমার এই স্থান হইতে পবিত্রতম স্থান আর কি হইতে পারে? ঠাকুরের দর্শন এই স্থান হইতে ঠাকুরের কোলের মধ্যে বসিয়া প্রচার করিলেই তো সবচেয়ে শোভন ও সুন্দর হইত। আমার 'নরনারায়ণ আশ্রম' করিবার দরকার ছিল কি? কিন্তু এখানে তো দুঃস্থদের সম্ভাবনা ছিল না। নিষ্কাম ধর্ম পত্রিকায় রাজনীতির স্থান ছিল না। সতীশ কুমার আমার আলোচনায় রাজনীতি থাকে নাকি তাহার জন্য পাঠানো দিতেন। রাজনীতিহীন ধর্ম আমি বুঝি না। উদ্ভ্রান্তবাবু ঠাকুরেরই কথা বলিয়া আসিতেছে। আমি এই মুহূর্তেই সব গুটাইয়া এখানে আসিতে পারি উদ্ভ্রান্তবাবু সহ। এই সম্প্রদায়ের কোন পত্রিকা তো নাই। এই সব আলোচনা ইহাদের মধ্যে হয়। চা টার পর চলিয়া আসি।...সন্ধ্যায় ট্রামে আসিবার কালে আশুতোষ পাল নামে একটী শিক্ষকের সঙ্গে ঠাকুর-বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি সামনে কাছে আসিয়া বসাইলেন। পত্রিকার শক্তবাড়িকীর কথা জানিয়াছেন। পরমহংসদেবে ঠাকুরকে 'পরমহংস' বলিতেন—তিনি বলিলেন। তিনি একজন শিক্ষক।...

২৯শে ফেব্রুয়ারী

মাধারাণী আমার, হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে তোমায় বহিয়া চলিয়াছি। এই বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটী পরিণামের বুকে তোমাকে স্থাপন করিব—ইহাই ছিল লোভ। কিন্তু তাহা তো পারিলাম না। আমার শুধু বেদনাই সার হইল। অথচ কোথায় কেন যে তোমায় ছবি তোমার নাম ভাল লাগে তাহা বুঝি না। তোমায় ভাল লাগে—ইহা বুঝি। কেমন করিয়া তোমার জীবনের সঙ্গে প্রথিত হইল জানি না। কে তুমি আমার, কতখানি

তুমি আমার—ভাবিয়া অবাক হই তোমাকে না হইলে আমার চলে না তুমি আমার স্বজন, তুমিই আমার আমি—ইহা বুঝিতেছি। সকালে একবার মঠে যাই। ১০৲ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিবার কথা বলিয়া আসি। তাহাতে উহারা তুলিয়া গিয়াছেন টাকাটা দিয়া আসিলাম। ...অপেনবাবুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। ট্রাস্টীদের কাছে যে ২০০০৲ টাকা চাওয়া হইয়াছিল উহারা তাহার কোন জবাব দেন নাই কিছু দিবেন কিনা তাহাও বলেন না। অথচ বাজেট তৈরির কালে মর্যাদা-হানিকর সব হিসাব ধরিতে বলেন। তাঁহা হইলে পত্রিকার প্রচার করাই তো ভুল হইয়াছে উহার ঘাট হইতে এক পয়সাও তুলিতে রাজি নন। বাহিরের চাঁদাও উহাদের নিকট কিছু চাহিলেই উহারা বলেন 'উহা বেআইনী'। যাহার বংশের স্টেট চালাইলেন, আজ এত বড় একটা function-এ ইহারা ২০০০৲ টাকা দিবেন না? ইহাতে কি কোন অর্থ হয়? সব পরমৈপদী চালাইতে চান আজ শতবার্ষিকীর একজিকিউটিভের সভা স্থগিত হয়, নরনারায়ণের সভা। কাল উহারা একজিকিউটিভের সভা করিবেন সকালে। ৯টার (রাত) পর আসি: মনটা বড় বিশ্রী হয়

২৭শে ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, তোমারেই প্রাণের আশা কহিব। বড় আশা করিয়া ছিলাম তোমার দর্শন ও জীবন এই দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করিব। সকল দ্বন্দ্বের মাঝে, সুখদুঃখের মাঝে, আঁধারে আলোকে তোমার ঐ সর্বস্ব-সমর্পণ চরণের দিকে চাহিয়া রহিব। আমার জীবন দিয়া তুমি তোমার কোন্ প্রয়োজন সাধিবে তুমিই তাহা জান। পথ চলিতে চলিতে আমার অনাদর যাহা কিছু কুড়াইয়া পাইব, তোমার দেওয়া দান বলিয়া তাহা মাথায় তুলিয়া লইব। প্রাণ ব্যাকুল হইলে তোমার নাম লইয়া ডাকিব। তোমায় আমার এক-তরফা প্রেম বিলাইব। শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিয়ো কোলে। আর তো আমার বিশ্রাম করিবার স্থান নাই তোমার শ্রীচরণতল ছাড়া। ৮টায় মঠে যাই। ৯টার পর ডেপুটেশন আসে। সে প্যাণ্ডেল ও বাসনের মধ্যে যায়া যব, তাঁড়ার ঘর, মেয়েদের খাবার স্থানের মাপ নেয়। মঠের এক্সিকিউটিভ কমিটির সভায় ১০০০৲ টাকা অনুমোদনের জন্য ট্রাস্ট কমিটিতে অনুরোধ জানাইয়াছে।... বেশি ট্যাক্সী ভাড়া করিয়া বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক, মন্ত্রীদের নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইব—ইহা রেলুর সঙ্গে ঠিক করি। আমার ঠাকুর আমার স্বামী; অন্যান্য শিষ্যদের তিনি গুরু পিতা। উহারা না করিয়া থাকিতে পারে, আমি কি করিয়া চুপ করিয়া থাকিব? বাহিরের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক আসিলে মঠের সমস্ত গোলমাল অনাচার বন্ধ হইবে। কাহাদের নিমন্ত্রণ করিব তাহার লিষ্ট প্রস্তুত করা প্রয়োজন। ট্যাক্সি-ভাড়া আমি দিব। নরেনদাদাকে বেশী দিন কাশীতে না থাকার জন্য অনুরোধ করি। ১০০০ টাকা তুলিয়া প্রস্তুত রাইয়া সময় কাটানোই 'বিষয়'। এখন সামনে আগাইবার কথা ভাবিতে হয়। যিনি আমার জীবনে বাসন্তীপূজার, তাঁহার জন্মোৎসব সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয়, মানুষ পেট ভরিয়া খায়, আনন্দে ভরপুর হয়—ইহাই তো করিতে চাই ঠাকুর তাই কর।

২৮শে ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, প্রাণ-বিগ্রহের দেবতা আমার, বিগ্রহের যে ছবি তুমি আমার মনের সামনে প্রকটিত করিয়াছ, তাহার আসিতে আর কতদূর? অপেক্ষার অপেক্ষার দিন গেল। জীবন তো শেষ হইয়া আসিল। তুমি বিশ্বকে প্রাণ-চঞ্চল করিয়া তোল। তোমার প্রেম-প্লাবনে জাতি-অভিমান, কুল-অভিমান সব ভাসিয়া যাউক। সহজ মানুষ ফুটিয়া বাহির হউক। এ আবেষ্টন যে আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। তোমার শতবার্ষিকীকে উপলক্ষ করিয়া কি তোমার প্রাণ-প্লাবন ঠেকাইয়া পড়িবে? আমাকে যোগ্য কর, অধীকার কর। আমি তোমার এত আপনার, তাই তুমি তোমার দর্শন ও জীবনের অংশীদার করিয়াছ। আমি যে তোমারই শক্তি, তাহা তুমি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছ। তোমার জয় হউক আমার জীবনে। খুব সকালে দিনপঞ্জী না লিখিয়াই মঠে যাই, প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে কি কি কথা বলিতে হইবে তাহা তারিণীবাবুকে বলিবার জন্য। বেলু ১১॥টার পর প্রথমে 'নদের নিমাই' হৃষীকেশ ব্যানার্জীর ওখানে যায়। দেখা হয়। Formally

একজনে গিয়া তাহাদিগকে জানাইতে হইবে। কাল সন্ধ্যা ৬টার হাওড়ার মহাপতিবাবু যাইবেন স্থির হয়। বেণু 'ভক্তিযোগদর্শন', 'মাতৃ-সাধক শ্রীনিত্যগোপাল' ও 'শ্রীনিত্যগোপাল জীবনে ও দর্শনে'-র কাটতি কিনিবার জন্ম ও ঠাকুরের প্রতিমূর্তির ব্লক তৈয়ারীর জন্ম যায়। ফেরে ৬টার পর মঠে।...তারিণীবাবু বেলার মার্কেটে এক মাড়োয়ারীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্ম গিয়াছিলেন অর্থ আদায়ের জন্ম যথাসম্ভব সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিব। আশুবাবু ওখানেও বেণু যায়।...আমি ৬টার পর মঠে যাই। ১লা মার্চ

ঠাকুর, আমি শূন্য, তুমি পূর্ণ। আমার তুমিই ধন-জন, সহায় সম্বল, সর্বাণি সর্বম্। কিছুই তো আমার নাই। অথচ তোমার কাজ করিব, তোমার অবতরণকে সফল দেহপ্রাণমন দিয়া সার্থক করিব, বিশ্ব-জীবনে প্রতিষ্ঠা করিব—এই স্বপ্নে বিভোর হইয়াই তো চলিয়াছি। আমার সারা জীবনের স্বপ্ন কি বাস্তবে পরিণত হইবে না? আমার মাথা চিরদিন তুমি উঁচু করিয়াই রাখিয়াছ, কোনও দিন হেঁট হইতে দেও নাই। আজও তুমি আমার মান মর্যাদা রক্ষক। আমার সকল সত্তা দিয়া তোমার সেবা করিবার সুযোগ দেও। সকালে সভোন দাস আসে। ব্রহ্মসূত্র ২য় খণ্ড নিয়া যায়। সে শঙ্করাচার্যের কিছু কাজ করিয়া দিতে প্রস্তুত।...আজ কার্যকরী সমিতির বৈঠক সভা হয়। জিতেন মুখার্জী এখান হইতে মঠে যায়। সভার শেষে তাহাকে শঙ্করাচার্যের কাজ করিতে বলি সে অর্থনীতির সমস্যা সমাধান না করিতে পারিলে কোন দর্শন চলিবে না, সরকার মিথ্যার প্রশ্রয় দিতেছে—ইত্যাদি উত্তেজিত হইয়া বলিল। অথচ শ্রীধর শঙ্করাচার্যের চলিতেছে, অনুকূল ঠাকুরের চলিতেছে। দর্শনের ক্ষেত্রে যে অনাচার চলিতেছে, তাহার জন্যও তো আন্দোলন দরকার। আর আমি তো কর্ম লইয়াই ছিলাম। আমাকে এ কথা শুনাইয়া লাভ কি? তাহার কথা ভাল লাগিল না। একদিন 'নিত্যগোপাল' বলিয়াছে, আজ তাই চাহিয়াছিলাম। ছেলেমেয়েরা ছাড়িয়াছে। দুঃখ আসার অনেক। একাই চলিব।... ২রা মার্চ

নিত্যগোপাল, শিবসুন্দর আমার, একাধারে সংসার-সন্ন্যাস সমন্বয়, কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি সমন্বয়, তুমি গৃহে, তুমি শ্মশানে, তুমি সংসারের যাবতীয় দুঃখের মর্যাদাদাতা, তুমি ভূত প্রেত নিয়া আছ, ধুতরা ফুল তোমার প্রিয়, ছাই তোমার সর্বাঙ্গে, সর্প তোমার ভূষণ, তুমি দিগম্বর; তোমার রূপের তুলনা নাই; তুমি গৌরীপতি, তুমি ব্রহ্ম। তোমাকে ছুঁইবার, পূজা করিবার অধিকার সকলেরই আছে। তুমিই সর্বজনাধিবাস। অবধূত সম্প্রদায়ের ইষ্ট তুমি, তোমার জয় হউক। মীনু ঘুমিয়ে যায়।...বেণু যাবতীয় কাজ করে। ৪টার বিমলা আসে গাড়ীতে...। আজ ওকারে দীক্ষার দিন। সে তো একবার দেখিতে আসিতে পারিত।...মঠে সুরেশ দেব আসে।... রমাপতি বাবু নদের নিমাই-র সঙ্গে সব বলিয়া সব আনিয়া আসিয়াছেন।...

৩রা মার্চ

শিবসুন্দর নিত্যগোপাল, তুমি বিশ্ব সংস্কৃতির মহামণি, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ, তোমার জীবনে সংসার সন্ন্যাস মিশিয়া একাকার হইয়াছে, কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-যোগ তোমার শ্রীচরণে মূর্চ্ছিত, মূর্ত তুমি বিভূতি-ভূষণ; সকল বিভূতি তোমার চরণতলে লুণ্ঠিত, অথচ তুমি উলঙ্গ, দিগম্বর। তোমাতে দ্বৈত অদ্বৈত জমিয়া গিয়াছে। তুমি সত্যং শিবং সুন্দরম্। 'শিবোঽহম্ শিবোঽহম্' প্রেমে, শক্তিতে নয়। শক্তিক্ষেত্রে তুমি পিতা, বিশ্বনাথ; আর আমি সন্তান, দাস। 'শিবোঽহম্' 'শিবোঽহম্'—আমি শিব, আমি শিব, আমি শিব। বিশ্ব শিবময় হউক। সকালে জলখাওয়ার পর জিতেন গুহঠাকুরতার ওখানে ৪ জনকে রোজে ছাড়িয়া যাই ও আসি। তাহাকে বলিয়া আসিলাম—'আমি ঠাকুরের দর্শন লইয়া বাহির হইলাম।...তোমরা...আমাকে আপনাইও, ইহাই আমার দাবী' বেণু রান্না করে।... জ্ঞানবাবু মলিনা আসে।...শিশির এখান হইয়া মঠে যায়। তাহার সঙ্গে চলিয়া আসি।...কে আমার আছে? আজ আমার মানুষের বড় প্রয়োজন। ঠাকুরের কাজ লইয়া আমি বিপন্ন। আজ তিনি কথা কহিতে চাহিতেছেন। কেমন করিয়া তাঁহার কথা বিশ্বকে শুনাইব? তিনি

স্বপ্রকাশ। আমরা তাঁহার 'স্ব' হইয়া তাঁহাকে প্রকাশ করিব—ইহাই ছিল লোক।

৪ঠা মার্চ

রাধারাণী আমার, বৃষভানুপুরে কালী কান্তারিণী আমার, যেদিন তুমি আমার জীবনে এলে, আমার জীবনে সেই দিনই ঝড় নামিয়া এল, সকল আর্য্য-পথ মুছিয়া গেল, সকল আপন জন যে যার মত সরিয়া দাঁড়াইল। আজ আমি একা পথের ধূলিতে নিঃসঙ্গ। বিপ্লবময়ী আমার, তুমি সকল শোষণের মূর্তিমতী প্রতিবাদ, তুমি শোষণময়ী, কৃষ্ণময়ী, কৃষ্ণকামিনী কৃষ্ণতারিণী, কৃষ্ণবাসিনী। জীবনের কোন্ মর্মস্থানে তুমি আসন বিস্তার করিয়া আছ যে তোমার নাম শুনিলেই প্রাণটা তেমন করিয়া উঠে। কে তুমি আমার? তুমি প্রকাশিত হইবে না? সারা জীবন তো মাটির ঢেলা তোমাকেই খুঁজিলাম। ওগো মুন্ময়ী আমার, তোমার জয় হউক।···মিনু আসে ১১টার পর।···মঠে নীলাম্বর-(?)এর (ড্রাক্তার) সঙ্গে দুর্বার উপর বসিয়া অনেক ক্ষণ আলোচনা হয়। তিনি বলিলেন, তিনি অনেকটা শান্তি পাইতেছেন। ঠাকুরকে রোজ প্রণাম করার কথা বলিলাম

৫ই মার্চ

নিতাগোপাল, জীবন-ধন, কি আছে আমার বাঁচিবার মত, গর্ব করিবার মত তুমি ছাড়া? তুমি আছ আমার সকল সত্তাকে ঘিরিয়া—তাই আমি আছি। তোমার কথা বলিবার কামনাতেই আমার বাক্যের উদ্ভব। আমার আবার কথা কি? তোমার বাক্‌ই আমার বাক্, তোমার কথাই আমার কথা, তোমার দেখাই আমার দেখা, তোমার শোনাই আমার শোনা, তোমার মননেই আমার মনন। তোমার ভিতর দিয়াই আমি আমি, যেমন পিতামাতার ভিতর দিয়াই সন্তান সন্তান। আমি তোমার অংশ তুমি, তোমার প্রকাশ তুমি। আমাকে তেমন করিয়া অস্বীকার কর যাহাতে আমি তুমি মরিয়া যাই।···৩টায় মনোরঞ্জন বসু আসে। সেও আমায় ঐ কথা তোলে—কোনও কর্ম না করিলে যেমন শিশুদের নিয়া কোন ফল না করিলে শুধু আলোচনায় কি হইবে। আলোচনা করি। একটা বাস্তবিক বিপ্লব ছড়াইয়া না দিলে কোনও 'কার্য' হইবে না। মহাত্মাজীর মত শক্তিশালী পুরুষেরও গঠনকর্ম দানা বাঁধে নাই। মনোরঞ্জনকে একটি লিষ্ট করিতে বলিলাম যাহাদের নিমন্ত্রণ করিতে পারি। কিছুদিন পরে বাহির হইব।···প্রফুল্লবাবু কাল গভর্ণরের কাছে এক দরখাস্ত লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। আমরা একটা ঘুসাঘিসা করি।··

৬ই মার্চ

নিতাগোপাল, তুমিই 'মধ্যমপ্রাণ'। আমি অকূলে ভাসিয়া চলিব, এ কূলে ও কূলে কোনও কূলে দাঁড়াইয়া পড়িব না। তুমিই আমার অকূলে কূল, জীবনের ধ্রুবতারা। তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোথায় যাইব? তোমার স্নেহ তোমার করুণ নয়নে চাহনি সদা মনে জাগিতেছে। তাহাই বহন করিয়া আমি চলিয়াছি। তুমি আমার জীবন-মরণ ধন। এ কূলের ও কূলের সবাই আমায় ছাড়িয়া গিয়াছে। তুমি আমার আছ—ইহাই আমার বল। তুমি আমার সামনে ধ্রুবতারা হইয়া পথ দেখাইয়া চলিয়াছ। 'এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথ-হারা'। তারিণীবাবু প্রায় ৭টায় আসেন। আমি তারিণীবাবু ও রেণু ঠাকুরের বই, উদ্বোধনের (চৈত্রফাল্গুন), ঘরে বাইরে, শেষপ্রশ্ন ও ২ কপি typed গভর্ণরের কাছে দরখাস্তসহ ট্যাক্সীতে রাজভবনে পাঠানো হই। প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে দেখা হয়। একটা typed কপি তাহাকে দেওয়া হয়। ঘরে বাইরে ও শেষপ্রশ্ন দেওয়া হয়। উদ্বোধনের চাঁদা বাবদ ১০ টাকা দেয়। আর এক কপি দরখাস্ত গভর্ণরের চীফ সেক্রেটারীর নিকট দিয়া আসা হয় বইগুলি ও পত্রিকা সহ। গভর্ণরকে ঈশ কেন ও রুদ্রসূক্ত দেওয়া হয়। বাদবেন্দ্র পাঁয়ার সঙ্গে দেখা করি। গ্রাহকবাবদ ৪ টাকা আনি। ট্রামে চলিয়া আসি। মিনুর স্বপ্নাসহ তাহার ভাইয়ের স্থানে যাওয়া স্থির করি।···সে যাহা বলিয়া ও শুনিয়া আসিয়াছে তাহাতে জীবনে আর তাহাদের মধ্যে যাওয়া উচিত নয়। তবু সে স্বপ্না সহ থাকিবার জন্য সেখানে যাইবার জন্য প্রস্তুত। ভাইয়ের স্থানে থাকিয়া সে বুঝি স্থির করুক—কোথায় থাকিবে, কোথায়

যাইবে। এখন স্বপ্নাদ্য খাকিবার জন্য বাড়াবাড়ি করিলে করিবে তাহার অন্তকার। বেণু মিহুসহ নিজের ভাই-বৌর কাছে যায় এটালী।...আমি চাটার পর ফিরি।

৭ই মার্চ

রাধারাণী, মহাভাবস্বরূপিণী দিদিমণি আমার, তুমি রসের ক্ষেত্রকে গড়িয়া তুলিয়া চলিয়াছ দিব্য বিশ্বরূপে। তুমি রাসবিলাসিনী, তুমি মহাভাবস্বরূপিনী। এতদিন ভাব ছিল রসের ক্ষেত্রকে ডিঙাইয়া, রসের ক্ষেত্রকে অস্বীকার করিয়া। কিন্তু তুমি আসিয়াছ বাস্তবকে, রসময় জগৎকে মহা ভাবের হাতে, ভাবুকতার হাতে ideally গড়িয়া তুলিতে। রসরাজ-মহাভাব তোমার জীবনে একীভূত হইয়া আজ নিত্যগোপালরূপে প্রকট। তোমার নামে, তোমার স্মরণে আমার হৃদয়ের তন্ত্রী বাজিয়া উঠে। তোমার জয় হউক। সকালে সতীশ দাস (থলিয়াকোঠা) আসে। মিহুর সম্বন্ধে কিছুই স্থির হইল না।...আমি ৪টার পর মঠে যাই। অণ্ডা সন্ধ্যার পূর্বে এখানে আসে। আমি ৭টার পর ফিরি। সে চাটার পর যায়। মিহুর জন্য বসন্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। সব কিছু আবার গোলমাল হইয়া গেল। আবার বেণুর উপর রান্নার ভার পড়িল। এত দুর্যোগ লইয়া কি করিয়া অগ্রসর হওয়া যায়। ৯টার পূর্বে ঈশ্বর প্রামাণিক আসে। সে ৩জন কর্মী ৭ই এপ্রিল পাঠাইয়া দিবে। উহাদের খরচ যতদূর সম্ভব তাহারাই বহন করিবে। না হইলে আমরাই দিব। ৬৲ টাকা মত যাতায়াত খরচ লাগিবে। সত্যবাদিকীর চাদা বাবদ ১২ টাকা দিয়া গেল। উহা তাহার নামে এখন deposited থাকিবে। সে তাহার চাষের খেলা ১২টী রাখিয়া গেল বিক্রয়ের জন্য।...উৎসবের সময় গোপাল দাস আসিবে।...তাহার সঙ্গে ঠাকুরের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়—রামকৃষ্ণ ও নিত্যগোপালের তফাৎ কি। ঈশ্বরকে কিছু নাম দিতে বলিলাম যাহাদের নিমন্ত্রণ করা যায়।...

৮ই মার্চ

ঠাকুর, এত বড় ঝড় ঠেলিয়া চলিলাম, আরও কি তাহার শেষ নাই? তোমার স্থির দৃষ্টির দিকে চাহিয়া চলিয়াছি, চলিব। তুমিই তরোহিত এই সমুদ্রের মধ্যে নঙ্গর। পরম আমার, তুমি না থাকিলে কি আজও বাঁচিতে পারিতাম? ঝড়ের ধাক্কায় কোথায় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতাম! সখী আমার, সুহৃৎ আমার, স্বামী আমার! চতুর্দিকে বড় দুর্যোগ, খাওয়া-পাওয়ার নিশ্চিন্ততাও আজ নাই। তোমার পাদপদ্ম ছাড়া মাথা রাখিবার স্থান আর আমার নাই। মিহুকে ৬বার sp I দেওয়া হয়। শ্যামলী একটী নূতন বাঁধুনী নিয়া আসে। বৈকালে কথা ঠিক হয়—সে-ই বাসন ধোয়া প্রভৃতি করিবে, মাহিয়ানা ১৬টাকা +খাওয়া। আর অপেক্ষা করা চলে না। সুহৃদও যায়া চায় না, মিহুও না। সকলেই পড়াশুনার জন্য অস্থির। সেবাবুদ্ধিতে ইহারা কাজ করে না। ৪:০টার পর মঠে যাই। মঠের কাছে তখন, বুম নিয়া কাঁহর হইতেছিল, মা, আমার বড় কষ্ট। গিয়া শুনি—গভর্ণরের সেক্রেটারীর চিঠি আসিয়াছে কাহাকে মারফত যে গভর্ণর ১০ই এপ্রিল সভায় যোগদান করিবেন প্রধান অতিথি হিসাবে। সংক্ষিপ্ত জীবন ও উপদেশাবলী চাহিয়াছেন, প্রোগ্রাম চাহিয়াছেন। ৪৷৷টায় চীফ জাষ্টিস কালী মুখার্জীর ওখানে যাই আমি হরিসত্যানন্দ, তারিণীবাবু। উঁহাকে ঠাকুরের দর্শন ও জীবন কথা বলি। তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেন, হয় আপনারা সংসার-পলাতক, নয় তো অলস—ইহাও মানুষ মনে করিতে পারে আপনাদের যদি কথা থাকে, তবে না বলা অপরাধ। আমি বলি, 'প জমজম, দে চিমচিম, নি চুপ'—নি এইবার কথা কহিবেন। ঘরে ঘরে তাঁহার কথা শুনাইব। তিনি একটা বৈপ্লবিক দর্শন নিতে আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের মূর্ত্ত প্রকাশ, আর শ্রীনিত্যগোপাল ছিলেন জটিল কুটিল জীবনের মূর্ত্ত প্রকাশ। উঁহাকে টাকা আর সমাধি নিত্যগোপালেই সম্ভব—ইহা রামকৃষ্ণদেব বলিতেন। রমাপতিবাবু, নীলরতন, সুধাংশু ডাক্তারের সামনে ঠাকুরের সঙ্গে আমার কিছু কিছু ব্যবহারের কথা বলি। নগেন বাবু যে প্রশ্ন ঠাকুরকে করিতে বলিয়াছিলেন—'আমরা কাহার অনুগ হইয়া চিন্তা করিব, তাহার কি মীমাংসা দিলেন, তাহা বলি। দীর্ঘ বৎসর পরে বিনাঅপূর্বের

বরফীঘর গুহের সঙ্গে দেখা হয় মঠে সন্ধ্যার পরে ৮॥টার পর ফিরি।...

১৯ মার্চ

ঠাকুর, তোমারেই প্রাণের আশা কহিব। এ দেহ প্রাণমন দিয়া কতটুকু তোমার সেবা করিতে পারিয়াছি, তাহা তুমিই জান। তুমি থাকিতে আদর তো করি নাই আজ চোখের জলে ভাসিতেছি। কাল মঠে যাইবার সময় মনে মনে বলিয়াছিলাম, 'না, আমার বড় কষ্ট'। আমি সকলকে বুকের মধ্যে পুরিয়া রাখিতে চাহিয়াছি, আর আজ সবাই আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছে। আমার বড় কষ্ট। তোমার সেবা করিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম পথে, তাহাও প্রাণ দিয়া করিতে পারি না। আমার সেবার অধিকার দেও, সুযোগ দেও আমার সেবা লও আগে তো আট আনার মতো ছিলে। ইচ্ছা করিলেই টুক করিয়া রেলে চড়িয়া হুগলী যাইতাম আর আজ? কতদূরে, কত ব্যবধানে গিয়াছে। সেবা দেও, কথা কও। আমার বড় কষ্ট। নীলুর পরীক্ষা বাতিল হইল। মধ্য শিক্ষাপর্ষদের ব্যবস্থা চমৎকার। কি দুর্ভোগ ছাত্রদের। ছাত্রগণ আবার শিক্ষকদের প্রহার করিয়াছে। চমৎকার ছাত্রগণ! ষষ্ঠীন আসে। গোপাল আজ পড়া বন্ধ। কথা না শুনিলে পড়াশুনায় মানুষের বিপদ আসে। বাধ্য হইয়া চলার শিক্ষা সর্বপ্রথম। জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিবার শিক্ষা সর্বাগ্রে। ৪টার পর মঠে যাই। প্রভুর সেনের স্থান হইতে এক পত্র আসে গভর্ণরের কাছে শ্রীশ্রী নিত্যগোপালের দর্শন ও জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২।৩ পৃষ্ঠার মধ্যে দিয়া আসার জন্য।...আজ রাধা আসে দুপুরের পর বেলেঘাটা হইতে। আজ উৎসবের জন্য ৪টাকা দিয়া যায়।...

১০ই মার্চ

ঠাকুর, আমরা যে কেমন পচা গোবর তাহা বুঝিতে পারি যখন দেখিতে পাই যে নিত্যানন্দের ম্যানেজার থাকাকালীন তোমার দুপুরের ভোগই বন্ধ হইয়া যায় এবং কালা আসিয়া আলু পটল কিনিয়া রান্না করিয়া তোমার ভোগ দেয়। পারিপার্শ্বিক মন কষাকষির ফলেই এইরূপ হইয়াছিল যে-তুমি দানীবাবু আফিং খায় বলিয়া দুধের যোগাড় কর, সেই-তোমার ভোগও বন্ধ হয়। কি নির্লজ্জ আমরা! প্রাণের কাছে অপরাধ করিলে যে শাস্তি হয় তাহা আমাদিগকে পাইতে হইবে। আজিও আমরা মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে শিখিলাম না। অথচ তুমি তাহাই ভাল বাসিতে। আমাদের তোমার যোগ্য করিয়া লও। গোপাল আজও পড়া বন্ধ। সে দক্ষীর মত চলিবে বলিতেছে!...আমি প্রায় ৫টায় মঠে যাই। যতীন মামাজী আসেন সকলের সঙ্গে একত্র হইয়া নিমন্ত্রণ যাহাদের করা হইবে তাহাদের নাম লেখা হয়। শ্যামসুন্দরানন্দ হরণ চাউল দিবে ৫ মণের দাম দিবে ধীরেনবাবুকে ঠাকুর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে বলি। রমাপতিবাবু ঠিকানা লেখার কাজ নিবেন কাল হইতে। অনঙ্গ ঘোষ বিমলেন্দু ঘোষদহ মঠে যায়। বিমলেন্দু ঘোষকে একখানি রসিদ বই দেওয়া হয়। ৮টার পর ফিরি। রাঁধুনী রাখা নিয়া গোলমাল চলিতেছে, লোক ঠিক করা যাইতেছে না। সারা জীবন প্রকৃতির 'যো মাং জয়তি সংগ্রামে' রূপ যুদ্ধঘোষণা মানিয়া চলিয়াছি, আজও কি তাহা করিতে পারিলাম? প্রকৃতি যতদূর সম্ভব তাহার জটিলতা উপস্থাপিত করিয়া চলিয়াছেন, ঠাকুর সঙ্গে আছেন তাই আজও পথ চিনিয়া চিনিয়া চলিয়াছি, চূর্ণ বিচূর্ণ হই নাই। সকলেই যে যাহার অনুবিধার দিক আমার সামনে উপস্থাপিত করিয়া আমার পথ রোধের চেষ্টা করিতেছে। আজও বিরাম নাই। তবদা আমার শ্রীনিত্যগোপাল। জল-বিহ্বল হরিণীর মত মায়া জলে পালাই নাই। আমি তো পলাতক নই।

১১ই মার্চ

বিশ্বনাগরিক, সমন্বয়-মূর্তি, প্রাণ-দর্শনের মূর্ত বিগ্রহ যুগসমস্যার সমাধান-ঘন নিত্যগোপাল আমার, তুমি আসিয়াছিলে লুকাইয়া, চলিয়াও গেলে লুকাইয়া। কেহ তোমাকে চিনিল না, আদর করিল না, হৃদয় দিয়া ধরিয়া রাখিল না। অনাদরে অবহেলে তুমি চলিয়া গিয়াছ। তোমার দেহের ঘর তুমি কর নাই, কাহাকেও করিতে

দেও নাই। আজ বেদনায় তাই বুক ভরিয়া উঠিতেছে। তোমার দর্শন লইয়া তুমি আমাদের সঙ্গে আলোচনাও কর নাই। আমরা কি যোগ্য ছিলাম, না তাহার জন্য প্রস্তুতই ছিলাম? নবদ্বীপে যেদিন তোমার সঙ্গে 'নির্গুণবাদ' লইয়া তর্ক করিয়াছিলাম, আমি ছিলাম নির্গুণবাদের সমর্থক, তুমি বলিয়াছিলে, 'পরে, ইহার পরের কথা উপলব্ধিদ্বারা বুঝিতে হয়'। আমি বলিয়াছিলাম, 'আশীর্বাদ করুন, আমার যেন সে উপলব্ধি হয়'। তুমি বলিয়াছিলে, 'তাহাই হইবে'। সেদিন সগুণ-নির্গুণ সমন্বয় তত্ত্ব বলিলে ঠিকই বুঝিতাম না। তাই তুমি শুধু লিখিয়াই গিয়াছ। তাহারও সঙ্গে আলোচনার সূত্রপাতও কর নাই বাস্তবিকভাবে। তুমি আশীর্বাদমাত্রই দিতে। তোমার জয় হউক। ১০টার জন্মের প্রায় আসে নিমন্ত্রণ করিবার মত লোকদের একটী বড় লিষ্ট লইয়া। আমার চিঠিটা যেই। সে পড়িয়া লয়।...গভর্ণরের কাছে দিবার জন্য ৪পৃষ্ঠার একটা লেখা লেখা হয়। রেণু লেখে। শিশিরের একটি পত্র আসে।...লেখাটা রেণু তারিণীবাবুকে প্রথমে শুনায়। সে জীবনী-অংশ আরও বিস্তারিত ধারাবাহিক ভাবে দিবার কথা বলে। কিন্তু ৪৫ পৃষ্ঠার মধ্যে তাহা কি সম্ভব? সে কিছু লিখিয়া দিবে বলিল রমাপতিবাবু খাবে ঠিকানা লেখে (নিমন্ত্রণ চিঠির) ৮টার পর চলিয়া আসি।...সভাপতির জন্য পঙ্কু ব্যানার্জীর কাছে যাও তারিণীবাবু। তিনি অসুস্থ। রমাপ্রসাদবাবুর কাছে যাই। তিনি রবিবার সন্ধ্যার পর বলিলেন।

১২ই মার্চ

রাধারাণী, তুমি অযাচিত করুণায় আমার জীবনে আসিয়াছিলে। তুমি পরা প্রকৃতি, পরাশক্তি। তোমার আসার ফলে আমার অপরা প্রকৃতি, mechanical nature তো পরাপ্রকৃতিতে গড়িয়া উঠিল না, আমার আবেষ্টনের মধ্যে organic কিছুই develop করিল না। আমার আবেষ্টন আমাকে শুধু বাধাই দিতেছে। তোমাকে পাইয়াও পাইলাম না। কি আমি করিব? আমার যে বড় কষ্ট। আমি তো অপরা প্রকৃতিকে পরিপাক করিতে পারিতেছি না। তোমার বল, তোমার যোগিনী রূপ আমায় দেও। আমার মত যোগে যোগী কর। আজ উদ্বোধনের matter প্রস্তুত করা হয়।... আমি ৩টার পর অন্নদের বাড়ীর জন্য বাহির হইয়া যাই।.. ৪ জনের উদ্বোধনের চাঁদা ১৬ টাকা, আমার ৫ টাকা ও শতবার্ষিকীর ২ টাকা দেয়। ৫টার পর মঠে আসি। তারিণীবাবু উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার প্রফুল্ল হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ডের একজন সহ-সম্পাদক সহ আসে। তাহার কাছে ঠাকুরের দর্শন ও জীবন বলি। অমৃতবাজারের (বরিশালের) হরিদাসবাবু হঠাৎ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নিকটও বলি। পরশুতে তিনি ঠাকুরের কথা জানেন। অবনী সরকার ও প্রতাপ সরকার আসে। তাহারা বিভিন্ন দিনের সভাপতি সংগ্রহে বিশেষ সাহায্য করিবে বলিল। অবিনাশবাবু ১ মণ চাউল দিবেন। রাণীগঞ্জে যাদবানন্দকে চাউলের জন্য পাঠানো হইল। সরকার হইতে কোন্ দিন হইতে কত চাউল চাই তাহা জানাইবার জন্য চিঠি আসিয়াছে। ৮টায় এখানে ফিরি।...

১৩ই মার্চ

নিত্যগোপাল, আমি আমার সকল ভালবাসা দিয়া স্ত্রীপুত্র ধনজনের আসক্তি দিয়া তোমাকে জড়াইয়া ধরিব। বিদ্যার বিদ্যাসক্তি তোমাতে হউক, রূপের ধনাসক্তি তোমাতে হউক, নারীর প্রতি কামাসক্তি তোমাতে থাকিত হউক আমার গভীর আশা— তোমাকে বিশ্ব-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার আশা। তুমি শোন, ওগো তুমি কান পাতিয়া শোন! যখন যেখানে যেভাবে আমার চিত্ত থাকে, তোমার ডাকে যেন সাড়া দেয়, জীবনের অগ্রগতি পথে সকল বাধা ঘুচিয়া যাক তোমার টানে। আমি ছুটিয়া যাইব তোমার শ্রীচরণতলে। বাহিরের কাছ হইতে অন্তরের অভিনন্দিতে পাওয়া আমার ভিক্ষার ঝুলি নিঃশেষে খালি হউক। তোমার অকৃপণ প্রত্যাশাবিহীন দানে আমার জীবন পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক।...সকালে রত্ন মায়া ও তাহাদের পুত্র আসে।... ৯টায় এখানে ফিরি। ঠাকুরের মূর্তি প্রস্তুত করা হইলে রমাপতিবাবু ১০০০ টাকা ও নীরদতনয়বাবু ২০০ টাকা দিবেন বলিলেন। এই উৎসবে রমাপতিবাবু আরও ৫০

টাকা দিবেন, নীলরতনবাবুও দিবেন। ঠাকুরের নাতির পুত্র আসে। সে সেদিন ঠাকুরের মূল সেবার বাবতীয় জিনিষের ব্যয় বহন করিতে চায়। রাত্রে লোক আসিয়াছিল। কথা হয় নগেনবাবু কাল কাশী হইতে আসিয়াছেন।...মঠে যে সব অন্তর্বর্তী কার্যকলাপ চলিতেছে, তাহা শুনিয়াও ওঁরা একটী দুঃখ মঠ গড়িয়া তুলিবার মত যোগ্যতা আমাকে কি ঠাকুর দিবেন? এমন আবেষ্টন যদি তৈয়ার করিতে পারি, যাহাতে সব অনাচার, সব ক্ষুদ্র আপনা আপনি ধসিয়া পড়ে, তবেই না এই কাজ সহজ হয়? Resistance যাহা তে আরও জটিল হইবে। আর ঠাকুরের নীতিও তো তাহা নয়

১৪ই মার্চ

নিত্যগোপাল, আমার বিশ্ব তোমার চিন্তরে কেন্দ্রীভূত, ঘনীভূত; আমার সকল সত্তা তোমাতে ঘনীভূত; আমার পিতা তুমি, মাতা তুমি, স্ত্রী তুমি, পুত্রকন্যা তুমি, ধন তুমি, জন তুমি, আমার আশ্রয় তুমি, আমার সকলি তুমি। আমার আমি তুমি। তুমি সূর্য, আমি ছায়া। তুমি আমি এক অদ্বৈত, এক-হৃদ, এক-প্রাণ, এক-মন, এক-বিজ্ঞান, এক-আনন্দ আমার সকল চেষ্টার ধিষ্ঠিকেন্দ্র তুমি। তুমি শরণ...আমি এটার পর মঠে যাই। প্রভাস সরকার ও অবনী সরকার আসে। শতবার্ষিকী কমিটী ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা গঠিত হয় নাই, যুগ্ম সম্পাদকের সহ্য (?) করিবার চিঠি, গভর্ণরের চিঠি, টেলিগ্রাফি কথা এমন রকমভাবে বলে যে সমস্ত আবেষ্টনটা বিষাক্ত হইয়া উঠে। নিমন্ত্রণ ভক্ত মণ্ডলীর নামে হইবে, না শতবার্ষিকীর নামে হইবে—ইহাই ছিল আলোচ্য বিষয়। তারিণীবাবুর ইচ্ছাও ছিল ভক্ত মণ্ডলীর নামে নিমন্ত্রণ হওয়া। শতবার্ষিকী কমিটী যখন ট্রাস্টীদের সৃষ্টি, তখন এই উৎসব ব্যাপারে সে autonomous, ইহাই ছিল আমার বক্তব্য। উহাদের যুক্তি, জমিদারের ছেলের বিবাহের নিমন্ত্রণ ম্যানেজার করে না, জমিদারই করেন। কিন্তু উৎসবের জন্যই গঠিত কমিটী আর ম্যানেজার কি এক কথা? তারিণীবাবু প্রভৃতি patch-work দিয়া দুই নামেই নিমন্ত্রণ করার কথা বলে। ইহা হইবে না—দুই নাম থাকা বিরোধসূচক। মঠের নামেই হইবে, শতবার্ষিকীর নামে হইবে না—তাহাও মানিয়া লইব। কিন্তু নিমন্ত্রণ যখন শতবার্ষিকী কমিটী করিতেছে না, তখন (?) অভিনন্দন দেওয়া, বাড়ী বাড়ী গিয়া নিমন্ত্রণ করা, স্বাগত সম্ভাষণ জানাইবার অধিকারও নাই। উহাও ভক্ত মণ্ডলী বা মঠের ম্যানেজার করিবেন। কে আমি তাহা আজ জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। কি আমার status? প্রায় ১০টায় আসি। ৮মাস যাহাদের তাগিদাও পাই নাই, আজ তাহারা এই উৎপাত করিতেছে ইহাতে বড় কষ্ট পাইতেছি।

১৫ই মার্চ

ঠাকুর, আজ তোমাকে লইয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। কে তোমার আছে? কেহ তোমার কাজে আগাইয়া আসে না, শেষে আসিয়া কাজ পণ্ড করিবার অন্ত যা-খুশি তাই করে। আমি আর পারি না। আমার এই পাগল প্রাণ লইয়া কি করিব? আমার তো তুমি ছাড়া কিছু নাই। তোমার কাজ তুমি কর, আমাকে ছুটি দাও। তোমার নাম করিয়া যাহারা ভিড় করিতেছে, আমি যে তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না; তাহাদের না আছে কোনও ব্যাপক ধারণা, না আছে হৃদয়ের প্রসার। আমি যে সকল দিক দিয়া বেদনা পাইতেছি। ঠাকুর আমার, প্রাণধন আমার, শান্তি আমার, আশ্রয় আমার! তোমাকে বুকে লইয়া আমি পড়িয়া থাকিব। ঠাকুর, সারা জীবন বড় কাঁদিলাম। সকালে একবার মঠে যাই। পথে সুধাংশুর সঙ্গে দেখা...নগেন দাদার সঙ্গে কথা আরম্ভ হয়। নিত্যভক্ত মণ্ডলীর নামে চিঠি ছাপা হইলে আমি কোন্ capacity-তে নিমন্ত্রণ করিব, নিমন্ত্রিতদের সাদর সম্ভাষণ জানাইব?...ঠিক হইল—'সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-জন্মশতবার্ষিকী' নামে চিঠি ছাপা হইবে। নীচে নাম দিকে থাকিবে, 'সম্পাদক, জন্মশতবার্ষিকী কমিটী'। একটী ব্লক দিয়া কার্ড ছাপানো অশোভন। ইহাদের কোনও রুচি নাই। ইহা কি জ্যোতিঃশায়ী হরিশ্চন্দ্রের ছবি দিয়া তাহার জ্যোতিষের বিজ্ঞাপন? আসিবার সময় আমার পাশিহাটির মেয়ের দেওয়া এক কানা বলা ও কিছু ফিকে পাপ সুতীলা দিয়া যায়...রেণু ১টায় ঠাকুরের ছবি ছাপাইবার কাগজ কিনিতে কলিকাতা যায়। ফেরে ৪টার পর। আমি ৫টায় মঠে যাই। ফিরি ৮। টার পর। প্রেসে চৈত্র মাসের কপি দেওয়া হয়।...

১৬ই মার্চ

ক্রমশঃ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি-সমস্যা

[সমস্ত বাড়ির লেখকের]

॥ শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত ॥

পশ্চিম বাংলায় 'শিক্ষা' একটি বিরাট সমস্যার দাঁড়িয়ে গেছে। সর্বত্রই 'স্থান নেই স্থান নেই'। কলেজে ও তৃতীয় বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের স্থান নেই বললেই চলে। এমন কি অনেক কলেজ শহর ও শহরতলীতেও আছে, যেখানে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ অনেক ছাত্রছাত্রীও স্থান পায় না। উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতেও স্থান নেই। অথচ একটি রাষ্ট্রের ছাত্রছাত্রী সম্প্রদায়কে অশিক্ষার অন্ধকারে রাখবার উপায়ও নেই। পশ্চিমবঙ্গের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি স্তরে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, সেই বিশৃঙ্খলা ও আরও বেড়ে যাবে যদি শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা না যায়। কিন্তু কথাটা ত শুধু বললেই চলবে না, কারণ পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা বহু রকমের, এবং সেই সমস্ত সমস্যার প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রেও।

আমি অতবড় বিরাট আলোচনার মধ্যে যেতে চাই না, তার কারণ সব কিছু সমস্যার সমাধানের পথ দেখিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শুধু প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তি ও সামগ্রিক ভাবে শিক্ষা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে ৬-১১ বৎসরের শিশু অর্থাৎ প্রাথমিক (বুনিয়াদী) বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৬.৩। প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিকরণ এক বিরাট সমস্যা সন্দেহ নাই। অথচ প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক না করলে স্বাধীন দেশের অগ্রগতিও হবে না। আমাদের দেশের সংবিধান রচিত হল ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে। বলা হল যে ১০ বৎসরের মধ্যে ৬ হতে ১৪ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা পর্যন্ত আবশ্যক করা হবে। কিন্তু এ ত বাস্তবিক ব্যাপার নয় যে তাড়াতাড়ি টাকা পয়সা শ্রম ইত্যাদি ঢেলে খরচ করে একটি বিরাট ইমারত গড়ে তোলা যাবে। এ হচ্ছে মানুষ নিয়ে ব্যাপার। তাই শিশুদের বিদ্যালয়ে ধীরে ধীরে কিছুটা আনিয়ে তারপর প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করা হবে এই স্থির হয়েছিল। ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬-১১ বৎসরের শিশু বিদ্যালয়ে আসত মোটে ৪২.৩। এ সব পুরানো কথা। তারপর কিভাবে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক-করণের সমস্যা ধীরে ধীরে পিছিয়ে গেল, তা সকলেই জানেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে ৬-১১ বৎসরের শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হবে, আর পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে অর্থাৎ ১৯৭৪-৭৬ এর মধ্যে ১২-১৪ বৎসরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য elementary education আবশ্যিক হবে বলে স্থির হল। এখন জানা যাচ্ছে পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যেও elemeutary education আবশ্যিক হতে পারবে না, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অর্থাৎ ১৯৮০-৮১ এর মধ্যে হয়ত উহা আবশ্যিক হতে পারবে।

এদিকে ৬-১১ বৎসরের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৬৫-৬৬ এর মধ্যে আবশ্যিক হবে বলে কথা ছিল। অবস্থা অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে এসে গিয়েছে, অর্থাৎ বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গে শতকরা ৮০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে আসছে, কিন্তু এখনও প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যায় নি। বর্তমান যুগ প্রচারের যুগ। একজন আর একজনকে দেখে শেখে, আর এক জনের কথা শুনে কাজ করে। সেখানে সরকার এ বিষয়ে চুপ করে থেকে প্রাথমিক শিক্ষার আবশ্যিকরণের কাজকে বিলম্বিত করছেন।

কিন্তু যে সংখ্যক শিশু বিদ্যালয়ে আসছে, তা নিয়েই আমাদের সমস্যার অন্ত নেই। প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরি-

কল্পনার শুরুতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৬ হাজার, সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয়েছে প্রায় ৩৩ হাজার। ছাত্র সংখ্যা শতকরা ৪২ হতে শতকরা ৮০ ভাগের উপরে উঠেছে, অতএব বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, এতে আর বলবার কি আছে।

কিন্তু তাহলেও স্থান সঙ্কুলান হয় নি অনেকে বলে থাকেন বিদ্যালয়-গৃহ শিক্ষার সহায় নয়, কারণ আমাদেরই দেশে পূর্বে মন্দিরে, মসজিদে, ধর্মশালায়, চণ্ডীমণ্ডপে পড়াবার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু তখনকার দিনের ছাত্রসংখ্যা ও বর্তমান যুগের ছাত্রসংখ্যার মধ্যে পার্থক্যের কথা ভুলে গেলে চলবে কেন? আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি একটি কথা মুর্শিদাবাদের পরগাছি জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজে শিক্ষাদান পরীক্ষার জন্য গিয়েছিলাম, ঠিক কোন সনে মনে নেই ১৯৬০-৬১ হবে হবে, বহরমপুরের কাছে এক আমবাগানে পরীক্ষা নিয়েছিলাম। পরগাছির কলেজের অধ্যক্ষকে বলেছিলাম, ঐ ইস্কুল বাড়ীটি দেখবার আমার ইচ্ছা। এনিমেতেই যেতে হল—একটি শিক্ষক-শিক্ষার্থী ইস্কুলেই পড়াচ্ছিলেন। দেখলাম একটি ঘর ও একটা বারান্দা, শিক্ষকের ঘর আলাদা। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২০৬। বৃষ্টি এলে ২০৬ জন ছাত্রছাত্রীর দাঁড়াবার স্থান নেই। এমন স্কুল-গৃহ কেন তৈরী করা হয়েছিল জানি না। সরকারের টাকা না থাকতে পারে, কিন্তু ঘুঘুডাঙ্গা থাকবে না কেন? এর চেয়ে চণ্ডীমণ্ডপ বা কারও বাড়ীর বৈঠকখানা কোন অংশে খারাপ ছিল না। আমার বহুদিনের শিক্ষকতা কালের অভিজ্ঞতায় একটি ব্যাপার আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, নিজে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িয়েছিও বলেই বলতে পারি সে কথা—শিক্ষাদান কালে শিশুদের জন্য উপযুক্ত স্থানের সঙ্কুলান করে দিতে হবে, তা না হলে যত পদ্ধতিই প্রয়োগ করা যাক না কেন, পাঠদান সুষ্ঠুভাবে চলবে না। লেখাপড়ার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান আমাদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে, তা আমরা পরিসংখ্যান থেকে জেনেছি। কিন্তু ১৯৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত খানবাহাদুর আব্দুল হাকিম এম এ (ক্যান্টাব) প্রণীত 'The Reconstruction of Education নামে পুস্তকে দেখেছি পূর্বপাকিস্তান শিক্ষা-বিভাগ ৬৬৬৬ টাকা খরচ করে পাকা কিন্তু, দু ফুট উঁচু পাকা দেওয়াল ও উপরে টিন ও পাশে বাঁখারি দিয়ে দশা ঘর তৈরী করবার পরিকল্পনা করছেন। মধ্যে থাকবে পার্টিশান, চারটি ঘর থাকবে, প্রত্যেকটি ঘর হবে ২০'×১৬', আর সম্মুখে থাকবে ৮' ফুট চওড়া পাকা বারান্দা। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের পাকা বাড়ীর চেয়ে ঐ স্কুলগৃহগুলি খারাপ সন্দেহ নাই, কিন্তু আলোবাতাস-পরিসর যুক্ত গৃহ যে শিশুদের পাঠদানের পক্ষে বেশী উপযোগী সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। আর আমাদের ঘোরান বারান্দাওয়ালা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কথাও না বলে পারছি না। চাকুরীতে থাকাকালীন বহু নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় দেখেছি, ২১ বৎসরের মধ্যে সে সব গৃহের যে পারগতি দেখেছি, তাতে মনে হয় সাধারণ খড়ের বাড়ীও ঐ বাড়ীগুলি হতে শক্ত ও পোক্ত। আমি উদাহরণ দিলাম না, কটার কথা বলব, সবগুলিই প্রায় তাই।

এসব অবান্তর কথা। শুধু বলছি এজন্য যে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু তারা পড়বে কোথায়? ছাত্র ছাত্রী বেশী সংখ্যায় ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ে আসছে, আর তা আমরা চেয়েছিও কিন্তু তাদের না দিতে পারছি বসবার জায়গা, না পারছি লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করতে।

এদিকে ছ' বৎসর না হতেই শিশুরা এসে বিদ্যালয়ে ভিড় করছে। না নিয়ে উপায় নেই, অভিভাবক ক্ষুব্ধ হলে স্থানীয় শিক্ষকের দুর্বিপাকের কথা। ফলে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বাবস্থায়, অর্থাৎ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের প্রাথমিক শিক্ষা আইন চালু হবার পূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে ক'টি স্তর ছিল আজও তাই থেকে গেছে। আগে ছিল শিশুশ্রেণী, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী। বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইনে হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা চার বৎসরের। কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে তিনটি শাখা প্রায় অনেকই প্রাথমিক ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে দেখা যায়। ১(গ) তে আছে ৬বৎসর হয়নি

এমন শিশু, ১(খ)-এ আছে ৬বৎসর হয়েছে, অথচ প্রথম শ্রেণীর উপযুক্ত হতে পারছে না, আর ১(ক)-এ আছে গ ও ঘ থেকে পাশ করে আসা প্রথম শ্রেণীর উপযুক্ত শিশু। শিক্ষকেরা কি করবেন? উপায় নেই, স্থান নেই। যে বিদ্যা তাঁরা শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় হতে শিখে এসেছেন তার প্রয়োগ করবার উপায় নেই। এ অবস্থায় শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকাদেরও হার মেনে যাবেন বলে আমি মনে করি, অন্ততঃ পক্ষে আমি হলে ত পারতাম না।

শিক্ষকগণ অসহায়, তাই তাঁরা যা পারছেন করছেন, আর পরিদর্শকগণও সাহায্য করতে পারেন না, তাঁরাও নানা পদ্ধতি প্রয়োগ করে, ব্যক্তিগত শিক্ষাদান করে শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে মডেল স্বরূপ হতে পারছেন না। তিনটি বা দু'টি শাখায় ১ম শ্রেণীকে কোথায় বসান যাবে, তাই সমস্যা। শুধু শুধু শিক্ষক শিক্ষিকাদের দুর্নাম দিলেও চলবে না. আর তা ছাড়া আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, যেখানে শিশু নির্ধারণের প্রশ্ন নেই, সেখানে নানা ধরণের শিশু আসবে, তাদের আরও শ্রেণীবিভাগ করে পড়ান উচিত, আরও শ্রেণীবিভাগ না করতে পারলেও ব্যক্তিগত শিক্ষাদান করে শিক্ষাদান করা উচিত, কিন্তু তার সুযোগ কই?

প্রাথমিক ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের পথ দেখাবেন কারা? কাদের মডেল হিসেবে তাঁরা নেবেন? প্রচুর ব্যয়ে সরকারী বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে স্থাপিত প্রাতঃকালীন সরকারী প্রাইমারী স্কুল বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক শিক্ষিকারা পথ দেখাতে পারেন। কিন্তু তাঁদের কি অবস্থা একবার বিচার করে দেখতে হবে। ঐ প্রাতঃকালীন বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে P. G. B. T., B. T., M. Ed. অনেকে আছেন অতএব সাধারণ প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদলী হতে তাঁরা অনেক উচ্চে তা আমরা ধরে নিতে পারি। তাঁদের মডেল ধরেই গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা শেখাবেন। কিন্তু ঐ সকল প্রাতঃকালীন বিদ্যালয়ে ভর্তি কি ভাবে হয় তা একবার বিচার করে দেখতে হয়। কলকাতায় আছি, তাই কলকাতার প্রাতঃকালীন বিদ্যালয়ের কিছু খোঁজ খবর নানা কারণেই রাখতে হয়। কোন নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ের কথা বলছি না। সাধারণ ভাবেই বলছি প্রতি বিদ্যালয়েই প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হবার জন্য ভিড় খুব বেশী হয়ে থাকে। অন্য শ্রেণীতে শূন্য আসন থাকে না, অতএব সে সব শ্রেণীর কথা বলছি না। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হবার জন্য বহু ছাত্রছাত্রী সমবেত হয়। এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক শিশু নিতে হলে পরীক্ষা নেবার প্রয়োজন আছে। প্রচুর প্রার্থী, অতএব কর্তৃপক্ষকে পরীক্ষার মানকে কঠিন করতে হয় কি মাতীয় পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার নমুনা আমি দেব না, কারণ কর্তৃপক্ষের দোষ নেই, ঐ মাতীয় পরীক্ষা না নিয়েও উপায় নেই। অনুপযুক্তদের বাদ দেবেন কি করে? আরও একটা কথা বলে গেল। প্রথম শ্রেণীতে পড়ানই সব চেয়ে শক্ত। যতটা ধৈর্য নিয়ে সেখানে পড়াতে হয়, ততটা ধৈর্য আর কোনও শ্রেণীতে দেখানর প্রয়োজন হয় না। শুধু ধৈর্যই নয়, আরও অনেক জিনিসেরই দরকার হয়। প্রাতঃকালীন সরকারী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক শিক্ষিকাদের সে গুরুভার মোটেই বইতে হয় না। অথচ সাধারণ নিম্ন বুনিয়াদী ও প্রাথমিক শিক্ষকগণ যেন পদ্ধতি অনুযায়ী পড়াচ্ছেন না, সে বিষয়ে আমরা অনুযোগ করে থাকি। গ্রামে যে শিশুর ৬ বৎসর বয়স হল, তাকেই স্কুলে ভর্তি করতে হবে। অথচ শহরের প্রাতঃকালীন সরকারী বিদ্যালয়ে এমনি বস্ত্র আঁটুনী যে সেখানে ভর্তি হওয়া আই, এ এস পরীক্ষায় পাশ করার মত। আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক সরকার। শিক্ষায় সবার সমান অধিকার। ভাল ভাবে পড়ছে এমন ছেলেদের পড়ান কঠিন নয়, যারা কিছু পড়েনি তাদের পড়ানই কঠিন, তাদের এড়িয়ে গেলে চলবে কেন?

আমি এ বিষয়ে শিক্ষাবিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কিভাবে এরূপ ব্যবস্থার পরিবর্তন করা যায় তার ব্যবস্থা করুন। কিভাবে তাহলে ভর্তি করা যাবে, তার পন্থাই বা কি প্রশ্ন হতে পারে। মীমাংসা অতি সহজ। গ্রামে

যদি 'শিক্ষায় সমান অধিকার' এই দাবীতে সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে, তবে সহরেই বা সকল শিশু সে সুবিধা ভোগ করবে না কেন? একটি নির্দিষ্ট দিনে যাঁরা আগে গিয়ে নিজের শিশুদের জন্য দরখাস্ত দেবেন, সেই দরখাস্তগুলিকে বিবেচনা করে দেখা হবে, এরূপ নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। ৩০টি আসনের জন্য ৩৫ জনের দরখাস্ত নেওয়া যেতে পারে। বিকলাঙ্গ না হয়, শুধু তাই ত দেখতে হবে, আর দেখতে হবে ছয় বৎসরের খুব বেশী না হয়। ৩৫ জন থেকে ২।১ জন বাদ গেলেও নির্দিষ্ট সংখ্যা থেকে যাবে। যদি কেউ না ভর্তি হয়, তার জন্য waiting list থাকবে। আমার মনে হয় শিক্ষা বিভাগ একবার চেষ্টা করে দেখুন। গ্রামীণ শিক্ষকদেরই শুধু কঠিন দায়িত্ব থাকবে অথচ উচ্চ শিক্ষিত, ও উচ্চশিক্ষা অনুযায়ী বেতন ভোগী শিক্ষক শিক্ষিকার কোন দায়িত্ব থাকবে না, এ হতেই পারে না।

"সবার উপরে মানুষ সত্য। হিন্দু তখনই সত্যকার হিন্দু, যখন সে 'মানুষ'; মুসলমানও তখনই সত্যিকার মুসলমান যখন সে মানুষ। মানুষ একান্ত হিন্দুরও 'উপর', একান্ত মুসলমানেরও পর'। হিন্দু যখন সঙ্কীর্ণ হিন্দু-উপাধি ডিঙ্গাইয়া মানুষের স্তরে আসীন হইবে, তখনই সে সত্য বাস্তব হিন্দু; মুসলমানও যখন সঙ্কীর্ণ মুসলমান-উপাধি পরিত্যাগ করিয়া মানুষের স্তরে উন্নীত হইবে, তখনই সে সত্য বাস্তব মুসলমান। দুই দুই থাকিয়া, দুই-এর বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া এবং তিন তিন থাকিয়া, তিন-এর বিশেষত্ব অটুট রাখিয়াও যেমন ছয়-এর মাঝে এক হইতে পারে, ঠিক তেমনি মানুষের মাঝেই হিন্দু-মুসলমান স্ব স্ব পারিবারিক সামাজিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া এক হইতে পারে। হিন্দু-মুসলমান যদি এই কৌশলের খোঁজ না রাখে, বুকে বুক মিলাইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য প্রাণপণ না করে, তবে হিন্দু মানুষও নয়, হিন্দুও নয়, মুসলমান মানুষও নয়, মুসলমানও নয়। সহজ মানুষকে জানিয়া, সহজ মানুষ বনিয়া গিয়া হিন্দু-মুসলমান নিজকে জানো, আত্মস্থ হও। * * মানুষ-রাজ প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের ধ্যানের বস্তু—হিন্দু-রাজও নয়, মুসলমান-রাজও নয়। * * *"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

সাময়িকী

বর্তমান শিক্ষা মেয়েদের অধর্মচ্যুত করছে কি না—এক জন শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর এই প্রশ্ন করে পাঠিয়েছেন। এক কথায় এর প্রথম উত্তর হাঁ, বর্তমান শিক্ষা মেয়েদের যা করা উচিত ছিল তা মোটামুটি ভাবে করতে পারে নি, বেশীর ভাগ যা করেছে, তা সুস্থ নয়—তা বিকৃতিই বলা যায়। নারী-জীবনের সার্থকতা এ নয়। লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন আছে আত্মশক্তি উদ্বোধনের, প্রয়োজন আছে যার যেদিকে প্রবণতা সেদিকে অগ্রসর হয়ে যাবার স্বাধীনতার, প্রয়োজন আছে নারীও মানুষ, তারও যে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে তার স্বীকৃতির, সর্বোপরি প্রয়োজন আছে সুস্থ সংহত শুদ্ধ দেহ মন নিয়ে নিজের আত্মমর্যাদা বজায় রেখে সামগ্রিক জীবন অর্থাৎ পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় জীবন যাপন করার। বর্তমান শিক্ষা এ সবের কতটুকু দিয়েছে? লেখাপড়া অনেকেই অনেক করছে বটে, কিন্তু সত্যিকারের শিক্ষার প্রশ্ন বাদ দিয়েই বলা যায়, যে-লেখাপড়া করছে, তাই-বা শিখেছে কে কতটুকু, পড়কয়া কয়জন? কজন তাদের পাশের মান অনুযায়ী লেখাপড়া জানে?

পরে আসে সত্যিকারের শিক্ষার কথা। সত্যিকারের শিক্ষা যাকে বলে তা যে হয় নি সে কথা বলার তো অপেক্ষা প্রয়োজনই নেই। এ শিক্ষায় কয় জনের আত্মশক্তির উদ্বোধন হয়েছে? কয়জন নিজের স্বরূপের পরিচয় লাভ করেছে? যার যেদিকে প্রবণতা সেদিকে যাওয়ার খানিকটা আবেষ্টনগত অনুকূলতা এ শিক্ষা মেয়েদের দিয়েছে—এরকম মোটামুটি সত্য বটে। নারীর যে নিজস্ব মন আছে, স্বাতন্ত্র্য আছে, মর্যাদা আছে—এইটে মেনেই বোধহয় খুব বেশী প্রয়োজন ছিল, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে দেখতে হয় আত্মমর্যাদা বোধ বা নিজস্ব সত্তা বোধ বোধহয় একেবারেই আয়ত্ত হয় নি। যা হয়েছে সেটা হচ্ছে অহংকারের স্ফীতি। মোটামুটিভাবে বলা যায় ছোট বা বড়, ঘরের বা বাইরের সব ব্যাপারেই অন্যের উপর নির্ভর করে থাকার সেই দাস মনোবৃত্তি আজও প্রায় সমানভাবেই আছে—বাইরের রূপমঞ্চের তার যেটুকুই হোক না কেন। তারও পরে সব চাইতে যার অভাব হয়েছে সে হচ্ছে সুস্থ সংহত দেহ মন নিয়ে পারিবারিক সামাজিক অর্থাৎ সামগ্রিক জীবন যাপন করার। এ শিক্ষা মেয়েদের আত্মমর্যাদা বোধ শেখায় নি, অহংবোধের বিকৃতি এনে দিয়েছে। স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীন সত্তা বোধের স্থানে ভিতরে দাস মনোবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও অহংকার তার সৌন্দর্য নষ্ট করে দিয়েছে। বিনয় শ্রদ্ধা সংযম—যা শিক্ষার বিশেষ ফল—তা মোটেই দেয় নি। বিকৃত অহংকারের জন্যই তারা পারিবারিক সামাজিক জীবন যাপনে অক্ষম হচ্ছে।

এ সমস্তই সত্য কথা। অবশ্য এই সঙ্গে এও সত্য যে বর্তমান শিক্ষার এই সকল কুফল কেবল মেয়েদের বেলাতেই যে সত্য তা নয়—ছেলেদেরও এ শিক্ষা বাহিত সৌন্দর্য দান করে নি, জীবিকার সন্ধানে যতটুকু যা করেছে, জীবনের প্রয়োজন মেটায় নি। মানুষ হিসেবে তারা কতটুকু বেশী মানুষ হয়েছে সে প্রশ্নের অবসর অনেক আছে। সে প্রশ্ন বর্তমানে আলোচ্য নয়। মেয়েদের এই শিক্ষার এই ফল যে অবাঞ্ছিত, অসুন্দর এটা সত্য—এখন পথ কি?

মেয়েরা এই রকম শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য হল কেন? মেয়েদের শিক্ষার ধারা এই রকম হওয়া থেকে আমরা ঠেকাতে পারলাম না কেন? আজও আমরা এটা বাতিল করতে, পালটে দিতে পারি না কেন? শিক্ষার ধারা কম বেশী এই 'রকম' থাকলেও কোথাও কোনরকম কোন-টুকু পরিবর্তনের দ্বারা এই 'রকম' থেকে সুফল, কল্যাণফল পাওয়া যায় কিনা। আমরা আবার ঠিক আগের

অবস্থায় ফিরে যেতে পারি কিনা অনেক প্রশ্ন আমাদের সামনে।

ভারতবর্ষে সামাজিক ব্যবস্থাপনায় মেয়েদের যে স্থান মর্যাদা ও জীবনধারা ছিল, বর্তমান অবস্থা তাদের স্বাভাবিক পরিণতিতে তারই প্রতিক্রিয়া মাত্র। সে দিনের ব্যবস্থাও ছিল ঐকদেশিক, আজকের প্রতিক্রিয়াও ঐকদেশিক। সেদিনের ব্যবস্থার সৌন্দর্য যেমন পাওয়া যাবে, আবার দুঃখ লাঞ্ছনা বেদনার কথা ইতিও পাওয়া যাবে। আজকের দিনে তার তুলনায় অসৌন্দর্য নেই হতে পারে কিন্তু সেদিনের বেদনাকে যেন আমরা না ভুলে যাই, এবং এ অসৌন্দর্যই যে প্রমাণ করে না যে সেদিনের ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ ভাল ছিল, সে কথাও যেন মনে রাখি। সেদিন যদি সবই ভালই ছিল তবে এবং তবুও সে ব্যবস্থাকে ফিরে আনে সমাজ-জীবনে মেয়ের দুঃখ সম্ভব হল না কেন? সেদিনের অনেক ভাল সত্ত্বেও যে অবস্থাটা কালধর্মে আজ ফুটে উঠতে চাইছে সেটা হল মানুষ মাত্রেরই মানুষ হিসাবে প্রথম পরিচয় এবং তারও একটা স্বাধীনতা এবং মর্যাদার স্বীকৃতি। অর্থাৎ সে কেবলই এবং সব সময়ের জন্যই অন্যের দ্বারা explained হবে না, অথবা তার সবটুকুই কেবল অন্যেরই জন্য নয়, দার্শনিক ভাষায় সে শুধু দৃশ্য (object) বা supporter of combustion নয়, সে-ও কোথাও কখনও দ্রষ্টা বা combustible substance-ও বটে। এই যে চেতনা, এই যে আত্মস্বরূপের উপলব্ধির ভাব এ কেবল মেয়েদের জাগে নয়—যে কেউ যে কোন দেশে নিপীড়িত ছিল, অত্যাচারিত ছিল, বঞ্চিত ছিল, তারই বুক জুড়ে জাগ্রত হওয়ার এই ভাব এসে গেছে। নারী শূদ্র শ্রমিক চাষা-ভূষা—সমাজে যারা শুধু দিয়েই এসেছে, পেয়েছে আর এক জনের ইচ্ছার প্রসাদটুকু, নিজেদের নিজস্ব অধিকার বলে যাদের কিছু ছিল না—সেই সকলকেই বিধাতা জাগিয়ে তুলে দিলেন; বলতে শেখালেন, আমাদের পরিচয় প্রথমে এই যে আমরা মানুষ—নারীও মানুষ, শূদ্রও মানুষ, শ্রমিকচাষাভূষাও সব প্রথমে মানুষ—তারপরে যে আর কিছু। সেদিনের সমাজে নারীর কোন স্বাতন্ত্র্য ছিল না—সব সময়ই সে পরতন্ত্র—বাল্যে সে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর, বার্ধক্যে পুত্রের—অন্যের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা প্রয়োজনকে নীরবে নিঃসঙ্কোচে রূপ দেবার প্রচেষ্টাতেই সারাটা জীবন সে কাটিয়ে দিয়েছে, তাদের যে কোন অভাব বা অন্যায়কে নত মস্তকে সহ্য করে গেছে—এই ছিল তাদের জীবনেতিহাস প্রতিবাদ করবার অধিকার ছিল না, ছিল না নিজেদের কোন দাবী পেশ করবার কোন অবকাশ—কেবল মেনে নিয়েই নিজেদের সবটুকু দিয়ে অন্যের প্রতিষ্ঠা দান করে এসেছে—তাই বিবাদের অবকাশও ছিল কম এ কেবল মেয়েদের বেলায় নয়, এই অবস্থাই ছিল সমাজের নিম্নশ্রেণীর, ছিল দরিদ্রের, ছিল অনুন্নতদের এ হচ্ছে একদিক। কালের যাত্রার এর অপর দিক, এদের সকলের স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতিই পুরাতন সব ব্যবস্থা ভেঙে দেবার গোপনের মনস্তত্ত্বগত কারণ।

সকলেরই এই মানুষী সত্তার স্বীকৃতি আনতেই বর্তমান কালের ঔৎসুক্য। কিন্তু সে স্বীকৃতিটা যেমন সত্য তেমনি সত্য তার আনবার ছন্দটুকু এবং স্বীকৃতির পথের কথাটুকুও। আনবার ছন্দে যেমন আমাদের ভুল রয়ে গেছে, তেমনি একজনের স্বীকৃতি দিয়ে যে আর একজনের অস্বীকৃতি হয়ে যায় না সে সম্বন্ধেও আমরা সচেতন হই নি। নারীর স্বীকৃতির জন্য নরের স্থান মন যেমন নষ্ট করা চলবে না, নিম্নশ্রেণীর বা বঞ্চিতের স্বীকৃতি দিয়েও তেমনি অপর পক্ষকে অস্বীকার করা যাবে না। সব ক্ষেত্রেই দুই পক্ষ মিলিয়ে একটা সমগ্র এই কথাটা সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে। প্রতি পক্ষই একই সময়ে পরস্পর নিরপেক্ষও বটে আবার পরস্পর অপেক্ষমানও বটে। আমাকে ছাড়া তোমার চলে না, তোমাকে ছাড়া আমার চলে না। আমার সন্তান তুমি রক্ষা করবে, তোমার সন্তান আমি রক্ষা করব। নরনারী মিলে একটা সমগ্র। এখানে প্রত্যেকে অপরের অধীনও বটে, স্বাধীনও বটে। ধনিক শ্রমিক মিলে একটা সমগ্র—সেখানেও একজন আর একজনের অধীনও বটে, স্বাধীনও বটে, অপেক্ষমানও বটে, নিরপেক্ষও বটে—মিলে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক সম্বন্ধেই এটা সত্য।

বিধাতার এই সহজ সুন্দর বিধান প্রবর্তন করতেই বর্ত্তমান যুগ-প্রয়োজন। এটাই বর্ত্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য। এটাই যদিও বর্ত্তমান যুগ স্থাপন করতে চায় কিন্তু এই কথাটা আজও এই ভাষার মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। সর্ব ক্ষেত্রে আজও যা হচ্ছে তা হল অনেকাংশেই প্রতিক্রিয়া মাত্র—সামগ্রিক সত্যের চিত্র নয়। আমরা কোন ক্ষেত্রেই এ সমগ্রতার ধর্ম মানুষের সামনে তুলে ধরি নি বলে এবং একজনকে নস্যাৎ করেই আর একজনের অস্তিত্ব ও বিবৃদ্ধি সম্ভব গোড়াতে এই তত্ত্ব আজ পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছে এবং হচ্ছে বলে নারীর এই উচ্ছৃঙ্খলতা, শ্রমিকের এই উৎপাদন ক্ষতি, শ্রম নষ্ট; সকলেরই সর্ব ক্ষেত্রেই কর্ত্তব্যে অবহেলা অথচ কেহই নিজের দাবী বাড়িয়ে তোলা। প্রত্যেকেরই অধিকার আছে এ কথাই তো বলতে চাইছি—কিন্তু এতদিন যার অধিকার ছিল না তেমন একজনের অধিকার আছে বলে সেটাকে এমন ভাবেই স্থাপনা করতে হবে যা বাড়িয়ে তুলতে হবে যাতে অপরের অধিকার অস্তিত্ব বা বিবৃদ্ধি ধূলিসাৎ হয়ে গিয়ে সমগ্র সমাজই বিপন্ন হয়ে পড়ে, তা তো চলবে না। এতদিন যেখানে একজনেরই শুধু অধিকার ছিল, একজনের দিকে তাকিয়েই সমস্ত ব্যবস্থা হত, সেখানে দুজনেরই অধিকার থাকলে প্রথমের অধিকার ও সুখসুবিধার কিছু কমতি হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই-টুকুই কমতি হবে যেটুকু সে বাড়তি ভোগ করছিল—আসলে মোটেই সেটা তার পাওনা ছিল না। এ সব পাওনাটুকু তাকে স্বীকার করতেই হবে—যে স্বীকার করতে চাইবে না তাকে কিছু দুঃখভোগ করতেই হবে। কিন্তু নারী-শ্রমিক-নিপীড়িত-শূদ্র-পতিত যদি মনে করে থাকে যেহেতু তাদের অধিকার আছে অতএব যেন তেন প্রকারেণ সে অধিকার প্রতিষ্ঠা করব—যা খুশি তাই করে জীবন চালাব—তাহলে শেষ পর্যন্ত তারা যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং হচ্ছে তা কি তারা আজও দেখতে পাচ্ছে না? তাদের এই মাত্রাহীনতার জন্যে তো সমস্ত ক্ষেত্রে সমগ্রতা নষ্ট হয়ে গিয়ে যে চাপ তাদের উপরেও পড়ছে, পড়বে—তারা তো সে চাপ থেকে রেহাই পাবে না। আজ নিজের দিকে যা ঘটছে—কি নারীর জীবনে, কি শ্রমিকের জীবনে, কি যে কেউ নিপীড়িত ছিল তাদের জীবনে যারা ছকহীন ভাবে আজ তাদের দাবী পেশ করে চলেছে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুইয়ে মিলে এক সমগ্র, দুইয়ের স্বীকৃতি নিয়ে অথচ এমন পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে চলা যাতে কারোরই জীবন যাপন অস্থিষ্ঠ না হয়ে ওঠে—এই মনোবৃত্তির অভাব বলেই এই সব ঘটছে। নারী ছিল ঘরে বন্দী, তার ছিল না কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা বা স্বীকৃতি—সেইটে ছিল তার পাওনা। আজ নূতন জীবন-চেতনার কথা তাকে বলতে গেলাম যারা তারা এটা দেখতে পায়নি যে, ঘর বাদ দিয়ে তার বাইরে নয়, অপরের মর্যাদা নষ্ট করে তার মর্যাদা থাকবে না, তার স্বধর্ম যে প্রাণ সেই প্রাণকে বলি দিয়ে শুধু বুদ্ধিমান হতে চেষ্টা করে তার কোন কল্যাণ লাভ হবে না, সে যদি স্বামী, তার পরিজন, পুত্রকন্যা ও নিজের আবেষ্টনকে মিলিয়ে মিশিয়ে শান্ত সুস্থ সংযত জীবন যাপন করবার মন তৈরী করে' না তোলে ও সেজন্য প্রয়াস না করে—এবং সেই সঙ্গেই একটা বিশ্ব-জীবন যাপন করবার দিকে প্রবণতা না রাখে তাহলে কোন সার্থকতাই সে অর্জন করতে পারবে না। শ্রমিক যদি তার শ্রম দিয়ে সমগ্র সমাজের সেবা না করে' তার শ্রম দিয়ে সমাজের উপর চাপ দেবার মনোবৃত্তি রাখে, তাহলে উৎপাদন বন্ধ হয়ে সমগ্র সমাজের ক্ষতি হবে—তাতে যে কোন কল্যাণ নেই—এতথা শ্রমিককে কেউ তাকে আগ্রহ হতে বলার দিন থেকে শেখায় নি।

নারীর সমস্যা এইখানে। আগের দিনের মত সে সেছনে ফিরে যেতে বাধ্য হবে যদি আজও তার চলবার ধারা না বদলায়। এজন্য শুধু তাকে দায়ী করেও লাভ নেই—তাকে সত্যি পথ, ঠিক পথ তো দেখান হয় নি—দড়ি-ছেঁড়া বাছুরের মত উদ্দেশ্যহীন ভাবে সে যা খুশী তাই করে বেড়াচ্ছে—তাতে তার নিজের যাচ্ছে নষ্ট হয়ে—তার নারী আনন্দ সৌন্দর্য কোথাও থাকছে না। আজ যে ভাবে সে চলেছে—মোটামুটি ভাবে এটা তার মরণের পথ, এ তার বাঁচার পথ নয়। কিন্তু কে তাকে পথ

দেখাবে ; যে তার জীবনে সমগ্রতার দৃষ্টি তুলে ধরবে ; যে তাকে শেখাবে যে জীবনে মুক্তি, শান্তি ও আনন্দ পেতে হলে তাকে সংযত হতে হবে, তাকে বাইরের জীবন রাখতে হলেও তার ঘর গুছাতে হবে, তাকে ঘরে বাইরের মধ্যে সামঞ্জস্য ঠিক করে নিতে হবে।

স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্রকে স্থিত না হয়ে জীবনে সংযম, শালীনতা, অন্যকে স্বীকার করার বিনয় শ্রদ্ধা প্রভৃতি নিয়ে সামগ্রিক জীবনদর্শনের বাণী বা তত্ত্ব—যার মধ্যে নারী-জীবনের সকল সমস্যার সমাধানের নিহিত—রেখে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল। তাঁর সেই তত্ত্বকে তিনি আচরণেও রেখে ছিলেন। আজ থেকে আশী বছরেরও বেশী আগে ভারতবর্ষের একজন সন্ন্যাসী হয়েও তিনি মেয়েদের তাঁর মঠে রেখে মেয়েদের এ অধিকারকে বাস্তব স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। কিন্তু এ অধিকার জানাকে যে চিন্তাধারার মধ্যে রেখেছেন সেটা হচ্ছে এতক্ষণ যা বলেছি নারীর তথা সমস্ত ব্যক্তিত্বের অধিকার আছে বটে যেখানে সে complete-in-itself কিন্তু সেই সঙ্গে সে একটা সমগ্রের অংশ, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠাদানের অন্যের অধিকার খর্ব না করা, অধিকার কর্তব্য মিলিয়ে জীবনের তথা সমাজের কোন ক্ষেত্রের সামগ্রিকতাকেই নষ্ট না করা। শ্রীনিত্যগোপালের এই তত্ত্বকে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ হিন্দু প্রস্থান ত্রয়ের বাক্যের মধ্যে দিয়ে প্রস্থাপন করেছেন। ভারতবর্ষ যতই আধুনিক হয়ে তার বেদান্ত উপনিষৎ গীতাকে আজ বাদ দিয়ে চলুক না কেন, তবু এই প্রস্থানত্রয়ের মধ্যেই যে এই আজকের নবীন জীবন-চেতনা রয়ে গেছে সেই কথা তাকে জানাতে পারলেই তার পক্ষে সহজ স্বাভাবিক হবে, তার পক্ষে তা গ্রহণ করে কল্যাণ লাভ করা সম্ভব হবে। সেই চেষ্টা তাঁর সারা জীবন ধরে করে গেছেন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ—আজও তাঁর অশরীরী আত্মা সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছে। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে এই জীবন-চেতনার কথা মানুষ পাবে। এতে সমাজ সুস্থ হবে, নারী তার স্বধর্ম প্রাকৃতধর্ম বজায় রেখেও মানুষ-ধর্মে স্থিতি লাভ করবে, তার স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা রক্ষার রেখেও সমগ্রতাকে, সমষ্টি জীবনকে হানি করবে না।

যে শিক্ষা-ব্যবস্থা চলছে তাকে আমূল বদলে ফেলা আজই সম্ভব নয়, কেননা এ ব্যবস্থাটা একটা বিজ্ঞির ব্যাপার নয়, দ্বিতীয়তঃ এর স্থানে বসাবার মত কোন কিছু তৈরী করা তো নেই-ই, তৈরী করবার মত মানসিকতাই আজও তৈরী হয় নি বলা চলে ; আর শিক্ষার বিষয় বদলানও খুব একটা বড় কথা নয়, তাতেই ঠিক কল্যাণ হওয়ার কথাও নয়। তবে সাধারণ যোগাতাসম্পন্নদের জন্য কিছু বিষয় বদলান ভাল বলেই মনে হয়। সে রকম কিছু বদলান আছেও। এ কথা বলা যেতে পারে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন বিচারের এই যুগে পথ খুলে রাখাই পথ—স্বাধীন থেকেও সংযত, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও কল্যাণধর্মী হতে পারা যায় কি না—সেইটেই আজকের দিনের সাধ্য, চলার পথ। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকেও কল্যাণ লাভ করা যেতে পারবে যদি তার পেছনে ঐ পূর্ব উল্লিখিত সামগ্রিক চিন্তাধারা রাখা যায় এবং সেই অনুযায়ী চলা যায়। এ সামগ্রিকতার বোধ অভিভাবকদেরও গ্রহণ করতে হবে, নইলে কোন্ পথে চলতে হবে তার নির্দেশ দিতে তাঁরা সক্ষম হবেন না। বলা যেতে পারে আজ আমাদের কারোরই সামনে কোন লক্ষ্য নেই—প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ঘন্দে বিপর্যস্ত আমরা হুজুকের মাথায় যা মনে লয় তাই করে যাচ্ছি—পরিণতি ভাবতে পারছি না। সেইজন্য আজ প্রয়োজন নিজের আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া—যেটা হচ্ছে স্বাতন্ত্র্য-বোধের সঙ্গে সমষ্টি জীবন যাপন করবার মত নমনধর্মশীল মনোবৃত্তি—অর্থাৎ শ্রদ্ধা, বিনয়, পরকে সহ্য করা, সব সময় মনে রাখা এ বিশ্বে আমি এক অর্ধ, আমার বাইরের বিশ্ব আর এক অর্ধ—এই দুইয়ে মিলে এক সমগ্র বস্তু।

—জীবনে সোয়াস্তি, সুখ ও শান্তি এইখানেই সম্ভব। মেয়েদের স্বধর্মও সেইখানে।

ঐক্যতান

শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৮৮৯ শকাব্দ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

বিংশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

বঙ্কিম-হেষ্টি বিরোধ

॥ শ্রীমনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥

শিল্পী বঙ্কিম, ঔপন্যাসিক বঙ্কিম, ঐতিহাসিক বঙ্কিম, ঋষি বঙ্কিম, রসিক বঙ্কিম, বিংবা সমাজোচক বঙ্কিমকে অনেকেই জানেন। তবে যোদ্ধা বঙ্কিমের সঙ্গে সাধারণ মানুষের তেমন পরিচয় নেই। যোদ্ধা বঙ্কিমের একটু পরিচয় পাওয়া যায় "বেঙ্গলেন এ্যাসেম্‌ব্লি ইনস্টিটিউশনের" অধ্যক্ষ হেষ্টি সাহেবের সঙ্গে মসী-যুদ্ধের ব্যাপারে।

ব্যাপারটা ঘটেছিল পৌত্তলিকতার রাজা হরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের নিজ মহীর "দান সাগর" শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান ব্যাপার নিয়ে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানটি হয়। অনুষ্ঠানের দিনে রাজবাড়ীর প্রশস্ত চত্বরে গৃহদেবতা গোপীনাথজীকে রূপার সিংহাসনে বসিয়ে তার সামনে "দান সাগর" শ্রাদ্ধের জিনিস পত্র রাখা হয়। শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার প্রায় চার হাজার সংস্কৃত অধ্যাপক। এ ছাড়া মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি সে যুগের ইংরাজী শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবৃন্দ।

২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়েছিল এই ধরণের বার-সাধ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান কলকাতায় বহু দিন দেখা যায় নি। শ্রাদ্ধের দিনে দশ হাজার কাঙ্গালীকে বিদায় দেওয়া হয়েছিল, দ্বিতীয় দিনে দু'হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়েছিল, তৃতীয় দিনে কায়স্থ ভোজন, চতুর্থ দিনে সাড়ে তিন হাজার মহিলা ভোজন এবং পঞ্চম দিনে জাতি ভোজন হয়েছিল।

এই ব্যাপারটা নিয়ে হেষ্টি সাহেব এই ব্যাপারটাতে এমনই ক্ষেপে গেলেন যে পৌত্তলিকতার রাজবাড়ীর শ্রাদ্ধের ব্যাপার নিয়ে তিনি ষ্টেটস্‌ম্যানে একটি চিঠি লিখলেন। তাঁর প্রথম চিঠিটি প্রকাশিত হয় ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে।

এই চিঠিতে হেষ্টি সাহেব বলেছিলেন পৌত্তলিক রাজ পরিবারের প্রতি কোনও প্রকার অসৌজন্য প্রকাশ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তবে ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার সত্ত্বেও কায়স্থদের শিক্ষিত থাকিয়া এই অনুষ্ঠানে পৌত্তলিকতার দেবতার প্রতি অন্ধ ও পরোক্ষ সহযোগিতা করেছেন, এই ঘটনাই তাঁকে বিচলিত করেছে। তিনি আশ্চর্য হয়েছেন যে মহারাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁর গৃহ-দেবতা (family idol)-কে এখনও পূজা করছেন এবং ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, স্যার যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর প্রভৃতির মত ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণও এই সব ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠানের পোষকতা করেছেন।

এই চিঠিতে হেষ্টি সাহেব নিজেকে "ভারতবন্ধু" ও ভারতের সমাজ সংস্কারের একজন কর্মী হিসাবে পরিচয় দিয়ে খৃষ্টীয় উদারতা ও সহিষ্ণুতার (all the breadth and tolerance of christian charity) সঙ্গে পরবর্তী চিঠিতে ভারতীয় হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মতবা প্রকাশ করবেন বলে জানালেন।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর ঘোষিত উপচিকীর্ষার মত পরের দিনই, অর্থাৎ ২৩-৯-১৮৮২ তারিখেই, তিনি

প্রকাশিত করলেন তাঁর দ্বিতীয় পত্রটি। এবার তিন হাজার শব্দ যুক্ত এই দীর্ঘ পত্রটির নাম ছিল 'The supposed necessity of idolatry' বা 'পৌত্তলিকতার কাল্পনিক প্রয়োজনীয়তা'। এই পত্রটিতে হিন্দু ধর্মের ভুধাকথিত পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে পিতৃসুলভ মন্তব্য এবং হিন্দু দেব দেবী সম্বন্ধে বর্ষণমোচিত কটূক্তি ছিল।

এই চিঠিতে হেষ্টি সাহেব বললেন, বাংলা দেশের যে সমস্ত ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্রলোক ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ছিলেন, তাঁরা যে মনে প্রাণে পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করেন, একথা আমি বলছি না, তবে ঐ শ্রাদ্ধ সভায় তাঁদের উপস্থিতিটা হচ্ছে পৌত্তলিকতাবাদী সাধারণ হিন্দুদের কুসংস্কার ও অজ্ঞতার প্রতি একটা সুন্দর প্রশ্রয়দান মাত্র এবং এই সূত্রে ঐ পৌত্তলিকতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত স্বীকৃতি। কিন্তু কি ছিল এই স্বীকৃতি? হেষ্টি সাহেবের মতে শিক্ষিত বাঙালীদের ধারণা যে প্রতিমা-পূজার তাঁদের প্রয়োজন নেই বটে, তবে স্ত্রীলোক ও অশিক্ষিত মুর্খদের প্রয়োজন আছে। হেষ্টি এই প্রয়োজনটিকে এইভাবেই সমর্থন করলেন এবং হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিমার প্রসঙ্গে বলেন সুরুচিসম্পন্ন এমন কোনও মানুষ নেই, যিনি শিব মন্দিরে গিয়ে স্বপ্নায় সঙ্কুচিত না হন। নগ্নও মালিনী দৈত্যবাহু-দেখলা-ধারিণী, লোলজিহ্বা রক্তপায়িনী বীভৎস-দর্শনা কালী মূর্তিকে দেখে ভয় ও ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, হস্তীমুণ্ডধারী লম্বোদর গণপতিকে দেখে শিশুদেরও হাসি আসে, ভক্তি আসে না। আর কৃষ্ণ-ভক্তিটা ত শুধু যৌন কামনাকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করবার ব্যাপার মাত্র।

প্রতিমা না হলে সাধারণ মানুষ নিরাকার অব্যক্ত ঈশ্বরের চিন্তা করতে পারে না এই জাতীয় যে একটা মতবাদ হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে, এটা একেবারে ভ্রান্ত। ভারতের পাঁচ কোটি মুসলমানরা বিমূর্ত ঈশ্বরের পূজা করতে পারে, আর হিন্দুরা সেটা পারে না কেন? তার কারণ হচ্ছে হিন্দুরা এমনই নিম্ন স্তরের মানুষ যে তারা নিজের হাতের তৈরী একটা পুতুল না পেলে ঈশ্বরের চিন্তাই করতে পারে না।

এই ভাবে হিন্দুদের ধর্ম সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য করে হেষ্টি সাহেব বলেন তাঁর মনে পড়ছে "সেন্ট পলে"র কথা, যিনি এথেন্সবাসীদের পৌত্তলিকতা ও 'পেগানিজম্' দেখে 'মার্স হিল' (Mars Hill) থেকে এথেন্সবাসীদের উদ্দেশ্য উপদেশ ও সংবেদনার বাণী দিয়ে ছিলেন। হেষ্টি বলেন তিনি যদি ঐ রবিবার দিন শ্রাদ্ধ বাড়ীতে উপস্থিত থাকতেন তাহলে তিনিও কলকাতাবাসীদের মঙ্গলের জন্য সেন্ট পলের মতই সংবেদনা ও উপদেশ দিতেন।

এইটুকু বলেই হেষ্টি সাহেব নিরস্ত হলেন না। এই চিঠিটি প্রকাশিত হবার তিন দিনের দিনই অর্থাৎ ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮৮২ তারিখেই তাঁর দ্বিতীয় চিঠিটি বেঙ্গল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হলো। এই চিঠিটির শিরোনাম হলো "The alleged harmlessness of idolatry"।

এই চিঠিটিতেও হিন্দু ধর্মের প্রতি বর্ষণমোচিত নিন্দাবাদ বর্ষিত হলো। হেষ্টি এই চিঠিতে বলেন হিন্দু ধর্ম হচ্ছে আদিম পশু-মানবের পশু-প্রবৃত্তির জয়গান, এটা হচ্ছে "আত্মাকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করবার জন্য শয়তানের সুকৌশল সৃষ্টি"। এই ধর্মকে রক্ষা করছে ৩৩ কোটি দেব দেবী, যাদের সঙ্গে নরকের দৈত্য দানব ছাড়া অন্য কারোর সঙ্গেই তুলনা হয় না। হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে যে নির্লজ্জ অশ্লীলতা আছে, সেটা Homer Hesiod, Aristophanes, Lucian Ovid প্রভৃতির চেয়ে সহস্রগুণ বেশী। একটা নৈতিক কুষ্ঠ রোগ সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যকে আক্রমণ করে তার সর্বদেহে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতীয় হিন্দুরা তাদের পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছে লিঙ্গপুরাণের বীভৎস কল্পনা এবং বিপুল অশ্লীল সাহিত্যের পুঞ্জিভূত আবর্জনা।

এই পৌত্তলিকতা ও অসার ধর্মের জন্যই হিন্দুদের অধঃপতন ঘটেছে। এই জন্যই অপৌত্তলিক অভিযান-কারীদের কাছে তারা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এই জন্যই গোটা হিন্দু জাতটাই হয়েছে a mass of shrinking cowards, of unscrupulous deceivers of beastial idlers, of filthy songsters, of degraded women and lustful men"। এই

অন্যই এ দেশের শিক্ষিত মানুষের উচিত এদেশের পৌত্তলিকতা ও মিথ্যা ধর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে দাঁড়ানো। এই পৌত্তলিকতাটা যে জাতির পক্ষে কেবল অহিতকর, তা নয়। এই জিনিসটাই এদেশের মানুষকে শিখিয়েছে কামুকতা মিথ্যাচার অন্যায় অত্যাচার চৌর্য। এ সত্য। এই জিনিসটাই এ দেশের কোটি কোটি মানুষকে তাদের দেবতাদের আদর্শে সৎ রক্তের পাপে পাপী করে তুলেছে (It has taught the millions every possible iniquity by the example of these gods)। একমাত্র হিন্দুরাই আজও "নিরীহ" পৌত্তলিকতা ও তার আনুষঙ্গিক পাপের জন্য লজ্জা দিচ্ছে সমগ্র আর্য সংসারে হায় ভারতবর্ষ! হায় সত্যতার প্রভাতের সুন্দরী কন্যা! তোমার কী অধঃপতন! তোমার অতীত গৌরবের সিংহাসন থেকে নেমে এসে আজ তুমি কেন ও হীন জীবনের জননী হয়েছো!

এই চিঠিটির পর প্রকাশিত হল হেষ্টি সাহেবের চতুর্থ চিঠি ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে। তাঁর শিরোনামা ছিল "The ultimate philosophy of Brahmins".

আগের চিঠিগুলিতে আক্রমণ করা হয়েছিল সাধারণের মধ্যে প্রচলিত সাকার উপাসনা ও বহু দেব-দেবী-বাদকে। এই চতুর্থ চিঠিতে হেষ্টি আক্রমণ করলেন বেদান্ত দর্শনকে।

Monier Williams-এর লেখাকে প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করে তিনি বলেন ভারতীয় ব্রাহ্মণদের দর্শন বর্তমান জগতের কোনও প্রশ্নেরই সমাধান করতে পারে না বেদান্তের অর্থ বৌদ্ধদের শূন্য ছাড়া আর কিছুই না এবং "The Vedanta theory, if pushed to its ultimate consequences, must lead to the neglect of all activity, physical intellectual and of all self culture. If everything be God, then He and you and I must be one. Why should any effort be made for the advancement of self or for the good of others?

In this lifeless faith then, and not nearly in external climatic influences, do we find the ultimate explanation of historical dreaminess and inaction of the Hindus".

এই অর্থে হিন্দু-দর্শনের প্রতি চরম বিদ্বেষভাব করে হেষ্টি সাহেব বলেন "It is only christianity with its revelation of the Divine personality.....that can rationally take the place of the falling Brahminism"

হেষ্টির পক্ষ থেকে হিন্দু-ধর্মের প্রতি যথেচ্ছ আক্রমণ মূলক এই পত্র চতুষ্টয়ের কী ভাবে এলো নানা দিক থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রও এগিয়ে এলেন হেষ্টির প্রতিবাদে। ৬ই অক্টোবর তারিখে তাঁর প্রতিবাদ পত্রটি "The modern Saint Paul" এই শিরোনামায় হেরম্বচন্দ্রে প্রকাশিত হলো "রামচন্দ্র শর্মা"র ছদ্ম নামে বঙ্কিমচন্দ্র তখন ছিলেন উড়িষ্যার কটক জেলার জয়পুর-নামক স্থানে। এই চিঠিতে বঙ্কিম বলেন হেষ্টির যুক্তিধারা হচ্ছে অবশ্য ও ঘৃণ্য। এই রকম অসার প্রবন্ধের চেয়ে দুর্গা পূজার পণ্য-দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দিলে হেরম্বচন্দ্রের উপকার বেশী হতো। এই জাতীয় প্রবন্ধ লিখে পৌত্তলিক হিন্দুদের চক্ষে খৃষ্টধর্মের উৎসাহীতা আরও ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠলেন। যিনি বেদান্তের সঙ্গে হিন্দুধর্মের অভিন্নতা প্রচার করেন এবং আদ্য-পক্ষ সমর্থনে Monier Williams-এর সাহায্য নিয়ে হিন্দু ধর্মের "inner citadel"কে আক্রমণ করেন, তাঁর কার্যকলাপ দেখে আর একজন বীরপুরুষের কথা মনে পড়ে যায় যিনি দৈত্য ভ্রমে Wind-Millকে আক্রমণ করতে গেছলেন।

হেষ্টিকে বলি তিনি আমার উপদেশ নিন। তিনি সংস্কৃতের মূল শাস্ত্রগুলি পড়ুন, হিন্দুদের ষড়দর্শন, কাপিলভাষ্য গীতা, শাণ্ডিল্যের ভক্তি সূত্র প্রভৃতি পড়ুন, ইউরোপীয়দের কাছে নয়, কারণ হিন্দু-শাস্ত্র বোঝবার ক্ষমতা তাদের নেই, অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না। তাই হেষ্টির সহকারে হিন্দু-ধর্মে যাদের বিশ্বাস আছে, হিন্দু ধর্ম যারা বোঝে, এমন দেশী পণ্ডিতদের কাছে শ্রদ্ধা নিয়ে হিন্দু

শাস্ত্রাদি পড়া ও বোঝা—তার পরে তাঁর সঙ্গে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এখন তাঁর সঙ্গে আলোচনার অর্থ হচ্ছে যুক্তির বৃথা অপব্যয় মাত্র। যাঁর শাস্ত্র-জ্ঞান নেই, তাঁর সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে বাদ-বিতণ্ডার অর্থ হয় না।

পরের দিনই "The modern Ram Chandra" এই শিরোনামা নিয়ে হেষ্টির প্রতিবাদ-পত্র প্রকাশিত হলো। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মুখনিঃসৃত বাণীতে ভারত বীরেরা কর্ণপাত করছে না দেখে হেষ্টি সাহেব এবেলাতে ক্ষেপে গেলেন। তিনি বলেন সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃত শাস্ত্রে ভারতের চেয়ে ইউরোপ আমেরিকার পণ্ডিতরা অনেক বেশী বোঝেন। যা কয়েকশো বছর আগে বেদের সংকলন ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছিলেন, তখন বাংলার পণ্ডিতরা বলেছিলেন এ কাজ অসম্ভব। অসম্ভব শব্দটা হিন্দুদের অভিধানে যতটা গুরুত্ব নিয়ে থাকে, ইউরোপীয় অভিধানে ততটা গুরুত্ব নিয়ে থাকে। তবে হিন্দুরা যা পারেনি, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সেটা করতে সমর্থ হয়েছেন। এরপর হেষ্টি সাহেব বেদ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেন আমি বর্তমান রামচন্দ্রকে প্রকাশ্যে আহ্বান করছি তিনি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সাহায্য না নিয়ে বেদের এই সামান্য শ্লোকটির ব্যাখ্যা করুন। সময়টা পূজার ছুটির। আমি সময় দিচ্ছি। তাতেও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে যত দিন ইচ্ছা সময় নিন, আমি সভায় নিমন্ত্রিত চার হাজার পণ্ডিতদের নিয়ে ভারতীয় শাস্ত্র অনুসন্ধান করুন। তাঁরা না পারলে আমি তাদের বুঝিয়ে দেবো। ভারতবর্ষে তিন হাজার বছর ধরে অজ্ঞাত থাকার পর একজন ইউরোপীয় কর্তৃক এই শ্লোকটির অর্থ আবিষ্কৃত হয়েছে।

এ ছাড়া আরও অনেক রকমের পরীক্ষা আছে, যা দিয়ে শাস্ত্র-লেখকের পাণ্ডিত্য নিরূপণ করা যায়। আমি প্রস্তুত আছি। তিনি অস্পষ্ট নিন্দাবাদ (vague vituperation) ছেড়ে একবার জ্ঞানের পরীক্ষা দিন। এতে কৃতকার্য হলে ক্রমশঃ কঠিনতর প্রশ্ন করবো।

এই উদ্ধৃত পত্রটির পর আসে ১৪ই অক্টোবর তারিখে হেষ্টি "The challenge renewed" নামে আরও একটি পত্র লিখলেন। এই পত্রটিতে আগের পত্রেরই রেশ টেনে "ধনুর্ধারি" যুক্তিতে তিনি জানান রামচন্দ্র (অর্থাৎ চার হাজার পণ্ডিত) যে "to bend this bow of Western Jamka" এবং ব্যাখ্যা করতে ঐ শ্লোকটি। এ যদি না পারেন, তাহলে লজ্জা ও অপমানে নিজের মুখ লুকিয়ে রাখুন—এই হল হেষ্টির বক্তব্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় পত্রটি প্রকাশিত হলো ১৬ই অক্টোবর তারিখে "European version of Hindu Doctrines" এই নামে। এই পত্রটিতে বঙ্কিমচন্দ্র সুনিপুণ যুক্তিতে বুঝিয়ে দিলেন যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যকে তিনি অস্বীকার করেন না, কিন্তু প্রকৃত পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় শাস্ত্রের যথার্থ বুঝতে পারা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই জন্যই তিনি এক জন ভারতীয় পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করবার জন্য হেষ্টিকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

ঠিক পরের দিনই, অর্থাৎ ১৭ই অক্টোবর তারিখে হেষ্টির প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হলো "Ram Chandra Redivius" এই নামে। (তিনি তাঁর সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে রামচন্দ্রকেই শক্তিমত্তম বলে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি রামচন্দ্রকেই তাঁর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন) যাক, তাঁর এই চিঠিটিতে রামচন্দ্রের প্রতি বিদ্রূপটা কম ছিল না, তবে এই চিঠিতে হিন্দু ধর্মের প্রতি আক্রমণের তেজটা মোটেই ছিল না। হেষ্টি এই চিঠিতে জানালেন এই রামচন্দ্রটি হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে নূতন বাণী যা শোনাবেন, সেটা তিনি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন যাতে তাঁর উপযুক্ত সমাধান হয়। তিনি আরও জানালেন যে গত চিঠিটাতে রামচন্দ্র ছেলে মানুষ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের তৈলমর্দন করেছেন, তাতে তাঁরা কৌতুক বোধ করছেন।

এর পরে ২৮শে অক্টোবর তারিখে বঙ্কিমের তৃতীয় চিঠিটি প্রকাশিত হলো "The intellectual superiority of Europe" এই নামে। এটি ছিল প্রায় চার হাজার শব্দ যুক্ত একটি দীর্ঘ পত্র। ২৮শে, ৩১শে ও

১৮৭৯ অক্টোবর তারিখের ছেপ্সমানে তিন দিন ধরে এই পত্রটি ক্রমশঃ প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম মতটি সুস্পষ্ট হয়েছিল।

এই চিঠিতে প্রথমেই তিনি তাঁর পূর্ব বক্তব্যের সমর্থন করে বলেন যে ইউরোপীয়দের পক্ষে হিন্দু ধর্ম বোঝা কিংবা বোঝানো সম্ভব নয়। যিনি যে ধর্মাশ্রয়ী তিনি সেই ধর্মটা তিন ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তির চেয়ে ভাল বোঝেন এটা বলা বাড়তি কথা মাত্র। কিন্তু ইউরোপীয়রা এমনই সর্বজ্ঞতার দাবী করেন যে তাঁদের বেটার সম্বন্ধে জানে নেই, সেটা তাঁদের কাছে জানের বস্তুই নয়; তাঁদের শ্রীমুখের চালুনি দিয়ে যে সত্যটা নির্গত না হয় সেটা সত্যই নয়; যে মুদ্রায় তাঁদের টাঁকশালের ছাপ নেই, সেটা তাঁদের বাজারে অচল মুদ্রা। তাঁদের বাদে তাঁরা ছাড়া বাকী দুনিয়ার সব মানুষই হচ্ছে অসভ্য বর্বর মানুষ। ইউরোপের দেবদূতেরা তাঁদের উজ্জ্বল পাখায় ভর করে পশ্চিম দিগন্ত থেকে উড়ে এসে এ দেশে দুচারটে এ দেশেরই বৈদিক শ্লোকের টুকরো ফেলে দিলেই তবে এ দেশের অন্ধ চক্ষে আলো ফুটবে এইটেই তাঁরা মনে করেন।

অথচ এ দেশে এ বেদ সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের সীমাহীন অজ্ঞতার কথা একটা সাধারণ কৌতুকের ব্যাপার। সে সম্বন্ধে হাজার হাজার কাহিনী প্রচলিত আছে। একটির কথা বলি। একজন ইউরোপীয় নাবিক ক্লান্ত সূর্যাস্ত ও পিপাসিত হয়ে এ দেশে এক জন লোকের কাছে কিছু খেতে চাইলে সে তাকে একটি ডাব খেতে দেয়। তখন সেই নাবিকটি ডাবের খোসার উপর কামড় দিতে লাগল। দেশী লোকটা তাকে বুঝিয়ে দিতে চায় ডাব খাবার নিয়ম। কিন্তু সর্বজ্ঞ সাহেব বুঝতে চায় না। তাই ডাবের খোসার উপরই সে কামড় দিয়ে তার রস গ্রহণ করতে চায়। পরে ক্রুদ্ধ হয়ে দাতার মাথায় ছুঁড়ে মারে সেই ডাবটা। এই হলো তার ধর্মজ্ঞদের ভক্তী।

সময় থাকলে অন্ততঃ তখন অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারতাম কেন দেশী পণ্ডিতরা দেশী হবার জন্যই দেশের কাব্য সাহিত্য শাস্ত্রাদি বিদেশী পণ্ডিতদের চেয়ে দেশী ভাল জানে বুঝতে পারেন সব দেশ সম্বন্ধেই একথাটা সত্য কিন্তু সর্বজ্ঞ হওয়ার তাদের বুদ্ধিমত্তার মনে আমাদের কথা শুনতে চায় না, নারকেলের ছোবড়াতেই প্রচণ্ড কামড় দেয়, নারকেলের শাঁসে পৌঁছাতে পারেন না।

ধর্মীয় মতবাদ বুঝতে হলে দেশীয় পণ্ডিতদের সাহায্যের প্রয়োজনটা আরও বেশী হয়। কারণ সেই ধর্মে তাঁদের বিশ্বাস আছে বিশ্বাসহীন লোকের কাছে ধর্মের তত্ত্ব নিষ্প্রাণ সূত্র মাত্র। যে ধর্মের সঙ্গে প্রাণের যোগ নেই, তার ধর্মশাস্ত্রের পর পর অধ্যায়ের ক্রমে "এনাটমির" জ্ঞান খানিকটা হতে পারে, কিন্তু প্রাণ-তত্ত্ব বা আচরণ-তত্ত্ব-বিজ্ঞান তার কাছে তার কোনও মূল্যই নেই।

প্রত্যেক ধর্মই গড়ে ওঠে কিছুটা লিখিত শাস্ত্রের উপর, আর কিছুটা মেলে যায় পুরুষ-পরম্পরাগত অলিখিত জ্ঞানের উপর সেইটেই হচ্ছে ধর্মের 'ট্রাডিশনের' (tradition) দিক এর কিছুটা হচ্ছে গুরুমুখাৎ লভ্য। আগেকার দিনে প্রায়ই গুরুই তার বিদ্যার রহস্যটা নিজ নিজ শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত রাখতে চাইতেন। তার একটা কারণ ছিল স্ব স্ব অধিকার (trade secret এর মত) বজায় রাখবার চেষ্টা, আর একটা কারণ ছিল অনধিকারীর কাছে শাস্ত্র ব্যাখ্যা না দেবার যুক্তি। এতদ্ব বা অতদ্বকে পরম জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা। কবিরাজদের বিদ্যাটাই ধরা যাক। কবিরাজী এই পত্রে যা লেখা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যবহারিক জ্ঞানের কারবার চলে গুরুশিষ্যের মুখে মুখে। এই যে গুরু-পরম্পরাগত বিদ্যা, এইটাই লিখিত শাস্ত্রের শুষ্ক আস্থতে প্রাণের সঞ্চার করে। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে এই জ্ঞানটা সম্ভব নয়। তাঁদের হাতে আছে শাস্ত্রের শুষ্ক অস্থি। তাই নাড়া চাড়া করে বিকট নিনাদে তাঁরা জগতের সভ্য মানুষদের কান ঝালা পালা করে তোলেন।

বেদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের জ্ঞানের উৎকর্ষ স্বীকার করতে আমার কোনও দ্বিধা নেই। তার কারণ আছে। ভারতীয়দের কাছে বেদ হচ্ছে

মৃত শাস্ত্র। মৃত আত্মীয়কে লোকে যে ভাবে সম্মান করে, ভারতীয়রা বেদকে সেই ভাবেই সম্মান করে। তাছাড়া হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বেদের কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে বেদই সর্বস্ব। তাই বেদে ভারতীয়দের চেয়ে তাদের পাণ্ডিত্য বেশী। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ভারতীয় দেশের ভারতীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁদের তুলনাই হয় না। ভারতের ষড় দর্শন, বাংলার ন্যায় দর্শন, যেখানে রঘুনাথ শিরোমণি জগদীশ প্রভৃতি স্বাধীন গৌরব অর্জন করেছেন সে সব সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণ কিছুই জানেন না। বৈদিক দর্শন, যেটা ভারতে প্রথম সূত্রাকারে হয়ে ব্রাহ্মণ্য থেকে জৈন বৌদ্ধাদী প্রভৃতির হাতে বাড়ানো হয়েছে, তার সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের কোনও ধারণাই নেই। তন্ত্র শাস্ত্র ভারতীয়দের যে ভাবে প্রভাবিত করেছে, এমন আর কিছুই নয়। এই তন্ত্র শাস্ত্র সম্বন্ধেও ইউরোপীয়দের জ্ঞান নেই বল্লেই হয়। এমনকি লৌকিক শাস্ত্রও তাঁরা অনুবাদের মাধ্যমে পাঠ করে বিশেষ কিছুই বোঝেন না। বাবু চন্দ্রনাথ বসুর কাছে কালিদাসের শকুন্তলা সম্বন্ধে এক ঘণ্টা মাত্র পাঠ নিলে যা দেখা যায়, ইউরোপের সমস্ত অধ্যাপকদের কাছ থেকে (এমন কি 'গেটে'র বিখ্যাত সমালোচনা নিয়েও) তা দেখা যায় না। হিন্দুদের পুরাণাদির কাহিনী সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণ একেবারে অজ্ঞ। এগুলি তাঁদের কাছে উপহাসের জিনিষ। এই সব সম্বন্ধে 'পুনশ্চ'লির' লেখকের (কৃষ্ণের মুখোপাধ্যায়) প্রবন্ধগুলি পড়ার সঙ্গে পাঠ করলে এমন একটা জিনিষের সন্ধান পাওয়া যাবে, যার ঐশ্বর্য ও গাম্ভীর্য ইউরোপীয় সাহিত্যে দুর্লভ। এই ভাবে আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ইউরোপীয়দের যেখানে প্রাধান্য আছে, সেখানে অকপটেই স্বীকার করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়ে তাঁরা বিশেষজ্ঞ হয়েছেন বলে যেটা তাঁরা জানেন না, সে বিষয়ে পথ-প্রদর্শক হতে পারেন না।

ফেলিক্স ১৬ তারিখের চিঠিতে একটা ব্যাপারে আশ্চর্য বোধ করছি। তিনি আশা করেছেন তাঁর কাছে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে আমি explanation and defence দেবো। তিনি ভুলে গেছেন যে আমি প্রথম পত্রেই তাঁকে জানিয়েছি যে বর্তমানে তাঁর সঙ্গে বিতর্ক বিতণ্ডা আমার দ্বারা হতে পারে না। কারণ তার সে বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান পুঁজি নেই।

ফ. হিন্দু ধর্ম মনে করে না যে তার বিরুদ্ধে "চার্জসিট" তৈরী হয়েছে। তাছাড়া খৃষ্টানদের আদালতে তার বিচারটা করবে কে? সেটা এমন সাধারণ জিনিসও নয় যে একটা চিঠিতেই তা করা সম্ভব হবে। কাজেই হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে হিন্দুদের পক্ষ থেকে দুই একটা কথা যদি বলবো, যারা ইচ্ছা করেন তাঁরা হিন্দু ধর্মকে অর্ধচন্দ্র দেবার আগে সেটা পাঠ করে উপকৃত হতে পারেন।

অন্যান্য পরিপুষ্ট ধর্মের মতই হিন্দুধর্মের মধ্যে আছে মতবাদের (dogma) দিক যেটা দর্শনাদি শাস্ত্রের মধ্যে নিহিত আছে, আর একটা আছে পুরাণ ও কাহিনীর (legends) দিক। দর্শনের চেয়ে পুরাণের মূল্যটা কম হলেও এরই উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে হিন্দু ধর্ম। এটা সম্ভবত বেদোত্তর যুগের জিনিস এই পুরাণগুলিই হচ্ছে অতীত ও বর্তমানের হিন্দু ধর্মের সীমা।

হিন্দু ধর্মের প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই একটা নিজস্ব দর্শন আছে, সেটা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া আছে কতকগুলি নীতি যেটা সর্ব সাধারণের জিনিস। এই সব দর্শনগুলির মধ্যে একটা শাখা আছে, যেটা উত্তরকালে ভারতীয় ধর্ম-চিন্তার উপর সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে সেটা হচ্ছে সাংখ্য দর্শন। কপিল মুনিই এই দর্শন জগতের মধ্যে প্রথম প্রচার করলেন পুরুষ ও প্রকৃতির, অথবা জড় ও চেতনের (matter and soul) পার্থক্য।

এই তত্ত্বটি মনে রাখলে বুঝতে পারা যাবে যে হিন্দু ধর্মটা একটা জীবন্ত জিনিষ। সেটা ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে। এটা মৃত উপাদান নিয়ে কোন শিল্পীর হাতে তৈরী করা সামগ্রী নয়।

প্রকৃতি হচ্ছে nature। এই nature অভিব্যক্ত হয় শক্তির (force) মাধ্যমে। এই শক্তির দুটো দিক আছে, একটা সৃষ্টি মূলক, আর একটা ধ্বংস মূলক।

ধ্বংসাত্মক শক্তি হচ্ছে কালী এবং সৃষ্টি মূলক শক্তি হচ্ছে দুর্গা। বিশ্ব-আত্মাকে (Universal Soul) যে তিনটি গুণের মাধ্যমে চিত্র করা হয়, সেটা হচ্ছে goodness passion and darkness এই তিনটির প্রতিশব্দ দেওয়া যেতে পারে love, power and justice এই শব্দগুলি দিয়ে। Love সৃষ্টি করে, power রক্ষা করে, আর justice শাস্তি (doom) দেয়। এই শক্তিত্রয় হচ্ছেন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর। প্রাচীন বৈদিক দেবতাগুলি মরে গেলো, কিন্তু তাঁদের উপর নূতন দেবতা এলো। তার পর প্রাচীন ধর্ম্ম আক্রান্ত হলো বৌদ্ধদের দ্বারা তারপর 'বিশ্বের বাদ' (Pantheism), 'বহু দেবতাবাদ' (Polytheism), 'রহস্যবাদ' (Mysticism), 'দর্শন' (Philosophy) প্রভৃতির প্রভাব পড়লো। সকলের কাছ থেকে কিছু কিছু নিয়ে সকলকেই কিছু কিছু দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো হিন্দু ধর্ম্ম সমন্বয়ের পথ ধরে এটা ঈশ্বরের বাণীতে সৃষ্ট নয়, মানুষের অসাধারণ প্রতিভার সৃষ্টি।

এই যার পৌরাণিক কাহিনীর (legends) কথায় ফিরে আসা যাক। এখানেও প্রকৃতি (nature) ও পুরুষের (soul) ব্যাপার আছে। রাধা কৃষ্ণের কাহিনীর মধ্যে এই nature and soul এর লীলা দেখা যাক। এখানে কৃষ্ণ হচ্ছেন soul, আর রাধা হচ্ছেন nature,—সেই সাংখ্যের কথা। তবে সাংখ্যে বলা হয়েছে মানুষের চরম আনন্দ হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্পর্কের বিচ্ছেদের মধ্যে। সাংখ্য মতে এই মিলনটা পাপাত্মক। কিন্তু পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্ম বলে এই মিলনই আসল তত্ত্ব। জগতের সত্য সৌন্দর্য্য প্রেম সবই এই মিলনের মধ্যেই অভিব্যক্ত হয়েছে। সাংখ্য যে সত্যের সন্ধান পায়নি, পুরাণ সেটা পেয়েছে।

এই মতবাদ শুধু ধর্ম্মে নয়, সাহিত্যেও এসে পড়েছে কৃষ্ণায়নতত্ত্বের তত্ত্বটাই হচ্ছে এই Nature and Soul এর (পার্ব্বতী পরমেশ্বরের) মিলনের তত্ত্ব। এ মিলন হচ্ছে পবিত্র মিলন। কবি এখানে দার্শনিক ও পৌরাণিককে ছাপিয়ে গেলেন। বঙ্কিম দেখিয়েছেন "...the yearning of the physical and human for the moral and the divine and the accomplishment of this union after purification through the sacrifice of earthly desires and the discipline of the heart..... the sacrifice, the destruction of 'Kama'.. still remains the loftiest in all Indian literature"।

এইবার পূজার কথায় আসা যাক। প্রতিমা পূজাটা হিন্দুদের একটা পৌত্তলিক অনুষ্ঠান মাত্র (a mere mummery) কিন্তু খৃষ্টান মিশনারিরা মনে করে, এইটেই হচ্ছে হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্মগত। এটা মর্ম্মগত ত নয়ই, এটা একটা আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানও নয়। হিন্দুর সন্ধ্যা আহ্নিকটা প্রতিমা পূজার ব্যাপারে নয়। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে নিত্য পূজা করতে হয়। কিন্তু সেটার জন্য প্রতিমা পূজা না করলেও ক্ষতি নেই। কোনও ব্যক্তি জীবনে মন্দিরে না গিয়েও নিষ্ঠাবান হিন্দু বলে পরিগণিত হতে পারেন।

প্রতিমা পূজার মধ্যে শিশুদের পুতুল নিয়ে খেলার মত একটা ব্যাপার আছে বলে হেষ্টি সাহেব মন্তব্য করেছেন। এ মন্তব্য ভ্রান্ত ও হাস্য। মানুষ স্বভাবশিল্পী। শক্তি সৌন্দর্য্য পবিত্রতা প্রভৃতির জন্য মানুষের কামনা রূপায়িত হয় তার কাব্যে এবং শিল্পে। এই হিসাবেই দেবত্বের একটা কল্পনা রূপ নিয়েছে প্রতিমার মধ্যে। এই হিসাবে হ্যামলেট বা প্রমিথিউস্ নাটকও যেমন সার্থক, দেবদেবীর কল্পনায় প্রতিমাও তেমনই সার্থক।

হিন্দুরা যে প্রতিমাকেই দেবতা বলে মনে করে—এই ভুল চিন্তাটা কেউ যেন না করে। দেবতা এবং এবং দেবতার প্রতিমা এই দুটো যে পৃথক জিনিস, এটা সকলেই জানে। যতক্ষণ না প্রতিমার মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, ততক্ষণ প্রতিমাটা বাজারের পুতুলের চেয়ে পবিত্র জিনিষ নয়।

হেষ্টি বলেছেন হিন্দুদের দেবদেবীর প্রতিমাগুলি বীভৎস-দর্শন; এ কথাটা যদি সত্যও হয়, তাহলে সেটা হবে শিল্পের কথা, ধর্ম্মের কথা নয়।

এইবার হিন্দুদের নীতি-দর্শনের (ethics) কথায় আসা যাক। হিন্দুদের এই শাস্ত্রটি ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে পৃথিবীর কোন সমাজেই এর তুলনা নেই, খুব সমাজেও নেই। হেস্টি প্রভৃতি অনেকে মনে করেন হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রের এই উচ্চ আদর্শটা খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। অদ্ভুত যুক্তি। আমার দাঁত জুঁই ইলিশে খেতেন। সুতরাং যত লোক জুঁই ইলিশে চলে, তারা সকলেই আমার কাছ এটা যেন এক জাতীয় যুক্ত। হিন্দুদের সমাজ-নীতিটা আরও উচ্চ স্তরের ছিলো। এই দেশেই নীতি-দর্শনটা শক্তি বা শাসন ব্যবস্থার বলে প্রায় সম্বন্ধে (moral power) সমাজ নিয়ন্ত্রণের কাজে লাগিয়েছে। এই দেশেই নীতি-দর্শনটা দুষ্ট ও সামাজিক শক্তিকে বর্জন করেও মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

ঊনবিংশ শতকের গতীয়ন চিন্তানায়কদের যেটা সাধের স্বপ্ন সেই Positive Polity এবং Intellectual Hierarchy হাজার হাজার বছর আগে যখন কাস্ত-বর্ণে প্রতিষ্ঠিত এবং সার্থকতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তখন ইউরোপীয়রা সুদূরতম কল্পনা দিয়েও সেটা ভাবতেও পারতেন না।

এখানেও একটা কথা স্মরণীয়। হিন্দুধর্মের মতে কতকগুলি বিধিনিষেধ হচ্ছে essential এবং কতকগুলি non-essential। আপেক্ষিকের কথাটাও non-essential। হিন্দুদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে যারা আপেক্ষিকের মানেন না। বৈষ্ণবরাও আপেক্ষিকের মানেন না।

মিষ্টার হেস্টি হয়ত বললেন "তুমি হিন্দু ধর্ম থেকে তার আচার অনুষ্ঠান বাদ দিচ্ছো, তার প্রতিমা পূজা বাদ দিচ্ছো, তার আপেক্ষিকের বাদ দিচ্ছো, তাহলে তার রইলো কি? রইলো শাঁসটুকু, আমি ছোবড়াটুকু বাদ দিয়েছি।

আমার বক্তব্য শেষ হয়ে এলো। হেস্টি সাহেব পাশ্চাত্য অনেকের মত যীশুখ্রীষ্টের জন্য আমাকে আহ্বান করেছেন। বর্তমান রামচন্দ্র কানাই অঙ্গুলি দিয়েও সে বস্তু স্পর্শ করবে না। রামচন্দ্রকে তাঁর বীরত্বের জন্য পুরস্কার দেবার মত মানুষ নেই বর্তমান জনতের। বর্তমান মানুষ অর্থাৎ সভ্য, তাকে অন্যভাবে পেতে হবে যেভাবে আমরা বাল্মিকীকে পেয়েছি, সেটা যেন বিদেশ আসরে স্কুলের ছেলেদের উৎসাহিত করার ব্যাপার। সেটা হেস্টি সাহেব বা আমার পক্ষে মানায় না।

এ হেস্টি বলেছিলেন তিনি আমার জন্য পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞদের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করে দেবেন। তিনি ভুল করেছেন এ বিষয়ে আমার লোভ নেই। এ স্বীকৃতি আমাদের দেশের কিছু কিছু লোক পেয়েছেন। আমি হেস্টিকে জানিয়ে দিচ্ছি গত ২০ বছর ধরে আমি আমার দেশবাসীর কাছ থেকে যতটুকু স্বীকৃতি পাচ্ছি। ঐটুকুই আমার সান্ত্বনা। যে মালা হেস্টি সাহেব আমার গলায় দিতে চাইছেন, সেটা আমার মত মূঢ় গর্ভ লোকের মানায় না। হিন্দুরা পূর্ব জন্মেই মালা দেয়, মৃত জন্মে দেয় না।

আমি মেটমুয়ান সম্পাদকের কাছে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার চিঠির জন্য তিনি পাদটীকা যোগ্য দিয়েছেন বলে। হেস্টির জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। তিনি হাত দেখে-ছিলেন যার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছেন, তিনি একটা হোম্‌রা চোম্‌রা ব্যক্তি হবেন এবং তাঁকে পরাজিত করে হেস্টি সাহেব তাঁর মরিচা পড়া তরবারিতে নূতন ধার দেবেন। এখন তিনি হতাশ হলেন তবে হিন্দুধর্মের দুর্গদ্বারে তিনি তাঁর রণদুন্দুভির উচ্চতর ও কর্কশতর ঝঙ্কার তুলুক, হয়ত নূতন প্রতিযোগিতার সন্ধান পাবেন, হয়ত windmill আক্রমণের গৌরবও।

• • •

এই চিঠিটি পাঠাবার পরও হেস্টি সাহেব নিরস্ত হলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠির প্রতিবাদ প্রকাশিত হলো একটি দীর্ঘ চিঠিতে। ২৮শে ও ২৯শে অক্টোবর এবং ২রা নভেম্বর Intellectual inferiority of India এই শিরো-নামায় পত্রটি প্রকাশিত হলো। হেস্টি এই চিঠিতে রাম-চন্দ্রের মূর্খতা নিয়ে নানা রসের বিস্তার করলেন এবং জোর গলায় প্রচার করলেন তাঁরই পূর্বতন মন্তব্য, অর্থাৎ এদেশীয় পণ্ডিতদের চেয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা এদেশের ধর্মতত্ত্বটা যে বেশী বোঝেন এই তত্ত্বটাই অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে

ব্যাখ্যা করা হলো। হেষ্টি বলেন হিন্দুদের সাংখ্য প্রকৃতি দর্শনগুলির উদ্ভব হয়েছে প্রগতিশীল গ্রীকদের অনুকরণে। হিন্দু ধর্মের মধ্যে সার পদার্থ কিছু নেই, আছে শুধু ছোবড়া এবং শুষ্ক কঙ্কালের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টাটা হচ্ছে পণ্ডশ্রম মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র এই পত্রটির আর প্রত্যুত্তর দেন নি। ২৮শে অক্টোবর তারিখের চিঠিতেই তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করে ছিলেন। তা'ছাড়া "কাদার হোলি খেলার" বঙ্কিমের মত সুরুচি-বোধ যুক্ত মানুষ হেষ্টির মত লোকের সঙ্গে বেশী দিন লেগে থাকতে পারেন না।

এর পর ১৪ই নভেম্বর তারিখে রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে 'The Recent Controversy" নামে একটি চিঠি পাঠান। তাতে তিনিও হেষ্টির সম্বন্ধে বঙ্কিমের মন্তব্যটায় ভুল সাক্ষ্য করেন। ফলে বাধ্য নভেম্বর তারিখে বঙ্কিমকে আরও সমর্থনে নামতে হয়। রেঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পত্রে রামতনুকে "কপালি কুণ্ডলার" লেখক বলে উল্লেখ করে ছিলেন। কাজেই বঙ্কিম আর ছদ্ম নামে গোপন থাকতে পারলেন না। তবে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের প্রতিবাদে তিনি দেখিয়ে ছিলেন যে একটা বিশিষ্ট মতবাদ একটা জাতিকে প্রভাবিত করেছে বলে সেই মতবাদটা ঐ জাতির ধর্মের মৌলিক জিনিষ মনে করাটা অত্যাবশ্যক নয়। "পেগানি" ধর্ম (Peganism) গ্রীসকে প্রভাবান্বিত করেছে বলে এই কথা বলা হয় না যে পেগান ধর্ম গ্রীসের খৃষ্ট ধর্মের মৌলিক জিনিষ। ইসলাম ধর্ম, এমন কি খৃষ্ট ধর্মও ভারতকে খুব প্রভাবান্বিত করেছে। এর মানে এই নয় যে এ দুটি ধর্ম ভারতের হিন্দু ধর্মের মৌলিক জিনিষ। তাত্ত্বিকতা ও হিন্দু ধর্ম এক জিনিষ নয়।

চুলোয় যাক তাত্ত্বিকতা। কিন্তু সেটা সম্বন্ধে আমরা কিছু জানবো না, এমনটা ঠিক নয়। গভীরতম ভ্রান্তি সম্বন্ধে জ্ঞানটাও সত্য সম্বন্ধে জ্ঞানের মতই মূল্যবান্। বস্তুতঃ মানুষের ইতিহাসটা কি জিনিষ? এটা কি মানুষের ভুলের ইতিহাস নয়?

মিঃ হেষ্টি, "তাত্ত্বিকতার বাইরের" বলে যে খোঁচাটা দিয়েছিলেন, সেটা প্রতিবাদের অযোগ্য বলেই তার উত্তর দিই নি, তবে বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই যদি আমাকে ভুল বোঝেন, তাহলে তাঁর উত্তর না দিলে অন্যায় হয়।

এখন আর আমার ছদ্ম নামের প্রয়োজন নেই। কাজেই আমি স্ব নামেই স্বাক্ষর করছি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* * *

আজ থেকে ৮৫ বৎসর পূর্বে বঙ্কিম-হেষ্টি মসী-যুদ্ধের সংবাদে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা আজ আমরা ঠিক অনুভব করতে পারব না। তবে আজও বঙ্কিমের এই পত্রগুলি থেকে শুধু বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেই নয়, হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধেও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

'মানুষের জন্য ধর্ম এবং ধর্মের জন্য মানুষ—দুই-ই সত্য হইতে পারিত যদি ধর্ম বলিতে বিশেষ কোন ধর্ম না বুঝাইয়া সর্বধর্মসমন্বয়ই বুঝাইত। সর্বধর্মসমন্বয়ই মানুষের স্বধর্ম। প্রতি মানুষ এই হিসাবে স্বধর্মী, সর্বধর্মী। .....ইহাও সত্য যে প্রত্যেকটি ধর্মই স্বয়ংপূর্ণ, উহা ঐ সম্প্রদায়ের সকল স্তরেরই আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও তুল্যভাবেই সত্য যে, কোনও বিশেষ দেশ-কাল-পাত্র বা বিশেষ দৃষ্টিকোণের মধ্যে সমগ্র মানবসমাজকে, এমন কি কোনও বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানুষকেও আটকাইয়া রাখা যাইবে না। সব বিশেষত্বকে ছাপাইয়া অখণ্ড বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানব ও মানবসমাজ আগাইয়াই চলিয়াছে, চলিবেও।'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-কৃত মহাত্মাজীর গঠনকর্ম পদ্ধতি

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৭০)

নিত্যগোপাল, সাগর, আমি নদী হয়েও তোমায় বল সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারলাম না...মানুষকে বোঝাতে পারলাম না আমার কথা...মানুষের দুর্গতি দুর্বুদ্ধি ঘোচাবার জন্ত কতই তো চেষ্টা করলাম...। একলাই হয়তো যাব—কেউ হয়তো সেদিন সঙ্গে থাকবে না! আমার মত গীতাকে ভালবেসে কে নিজের সবটুকু পরিত্যাগ করে শরণাগত হবে? নিজের খোলসটুকুই পরিত্যাগ করতে পার না...। ব্রজগোপীরা উপনিষদ্ পড়েন নি, ওঁরা মূর্খ ছিলেন, কিন্তু শরণাগত হতে তো আটকায় নি!...নিত্যগোপাল, আমায় নিরাবরণ কর, আমায় দিগম্বর কর...আমি যা তাই হয়ে তোমার কাছে যাই...আমি ব্রহ্ম রূপ, ব্রহ্ম স্বরূপ ...গীতা,...নিত্যগোপাল-জননী গীতা...গীতা তো মন্ত্রের দেহ—অযাচিত করুণায় তুমি এক বিশেষ অর্থ নিয়ে আমার জীবনে প্রকাশিত হচ্ছে...,আমায় বল দেও...। আঘাতে আঘাতে এক একবার মুষড়ে পড়ি—আবার বল পেয়ে উঠি। এই আশা নিরাশায় দিন যায়...। ঠাকুর, আর কিছু যদি আমার করবার না থাকে আমায় বিদায় দাও...অনেকের অনেক সেবা নিয়ে ধন্য হয়েছি...আর ধন্য করতে দিও না...তাদের যদি কিছু করতে না পারি, আমি যাকে মানুষ হওয়া বলি—নিত্যগোপাল-তত্ত্ব ও জীবন আয়ত্ত করা—তাই যদি তাদের গ্রহণ করাতে না পারি তাহলে তাদের সেবা নিতে আমার প্রাণ চায় না...। ঠাকুর, এরা মন্ত্র নিয়েছে কিন্তু নিত্যগোপাল সম্বন্ধে এরা কত কম জানে...এরা কেন আছে—আমার তো দিন চলে যায় না...। বোঝা ছিলাম, কেনই বা কথা দিলে যদি সে কথা মানুষকে শোনাতে না পারি...। আমি তো মুখ দিয়ে কথা বলি না—আমি রক্ত দিয়ে, আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে কথা কই...। মা, গীতা,...আমার সকল জীবনের প্রণাম গ্রহণ কর...। মা, ধরার ধূলিকে ব্রহ্ম-ধূলি করতে পারলাম না—ব্রহ্ম-মানুষ কোথায়? মানুষই হতে চায় না—কে শরণাগত হতে চাইছে?.. নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল, আমার বেদনার ঠাকুর, আমার কান্নার ধন,...আমার সকল জীবন-মরণ ধন, আমার দুঃখ-সুখন ধন..নিত্যগোপাল, সব হারিয়ে তোমায় পেয়েছি—তুমি আমার, তুমি আমার...।

১৭, ১২, ৪৮। ওঁ নমো... ওঁ। ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য দেবহুতিকে ভগবৎ প্রাপ্তির স্বরূপ বলতে গিয়ে বলেছেন, পুরুষ এবং কালের সমন্বয়ই ভগবান। পুরুষ হল অন্তর্মুখী গতি, কাল বাইরের শক্তি—এই বাইর ও ভিতরের সমন্বয়ই ভগবান। ভগবৎ-ভজনা করতে হলে এ দুটোর সমন্বয় সাধন করতে হবে। জীবমাত্রই একটা জাত যারা কালকে অস্বীকার করেছে তাই কালের কাছে সে মার খাচ্ছে, তাই বাইরের শক্তির কাছে সে পরাজিত হচ্ছে...। যথাসময়ে না পড়ে ডিসেম্বর মাসে রাত তিনটা পর্যন্ত পড়লে তার প্রতিক্রিয়া কাল হয় না...। যথাসময়ে না খেয়ে বেলা তিনটায় খেলে বিষতুল্য হবে...। সময় রক্ষা করার কোন বালাই তো আমাদের নাই-ই...। আজ আমাদের কালের মর্যাদা দিতে শিখবার দরকার আছে।...এ দেশ ব্রহ্ম ব্রহ্ম পুরুষ পুরুষ করেছে, কিন্তু কালের কাজ কালে করে নি।...নরনারায়ণ আত্মার যথা কালে...যথা দেশে কাজ করবার কথা বলছে।...কাজের সময় থাকবার সময়...সবই সময়মত করতে হবে...। কর্মক্ষেত্রে ব্রহ্মকে আস্বাদন করতে গেলে পূরা সংযম দরকার।...বেড়া বাঁধতে বাঁধতে ১টা ২টা বেজে গেল...

কাজ করতে করতে তিনটায় খাওয়া। কোনমতে বয়দাস্ত করা যায় না।...পাশ্চাত্য কখনও সময়কে লঙ্ঘন করে না...বয়সের কালে না পড়লে আর সে সময়কে পাওয়া যাবে না...ভারতবর্ষ কালের অপমান এত বেশী করেছে যে তার প্রায়শ্চিত্ত যে কেমন করে করবে বুঝি না...। কে এদের শেখাবে কালের মূল্য দিতে?...সারা জীবনে ১৫। ২০ হাজার বক্তৃতা দিয়েছি—একদিন late করি নি...। একদিন ঘটনাচক্রে রাণাঘাট থেকে বনগাঁ লাইনে যশোর যেতে হিসাবের ভুলে ট্রেন ধরতে পারি নি—যে প্ল্যাটফরম থেকে ট্রেন ছাড়ল আমি তার থেকে এক প্ল্যাটফরমে অপেক্ষা করছিলাম—ষ্টেশনের অনেকের কাছে ক্ষমা চেয়েই সেখানে ছিলাম...। কালের কাছে অপরাধ আমি করি নি...। কালের মর্যাদা দিতে পারলেই শৃঙ্খলা বোধ আসবে, জিনিষ যথাস্থানে রাখা, গুছিয়ে রাখা—বা এখানে পড়ে রইল...কীর্ত্তন করে বেলা তিনটায় যাওয়া...এগুলি বদলাতে হবে।...অন্ততঃ আমি চেষ্টা করব—কিন্তু সকলে মিলে চেষ্টা না করলে তো হবে না...। কাল ভগবানের একটা factor...। অমুক দিন এ কাজ করবে, এ রকম করে ব্যবস্থার একটা অর্থ ছিল একদিন অবশ্য কিন্তু ঘটনার অন্য রকম হতে পারে—আমাদের শৃঙ্খলা বোধ একেবারে নাই...। আবার শৃঙ্খলা আনতে গিয়ে যান্ত্রিক হয়ে যেতে হবে—তা নয়; চালাতে করতে গিয়ে যেমন বিশৃঙ্খল করা চলবে না, আবার শৃঙ্খলা আনতে গিয়ে যান্ত্রিক হলে চলবে না...। সময়-মত স্নান খাওয়া পড়াশুনা করতে হবে...। অসময়ে খেলে শরীর খারাপ হয়, কর্ম্মের প্রবণতা থাকে না...। কালকে মর্যাদা না দিলে কাল হাতছাড়া হয়ে যায়...জানুয়ারী মাসই তিনের মাস অর্থাৎ পরীক্ষার মাস মনে করে যে ছাত্র লেখাপড়া মন দিয়ে করল না—সে আর কূল পাবে না, তার কাছে কাল যম হয়ে আসবে। মানুষ যদি শৃঙ্খলা মেনে চলত তো সংসার কত সুন্দর হতো। ভারতবর্ষে সংসার চলছে না, চলছে হরি ঘোষের গোয়াল।...রাজা হয়ে বসে আছে, এগারটায় আপিস যায় না...। কথায় সংযম আনতে হবে...কথা কইলে কাজ নষ্ট হয়...। সকলের সমস্ত ব্যাপারে যাওয়া, যেটা নিজের কাজ নয় তারও মধ্যে মতামত প্রকাশ করা নিতান্ত অপ্রয়োজন ও অসুবিধাজনক...। লণ্ডন শহরে রাস্তার কিন্তু খুব কিছু টু শব্দ নেই...আর আমাদের ৫০ জনকে খাওয়াতে হৈ হৈ, বিশৃঙ্খলা।...আমাদের অনুষ্ঠানের কি চেহারা—আর নিতান্তগোপাল একজন সমাধিস্থ মানুষ হলেও তাঁর ঘরে ঢুকলেই বোঝা যেত কি গুছানো!...ঐ ছোট মেয়ে দুটি বই খাতা কিছু গুছায়?...আগামী শনিবার (স্বামিজীর জন্মতিথির দিন) যাতে ১২টার খাওয়া শেষ হয় তার ব্যবস্থা করতেই হবে...। তোমরা কিন্তু ঘরে নেই...তোমরা রাস্তায় আছ—তোমাদের চারদিকে দেওয়াল নেই...বহু লোক আসবে—নানা রকম লোকের নানা রকম ঘটনা...আজও আমি আছি, একদিন থাকব না...। রসরামপুরে বিদ্যোৎসাহী বলেছেন, আশ্রমেরটা দেখে লোকে শিখবে।...সংসারে গোঁজামিল দিয়েও চলবে, এখানে গোঁজামিল দিয়ে একেবারেই চলবে না—এখানে ছন্দ বজায় রেখে চলতেই হবে। বেদ মানে ছন্দ। এখানে সংসার নয়—তবু সংসার—দশজনে মিলে জীবনযাপন করাই সংসার...। আজ আমি কর্ত্তা, একদিন আমি কর্ত্তা থাকব না...আমি থাকতে থাকতে এ সংসারে চলবার কৌশল শেখো।...সংসারে গণ্ডী আছে, এখানে কোন গণ্ডী নেই...এখানে চলতে ব্যক্তিগত খেয়াল ছাড়, মেজাজ ছাড়—নিজেদের শুরুভাইবোনদের মধ্যে মিলন ও পথচলার ছন্দের উপর তোমাদের অস্তিত্ব—সংসার থেকে কোন সুযোগ তোমরা পাবে না—এই সব মনে রেখে চলবে।

১৯, ১২, ৫৬।...উপনিষদে ঋষি প্রার্থনা করছেন, 'তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময় অসতো মা সৎ গময়'...। গময় মানে পাওয়াও...আবিরাবি...। নচিকেতা মৃত্যুর মধ্যে অমৃত খুঁজে ছিলেন—মরণের বুক চিরে অমৃত...। আমার সারা জন্মের ইতিহাস এই—১৯১৯-এ যেদিন বেরিয়েছিলাম সেদিন সামনে ছিল অন্ধকার—কোন সম্ভাবনা আমার সামনে ছিল না, কেবল বুকের মধ্যে ছিল অপরিসীম প্রেরণা, সংকেত কিংবা

সেটা কী জিনিষ?...অন্ধকারের মধ্যেও আলো আছে, নইলে গভীর অন্ধকারে বেড়াল প্যাচা দেখে কি করে?... সূর্যকে দেখে মানুষ পথ চলে—সূর্য ডুবে গেলে চাঁদ দেখে পথ চলে—চাঁদ না থাকলে তারকা দেখে মেষাজ্ছন্ন দিনে অগ্নি নিয়ে—কষ্টে আগুন নিভে গেলে বাক্য—শুকবাক্য।—সব নিভে যায়...নিভে না এমন কিছুও তো আছে—সে আলো জীবনের বাইরেই নয়।...জীবনটাকে একরকম করে গুছিয়ে নিলে হয় আলো, অন্য রকমে সাজালে তাই-ই হয় অন্ধকার। সব নিভে গেলে শুরু যাত্রা—তাঁর সেই বাণী 'ভয় কি টেনে তুলব'—সেই বাক্যের আলোয় পথ চলি...কোনো মানুষ কৃপা ছাড়া নেই...। কারো ওপর চাপও সেই নি—কারো চাপও সহ্য করি নি...।...জীবনে দেখেছি গেল গেল সব গেল, সব গেল, আর বুঝি পথ নেই—আকাশ দেখি দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল। এসেছে জ্যোতির্ময়ঃ—তিনি তো এসে বসে আছেন...। সব নিভে যাবে, সব ছেড়ে যাবে থাকবে শুধু সেই বাণী—'সঙ্গে সঙ্গে আছি'—সেই বাণী আমায় ছাড়বে না—সারাটি ধরণী খুঁজে দেখি তিনি আমার মধ্যে এসে আছেন'...জটিলতার বাইরে আলো খুঁজিনি...আশৈশবগত সমস্ত রকম জটিলতাকে মেনে নিয়েই ব্রহ্মজ্ঞানে স্থিতি লাভ করবার প্রয়াস করেছি... বন্ধনের মধ্যে মুক্তি খুঁজেছি...। ইউক্লিড অ্যামিতি বলে দুটি বিন্দুকে যোগ করলে সরল রেখা হয়—আজকের অ্যামিতি বলে বিশ্বকে স্বীকার করাই সরল রেখা (উদ্ভোধন-ভারত পৌষ ১৩৬৩ তে বের হবে)। নিজের জীবনের বাইরে যা-কিছুকে দেখবে, তাই তোমায় পরাস্ত করবে। সমস্ত কিছু ঘটনা বা মানুষকে নিজ বলে দেখ...। বিশ্বকে যেখানে নিজ বলে, আত্মা বলে দেখতে বলা হচ্ছে সেখানে এইখানে যে কয়জন আছে তারা পরস্পরকে আত্মা বলে মনে করতে পার না?...অন্ধকারের যাত্রী আমি...আমার জীবনে একটি মাত্র কথা—যেখানে এক, একত্ব সেইখানে আলো...বিচ্ছিন্নতাতে, বিভেদে, সকল থেকে নিজেকে সরিয়ে আনাতেই অন্ধকার। এক রকমের জীবনের বিন্যাসে আলো জ্বলে—আর এক রকমের বিন্যাসে অন্ধকার...। এইখানেই তো আলো আছে—আলো খুঁজতে যেতে হবে আকাশে? কিংবা দূরে কোথাও? এইখানেই আছে।...অন্ধকারের মধ্যে আলোর উপাসক আমি...। কলিতে সব পচে গেছে—নীল পচলে তো গাঢ় হবে?—এই সব পঙ্কের মধ্য দিয়ে নূতন জীবন অঙ্কুরিত হয়ে উঠবে...। হেগেল বলেছেন মরণের মধ্যে জীবন আছে... Die to live...। রবীন্দ্রনাথের সেই গান 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো...' (স্বামিজী কি চমৎকার ব্যাখ্যা করলেন!)... মাতৃগর্ভে অন্ধকারে ছিলাম—সেই অন্ধকার থেকে জীবন আলো পেয়েছি—যেখানে মৃত্যু সেইখানেই মিলন—এক রকমে কবর হয়—আর এক রকম করে নিয়ে সেইখানেই মিলন...। নবদ্বীপে ঠাকুরকে বলেছিলাম, ঠাকুর, সংসার থেকে আমায় ছুটি দাও। বললেন, 'সংসারে যাও, কাজ আছে'।...আঘাতে আঘাতে আমি জর্জরিত...তবু আমি এরই মধ্যে আছি।...আমি সহ্য করব, আমি ধৈর্য ধরে চলব...। পথের ধূলায় রক্ত পেতে রয়েছে যেই পথ সেই তো তোমার গেহ...। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই আছে রাজা হতে হলে পথের ধূলায় নামতে হবে...,রাজরাজেশ্বর এলেন ধরার ধূলায় ...চিৎলোকের ব্রহ্ম শরীর ধরাবে... ছোট মানুষকে ভালবাসতে চেয়ে ছিলাম, পারলাম না...। মানুষকে খুঁজছি, ডায়োজেনিসের মত খুঁজছি...। ভগবান পেলাম, মানুষকে পেলাম না। মানুষ বড় নিষ্ঠুর—মানুষ আমার ভগবান।...সংসারের কোন সুযোগে আমি নেই নাই—ভলটিয়ারের সাথে ঘুরে বুঝি খেয়েছি...অর্থের পথে সুযোগও নেই নি, ধর্মের পথেও সুযোগ নেই নি...। নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল...। যদি কেউ এতটুকু আমাকে ভালবাসে, তবে সে যেন সকলকে ভালবাসে.....।.....চিৎ-এর স্বরূপ আমি ভালবাসি; আত্মা যখন মাটিতে মনরূপ নিল, তখনই পুরুষোত্তমের প্রকাশ।...আমি অফুরন্ত আদর পেয়েছি, অফুরন্ত অনাদর পেয়েছি...দুটো দিকই প্রচুর পেয়েছি...। এরই মধ্য দিয়ে ৭৩ বৎসর শেষ করতে বসেছি...। নিত্যগোপাল, তোমার বাণী, তোমার জীবন কি

মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবে...? তোমায় যেন না ভুলি...। সচিদেতায় গুরু হবে, আমার গুরুও হবে...। গরলের ঝি দিয়ে (উপদেশের) মাখিয়ে জীবনকে আস্বাদন করতে হবে।...নিত্যগোপাল আমার স্মরণ দেবতা... শিশুকাল হতে চিরকাল আমি কালো বরণ ভালবাসি...। অন্ধকারের লাঞ্ছনায় দেখতে তুমি, আমার দুঃখনিবারণ, আমার অন্ধকার নিবারণ...নিত্যগোপাল, সংসারে আমার স্থান নেই, সন্ন্যাসে আমার স্থান নেই—আমায় একেবারে আলাদা করে দিলে...আমার তোমার চরণে স্থান দাও... ধরার ধূলি হোক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম-মানুষ... জগন্নাথ নিত্যগোপাল...।

২০, ১২, ৫৬। ওঁ নমো ভগবতে...। উপনিষদ শুনিয়েছেন, অসতের সোনা ইদমগ্র আসীৎ—অগ্রে—এই সৃষ্টির অগ্রে অসৎই ছিল—ততো বৈ সৎ অজায়ত—সেই অসৎ হইতেই এই সৃষ্টি। কাল রবীন্দ্রনাথের যে লেখা আলোচনা করেছি, তাতেও তাই—সকল সৃষ্টির গোড়ার কথা নিজের না-থাকা...। সকল না-থাকার ভিতরে যে থাকা সেই তো থাকা।...কোন এক জায়গায় না-থাকাটা আস্বাদন করতেই হবে—নিজেকে সেখানে মুক্ত করে দিতে হবে—বুদ্ধদেবের আমার শূন্যতা...। যদি কারো থাকতে হয় তবে একটা জায়গায় না-থাকার অভ্যাস করতেই হবে।...একদিন মাতৃগর্ভে না-থাকার অবরোধ ছিলাম—সেই অবস্থাকে জ্ঞানে আর আস্বাদন করতেই হবে...। ভগবানের কাল হতে গেলে ভগবানের থাকায় থাকতে হবে। নবনারায়ণ আশ্রম এই থাকার কথা বলতে এসেছে।...সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে কাল সেই তো তোমার কাল...। দ্বন্দ্ব অর্থ বিরোধ, দ্বন্দ্ব অর্থ মৈথুন।...মানুষের থাকা নিয়েই বিড়ম্বনা...। এই না-থাকার অভ্যাস করতে হয় শ্রদ্ধায়, অর্থাৎ তোমার না-থাকা মানে শ্রদ্ধার সঙ্গে তুমি নিজেকে বৃহতের মধ্যে স্থাপন করছ...। অর্জুনের কর্মী-আমির অহঙ্কার ছিল—ভগবান সেইটুকু চাইছেন।...যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হও—তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার মত অবস্থা যদি জীবনে না আসে তাহলে তুমি তো তোমায় খুঁজে পাবে না—সংসারের আগাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়বে—মনপ্রাণশরীর আর থাকে না...। পেশাদারী কীর্তন, পেশাদারী সাধনা...পেশাদারী দীক্ষা...এ আমি চাই না...। কোন কাজে কথায় বা কিছুতে নিজে কোনদিন ফাঁকি দেই না... মানুষ গান গায়, তার অর্থ বোঝে না...। গান গাইতে হয় প্রাণ দিয়ে, তার অর্থকে জীবনে ফুটিয়ে তোলবার প্রচেষ্টা দিয়ে—জপ করতে হবে প্রাণ দিয়ে—যাঁর জপ করছ তাঁর স্বভাবচরিত্রগুণকে জীবনে ফুটিয়ে তোলবার শ্রদ্ধা নিয়ে...। নিত্যগোপাল এই সংসারের বুকে সন্ন্যাসের মানুষ হতে বলেছেন...না থাকার মধ্যে থাকতে বলেছে...নিত্যগোপালের বাণীই আমার জীবনে একমাত্র আলো—অন্ধকারের বুক চিরে সেই আলো এসেছে...। তাঁরই জন্য আজ বিশ্বে পেয়ে পেয়ে বেড়াতে হবে...আমি নিয়ে তাঁর মধ্যে মুক্ত হয়ে যাব।...যেদিন তোমার আমিত্ব তাঁর অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যাবে, সেদিন তোমার আমিত্ব সত্যকার থাকবে...। প্রশ্ন তো থাকা নিয়ে—জ্ঞানে থাকা, আনন্দে থাকা...। নিত্যগোপাল-সাগরে সেইদিন পুরুষোত্তমানন্দ লীন হয়ে যাবে সেইদিন তার অস্তিত্ব থাকবে...। নিত্যগোপাল, তোমার জন্মই সার্থক...তোমার জন্মকে ঘরে ঘরে বেড়াবার মত যোগ্যতা দান কর—আমায় মুক্ত করে নাও...। ধরার ধূলি তাহলেই ব্রহ্ম-ধূলি হবে, ধরার মানুষ হবে ব্রহ্ম-মানুষ। জগন্নাথ নিত্যগোপাল।

২১, ১২, ৫৬।...কাল তোমরা আমার জন্মতিথি উৎসব পালন করবার চেষ্টা করছ। তোমাদের কাছে ঐ সম্বন্ধে আমার দু এক কথা বলবার আছে। কোনদিন আমি এসব—একজন মানুষকে নিয়ে মাতামাতি—পছন্দ করি না। তাহলে বন্ধুবান্ধব অনেককেই রাখতে পারতাম। একটা কথা মনে রেখো, ভুল করো না—আমার মধ্যে নিত্যগোপালের জন্ম যতটুকু হয়েছে, ততটুকুই মানুষের কাছে আমার মূল্য—আমার মধ্য দিয়ে সেই নিত্যগোপালকেই তোমরা পূজা করছ, তাঁরই জন্ম উৎসব পালন করবে।...আমার জন্মাবার দাবীও নাই, অধিকারও নাই—তিনিই শুধু জন্মেছেন, আমি তাঁর সেই জন্মকে

যতটুকু ধারণ করতে পেরেছি সেই টুকুকেই তোমাদের প্রদা-জ্ঞাপন। এ অনুষ্ঠানে গম্ভীর পরিবেশ থাকবে, কাতরাযো যেন না থাকে...। আমি খণ্ডের মীমাংসা বুঝিনা...আর্মানীও দুটো কাপ—মীমাংসা হয় না,—কোরিয়া দুটো কাপ—জার্মানীর দুটো কাপ—পৃথিবীময় এই চলছে। নিত্যগোপাল তা করতে আসেন নি—কোন একটা খণ্ডের উপর জোর দিয়ে তাঁর মীমাংসা নয়—অখণ্ডের উপর কিংবা অখণ্ডের উপর···। সিস্টার ক্রিস্টিনে শরৎকে তিনি চেনে ধরেছেন—একবার বলছ আস্থা অনাস্থা বিবেক নেই, আবার বলছ আছে···। আমি সত্য জানিনা, দেখা জানতে চাই···আমি সংসারে ঘুরিয়ে ফিরেছি, নিজেকে কখনও সামনে তুলে ধরিনি, পেছনে থাকতেই ভালবেসেছি। আজ দৈব দুর্বিপাকেই বল বা যেজন্যই হোক অন্তর্হিতকে স্মরণ করতে কিছু ব্যবস্থা হয়েছে। বলা যেতে পারে এ নিত্যগোপালের জন্মোৎসব···। নিত্যগোপাল, পেশাদারী ওকালতির থেকে আমায় রেহাই দাও···আমি অখণ্ড বুঝি, খৈতনাদন বুঝি না···দুই কোরিয়া মিলে এক···। তাঁর জন্মোৎসবের ভিতরে শুধু সেবা—আনন্দেরও অধিকার নেই। সেবার অধিকার শুধু···। কাল প্রিয়রঞ্জনবাবু আসবেন··স্টেশনে কে থাকবে? যে থাকবে সে কি মনে করবে আমার আনন্দের কমতি হল?...সেবাবুদ্ধি না থাকলেই নিজের ত্যাগ কম পড়ার কথা মনে পড়ে। রাধারাণী বলেছিলেন—আনন্দ ও মদন দুই-ই সেবার দৈরী·· যতদূরে থাকতেই হোক সেবা করব...দূরে থেকেও সুখী থাকতে পেরে যে সেবা করে সে-ই সেবক···। সেবায় মন থাকলে কিছুতেই জটিলতা আসে না, নিজের সুখের বুদ্ধিতেই সব অন্যরকম হয়ে দেখা দেয়।...নিজের সুখ আমি কোন দিন চাই নি···চিরদিন পিছনে থাকতে ভালবাসি...। সি সি রায় মরিশাসে গেলেন—শোভাযাত্রার পিছনে আমি···কুম্ভকোণের আন্দোলনে আমি প্রথম—সেখানে আমাকে ডাকতেও হয় না—কিন্তু সুখের ঘটনায় আমি সব শেষে।···বৃন্দাবনের দুর্জয় মাৎসর্যের শীতেও আমার লেপ ছিল না।...উৎসব আমার নেই, আমি বড় দুঃখে দিন কাটাই···কে কাকে তাই বলে দেখে? ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার—মনের মধ্যে কোন্ গোপনে যে লুকিয়ে থাকে—তাদের সম্বন্ধে সচেতন থাকতে চেষ্টা করো, খুব সাবধান থেকো··। ঐ যে নিত্যগোপাল তাঁর শেষ বাণী লিখলেন—কতটুকু তা সত্য হয়ে উঠেছে তোমাদের জীবনে? মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ঘুচে উঠেছে যান্ত্রিক সম্পর্ক···। নিত্যগোপাল, তুমি আমার ভিতরে জন্মলাভ কর···। দুই বন্ধু সতীশ গুহ, অতীন চক্রবর্তী চিঠি দিয়েছেন একটা অলস আড়—ঠেলালেও ওঠে না, জীবনে কোন স্পন্দন নেই···সেই তিন অলসের কাহিনী জান না? কত রাত জেগে কে বা আঁকি মেলে ধীরে কথা কও বায়ু যদি বেগে...। আমার বৈপ্লবিক জীবন—সারা জীবন মেলে চলেছি—ছুটে ছুটে মানুষের দুয়ারে বিপ্লবের কথা পৌঁছে দিয়েছি...আন্দোলন করেছি।...বৃন্দাবনে এক উন্মাদ চাই, গৌর আর এক উন্মাদ...আর এক উন্মাদ নিত্যগোপাল।···তবু সত্য যাপনে তিরোভাবে, ভগবান সত্য আবির্ভাবে···। আমি বিদীন হয়ে যাব—এই তো আমার পক্ষে সত্য কথা...আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব...। টিমে তেতালার লোক নিয়ে যেন আমার দিন যাপন করতে না হয়।···একটা আগুন জ্বালিয়ে দাও নিজের জীবনে···। কে আমার লেখা পড়ছে?.. আমি নিত্যগোপালের আশীর্বাদ বয়ে নিতে এসেছিলাম...। রাজনীতির পঞ্চাশ···১০০ বছর আগে দর্শনের ক্ষেত্রে নিত্যগোপাল, সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজীর পর জওহরলাল রেখে গিয়েছিলেন···। ওগো বিপ্লবী নিত্যগোপাল, আজি দুল শীল ভেঙে প্রাণের পথে তুমি এসো···তোমায় আমি ঘরে ঘরে বেড়াব ঘরে ঘরে...। বেঁচে কি করব? যদি নূতন প্রেরণা নিয়ে পাগলের মত লোকের ঘরে ঘরে পৌঁছাতে না পারি, তবে ছুটি দাও—পারলে বাঁচিয়ে রাখ।

২৪, ১২, ৫৬। ওঁ নমো···ওঁ॥ শ্রীনিত্যগোপাল তত্ত্ব ও জীবন সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাঁর তত্ত্বই জীবন—তিনি তত্ত্বমূর্তি—সাধারণ

মানুষের জীবনে তত্ত্ব যা থাকে, তা তারা জানে না।... 'সমন্বয়মূর্ত্তি নিত্যগোপালি' বইটি সকলের পড়া উচিত···। 'নিত্যগোপাল গীতাভিনয়' টুকুও পড়া উচিত···। আমার জীবনে যদি কিছু থাকে তা তাঁরই প্রকাশ···একদিন তিনি বলেছিলেন ছিন্ন নেকড়ায় আতর মাখিয়ে রাখলে আতরের গন্ধ আসে, নয়তো সে ছিন্ন নেকড়া একদিন তাঁকে বলেছিলাম আপনি ভগবান—তার উত্তরে ঐ কথা বলেছিলেন। ভগবান দিয়ে—বিশ্ব দিয়ে যদি নিজেকে মাখিয়ে রাখতে পার তাহলেই তোমার জীবনের গন্ধ পাওয়া যাবে।···নিত্যগোপালকে বাদ দিয়ে কখনও যেন আমাকে স্বতন্ত্র করে না দেখ···। আমি সমন্বয়ের সাধনা করি, তিনি সমন্বয়-সিদ্ধ...আমার জীবনে যা'র আভাস, তিনি তার মূর্ত্তি।...সংসারের আগের শৃঙ্খলা তিনি গ্রহণ করেন নি···তা ভেঙ্গে দিয়ে নূতন order, নূতন ক্রম রেখে দিয়ে গেছেন।...সব সম্পর্কের মধ্যে ভগবানের সম্পর্ক কি করে পড়া যায় সেইটে বের করে সংসারে চলতে হবে···। কি রকম করে স্বামী চলবে, কি রকম করে স্ত্রী চলবে, প্রতি মানুষ কি রকম করে চলবে তার ছক তিনি রেখে গেছেন—সেই ছক অনুযায়ী চললেই জটিলতার এই বিশ্বের বুকে ব্রহ্মজ্ঞানে স্থিত হওয়া যায়। ...সন্ন্যাসের উপর তিনি জোর দেন নি...সংসার ছাড়া সন্ন্যাস তিনি করেন নি...। এতকাল স্বামীর পুণ্যে স্ত্রীর পুণ্য হতো...নিত্যগোপাল স্ত্রীলোককে অধিকার দিয়ে গেলেন...। কার সাহসে আমি বাজারের মেয়েদের ভাগবত শুনিয়েছিলাম?—নিত্যগোপালের আশীর্বাদে। ···এখানে এসেছ—মনে কর কি পূর্বজন্মে পুণ্য করেছিলে তাই এসেছ? কোনো পুণ্যে আস নি···একমাত্র তাঁর কৃপা···। পূর্বজন্মটন্ম বলে তাঁর স্নেহের অপমান করো না...। কে আমার কথা মানে? আমি যে যার যার বলছি বুদ্ধি চালিও না, ঝগড়া করো না, মান অভিমান করে নিজেকে ছোট করো না তা তোমরা কতটুকু শুনছ?···একমাত্র তিনি যে একদিন আমার মাথাটা তাঁর পায়ে ছুঁতে দিয়েছিলেন তারই জন্য আজ যেটুকু যোগ্যতা লাভ করেছি, এতটা পথ আসতে পেরেছি...নইলে সেই ত্যাবাগদায়ায় নয়ৎ ঘোষ কোথায় থাকত?···তোমরা সংসারী···পায়ের থেকে চুন খসলে কত অনর্থ কর··· আমি যদি করতাম? বুড়ো হলে কত পেয়ালটেয়াল ইত্যাদি মানুষের হয়—তা হওয়ার আগে যেন যাই...। এসেছ যখন নিত্যগোপালের কাছে, তখন তাঁকে ভালবাস। ছেলে-পুলেগুলিকেও বলি শান্ত হ' সকলের ত্রুটি আমারই ত্রুটি এইভাবে ভাবতে শেখ সব দায়িত্ব আমার মনে করতে হবে... কোনো ঘটনা কার দোষে হল তা বের করার নিয়ে হৈ হৈ করো না—ত্রুটি নিজেই নেবে নাও···। নিত্যগোপালকে স্মরণ কর, তাঁকে জপ কর...। যুক্ত হও, তাঁর সাথে যুক্ত হও, আমার সাথে যুক্ত হও, সকলের সাথে যুক্ত হও··। নিজের প্রশ্ন নিজে মীমাংসা করতে যেও না···আশ্রমের সঙ্গে এক হও...। তিনি জগন্নাথ ...আমার তিনি ছাড়া কিছু নাই...তোমাদের কি আছে জানিনা—আমি তাঁকে পেয়ে বেঁচে গেছি···।

২৪, ১২, ৬৬। ওঁ নমো.. ওঁ। এই বিশ্বে প্রত্যেক বস্তুরই দুটো দিক আছে—একটা বাহ্য, আর একটা অন্তর। বাক্যের অক্ষর বাইরের দিক, অর্থ ভিতরের দিক—মানুষের দেহ বাইরের দিক, প্রাণমন অন্তরের দিক।—দেহ দিয়া বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত··। গানেরও দুটো দিক—সুর ও অর্থ। শাস্ত্রকার লিখছেন, 'তজ্জপঃ তদর্থভাবনম্···। অর্থবোধ নেই, গান গেয়ে যাচ্ছি—সুরের ঝঙ্কার থাকলেও অর্থ না থাকলে গান পূর্ণাঙ্গ নয়···। কর্মের অর্থ প্রেম···। অর্থহীন সঙ্গীত বিলাসিতা, অভ্যাস।

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৪—

(৬২)

ঠাকুর, তোমার রাতুল চরণের যে স্পর্শ তুমি আমার মস্তকে হৃদয়ে দিয়াছ, তাহা বহন করিয়াই আমি এই দুর্গম পথে চলিয়াছি, তাহাকে জাগাইয়া রাখিয়াই আমি সকল দ্বন্দ্বের মাঝে মাথা খাড়া রাখিয়া চলিতে পারিতেছি। কতটুকুই তোমার সেবা করিতে পারিলাম, কত বাণি তোমার জীবন ও দর্শন ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বজনীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলাম, তুমিই তাহা জান। সেবার জন্য পথে বাহির হইয়াছিলাম, আজিও পথেই দাঁড়াইয়া আছি। পথে যাহা পাইতেছি আর তোমার পদ হস্তে দেওয়া বলিয়া যেন সহিয়া যাইতে পারি। তুমি আমার আপন হইতেও আপন, 'সর্বাপি সদৃশ্'। স্বামী আমার, তোমার জয় হউক। তোমার তত্ত্ব-আবির্ভাবে উৎসব যেন সফলতার সঙ্গে উদ্‌যাপন করিতে পারি। জন্ম যাওয়ার পর একবার মঠে যাই। মুরলীধরের সঙ্গে আলোচনা হয়। রেণু ১টায় বাহির হইয়া যায়—২০বিঘ w/p কাগজ কিনিয়াছে ব্যাঙ্ক হইতে ৪০০ টাকা তুলিয়া। পরিতোষ সঙ্গে ছিল। ফটো স্টাডিও-এ যায়। সেখান হইতে ২০০০ ঠাকুরের ছবি পাঠাইয়া দেয়। ফেরে ৪।টায়। আমার মঠে যাইবার পথে মেখা ৬০০ কার্ড কেনে, ২ টাকা একশত। আজ হইতে নানদা নামী নূতন রাধুনী নিযুক্ত হইল। মঙ্গলা বিদায় হইল। মঠ হইতে ৯টায় পূর্বে ফিরি। নিত্যপ্রকাশানন্দ ২০০ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। সুশীলা ৫০০ টাকা ২।১ দিনের মধ্যেই দিবে। টাকা হয়ত সংগ্রহ হইয়া যাইবে। কিন্তু সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করিতে হইবে। লোকাভাব লোকাভাব!...

১৭ই মার্চ

ঠাকুর, তোমার করুণা ও কৃপের সঙ্গে আমাকে নিরবচ্ছিন্ন যোগে যুক্ত কর। তুমি আর আমি, আমি আর তুমি। তুমি-আমি এক অদ্বৈত—এক-দেহ, এক-প্রাণ, এক-মন, এক-বিজ্ঞান, এক-আনন্দ। আমাকে অঙ্গীকার কর, আত্মসাৎ কর। আমি তোমার আমি বনিয়া যাই। আমার সকল দেহ মন প্রাণে তোমার আমি ফুটিয়া উঠুক, আমার আমির মহানির্বাণ লাভ হউক। তোমার শিষ্য প্রশিষ্যদের মাঝে কি তোমার প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হইবে না, তাহারা কি সংঘবদ্ধ হইবে না? কি শোচনীয় অবস্থা ইহাদের? মঠে যাহারা আসেন তাহারা কি অলস! কেন এমনটী হইল? তোমার সেবা করিবার জন্য কে এখানে বসিয়া আছে? যে যার অহঙ্কার ও খেয়াল লইয়া আছে। আজ নিত্য আলোচনা হয়। রেণু ১টার পর কমলা হাউজিং হইতে ডেমি লইয়া জগদীশ প্রেসে যায়। 'ঐক্যভাগোপাদ—দর্শনে ও জীবনে' পুস্তকের শেষ ৮পৃষ্ঠা এমন বিশ্রী ছাপা হইয়াছে যে তাহা গ্রহণ করা যায় না। আবার ৫০০ ছাপাইয়া দিবে। বাকী ৫০০ কাজ চালাইবার মত আছে। প্রফুল্লটায় মঠে যাই। কিছু পরে রেণু মঠে যায়। নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় দিল্লী থাকেন, তাহাকেও সম্প্রতি করা গেল না। মঠে এমনই অকর্মণ্য লোক আছে যে কাজ চালানো খুবই কষ্টকর, সম্প্রদায় আজ ধ্বংসের মুখে। কাহাকে দিয়া যে ঠাকুর রক্ষা করিবেন, তিনিই জানেন। একটি দর্শন ও সুচিন্তিত কর্মপন্থা এবং অসীম ধৈর্য ও সহনশীলতা ব্যতীত কিছুতেই রক্ষা করা যাইবে না। যিনি ইহা রক্ষা করিবেন, তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে, মানুষ তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে,

কিন্তু ঘাসড়াইলে চলিবে না। ক্রুশ-বিদ্ধ হওয়ার মত লাঞ্ছনা সহিয়া তবে এ শিখর পার হওয়া চলিবে। উৎসবের দিন 'সমন্বয়-মূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপালে' বিশ্লেষণ করা চলিবে না। গোলমালের সৃষ্টি হইবে। যাহাদের দান করিতে হইবে, তাহাদিগকে নিমন্ত্রণের সময়ই দিতে হইবে। যখন মঠে বৈকালে যাই, তখন পথে চাঁদপুরের উপেন্দ্র ঘোষের সঙ্গে দেখা। সে আলিপুর জজ কোর্টের উকিল, কুমিল্লার অমনী ঘোষ তাহার ভাই। সে-ই প্রথমে আমাকে চিনিয়াছে। তাহার নিকট গীতার অবধূত ভাষ্য আছে সে উহা আমাকে নিয়মিত পড়ে বলিল। তাহার সঙ্গে তাহার এক বন্ধু ছিল। ১৮ই মার্চ

নিত্যগোপাল, তুমিই সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্বে আসিয়াছিলে গৌরগোপাল রূপে শচীমাতার কোল আলো করিয়া ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হরিবোল ধ্বনির মাঝে। শচীর দুলালই আজ গৌরীদুলাল। শ্রীগৌরাঙ্গই বাঙ্গলা, বাঙ্গলাই শ্রীগৌরাঙ্গ। বাঙ্গালীর শিক্ষা, বাঙ্গালীর ভাষা, বাঙ্গলার সংস্কৃতি-সাহিত্য, বাঙ্গলার খোল-করতাল, বাঙ্গলার চোখের জল, বাঙ্গলার হরিবোল ধ্বনির মাঝে ঘুমের গড়াগড়ি, বাঙ্গলার নাটক সবই শ্রীগৌরাঙ্গের অবদান। ঠাকুর, তুমি এলে গৌরাঙ্গের আরব্ধ কার্য্যকে ব্যাপকতর ও গভীরতর ভাবে রূপদান করিতে। বাসবিলাসের পরিণতি গৌর আমার, নিত্যগোপাল আমার, জয় হউক। আমার অভিভাষণটা লেখা আরম্ভ করে রেখু। ৪টার পর মঠে যাই। গর্ত্ত করিয়া পায়খানা করা নিয়া হরিস্বরূপানন্দ, সুধাংশু আন্দোলন করিতেছে। বন্দোবস্ত করিবার জন্য হরিস্বরূপানন্দের উপর ভার দেওয়া হইল। কাল সন্ধ্যায় সে যাইবে। মঠের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। প্রোগ্রাম ছাপানো হইতেছে না। সুনীতি চ্যাটার্জীর ওখানে তারিণীবাবু যান সন্ধ্যার পর। তাঁহাকে পাওয়া গেল না। কাল সকালে যাইবে। ৮টার পর ফিরি। বৈকালে হরিদাসী 'আবির' ও ছুটকনাই ইত্যাদি…। বালিগঞ্জের ইন্দুলেখা…আসে। আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই বলিয়া সে খুব দুঃখ করিয়াছে।…

১৯শে মার্চ

ঠাকুর, তোমার সম্প্রদায় কি করিয়া দাঁড়াইবে? দুষ্টী-শিষ্যের হাতে এসকল চলিবে না, তোমার সন্ন্যাসী শিষ্যগণ তো যে যাহার আপন ঘর লইয়া ব্যস্ত। এখানের ভাবনা ভাবিবার কেহ নাই। শিষ্যেরা কেহ না বোঝে তোমার তত্ত্ব, না আছে তোমার উপর গভীর শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস। তুমি যে কোন্-চেনা, তাহা—মঠে গিয়া দেখিলাম,—মঠেও দেখিতেছি।—এ তোমার মন্দিরের নাম নাই। তাহাদের গুরুর জন্য নূতন মন্দির উঠিয়া গিয়াছে। 'যে যাহার গুরু লইয়া ব্যস্ত। কিন্তু তুমি কি প্রতিষ্ঠাতারও গুরু নও? ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কে রক্ষা করিবে যদি না তুমি কাহাকেও ঐ ভার দোলা করিয়া না দেও? অথচ তুমি যে বিশেষ বড় প্রয়োজনীয়, ইহা তো বুঝিতেছি। তোমার জয় হউক। সকালে মঠে যাই চিদানন্দ ও হরিস্বরূপানন্দ বিমল ঘুষাণী (Health officer)-এর কাছে গিয়াছিল। সে দরখাস্ত করিতে বলিয়াছে। সুনীতিবাবুর ওখানে তারিণীবাবু যান। সুনীতিবাবু অস্বীকার করেন। আমি ও চিদানন্দ ট্রামে পুণ্ডরীকবাবুর বাসায় আসি। তাঁহাকে পাই না। ওটার সময় দেখা হইবে বলিয়া আসি। তারিণীবাবু এস, আর, দাসের ওখানে যান। দেখা হয় না। মহেন্দ্র সরকারকে সম্পাদক করার কথা বলি। তারিণীবাবুর আপত্তি। ইহার জন্য রাগ করি। খেয়ু খাওয়ার পর আশুবাবুর ওখানে যাই, যাই যাবার মেট ঠিক করিয়া আসে। নিত্যগোপাল—দর্শনে ও জীবনে শতকরা ১৫ টাকা। আমি ৪।টার পর মঠে যাই। মঠে ১০০০ টাকা চুরি হওয়ার বিষয় লইয়া আলোচনাকালে অমলেবাবু ও চৈতন্যের মধ্যে কথা হয়। প্রতিষ্ঠানের নিয়া চলা অসম্ভব। চিদানন্দ চৈতন্যের পক্ষ লইয়া বারান্দায় বসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করে। দুঃখিতের মত চলিয়া আসি। অতি দুঃখেও হাসি পায়। নীলুর এক এন্‌ভেলাপ আসে।… মাখনবাবু আসেন।…এস, আর, দাস সভাপতি হইলেন না secluded life lead করেন বলিয়া।

২০শে মার্চ

ঠাকুর, তুমি বর্ণাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম—নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির

—মাঝখান দিয়া দুইবেই ছাড়িয়া এবং দুইবেই পরিপাক করিয়া চলিয়াছে। তাই তুমি দুই দলের কাছে অভিযুক্ত। তুমি কাহারও এসটেটিয়া নও, তাই কেহ তোমাকে স্বপক্ষে মনে করে না। তোমাকে বুঝে লইয়া চলিয়াছি, তাই কাহারও অভিযুক্ত। কেহ আমার নাই। তুমি, শুধু তুমি। তোমারও কেহ নাই। তোমার যদি কেহ থাকিত, তবে তোমায় কোলে বসিয়া এমন করিয়া কেহ তোমাকে অস্বীকার করিতে পারে? তুমি তো শুচির ঠাকুর ছিলে না, অশুচিও নয়। অথচ তোমাকে নিয়া এখানে শুচি-বাই চলিয়াছে। এখানে কোন দুইটি মানুষ এক নয়। অথচ তুমি ছিলে প্রাণ, মহা প্রাণ, বিশ্ব-প্রাণ। আর পারি না, যাহা হয় হয় ...শ্যামলালবাবুকে ফোনে ঠিক করা হইল সভাপতি হইবার জন্য ...৭টায় মঠে যাই। ৪॥ টায় চলিয়া আসি। আমি ও বেণু প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারীর ওখানে যাই। আজ তাহার জন্মোৎসব তারিণীবাবুর ৮টায় পর আসার কথা ছিল এখানে প্রোগ্রাম ঠিক করিবার জন্য। সেবানন্দ খবর দিয়া যায় তারিণীবাবু আসিবেন না। সেবানন্দ বলিল, হালীপদানন্দ প্রভৃতি বলেন আমি ঠাকুরের মত বলি না। তাহারা আমাকে বক্তৃতা দিতে দিবে না। বেণু সোম ও মুরলীধর আমার বিরুদ্ধে বলিতেছে। ইহা শুনিয়া তাহার দুঃখ হয়। আমাকে কে চায়? আমি এমনই অনভিপ্রেত। কিন্তু ইহাদের নিয়া কি সম্প্রদায় টিকিবে? সম্প্রদায় তো ধনের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ তো কোন আলো দেখিতেছে না।

২১শে মার্চ

ঠাকুর, তোমার দর্শন ও জীবন সম্বন্ধে আমি যাহা বুঝিয়াছি বা তুমি যাহা বুঝাইয়াছ, তাহা বুকে নিয়া চলিয়াছি, তাহাকেই রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আজ তোমার যাহারা তাহাদের কাছ হইতেও বিরোধ আসিতেছে। বিরোধ অনেক দিন হইতেই ছিল, আজ তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে চাহিতেছে। উহা নাকি আমার মত। তুমি তো বলিয়াছিলে, 'পরং, তুমি কি জাননা, ভগবান অন্তর্যামী রূপে তোমায় যখন যাহা প্রয়োজন তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন? তবে আর কি! যাও'—তুমি আমাকে ইহা বলিয়াছিলে যখন তোমায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। ইহা স্মরণে নগেন্দ্র নারায়ণ-রায়চৌধুরীদাদা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার মত শিখাইয়া দিয়াছিলেন—'আমরা কাহার অনুরূপ হইয়া চিন্তা করিব?'। বড় রুক্ষ ঠেলিয়া চলিতে হইতেছে। আপোস কি সম্ভব হইবে না? সকালে মঠে যাই, প্রোগ্রাম ঠিক করিয়া আসি। যাইতে বলিয়াছি, তখন অনেক দিন পর প্রতিবার নাকি দিয়া রক্তপড়া আরম্ভ হয় ...কম দুর্যোগ ঠেলিয়া চলিয়াছি? ইহার কি আর শেষ নাই? আজ কি করিয়া করিব? প্রেসে প্রোগ্রাম ও একনাথের চিঠি ছাপাইতে দেওয়া হইল।...সকাল ১০ টার পর অনাথবন্ধু আসে তাহার স্ত্রীপুত্র সহ তাহার নিজের গাড়ীতে ...শ্রীনিতাগোপাল যে শ্রীগৌরাঙ্গের ক্রমবিবর্তিত রূপ তাহা বলি। প্রার্থনায় বসিবার পূর্বে তখন পৌঁছে দিয়াছি, তখন দুর্বিকল্প অনুভূত হয়। বেশীক্ষণ থাকে না।

২২শে মার্চ

ঠাকুর, তোমাকে নিয়া অগ্রসর হওয়া যে কি কঠিন তাহা সারা জীবন প্রত্যক্ষ করিতেছি। কূল কিনারা নাই, কেহ নাই তোমার পথে আগাইয়া দিবে। পর্বত প্রমাণ বাধা। তুমি তো নিজে বলিয়া ছিলে, 'অন্তঃ, তোমার যখন যাহা প্রয়োজন, অন্তর্যামীরূপে তিনি তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন'। তাই যদি হয়, আমি তো বুঝিতেছি যে তুমি ছাড়া বর্তমান যুগের মীমাংসা অসম্ভব, তবে কেন সমস্ত-শিক্ষিত মানুষের কাছে তোমার দর্শন ও জীবনকে ছড়াইয়া দিতে পারিব না? আমার ভুল যদি হইয়া থাকে, আমি যদি তোমাকে তুমি যাহা নও তাহাই বলিতে চাই, তাহা কি অন্তর্যামীরূপে ভগবান বুঝাইয়া দিবেন না? ঠাকুর, আমাকে রক্ষা কর, পথ সুগম করিয়া দেও, আবেষ্টন অনুকূল করিয়া তোল। সকালে মঠে যাই।... বেণু ২টায় পর বাহির হইয়া জগদীশ প্রেস হইয়া প্রিন্টিং পাবলিসিটিতে যায়।...এমন করিয়া কালনা, নবদ্বীপ ও নলহাটি মঠের লোকজন দূরে সরিয়া থাকিতে পারে, তাহা আমি পূর্বে ভাবিতে পারি নাই। এ সম্প্রদায়ের

ভবিষ্যৎ কি? সকলেই ব্যক্তিগত মঠ ও শিষ্য লইয়া ব্যতিব্যস্ত। ঠাকুরের জন্ম কে বসিয়া আছে? নিত্য-গোপাল তাদিয়া গেলে কাহার কি আসিয়া যায়? উৎসবের সময় সাজিয়া গুজিয়া আসিবে। ঠাকুর, টানিয়া নিয়াছ (?)। আমাকে বাঁচাও। অতি ইচ্ছায় সঙ্কটে জড়াইয়া পড়ি নাই তো তোমাকে লইয়া? তোমার শতবার্ষিকী করা আমার অতি-ইচ্ছা নয় তো? তুমি জান। বেলু প্রায় একটায় ফেরে। তাহার পর মঠে যাই।...

২৩শে মার্চ

ঠাকুর, তোমার জন্মের শততম বর্ষকে কেন্দ্র করিয়া যাহা কিছু করিতে চাহিতেছি, তাহা কি সত্যই ambitious programme (যাহা সেদিন সুরেশ বেব বলিলেন)? আমি তো জোর করিয়া বড় করিতে চাহিতেছি না, আকাশে তুলিতে চাহিতেছি না। তোমাকে তো সত্যই বড় বলিয়া বুঝিয়াছি। বর্তমান বিশ্বের যাবতীয় সমস্যা (ঘরের বাইরের)-র সমাধান দাতা বলিয়া, 'জগন্নাথ' বলিয়া মনে করিতেছি। আমি কি অতি-দোষী হইতেছি? তুমি যদি জগন্নাথ, তবে জগতের লোক তোমাকে পাইয়াও উপবাসী থাকিবে কেন? সমস্যা লইয়া এমন বিব্রত হইবে কেন? তাই তো তোমাকে বুকে লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্ম প্রাণ আমার ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমায় সুযোগ করিয়া দেও ঠাকুর। আমার তো তুমি ছাড়া কিছু নাই সম্বল ঠাকুর। মঠে আজ হইতে প্যাণ্ডেলের কাজ আরম্ভ হইল।...বীরেশ্বরকে বসু মল্লিক লেনের ইলেক্ট্রিসিয়ানের প্রধান দেবেন চট্টোপাধ্যায় ও আরও একটী মাতব্বরকে লইয়া মঠে আসে। কথাবার্তা হয়। তাহারা পরিবেশনের ভার নিতে প্রস্তুত। আগামী রবিবার সকালে আসিবে। আজ স্পেশাল মেসেনজার দ্বারা চাউলের পারমিট পাঠাইয়া দিয়াছে। চিন্ময় অফিসে গিয়াছিল। ঐ পারমিট প্রথমে নলহাটি রেজিষ্ট্রী করিয়া পাঠানো হইবে। আজ নিমন্ত্রণ কার্ড ও ভক্তসভার নিমন্ত্রণ চিঠি ছাপা হইয়া আসিয়াছে জগদীশ প্রেস হইতে। কর্মসূচী কাল পাওয়া যাইবে: হীরালাল ধর নিমন্ত্রণ চিঠি ও নদের নিমাইয়ের প্রোগ্রাম আজ দিয়াছে। প্রতিভা পরাগেছে। দুধভাত খায়। ৯টায় পর আসি। যোগেশ কীর্তনীয়ার দলের একটি ছেলে কীর্তনের সময় কোনও একটী মেয়ের মুখে আগুন দেয়। পুনঃ পুনঃ সাবধান করা সত্ত্বেও উহারা বিরত হইতেছে না। বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত বলিলাম। ইহার সমস্ত দায়িত্ব মঠের উপরে বর্তাইবে। তাহার জন্ম মায়া? কঠিন শৃঙ্খলার অভাবে মঠ ডুবিতে বসিয়াছে।

২৪শে মার্চ

ঠাকুর, ভাবিয়া দেখিও এ তিন ভুবনে তুমি ছাড়া আমার আর গতি নাই। কোথায় যাইব, কাহার কাছে যাইব? তোমার কাছ ছাড়া প্রাণ জুড়াইবার আমার কে আছে, কি আছে? তোমার দর্শন ও তোমার জীবন আমার লোভের বস্তু। তাহা আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। আমি এমন ছিদ্র কখনও করি নাই যাহার ফলে অগ্রগতি নষ্ট হয়, কার্য পণ্ড হয়। আমার জিদের বড় তুমি ও তোমার বিশ্ব। তুমি আমাকে এমন এক চিন্তাধারা দিয়াছ যাহা লক্ষ লক্ষ লোকে পায় নাই। ইহা কি আমার কম গর্বের? তোমার গরবে গরবিণী আমি রূপসী তোমার রূপে। তুমিই আমি, আমি তুমি। তুমি আমি পৃথক হয় হইব, ইহা ভাবিতে বেদনা বোধ হয়। তুমি-আমি এক অঙ্গ। মিনু আসে ৬টার পর।...আজ চিঠিপত্র প্রোগ্রাম তাকে পাঠানো আরম্ভ হইয়াছে। নিমন্ত্রণ করার কাজ গুরুতর: আমি একা কতদূর দৌড়াদৌড়ি করিব? শিবোত্তমপুরের সতীশ রায় কর্মকার আসে বরিশাল সৎ সঙ্গের এক সভায় আগামী রবিবার বক্তৃতা দিবার জন্ম। পারিব না বলিয়া দেই। ঈশ্বর প্রামাণিক মঠে যায়। সে যে ওজন কমী সাফাই-এর কাজের জন্ম দিবে বলিয়াছিল, তাহাতে অসুবিধা হইয়াছে জানাইল। কেননা তাহারা সকলেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী...। মঠে কাহারও সঙ্গে কথা বলা যায় না। সকলেই নিজ নিজ বুদ্ধির উপর এত বিশ্বাসী যে কাহারও সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনা চলে না। প্যাণ্ডেলের কাজ চলিতেছে। এখনও কত কাজ বাকী। দিন তো আসিয়া পড়িল।... —আমার সম্বন্ধে অনেক অপ্রিয় কথা বলিয়াছে। বাবা,

যে যতদূর পার বলিয়া যাও। আমি মড়ার মত পড়িয়া আছি। মরা মানিয়া আর কি হইবে? তবু পথ চলিব। আমার যে চলা ছাড়া গতি নাই।... ২৩শে মার্চ

সত্যই কি তোমাকে লইয়া শতবার্ষিকী কমিটীর এই কার্যসূচী একটী ambitious scheme ঠাকুর? আমিই এক মুহূর্তে এই উৎসব চলিবে ঠিক করিয়াছি। এ সম্বন্ধে কাহারও এত বড় ধারণা ছিল না। 'হরি হে, ধরি চরণ লজ্জা নিবারণ কর আজ এই লোকসমাজে'। বরিশাল কনফারেন্সে এক টান দিয়া বাঙ্গলার সামনে তুলিয়া ধরিয়াছিলে, সারা বাঙ্গলার কাজ করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলে। আবার কি তেমনটী হয় না? ঐরূপ প্রতিষ্ঠা না হইলে কি কাজ করা যায়? ঠেলাঠেলি করিয়া কতদূর অগ্রসর হওয়া যায় বল? তুমি প্রতিষ্ঠিত হইবে না, ইহা তো ভাবিতেও পারি না। এতখানি যোগ্যতা লইয়া কে আসিয়াছেন? তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও তো বর্তমান যুগের দেবতা বলা যায় না। যাহা হয় করিও। আমি শরণাগত। রেণু প্রিন্টিং পাবলিসিটি হইবা মনোরঞ্জনবাবুর স্থান হইতে নিমন্ত্রণ যোগাযোগের নাম লইয়া ফেরে।...৪টার পর মঠে যাই। দুই প্রেস হইতে প্রুফ নিয়া আসে ও যায়। মঠে — প্রভৃতি প্রতি কর্মে বাধা সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া অভিযোগ। সত্যই ইহাদের প্রকৃতি এই রূপই বটে। মঠের সংস্কার হউক ইহা কেহ খোলা প্রাণে চায় না। নোংরামি বাঁধাইয়া রাখিতে পারিলেই সুবিধা আদায় করা সম্ভব। রাত্রিতে খাইতে বসিয়াছি তখন আশুবাবুর ম্যানেজার ও কালীবাবু আসে। কাল দুপুরে 'শ্রীনিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে' কিছুটা দিবে বলিয়া গেলেন। উপেন ধর এখানে হইয়া মঠে গিয়াছিল। সে কমলা ও ফুলের মালা আনিয়াছিল। একজন নূতন গ্রাহকের ছয় মাসের বাবদ ২টা ও আরও ২টাকা দিয়া যায়। তাহার ছেলে ও ছেলে-বৌ ধীরেন মজুমদারের বাসায় অর্থাৎ নিজের বাসায় গিয়াছে। ইহা সু খবর। ধীরেন মজুমদার প্রাণ খুলিয়া নিয়াছেন। আমার নীতি মানিয়া চলায় এই সুফল ফলিয়াছে—তাহারা মনে করে। আর সত্যই তাই।... ২৬শে মার্চ

ঠাকুর, আমার স্বপন, 'আমিত্ব দেখিনু এ তিন ভুবনে' তুমি ছাড়া আমার গতি নাই। এই সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইতে গেলে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা আমার কিছু নাই। আমার আছ মাত্র তুমি। তোমার গরবে আমার গরব। তোমার প্রতিষ্ঠা লইয়াই আমার প্রতিষ্ঠা। আমার চারিদিকে এমনই বিশৃঙ্খলা যে মাথা ঠিক রাখিয়া চলা একরূপ অসম্ভব। তবু যে চলিতেছি, তাহা শুধু তোমার স্নেহস্পর্শে। তাহাই আমাকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে। এই অকূল সাগরে তুমিই আমার কূল। আমার এ কূল ও কূল ভাসিয়া গিয়াছে। তোমাকে বুকে লইয়া চলিব। তোমার যাহারা তাদের মধ্যে যদি প্রতিষ্ঠা দিতে, সেবা করিতে পারিতাম। তোমার বিধান সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রেরাই তো বিরূপ হইয়া পড়িয়াছেন, কে তোমার মিশন রক্ষা করিবে? আজ হইতে অধিকা বাবুর নিযুক্ত হয় ১৬ টাকা মাহিয়ানা। মানদা বিদায় নেয়। হৃদ বাঁধে নাই। রেণু প্রিন্টিং পাবলিসিটিতে যায়, ফেরে ৩টার পর। ৪ টার পর আমি রেণু গোপা মঠে যাই। আজ কার্যকরী সমিতির অধিবেশন, কর্মবণ্টন হইল আলোচ্য বিষয়। ৫টার পর সভার কাজ সুরু হয়।...১২টায় শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের এক চিঠি লইয়া এক শিখ ভদ্রলোক আসেন—হরজিৎ সিং। উৎসবে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ জানাই। সভায় বিভিন্ন কার্যের জন্য বিভিন্ন লোক নিযুক্ত হয়। রণজিৎ বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা হয়। ফুকোমা হওয়ার জন্য এতদিন সে অনুপস্থিত ছিল। একখানি রসিদ বই নিল। সভার পর তাহার কাছে ঠাকুরের অবস্থতা সম্বন্ধে আলোচনা করি। ৯॥টার পর ফিরি। 'শ্রীনিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে' ২৪খানা বাঁধিয়া কালীবাবু ১টার পর দিয়া যান। নিতাইবাবুর নির্দেশ পালিতে পারিয়াছি। ঠাকুরের একখানি দার্শনিক ভিত্তিতে লিখিত জীবনী লিখিতে পারিলাম বলিয়া কৃতার্থ মনে করিতেছি। প্রস্থানত্রয়ের উপর ভাষ্য লিখিত হইয়াছে, একটী জীবন-চরিতও হইল, এখন ইহা ছড়াইয়া দিতে পারিলেই আমার সাধ মিটে। প্রতিভার ওষুধ সুধাংশু দেয়। ২৭শে মার্চ

ঠাকুর, তোমাকে বাঙ্গলার বুকে, ভারতের বুকে, বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল। তোমার সেই প্রতিষ্ঠিত রূপ আমার সামনে ভাসিতেছে, সেই ছবির ধ্যান করিয়া, সেই ছবির দিকে চাহিয়াই তো সারা জীবন চলিয়াছি। দেশময় বিপ্লবের মধ্যে আমাকে হাতে লইয়া তোমার সেই উদাত্ত মূর্তি আমার জীবনের সামনে স্পষ্ট রহিয়াছে। সেই মূর্তি কি বাস্তবে রূপলাভ করিবে না? ঠাকুর, আমাকে শক্তি দাও, বরিশালের বনকান্তারেতে যে ভাষায় আমি ১০।১২ হাজার লোককে মন্ত্রমুগ্ধ রাখিয়াছিলাম, তাহার সেই শক্তি আমায় দেও। আমি যে ধনে জনে রিক্ত। 'নহৎ'-এর জন্য ৫০ টাকা দিবার মত সাহস তো সেখানে উপস্থিত কাহারও হইল না। যে-কেউ সেখানে দিবার মত ছিল। তোমার জন্য এই সুখটুকু পূরণের লোভও যে নাই। যাহা হয় তুমি কর। আমার প্রণমন তুমি স্বীকার কর। সকালে চৈতন্য আসিয়া কিছু আদেশ ও প্রোগ্রাম নিয়া যায়। —চেয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিতে চান রেণুর জন্য। কি নির্বোধ! এতটুকু বাস্তব বুদ্ধিও মানুষের নাই? আমি ৪টার পর মঠে যাই। যে সব বিশেষ নিমন্ত্রণের জন্য নাম লেখা হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশের কাছেই তাকে চিঠি ছাড়িয়া দিয়াছে চিনানন্দ। কি আহাম্মক ইহারা! অথচ খরচিলে রাগ করে। তাকে একটা চিঠি পাঠাইয়া দিলে ইহারা আসিবেন তো না-ই, বরং বিরক্তির কারণ হয়। আমিই কি যাই? নিমন্ত্রণের তার অর্পণের জন্য আগামী বুধবার সভা ডাকিবার কথা বলিব। ৯টার পর ফিরি। আজ অভিভাষণ এরকম লেখা করে রেণু। মাখনবাবু সকালে আসেন।

২৮শে মার্চ

ঠাকুর, তুমি আছ, আমি নাই, তুমি আলো আমি ছায়া, তুমি বিধ আমি প্রতিবিধ। আমার এই না-থাকা ভাবাত্মক (positive); তুমি আমি মিলিয়া এক, অদ্বৈত। হে আমার স্বামী, তুমি ছাড়া আমার সার্থকতা কোথায়? তুমি আমার মূর্তিমতী সফলতা। আমি হিলাম ব্রজমোহন স্কুলের ৪০টাকা মাহিনার এক শিক্ষক। আমার সহকর্মীরা (যাহারা আমার থেকে যোগ্যতর ছিলেন) বা কোথায়, আর আমি বা কোথায়? আমি আজ বেদাতের ভার লিখি, বাঙ্গলাদেশে দাঁড়াইবার মত সুযোগও দিয়াছ। ইহা তোমার স্নেহ ছাড়া আর কিছু কি? মুখকে বাচাল করিয়াছ, মনুকে গিরি লঙ্ঘনের অধিকার দিয়াছ। তোমার জয় হউক আমার জীবনে। সকালে চৈতন্য আসিয়া আগামী বুধবার কার্যকরী সমিতির এক অধিবেশন (বিমলদের মুক্তিপ্রার্থনার জন্য) নোটিশ দিবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যায়। রেণু অভিভাষণটা re-write করে। ৮টার পর জগদীশ প্রেস ঘুরিয়া আসে। আমি ৯টার পর মঠে যাই। পূর্ণেন্দু ঘোষ মঠে আসেন। তিনি একজন মুসলমান অ্যাডভোকেটকে কোরাণ হইতে প্রার্থনার অংশ ঠিক করিয়া দিবেন বলিলেন। ধীরেনবাবু আসেন ঠাকুরের এক প্রবন্ধ লইয়া। রূপাহিৎ বসু ও তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়। তাঁহারা অর্থ আদায়ের জন্য বাহির হইবেন। নীলরতন বাবু শতবার্ষিকীর জন্য ২০টাকা দিলে ১০ টাকা তাঁহার স্ত্রীর নামে দিলেন। ৬টায় রেণু গোপা ও প্রতিভাসহ বিমলার মঠে যায়। সুধাংশু প্রতিমাকে রেখে শুধু দেয়। অমা ও বেলা মঠে আসিয়া ছিল। রেণু-প্রতিভার কাছে আগের মত তেমন করিয়া আর ছুটিয়া আসে নাই। ৯টার পর আমি ও তারিণীবাবু টামে আসি। অভিভাষণ শুনানো হয়। অভিভাষণ শুনাইবার জন্য তাকিয়া আনিয়াছি।

২৯শে মার্চ

প্রাবনের দেবতা আমার, প্রাবনের যে ছবি তুমি আমার জীবনের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছিলে, তাকেই রূপদান করিবার জন্য চোখের জলে বুক ভাসাইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছি। কতদূরে সেই সত্য যুগ যেখানে 'সব জাতি একজাতি হইবে, সব জাতি একধর্ম মানিবে'? তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিব। সেই যুগকে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রাণপাত করিবার সঙ্কল্প লইয়াই তো চলিয়াছি। উন্মাদ আমার, তোমার চরণ-স্পর্শে ধন্যায় ধূলি হউক ব্রজ-ধূলি, ধন্য মানুষ হউক ব্রজ-মানুষ। সকালে মঠে গিয়া ঠাকুরের জন্য 'শ্রীনিত্যগোপাল—দর্শনে ও

জীবনে' দিয়া আসি :—জিজ্ঞাসা না করিয়া মঠেরই জিনিষ দিয়া এক ঘর বানাইয়াছে। মহেশ্বরানন্দের ঘর লইয়া গণ্ডগোল, সচ্চিদানন্দকে সরানো হইতেছে না, আবার ও আরও ঝঞ্ঝাট বাড়াইতেছে। ইহার পরিণামও তো ঐ একরূপ। বেলু অমলদাস প্রেসে গিয়া 'অভিভাষণ' ছাপাইতে দিয়া আসে, ট্যাক্সী করিয়া 'ভক্তিযোগবর্ধন' ১০৯০ মঠে দিয়া বিকাল ৬টায়। শ্রীকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে মঠের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। মঠের অবস্থা ভাল নয়। কোথাও প্রাণের যোগ নাই। একটী নূতন আদর্শ, নূতন কর্ম-পন্থা, একজন বানাইয়া চালাইবে মত মানুষ না হইলে ইহার ভবিষ্যৎ কি? পত্রিকাটীতে বরং কিছু লোক ডাকা হইল। ইহাকে দিয়াইয়া রাখিবে যে কি করিয়া? এই অবসাদ কি করিয়া কাটিবে? ঠাকুর জানেন। আমার দীন শক্তির দ্বারা যতটুকু পারি সেবা করিয়া যাইব। আমার ধনও নাই, জনও নাই। আছে মাত্র প্রাণটা ও প্রাণের জ্বালা। হইতে হয় হইবে। না হইলে আমার আর করিবার কি আছে? সন্তোষ শাস্ত্রীর কাছে পত্র দেওয়া হয়।

৩০শে মার্চ

ঠাকুর, আমি তোমাকে স্বামী বলিয়া ভাবিতেই শিখিয়াছি, তুমিও এই সম্পর্ক মানিয়া লইয়াছ। তোমার সংসার আমার সংসার, তোমার বিশ্বকর্ম আমারই বিশ্বকর্ম। তোমার সংসারে তোমার স্থান গড়িয়া তুলিতে পারিলাম কৈ? কে তোমাকে চায়? তোমার সন্তানেরাই আজ তোমার প্রতিষ্ঠার পথে পর্বতপ্রমাণ বাধা সৃষ্টি করিতেছে। কেউ তো ছুটিয়া আসিল না তোমার বিশ্ব-বিজয়ের এই অভিযানের সংবাদে অবগত হইয়া? তোমার মঠ, তোমার কার্য পণ্ড হইতেছে। যে যাহার নিয়া ব্যস্ত। আমি কি করিব? স্বামী, একা আমি নিজের মধ্যে ছটফট করিতেছি। যদি থাকিত, ওখানে শৃঙ্খলা আনিতে পারিতাম। কে আমার কথা (তোমারই কথা) শুনিবে? কথা শুনাইবার মত যোগ্যতা আমাকে দেও, শক্তি দেও, মনবল তনবল দেও। তোমার আরব্ধ কর্ম রক্ষা হউক। ৭টার পর আমি ও বেলু বাসে প্রতাপ গুহ-রায়ের ওখানে যাই। ওখানে প্রতাপ ও প্রফেসার নির্মলবাবুকে নিমন্ত্রণ করি। বাসে আসি কালিদাস রায়ের ওখানে। সেখান হইতে রিক্সায় শশীর বাসায়। কালিদাস রায় ও শশীকে 'নিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে' বইটি দেই। প্রতাপদের 'সংবর্ধনা নিত্যগোপাল' দেই। শশীর বাসা হইতে ট্যাক্সীতে সুহৃৎবাবুর বাসায়। সেখান হইতে রিক্সায় প্রিয়রঞ্জনবাবু, তৎপর প্রিয়দারঞ্জন-বাবু, তাহার পর শৈলেন সিংহের ওখানে যাই। পথে ট্রামে ফিরি। খরচ লাগিয়াছে ৩৮৲। ৩টার পর মঠে যাই। বেলুও যায়।...

৩১শে মার্চ

ঠাকুর, নিখিলের অধীশ্বর, বিশ্বজনের আশ্রয় তুমি। তোমার শ্রীচরণতলে বিশ্ব একটী নূতন কৃতি লইয়া গড়িয়া উঠিতে চাহিতেছে। তুমি বর্তমান যুগ-স্রষ্টা, বিশ্বস্রষ্টা। বিশ্বনাথ আমার, প্রতি মানুষের কাছে তুমি তাহার মত হইয়া আসিলে—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। তুমি প্রত্যেকের কাছে তার তার মত। তোমার চরণতলে কবে সারা বিশ্ব আকৃষ্ট হইবে? তেমন দৃশ্য দেখিবার জন্য আমার প্রাণ বড় আকুল। স্বামী আমার, তুমি তাই কর, তাই কর। তোমার বিশ্বরূপ আমাকে দেখাও, স্বরূপ আস্বাদন করিতে দেও। তোমার জয় হউক। ৭টায় ট্যাক্সী করিয়া (ভাড়া ২টাকা) আসি, তারিণীবাবু ও বেলু রাসভবনে প্রফুল্লবাবুর ওখানে যাই। সেখানে কথাবার্তা সারিয়া বসেন দাশগুপ্ত, যাদবের পাঁজো, রাধাগোবিন্দ রায়ের কাছে নিমন্ত্রণপত্র দেই। যাদববাবু উৎসবের জন্য ৪ টাকা দেন। সেখান হইতে গোপিকাবিলাসের ওখানে যাই ট্যাক্সীতে—১টাকা ভাড়া। মন্ত্রীদের নিমন্ত্রণ করিবে প্রফুল্লবাবু, কার্ড দিয়া আসি। উপমন্ত্রীদের নিমন্ত্রণ করিবে গোপিকাবিলাস, ২৪খানা কার্ড দিয়া আসি। প্রফুল্লবাবু চুয়াডাঙ্গার নিকট ফোন করে। ১০টা হইতে ১০৷৷টার মধ্যে তাহার সঙ্গে দেখা করার কথা। সেখানে আমরা যাই। ১০৷৷টায় দেখা হয়। কথা হয়। ৪টার পর ট্যাক্সীতে আমি বেলু ও গোপা এ্যাসেম্বলী হাউসে যাই গোপালদাস

অধিকারীর কথা মত। সে উপস্থিত ছিল না। গোবিন্দ-নিবাসকে বেণু ডাকিয়া থানে এলাহাবাদী বস্ত্র হইয়া যায়। সেখান হইতে ট্রামে গোপালকে ছাওড়া ব্রীজ দেখাইবার জন্য বাই ব্রীজের উপর দিয়া হাঁটিয়া। পরে মঠ পর্যন্ত আসি। শান্তমণি দাশ উৎসবের জন্য ৫টাকা মনি অর্ডার করিয়া পাঠাইয়াছে।

১লা এপ্রিল

ঠাকুর, আমার দেহপ্রাণমন, বাঙ্গলার দেহপ্রাণমন, ভারতের দেহপ্রাণমন, বিশ্বের দেহপ্রাণমন যখন করিয়া তুমি প্রকাশিত হও। তোমাকে সর্ব রূপে, সর্ব রসে, সর্ব গন্ধে, সর্ব স্পর্শে, সর্ব শব্দে পাইবার জন্য আমার দেহপ্রাণ ব্যাকুল। আলো স্বামী আমার, সুহৃৎ আমার, পরম আমার, বন্ধু আমার! তোমাকে যে-রূপে আমি লইয়াছি, তোমাকে যাহা বলিয়া আমি বুঝিয়াছি, তুমি কি তাহা নও? তাহা কি শুধুই বিকল্প? ঠাকুর, প্রকাশিত হও সর্ব সমস্যার সমাধানরূপে সকলের হৃদয়ে। সকালে একবার মঠে যাই। বেণু ৮টার পর বাহির হইয়া সুবোধ ঘে, মইনুদ্দিন (হেমাউদ করিমের বড় ভাই), স্টাণ্ডার্ড ফটো, আশুবাবু, ঢাকেশ্বরী, মনোরঞ্জন বসু, ভূধর কান্তির সেক্রেটারী নির্মল ঘোষের সঙ্গে দেখা করিয়া ১টায় ফেরে। আমি ও বেণু রিক্সায় মঠ পর্যন্ত যাই। পথে লেক মার্কেটে মাসের জিনিষ কিনিবার জন্য নামি, তেলের পাত্র ফুটিয়া যায়। বেণু ফেরে যায়, সে মঠেও পরে যায়। চিত্তানন্দ ছাওড়ায় এখানে পৌঁছাইবার জন্য টেলাওয়ালার কাছে ১৬ মণ চাউলের পারমিট দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। ইহা খুব দুঃসাহসিক ব্যাপার। চাউল পৌঁছে ৮॥টার পর। কি দুশ্চিন্তা! দুইবার বাস্তার ধারে ঘুরিয়াছি। ১টার পর ফিরি। নীলরতন আজ 'নিত্যগোপাল—জীবনে ও জীবনে' ১৷৷টাকা দিয়া নিয়াছে। টাকা পয়সা আসিতে হইবে বলিয়া মনে হয়। এখন শুধাইয়া উঠিতে পারিলে হয়। হরিদাস বানার্জী (?) পত্র দিয়াছেন—একজন নৈষ্ঠিক বর্ণাশ্রমীর পক্ষে ভগবানের 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' এই উক্তি থাকার পর তেমন সভায় যোগদান সঙ্গত নয় সেখানে 'কোরাণ' সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। কর্মসূচীর 'আপনার ও তোমার' item দেখিয়া তিনি ঐরূপ লিখিয়াছেন। কি শোচনীয় অবস্থা! আজ ১৭দিন পূর্বে ঠাকুরের সেবার জন্য ২৫ টাকা দিয়াছেন।

২রা এপ্রিল

ঠাকুর, তুমি বলিয়াছ, 'মম যোনিঃ মহৎ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্'। বর্তমান যুগ-সৃষ্টির ব্যাপারে কে তোমার 'মহৎ ব্রহ্ম' যাহার গর্ভে তুমি বীজ আধান করিবে? তোমার বীজ গর্ভে ধারণ করিব, তুমি আমি এক-তনু, এক-প্রাণ, এক-মন, এক-বিজ্ঞান, একানন্দ হইব এমন বিশ্বাস লইয়া বসিয়া আছি। তুমি পূর্ণ আমি পূর্ণ, তুমি আলো আমি ছায়া, তুমি বিম্ব আমি প্রতিবিম্ব। কত লোকে বলে আমার মুখে তোমার সাদৃশ্য আছে, আমার পা তোমার পায়ের মত, আমার গঠন তোমার মত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও বলে। ইহা শুনিয়া তৃপ্তি আমার হয় না। তোমাকে প্রকাশ তো করিতে পারিলাম না। সুযোগ আসিয়া গেল, যোগেশ্বর। উজ্জ্বলতারতের কাজ বেণু শেষ করে। যমুনা ১০ দিনের ছুটি নিয়া আসে। সে ২০ টাকা দিয়াছে ঠাকুরের সেবার জন্য, সংগ্রহ করিয়াছে ১১টাকা। ৩টার পর অতীনবাবু আসেন। ২রা চৈত্র (?) কিরূপ নিয়া যজ্ঞেশ্বর যাইবেন। আমাকে যাইতে বলেন। সে সময় অসম্ভব। কিছু পরেই মনোরঞ্জন বসু আসে। ৪টায় ট্যাক্সীতে রওয়ানা হই। 'ভারতবর্ষ' হইয়া যাই, ভারতবর্ষ বন্ধ। ইহার পর তৃতীয় বারের তথায় যাই। সে ১০ই এপ্রিল বক্তৃতা দিবে ঠিক হইল। ৫টাকা নেবার জন্য দিল। সেখান হইতে বিজয়ের বাসায়। সে বাসায় নাই। শেলাম ফুলাতরে।—এর সঙ্গে কথা হয় তাহার ঘরে। সে বিশেষ কোন সম্বর্ধনার ভাব দেখাইল না: একরূপ arm chair-এ ঠেস দিয়া বসিয়াই রহিলেন। সে কম্যুনিষ্ট আমার সঙ্গে তো ঝগড়া কাহারও নাই। 'Beware of those whose God is in the skies'-ইত্যাদি বলি। ফুলাতর পর্যন্ত ট্যাক্সী ভাড়া ৫টাকা। ইহার পর অনেকী-জীবনের বাসায় যাই। তাহার off-day ছিল। সে বাসায়ও নাই। ইহার পর শনিবারের চিঠির সজনীবাবুর

ওখানে যাই। বাড়ী ছিলেন না কিন্তু শরৎই আসেন। বেণু তাঁর ব্যবহারে ভরিলেন উজ্জ্বলতারও পড়েন। সীতা বাহির হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসে প্রথমে নলিনী কিশোর গুহের সঙ্গে কথা হয়। তাহার পর সুরেশ মজুমদারের সঙ্গে কথা তাহার ঘরে। ঠাকুর ও শ্রীরামকৃষ্ণের পার্থক্য কোথায় তাহা বলি। মনোযোগ দিয়া শোনে। আমার সঙ্গে ইহাদের পূর্ব সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া আমাকে এই কাগজ বেচার ব্যাপারে সাহায্য করিতে বলি। উজ্জ্বলতারও বাবে এটা দেয়। সেখান হইতে ঐ একই ট্যাক্সীতে মনোরঞ্জনকে পথে নামাইয়া মঠে আসি। বেণু চলিয়া যায়, আমি আসি ৯ টার পর। বাকী উজ্জ্বলতারও আজ যায়।

৩রা এপ্রিল

ঠাকুর, সকল মতের মাঝে যখন প্রাণ-পথ ধরিয়া আমি চলিব, এ কূল ও কূলে কিছুর না, তোমার চরণ চাহিয়া চলিব। তোমার কোন্ কথা বলিবার জন্য তুমি আমাকে এই সংসারে পাঠাইয়াছ, তুমিই তাহা জান। 'বাঙ্গলায় কাজ আছে, সেখানে যাও'—ইহাই ছিল পৌষরূপে তোমার নির্দেশ। ব্রহ্মধামে কুহুর-সরোবরে ঐ নির্দেশ তুমি দিয়েছিলে। আমার কত দিনে দেখা হইবে? তোমাই মত কোনও প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া তেমনি করে জগতে শুধু প্রেম বিলাইব। কিছু চাহিব না। তুমি কিছু চাও নাই, পাও-ও নাই। আমরা অকৃতজ্ঞ। তোমার আনন্দই ছিল সকল তুমি নিজেকে দিয়া নিজে আসিয়াছিলে, নিজেই চলিয়া গেলে। আমার জীবনে তোমার জয় হউক। আমি তোমার তুমি আমার। বেণু ঠাকুরের বাণী বহাইয়া ঠিক করিতে থাকে। সকালে সিদ্ধিরের গাড়ীর বিনয় মজুমদার আসে। বেণু খুব তোরে সুবোধ দে ও রেজাউল করিমের ভাই-এর ওখানে যায়, সুবোধ দে-কে উদ্বোধন গান দিয়া আসে। সে উৎসবে আসিবে, উৎসবের জন্য ১০ টাকা দেয়। মৈত্রেয়ীদেবী পায় না। ৪টার পর মঠে যাই। প্রস্তুতি চলিতেছে। ওখানে সবকিছু খোয়া যায়, কাঁটা, অফিসের ফাইল, টাকা, কোদাল সবই চোরা যায়। অদ্ভুত অবস্থা। কোনও দুইজনের মধ্যে মিল নাই। অধর্ম বলিয়া কোন জিনিষ নাই। যে যাহার সুবিধা আদায়ে ব্যস্ত। ইহাদের লইয়া কাজ করা খুবই কষ্ট যাহা হউক, বাঙ্গলার সাধনের ঠাকুরকে যে-ভাবে উপস্থিত করা হইল, তাহা সর্বজনগ্রাহ্য হইবে—এই বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত, তৃপ্ত। কিন্তু এই আলোচনা মিটাইয়া রাখিবে কে কেমন করিয়া? ইহার পর কি বেণু থাকিবে? ৯ টার পর মঠ হইতে ফিরি। বৈকালে ফিরিয়া আসে···

৪ঠা এপ্রিল

ঠাকুর, তুমি বিশ্বস্রষ্টা, বর্তমান বিশ্ব গড়িয়া তুলিতে আসিয়াছ, বর্তমান যুগের দর্শন প্রদান করিয়া পোষণের বলে শোষণ ভাঙার জর্জরিত বিশ্বকে জুড়াইতে আসিয়াছ, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিশ্বকে এক-বিশ্বে গড়িয়া তুলিতে আসিয়াছ। তুমি কথা কও, তোমার বাণী বিশ্বমানবের হৃদয়ে সঞ্চারিত কর। তোমার বিপ্লবন জীবনের অগ্নিময়ী বাণী ছড়াইয়া বিশ্বকে আপ্লাবিত কর। তোমাকে প্রতিষ্ঠিত না দেখিয়া গেলে আমার যে মরিয়াও সুখ হইবে না। আমাকে বল দেও, বল-ভরসা দেও, সুযোগ দেও। তোমাকে বিশ্ব মন্থন করিয়া ধরিয়া তুলিব। আমি ও বেণু সকালের জলখাবার না খাইয়া ট্যাক্সীতে ৬এ পার্ক সার্কাস এক্সটেনশন-এ শৈলেন সেনের ওখানে যাই। ধীরেনকে নিয়া গিয়াছিলাম। একজন বৌদ্ধ পুরোহিত ঠিক করিয়া দিতে বলিলাম যিনি ২৭শে চৈত্র প্রার্থনা করিতে পারেন। ইহার পর বাসে চলিয়া আসি। বেণু ১২টার পর প্রথমে স্ট্যাণ্ডার্ড বটোতে গিয়া রক ও (?) সে পরে আশুবাবুর ওখানে যায়, পরে মনোরঞ্জন বসুর ওখানে যায়। মনোরঞ্জনও কাল ৪টায় আসিবে। আমি ৪টার পর মঠে যাই। বেণু তখনও ফেরে নাই। ২নম্বর কার্ড কেনে। বেণু সুবোধ দে-কে উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিবার জন্য ঠিক করিয়াছিল। ইতিমধ্যে প্রকাশ সরকারেরা নাকি গান গাহিবার জন্য লোক ঠিক করিয়াছে। সে yield করিল না। আমিই সুবোধ দে-কে মানুষ করিয়া দিব ঠিক করিলাম। ৪টার পর আসি। আমার

১০ টাকা রেণু সহ মঠে যাই। তখন মাত্র ইহার প্রসাদ পাইয়া উঠিয়াছে। আমি সেবানন্দ মহারাজের পত্র দিব বলা ছিল। তাহা আমি দিব না। তাহাদিগকেই জানাইয়া দিবেন। যোগেন্দ্রকৃষ্ণবাবু ঠাকুরের বড় ছবি করা হয় নাই বলিয়া ধরকাদমকি করিয়া গেলেন।

৫ই এপ্রিল

ঠাকুর, সকলেই তোমার দর্শনে। তোমার যোগেন্দ্রকৃষ্ণও তোমার পূর্ণ আকৃতি ছবি না করিবার জন্য তীব্র ভাষায় সমালোচনা করিয়া গেলেন। কি আর করিব? চুপ করিয়া শুনিয়া যাই। সকলে মিলিয়া তোমার মঠ ও সম্প্রদায়কে কোথায় টানিয়া লইয়াছে, ভাবিলে যে-কোন মানুষের বেদনা উপস্থিত হয়। ইহাদের কোনও দুঃখ নাই। বেশ আছে। আমাকে শক্তি দেও, সুযোগ দেও তোমার কার্যকে সুসম্পন্ন করিবার। বড় ব্যথা ঠাকুর। সকলের সব আছে, আমার তুমি ছাড়া কিছু নাই। ধন আমার নাই, জন আমার নাই। যাহারা সঙ্গে আছে তাহারা অসুখে বিসুখে কেমন করিয়া আসিবে? খুব ভোরেই মঠে একবার যাই রেণু সুযোগে যে-গো তাহার উদ্বোধন গানে হইবে না বলিয়া আসে। দুদুর আসে ২টার পূর্বে:...উৎসবের জন্য (পাবনা হইতে) কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে জানবাবু ৫টাকা, কিতীশবাবু ২টাকা, রাধাচরণবাবু ১টাকা, (?) বাবু ১টাকা, যোগমায়া-সুচারু ।৵ করিয়া। ঠিক ৩টায় মনোরঞ্জন বসু আসে। প্রথমে সুরেশ দাসের ওখানে যাই। সে ২০ টাকা দেয়। পরে বসুমতী—যামীনবাবুকে পাই না। 'সমন্বয়মূর্তি' নিত্যগোপাল রাখিয়া আসি। পরে ভারতবর্ষ ও সংহতি। দেখা হয় না। পরে মৃগাঙ্কর, অমৃতবাজার। অনেকী অফিস, যজ্ঞেশ্বরবাবু, বড় ও ছোট নির্মল ঘোষ, পি রায় প্রভৃতির সঙ্গে দেখা ও কথা হয়। রেণুর লেখাটা দিয়া আসা হয়। পরে আনন্দবাজারে যাই। নলিনী গুহ ও হরিপদ মহাদায়ীসের সঙ্গে দেখা ও কথা হয়।...ওখান হইতে সেনের বাসা হইয়া ট্যাক্সীতে মঠে আসি। আমি ফিরি ৯॥টার পর। রবীন আসিয়াছিল। সে 'নিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে' লইয়া যায়।

৬ই এপ্রিল

বিশ্বেশ্বর নিত্যগোপাল আমার, তোমার শ্রীচরণতলে সর্ব দর্শন, সর্ব ধর্ম, সর্ব সৃষ্টি সমর্পিত। তোমার জীবনের স্পর্শে বিশ্বসত্য ফুটিয়া উঠিবে—ইহারই সূচনা তোমার জন্ম ১২৮১ সনের চৈত্র মাসের বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে। তোমাকে বুকে লইয়া বিশ্ব জয়ের অভিযানে বাহির হইয়াছি। আজ তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে যুক্তের দল নাচ সুরু করিয়াছে। ভিতরে ভিতরে একটা জীবন গড়িয়া উঠিতেছে, তাই এই মরণ ছড়াইয়া পড়িতেছে। তোমার নামে যাহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা তোমার কেউ নন। এ যেন বাষ্টিদেহের মধ্যে তারুণ্যের জন্ম হইতে চলিয়াছে। সকলেরই তাত্ত্বিকীবাবুর উপর রাগ। আসল কথা, রাগ মূলতঃ আমার উপর। সামনে পায় তাত্ত্বিকীবাবুকে, সে-ই মার খায়। যে-দর্শন প্রচারিত হইতেছে, তাহাই তাহাদের ভীতির কারণ। কিন্তু সে কথা বলিবার মত সাহস বা শক্তি নাই। তোমার জয় হউক। সকালে মঠে যাই। বই বিক্রয়ের স্থান ঠিক করিয়া দুইটী সাধুর হাত এক আয়গায় আনিয়া জুড়িয়া দিয়াছেন। নগেনদাদাই করেন। ৩টার সময় নলিনেশ্বরবাবু (চারুবিকাশ) যান। তাঁহার গাড়ীতে ফিরি। তিনি রৌদ্রের মধ্যে বিন্দুদা ছাড়া দাতব্যাতে না করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন আমি ৪টায় উদ্বোধনীসহ মঠে যাই। কেহই সময় দিক দেখিয়া কাজ করে না। তাত্ত্বিকীবাবু একা কত করিবেন? যেখানে যাহা কিছু ত্রুটী, সেজন্য তিনিই তিরস্কৃত হন। গভর্ণমেন্ট সেক্রেটারী পত্র দিয়াছেন তাঁহার সহকারী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে নিমন্ত্রণ করিতে এবং ঐ দিনের কর্মসূচী পাঠাইতে। তাই প্রোগ্রাম ছাপাইবার কথা ঠিক হয়। নিত্যগোপানন্দ আসেন। ছুলালবাবুর উপর টাকা বাবের ভার দেওয়া হইল। দিনের অনুপিতশুন হইয়াছে বীরেন ডাক্তার বলিল। কাল হইতে মঠের খাওয়াদাওয়ার ভার সত্যব্রতীর উপর যাইতেছে। তারমণ্ডহারবার হইতে চাল আসিয়া না পৌঁছাইবার জন্য সকলেই চিন্তিত। নীলরতনবাবুর ভাইপো সঙ্গে আছে। রেণু বসুমতীতে যামীনবাবুর সঙ্গে দেখা করে, ম্যাট দিয়া আসে, প্রুফ দিয়া আসে।

ছাপাইবে বলিলেন।

৭ই এপ্রিল

ঠাকুর, প্রার্থনাতে আমরা তুমি আসিয়াছিলে 'প্রাণ' লইয়া। অথচ তোমার চরণাশ্রিত আমরাই আজ সর্বাপেক্ষা প্রাণহীন, অসার, ছন্ন-ছাড়া। কোথায় আমরা প্রাণবান হইয়া, সংঘবদ্ধ-সংহত হইয়া দেশকে প্রাণধর্ম শিক্ষা দিব, আজ আমরাই কিনা সব চেয়ে অসংহত। ঠাকুর, আমরা যে প্রতিপদে তোমার প্রাণেরই অবমাননা করিতেছি। আমাদের দেখা কি আমাদিগকে লজ্জা দিবে না? ঠাকুর, প্রাণ দাও, সংহত কর, শুচি কর, শুদ্ধ কর। কি আবর্জনা আমাদের মধ্যে জমা হইয়াছে! রক্ষা কর এই পোচনীয় অবস্থা হইতে! আমাদিগকে সংহত কর। ছয়টার মধ্যে মঠে যাই। প্রায় ৮টার পূর্বেন্দুমোহন কৌমিকের নেতৃত্বে মেদিনীপুর হইতে ১১টী স্বেচ্ছাসেবক আসে। উহাদের চিঁড়া-গুড় খাইতে দেওয়া হয়। পূর্বেন্দুর ২টী মেয়ে—রাজশ্রী ও অরুন্ধতী আসে। ১১টার পর রিক্সায় আসি। তারিণীবাবু স্নেহেন্দ্রপ্রসন্ন ঘোষের বাড়ী যায়, নিমন্ত্রণ করিয়া আসে। আমার 'নিত্যগোপালে—দর্শনে ও জীবনে' উহাতে ১খানা নেই। ১১টার পর আমি ও বেণু রিক্সায় মঠে যাই। তখন মঠে সকলে প্রসাদ পাইতে বসিয়াছে। ৩টার পর সুষমা, গোপা, উষারিণী ও কুসুম বাবুরা আমার খাবার নিয়া যায়। মেদিনীপুরের উহাদের জন্য কলা ছানা, ২৩ জনের জন্য সন্দেশ নিয়া যায়। প্যাণ্ডেল বেশ সুসজ্জিত হইয়াছে। সকলের চিন্তা খুব হইয়াছে। বেণু ২টা হইতে জগদীশ প্রেসে। কেরে মঠে ৩টার পূর্বে। ১০ইয় প্রোগ্রাম ছাপাইবার জন্য। বইগুলির দামের কমতি মূল্য ঠিক করে। পূর্বেন্দু কাঁটা কিনিয়া আনে। প্রধানতঃ সাজাইবার কাজ তাহারা করিবে। ঠাকুর, তোমার উৎসব তুমি কর। বড় বাধা। তোমার ঘরের লোকেরাই বাধা দিতেছে। কোনও প্রশ্নিস বলিয়াছে আমাদের 'ঠাকুরের' উৎসব চলিবে। নিত্যগোপালের উৎসব কত দিন চলিবে? কি আস্পর্দা! ওরে তোদের গুরু আর আমাদের গুরুর তুলনা? আমাদের গুরু রূপে গুণে যোগ্যতায় নরোত্তম। আর তোদের গুরুরা পচা গোবর ছাড়া কিছু নয়।

৮ই এপ্রিল

ঠাকুর, তুমি ক্ষমার সাগর, আমরা তোমার বড়ই অপমান করিয়াছি। পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, তুমি পচা গোবরের ঘুঁটে তৈয়ার করিতে আসিয়াছ। ঘুঁটে আমরা হই নাই। আমরা পচা গোবরই রহিয়া গিয়াছি। তুমি বিশ্বনাথ, আমার প্রাণনাথ—বিশ্বের বড় প্রয়োজন আজ তোমাকে দিয়া। স্বপ্রকাশ তুমি প্রকাশিত হও। ২বৎসর পূর্ব হইতে তোমার শতবার্ষিকীর ধ্যান করিয়া আসিয়াছি। সাধ মিটাইয়া কিছুই করিতে পারি নাই। তোমার উৎসব তুমি কর। তুমিই তো শতবার্ষিকীর সভাপতি। তুমিই আজ-উৎসব, চির-উৎসব। আজ আজ-উৎসব, চির-উৎসব এক হউক। স্বামী আত্মবোধ, তোমার জয় হউক। আমি ৭টার মধ্যে যাই। বেণু যমুনা গোপা কুসুম উষারিণী পরে যায়। উহারা কিছু আগে আসে। আমি ও কুসুম রিক্সায় ১১টার পর আসি। আবার ২টায় আমি ও বেণু যাই ঠাকুরের ছবি লইয়া রিক্সায়। উষারিণী যমুনা বাবু পূর্বে যায়, গোপাও যায়। বিকালের জলখাবার দশ গ্রামের ছেলেদের জন্য সুজির পায়স নিয়া যাই, আমরাও খাই। সব রকমের এলোমেলোর মধ্য দিয়া কাজ চলিতেছে। সন্ধ্যার পর তুলসী ঘোষ বিশ্বনাথ রায় সহ আসে। উহার সঙ্গে নিত্যগোপালের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। অনন্তবাবু সকালে ও বৈকালে উপস্থিত ছিলেন। অরবিন্দ ও নিত্যগোপাল দর্শনের পার্থক্য কোথায়, তাহারও আলোচনা হয়। বীরেনবাবু ঠাকুরের বড় ফটো আনেন প্যাণ্ডেলে বসাইবার জন্য। বইয়ের স্টল খোলা হয়। বেণু সুষমা বাবু প্রভৃতি বই বিক্রী করিবে। আজ যে যোগাদিন — ও — করিয়াছে, ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ (শ্যামসুন্দরানন্দ ছাড়া) যেভাবে অসহযোগ করিয়া আছে, তাহা অমার্জনীয়। ইহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ঠাকুর, ইহার ব্যবস্থা কর। ৯টার পর বেণু প্রভৃতি ফেরে। আমি ও কুসুম ফিরি প্রায় ১১টায়। দশগ্রামের ছেলেরা বেশ কাজ করিতেছে।

৯ই এপ্রিল

শ্রীনিত্যগোপাল-জন্ম

নিত্যগোপাল, বিশ্বাত্মন্, গৌরীদুলাল, আনন্দময়ীর পরাণপুত্তলী তুমি এক শত বৎসরের ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছ, এক শত বৎসরের ইতিহাস তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছে। আজ বিশ্বের কি উৎসব! তোমার জন্ম-জন্ম আমার জীবনে, যাহারা আমার ছিল, আছে ও আসিবে তাদের জীবনে অমিয়া উঠুক। তুমি আমার প্রিয়তম। আমার সব কিছু তুমি, তুমি আমিময়। তুমি প্রাণারাম, প্রাণ-বল্লভ। তুমি আর আমি, আমি আর তুমি, তুমি আমি আমি তুমি। তোমার আবির্ভাবে জগৎ মুক্ত হউক। সকালেই মঠে যাই।—'Jagaduanda Centenary' নামে একটী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছে। উহাতে এখানের কোন উল্লেখ নাই। কি এদের দুর্ভেদ্য ঘুণীয় কূটনৈতিক চাল। ইহারাই উহারা নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়াল মারিতেছে। রেণু প্রভৃতি ওখানেই প্রসাদ পায়। আমি ও প্রতিভা ১২টার পূর্বে আসি। ১২টার পর যাই। ঈশ্বর প্রামাণিক ও গোপাল দাস আসে। অভিভাষণ বিলি হয়। রাজাপাল, পালপাল বসু, পুলিন্দা রতন, জনার্দন চক্রবর্তী, ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা দেন। রাজ্যপালের আসিবার পথে লাল শালু পাতা হইয়াছিল। উহা তিনি পছন্দ করেন নাই। 'আপনারাও যদি করেন, তবে আর কি বলিব?'—বলিলেন। আমি আমার ভাষণ মুখে একটু বলার পর জনরঞ্জনবাবু উহার ৮পৃষ্ঠা ও শেষ অংশটুকু পড়েন। একজন মাদ্রাজী খৃষ্টান পাদ্রী, রেভারেণ্ড কলিমের ভ্রাতা মইনউদ্দিন, একজন শিখ ও কৃষ্ণপ্রিয়ার প্রার্থনা করেন। বন্ধুদের মধ্যে সুহৃৎবাবু, প্রিয়দারঞ্জনবাবু, বিভেশ গুহ, নরীবাবু, মন্মথ দাস, প্রিয়রঞ্জনবাবু, উপেন ধর প্রভৃতি অনেকে আসিয়া ছিলেন। সভা ভাল হইয়াছে। প্রেস রিপোর্টারগণ সভার ফটো নেয়। অনাথবন্ধুর ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা হইতে পারিল না। লোকের এত ভিড়। মাইকের বন্দোবস্ত থাকিলে হয়ত হইত। ৩০টায় আমি, সুধাংশু, রেণু ও সুষমা বাসে আসি। রেণু সুষমা বিমল প্রভৃতি বুক-স্টল চালাইয়াছে। ৮০টাকার মত বিক্রয় হইয়াছে। মন্দিরে ১১০টাকার মত সংগ্রহ হইয়াছে।

১০ই এপ্রিল

ঠাকুর, এইবার তুমি বাঙ্গলার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইলে। এইবার নিজের পথ তুমি নিজে করিয়া লও। আমি প্রাণপণ দিয়া তোমার পথের কাঁটা তুলিয়া দিবার জন্য থাকিব, যাহাতে তোমার পায়ে কণ্টক বিদ্ধ না হয়। আমার তুমি ছাড়া কিছু নাই। তুমি আমি, আমি তুমি। তুমি আলো, আমি ছায়া। আমি আমার দেহপ্রাণমনে তোমাকে বহন করিব। মানুষ আমাকে দেখিয়া তোমাকে দেখিবে, আমায় ছুঁইয়া তোমাকে ছুঁইবে। আমায় তেমন করিয়া গড়িয়া তোল। তোমার এই বিজয় অভিযান সফল হউক। রাত্রিতায় আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে গভর্ণর বক্তৃতা দিতেছেন এই ছবি দিয়া আমার অভিভাষণের অনেকখানি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে গোপাল ও ঈশ্বর উপস্থিত ছিল সারা দিন। মেদিনীপুরের ছেলেদের কর্মের সুখ্যাতি সকলেই করিয়াছে।...বই বিক্রয়ের স্টল বেশ ভালই চলিতেছে। ২টায় আবার যাই। ৪টায় মনের মিলাইয়ের গান (নীলাচল লীলা) আরম্ভ হয়। দারুণ সময় round দেই। স্টলের ওখানে মাঠে মাঝে বসি। বেশ ভিড় হইয়াছিল। তবে অসম্ভব হয় নাই। চৈতন্যের বড় ভাই বলেন, ঠাকুর আপনার নিকট তাঁহার চাবি রাখিয়া গিয়াছেন। জনরঞ্জনবাবুও বলেন, পুরুষোত্তমের medium-এ ঠাকুর প্রচারিত হইবেন: সমস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য। কে আমায় এই ধৃষ্টতা সহ্য করিবে? রাত ১১৸টায় যাত্রা শেষ হয়। ১২টার পর রওয়ানা হই আমি বিভাস...। ঠাকুরের কিছু ভক্তের আমার উপর দৃষ্টি পড়িয়াছে। ঠাকুর, তুমি আমাকে রক্ষা করিও। গোপালদাস অধিকারী ২০টাকা নিজে দিয়াছে, ১০ টাকা আদায় করিয়া দিয়াছে। উহারা সব দিক দিয়া আমার সেবা করিয়াছে। উহারা ঠাকুরের আশীর্বাদে ধন্য হউক। ঈশ্বর যাত্রার সময় সমস্ত ক্ষণ উপস্থিত ছিল। ছেলেরা নীলাচল লীলার প্রোগ্রাম, ঠাকুরের বাণী বিক্রয় করিয়াছে। লীলার ছেলে নরেন আমার অনেক সেবা করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ছিল।

১১ই এপ্রিল

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

সপ্তশ্লোকাত্মং সিদ্ধান্ত

বেদান্তমতানুসারে যাহার বহুতা আছে, তাহাই অবিদ্যার বিকাশ। একোনত্রিংশাধিকশত শ্লোকে ত্রিবিধ বৃত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ শ্লোকানুসারে ভাব-বৃত্তি অবলম্বনে ভাবত্ব লাভ করা যায়, শূন্য-বৃত্তি অবলম্বনে শূন্যতা লাভ করা যায়, এবং ব্রহ্ম-বৃত্তি অবলম্বনে ব্রহ্মত্ব লাভ করা যায়। ব্রহ্ম-বৃত্তি যেটি, পূর্ব্ব প্রমাণানুসারে সেটীকেও অবিদ্যা,অনাত্মার বিকাশ বলা যাইতে পারে। সুতরাং তাহা যদি ব্রহ্মত্বের কারণ হয়, তাহা হইলে সৎ পূর্ব্ব-বাক্যই বা ব্রহ্মত্বের কারণ হইবে না কেন? অন্ধকার দ্বারাও অন্ধকার তিরোহিত হয় না। অন্ধকারের বিপরীত আলোক দ্বারাই অন্ধকার তিরোহিত হয়। তবে ব্রহ্মত্বের বিপরীত যাহা তাহা দ্বারাই বা ব্রহ্মত্ব লাভ হইবে না কেন? ক্ষুধার দ্বারা ত ক্ষুধা নিবারিত হয় না, খাদ্যের দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়; ক্ষুধাই খাদ্য নহে বলিয়া প্রকারান্তরে খাদ্য ক্ষুধার বিপরীত বটে। তৃষ্ণার দ্বারা তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় না, জলদ্বারা তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয়! তৃষ্ণাই জল নহে বলিয়া প্রকারান্তরে জল তৃষ্ণার বিপরীত বটে। ঐ সকল উদাহরণের ন্যায় ব্রহ্মত্বের বিপরীত যাহা তাহা দ্বারাই বা ব্রহ্মত্ব লাভ হইবে না কেন?—

'ভাববৃত্ত্যা হি ভাবত্বং শূন্যবৃত্ত্যা হি শূন্যতা।
ব্রহ্মবৃত্ত্যা হি ব্রহ্মত্বং তথা পূর্ণত্বমভ্যসেৎ॥ ১২৯'

শ্লোকে ব্রহ্মত্ব নামক পূর্ণত্ব অভ্যাস করিতে বলা হইয়াছে। বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য্যের মতে আত্মাই ত ব্রহ্ম। তবে আর অভ্যাসদ্বারা সেই আত্মার ব্রহ্মত্ব নামক পূর্ণত্ব লাভ করিতে হইবে কেন? বেদান্তানুসারে কোন কারণেই নির্ব্বিকার আত্মা-ব্রহ্ম অনাত্মা অব্রহ্ম হন না। তিনি তাহা হন স্বীকার করিলে আত্মা-ব্রহ্মকে নির্ব্বিকারও বলা যায় না। তাহা হইলে তিনিও পরিণাম-বিশিষ্ট অবিদ্যা অনাত্মা প্রকারান্তরে স্বীকার করা হয়।

অষ্টমকাণ্ডং সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের দ্বাত্রিংশাধিকশত শ্লোকে বলিয়াছেন,

'যে হি বৃত্তিং অহাত্যেনাং ব্রহ্মাধ্যাং পাবনীং পরাং।
তে তু বৃষৈব জীবন্তি পশুভিশ্চ সমা নরাঃ॥'

আত্মা এক। সুতরাং সেই আত্মা শব্দের পরিবর্ত্তে বহুবাচক 'যে' কিম্বা 'তে' শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। শঙ্করাচার্য্যের মতেই আত্মা ব্রহ্ম। সুতরাং তাঁহার ব্রহ্ম-বৃত্তি অবলম্বনের অথবা তাহা পরিত্যাগেরও প্রয়োজন হয় না। সেই ব্রহ্মাত্মাই জীব স্বীকার করিলে তাঁহার ব্রহ্ম-বৃত্তি অবলম্বন কিম্বা পরিত্যাগের প্রয়োজন হয় না। কারণ শঙ্করাচার্য্যই ত তাঁহার ব্রহ্ম-নামাবলী মালা নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। মাণ্ডুক্যোপনিষদের মতে শিব ও ব্রহ্ম অভেদ। সেইজন্যই জীবন্মুক্ত-গীতা অনুসারেও বলা যাইতে পারে,

'জীবঃ শিবঃ সর্ব্বমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ'।

একোনষষ্টি সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে,

যে হি বৃত্তিং বিজানন্তি ত্যক্ত্বাপি কর্ম্মবৃত্তি যে।
তে বৈ সৎ পুরুষা জ্ঞেয়া ব্রহ্মাত্মে ভুবনত্রয়ে॥ ১৩১
যেষাং বৃত্তিঃ সমাবৃত্তা পরিপক্কা চ না পুনঃ।
তে বৈ সদ্ব্রহ্মতাং প্রাপ্তানেতস্মে শঙ্করাধিনঃ॥ ১৩২

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। সুতরাং সেই ব্রহ্ম-জীবের আবার ব্রহ্ম-বৃত্তি জানিবারই বা প্রয়োজন হইবে কেন? তিনি সেই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহার তাহা রক্ষিত করিতেই বা হইবে কেন? শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্মই ত সৎ। তাঁহারই মতে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ। সুতরাং তাঁহারই মতে ব্রহ্ম-জীব অসৎ কোন প্রকারেই নহেন। অতএব সেই ব্রহ্ম-জীবকে সৎ পুরুষ বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে ব্রহ্ম-বৃত্তি অবগত হইয়া তাহা রক্ষিত করিলে তবে তাঁহাকে সৎ পুরুষ বলা যাইতে পারিবে ইহা বিবেচনা করিও না। শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক জীব-ব্রহ্মের অভেদত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় অত সেই ব্রহ্ম-জীব স্বভাবতই ত সৎ পুরুষ। শঙ্করাচার্য্যের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া সেই সৎ-পুরুষ ব্রহ্ম-জীবকে অপর কেহ বন্দনা করিবার ত নাই। নিজেকে নিজে কেহ বন্দনা করে না। তাহা করিবার প্রয়োজনও হয় না। অপরোক্ষানুভূতির দ্বাত্রিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে যাহাদের ব্রহ্মবৃত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহা পরিপক্ক হয় তাঁহারাই সদ্ ব্রহ্মতা প্রাপ্ত হন। শঙ্করাচার্য্যের মতেই ব্রহ্ম-জীবাত্মাকে সদ্ব্রহ্ম বলা অসঙ্গত নহে, কারণ তাঁহারই মতানুসারে-ব্রহ্ম-জীবাত্মাই সদ্ব্রহ্ম সুতরাং সেই ব্রহ্ম-জীবাত্মার সদ্ব্রহ্ম লাভের প্রয়োজন নাই যাহারা শঙ্করাধী, তাঁহারা সদ্ব্রহ্মতা প্রাপ্ত হন্ বলা যায় না, কারণ তাঁহারাও ত শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে অব্রহ্ম-জীবাত্মা নহেন। শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে যে তাঁহারাও সদ্ব্রহ্ম, সুতরাং তাঁহাদেরই বা সদ্ব্রহ্মতা প্রাপ্তির প্রয়োজন কি? শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে বহু জীবের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করা যায় না। তিনি যে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ বলিয়াছেন। অতএব তাঁহার সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-জীবাত্মা যে বহু, তাহা তাঁহার অপরোক্ষানুভূতির দ্বাত্রিংশাধিকশত শ্লোকে 'যেষাং' 'তে' 'শঙ্করাধিনঃ' শব্দত্রয় ব্যবহারে তাঁহার পরিচয় দেওয়া উচিত হয় নাই।

ষষ্টি সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,

মূলং ব্রহ্মবার্ত্তায়াং বৃত্তিহীনা সুরাগিণঃ।
তেন্যজানিতয়া নূনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ॥ ১৩৩

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শঙ্করাচার্য্যের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ। সুতরাং বহু-জীবও স্বীকার করা যায় না সেইজন্য ঐ অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের দ্বাত্রিংশাধিকশত শ্লোকে বহুবচনে 'বৃত্তিহীনাঃ' 'সুরাগিণঃ' প্রভৃতি বলা উচিত হয় নাই। কারণ শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারেই এক ব্রহ্ম-জীবাত্মাই বর্ত্তমান। তাঁহারই মতে বহু ত নাই। শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্মই যে জীব। সুতরাং ব্রহ্ম-বৃত্তিহীনই বা কাহারা? শঙ্করাচার্য্যের মতে যে জীব স্বয়ং ব্রহ্ম, তাঁহাকে সদ্ব্রহ্মতা প্রাপ্তির জন্য ব্রহ্ম-বৃত্তিই বা অবলম্বন করিতে হইবে কেন? তিনি যে স্বয়ং ব্রহ্ম,

তাঁহার ব্রহ্মত্ব লাভের জন্য সাধনাই বা করিতে হইবে কেন? স্বয়ং যিনি ব্রহ্ম, তিনি কি হইবার জন্য সাধনা করিবেন? ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ত কিছুই নাই। ব্রহ্ম-জীবই নিশ্চয় ব্রহ্ম-ব্যতিরেকেশন, এবং তিনিই আপনাতে এবং আপনার বিষয়ে অজ্ঞানী, সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? বেদান্ত মতে নির্বিকার নিরঞ্জন ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য্যের মতে সেই ব্রহ্মই আত্মা, সেই ব্রহ্মই জীব। সুতরাং সেই নির্বিকার ব্রহ্ম-জীবাত্মার অজ্ঞান থাকা অতি অসঙ্গত। তাঁহার নির্বিকারত্ব জন্য অজ্ঞানতা নাই বলিয়া তাঁহার সেই অজ্ঞানতার জন্য বারম্বার গমনাগমন হয়ও বলা যায় না। বৈদান্তিক জ্ঞানী গ্রন্থমতে ব্রহ্ম-জীবাত্মা কোন্ স্থানে নাই? উক্তমতে তিনি যে সর্ব্বত্রে পরিপূর্ণ। কোন স্থানেই ত তাঁহার অভাব বলিতে পারা যায় না। তবে তিনি কোথায় গমনই বা করিবেন, এবং তাঁহার কোথায় আগমনই বা হইবে। শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারেই সেই ব্রহ্ম-জীবের কোথাও গমন করিবারও স্থান নাই এবং তাঁহার কোথাও আগমন করিবারও স্থান নাই।

একষষ্টি সিদ্ধান্ত

অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের চতুস্ত্রিংশাধিকশত শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,

নিষেধার্হং ন তিষ্ঠেত্তি বৃত্তিং ব্রহ্মময়ীং বিনা।
ইদং তিষ্ঠেত্তি ব্রহ্মাত্মাঃ সদাকাশাঃ শুভাশয়াঃ॥'

উক্ত শ্লোকের প্রথম চরণে কর্ত্তা নাই। ঐ চরণের অর্থ ব্রহ্মময়ী-বৃত্তি বিনা নিষেধার্হ থাকেন না। কিন্তু ঐ চরণে বলা হয় নাই যে ব্রহ্মময়ী বৃত্তি বিনা নিষেধার্হ কাহারা থাকেন না?

শঙ্করাচার্য্যের মতে

'কার্য্যে কারণতা ভাতা কারণে নহি কার্য্যতা।
কারণত্বং ভবেন্নিত্যং কার্য্যাভাবে বিচারতঃ॥ ১৩৫'
অথ শুদ্ধং ভবেদ্বস্তু বচসাবগোচরম্।
দ্রষ্টব্যং মৃদ্ঘটেনৈব দৃষ্টান্তেন পুনঃ পুনঃ॥ ১৩৬॥"

কার্য্য, কারণের অস্তিত্ব প্রমাণ করে সত্য; কিন্তু কার্য্যে কারণতা ভাত হয় না। কার্য্য কখনই কারণোৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। কারণ হইতেই কার্য্য বিকাশিত হয়, কার্য্যে কারণতা বিদ্যমানও নাই। তবে কার্য্য, কারণের পরিচায়ক বটে। কার্য্য বা ক্রিয়া-শক্তির আধার বা আশ্রয়ই কারণ তবে 'কারণে নহি কার্য্যতা' কি প্রকারেই বা বলা যায়। কার্য্যাভাবে কারণত্বের অভাব হইতে পারে না। কারণ, কারণ থাকিতে কারণত্বের অভাব হওয়া অতি অসঙ্গত। কার্য্যের বিদ্যমানতা জন্য কারণ নহে। কিন্তু কারণের বিদ্যমানতা জন্য কার্য্য, সেইজন্যই অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের পঞ্চত্রিংশাধিকশত শ্লোকীয় উপদেশ গ্রাহ্য হইতে পারে না। উক্ত গ্রন্থের ষট্‌ত্রিংশাধিকশত শ্লোকীয় বস্তু অর্থে, ব্রহ্মই বুঝিতে হয়। কারণ ঐ শ্লোকীয় বস্তু শুদ্ধ ও বাক্য মনের অগোচর। শ্রুতি ও বেদান্তে ব্রহ্মকেই শুদ্ধ ও বাক্য মনের অগোচর বলা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত শ্লোকীয় শুদ্ধ ও বাক্য মনের অগোচর-বস্তু ব্রহ্ম, ইহাই নিশ্চয় করিতে হয়। সাধারণতঃ বস্তু বলিলে, তাহার অর্থ ব্রহ্মকে বুঝায় না। বাস্তবিক, বস্তু অর্থে ব্রহ্ম নহে। নিয়ত আমি অনেক বস্তুই প্রত্যক্ষ করিতেছি। বস্তু জড়, ইহাই সকলের জানা আছে। আর বহু-বস্তু প্রত্যক্ষ করা হয় বলিয়া, বস্তুও প্রাকৃত বলিতে হয়। প্রাকৃত যাহা, তাহা শ্রুতি, বেদান্ত এবং পাতঞ্জলদর্শনের মতে সত্য নহে। ব্রহ্মও বস্তু বলায়, প্রকারান্তরে ব্রহ্মকেও প্রাকৃত বলা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকীয় ব্রহ্ম-বস্তু বাগেন্দ্রিয় ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলা হয় নাই। সেই ব্রহ্ম-বস্তুকে দর্শন করা যায় না, তাহাও বলা হয় নাই। সেই ব্রহ্ম-বস্তু বুদ্ধির অগোচর তাহাও বলা হয় নাই। ঘট নাশে মৃত্তিকা হয় বলা সঙ্গত নহে। কারণ যখন ঘট থাকে, তখনও ত মৃত্তিকা থাকে। মৃত্তিকাই ত ঘট হয়, তবে ঘট নাশে মৃত্তিকা হয়, না বলিয়া তখনও মৃত্তিকা থাকে বলাই অতি সঙ্গত। শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারেও কার্য্য কারণের অভাব হইলে, যাহা বাক্য-মনের অগোচর সেই শুদ্ধ বস্তু হয় বলাও সঙ্গত নহে। যিনি বাক্য মনের অগোচর শুদ্ধ বস্তু, ব্রহ্ম, তিনি শ্রুতি বেদান্তানুসারেই যে নিত্য-সত্য, সুতরাং তাঁহার হইবার ত প্রয়োজন নাই, তিনি ত আছেনই; সুতরাং তিনি হন্

স্বীকার কখনই করা যায় না। হয় যাহা, তাহা নিত্যই হয়, সুতরাং যাহা হয় এবং যাহা যায়, তাহা কখনই নিত্য-সত্তা-ব্রহ্ম নহে। অতএব সেইজন্যই শঙ্করাচার্য্যের 'অথ শুদ্ধং তদেবস্তু যদ্বৈ বাচামগোচরম্' নির্দ্দেশ স্বীকার করা যায় না। ষট্‌ত্রিংশাধিকশত শ্লোকীয়—

"অথ শুদ্ধং তদেবস্তু যদ্বৈ বাচামগোচরম্"

কোন্ বস্তু হয়? অবিদ্যমান হইতে কিছু ত বিদ্যমান হইতে পারে না। যদি বল, কোন অশুদ্ধ বাক্য-মনের গোচর বস্তু পরিবর্ত্তিত হইয়া শুদ্ধ-বাক্য-মনের অগোচর বস্তু হয়, তাহাও বলিতে পার না, কারণ কথিত ষট্‌ত্রিংশাধিকশত শ্লোকে কিম্বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন শ্লোকে ঐ কথার আভাস পর্য্যন্ত নাই। কথিত ষট্‌ত্রিংশাধিকশত শ্লোকে কিম্বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন শ্লোকে যদি ঐ কথার আভাসও থাকিত, তাহা হইলেও সে কথা স্বীকার করা যাইতে পারিত না। কারণ সবিকার বস্তু নির্ব্বিকার ব্রহ্ম-বস্তু হন্ বা হইতে পারেন, তাহা শ্রুতি কিম্বা বেদান্তে স্বীকার করা হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত কোন শ্লোকানুসারে, স্বয়ং কারণও বাক্য-মনের অগোচর শুদ্ধ-বস্তু হন্, বুঝিবার কোন প্রমাণও নাই।

দ্বি-ষষ্টি সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতে—

"অনেনৈব প্রকারেণ বৃত্তি র্ব্রহ্মাত্মিকা ভবেৎ।
উদেতি শুদ্ধচিন্তানাং বৃত্তি জ্ঞানং ততঃ পরম্॥ ১৩৭॥"

অপরোক্ষানুভূতির ষট্‌ত্রিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে বাক্যমনের অগোচর শুদ্ধ বস্তু ব্রহ্ম হইলে, কেবলাত্ম ত হইতে হয়। তখন নিশ্চয়ই কোন প্রকার বৃত্তির সঙ্গে সংস্রব থাকে না, সে অবস্থায় নিজে কি, সেই জ্ঞানই হয়। সে অবস্থায় ব্রহ্ম-বৃত্তি জ্ঞানেরও প্রয়োজন থাকে না, সে অবস্থায় ব্রহ্মাত্মিকাবৃত্তিরও প্রয়োজন থাকে না, সে অবস্থায় আত্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন প্রকার জ্ঞানই থাকে না। বৃত্তিও ত বহু এবং নানা প্রকার, সুতরাং কোন বৃত্তিই অপ্রাকৃত নহে। সুতরাং যাহা প্রাকৃত, তাহার সহিত বাক্য-মনের অগোচর শুদ্ধ-বস্তুর কোন সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। সেই বাক্য-মনের অগোচর শুদ্ধ বস্তু নিজেই ব্রহ্ম। তবে তাঁহার আবার ব্রহ্মাত্মিকাবৃত্তি জ্ঞানেই বা প্রয়োজন কি? তাঁহার ব্রহ্মাত্মিকা বৃত্তিতেই বা প্রয়োজন কি? অপরোক্ষানুভূতির সপ্তত্রিংশাধিকশত শ্লোকে বলা হইয়াছে, 'বৃত্তি ব্রহ্মাত্মিকা ভবেৎ,' ব্রহ্মাত্মিকা-বৃত্তি হয়, সুতরাং শ্রুতি বেদান্তানুসারে তাহা অবশ্যই নিত্য নহে। নিত্য যাহা নহে, তাহাতে বাক্য-মনের অগোচর শুদ্ধ-ব্রহ্ম-বস্তুর প্রয়োজন কি? তবে শঙ্করাচার্য্যের মতে উক্ত বস্তুও হন্। তিনি যে নিজেই তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের ষট্‌ত্রিংশাধিকশত শ্লোকে বলিয়াছেন—

"অথ শুদ্ধং তদেবস্তু যদ্বৈ বাচামগোচরম্"

সুতরাং তাঁহার মতে যে ব্রহ্মাত্মিকা বৃত্তি হয়, তাহার সহিত যে বাক্য মনের অগোচর শুদ্ধ-বস্তু হন্, তাঁহার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে। অথবা তাঁহার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ হইলেও হইতে পারে। তবে আমাদের বিবেচনায় বাক্য-মনের অগোচর শুদ্ধ-বস্তু নিত্য। সুতরাং তিনি হন্ না। তিনি নির্ব্বিকার এবং অপরিবর্ত্তনীয়। শ্রুতি ও বেদান্তমতেও তিনি উক্ত প্রকার। শঙ্করাচার্য্যের সপ্তত্রিংশাধিকশত শ্লোকীয় 'শুদ্ধ চিন্তানাং' আত্মাকে বলা যায় না, কারণ আত্মা ত বহু নন্, তিনি ত এক অদ্বিতীয়। সেইজন্য ঐ শ্লোকে বহুবচনাত্মক 'শুদ্ধ চিন্তানাং' শব্দ, আত্মাবাচক করিয়া ব্যবহার করাই অসঙ্গত হইয়াছে। বেদান্তমতে চিত্তও মায়িক। সেইজন্যই ঐ ষট্‌ত্রিংশাধিকশত শ্লোকে কথিত বাক্যমনের অগোচর যে শুদ্ধ বস্তু ব্রহ্মাত্মা, তাঁহার সহিত সেই চিত্তের কোন সংস্রবই থাকিতে পারে না, সেইজন্যই অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের সপ্তত্রিংশাধিকশত শ্লোকে—

"অনেনৈব প্রকারেণ বৃত্তি র্ব্রহ্মাত্মিকা ভবেৎ।
উদেতি শুদ্ধচিন্তানাং বৃত্তি জ্ঞানং ততঃ পরম্॥"

বলা সঙ্গত হয় নাই।

ত্রি-ষষ্টি সিদ্ধান্ত

"কারণং ব্যতিরেকেন পুমানাদৌ বিলোকয়েৎ।
অন্বয়েন পুনস্তদ্বি কার্য্যং নিত্যং প্রপশ্যতি॥ ১৩৮॥
কার্য্যে হি কারণং পশ্চেৎ পশ্চাৎ কার্য্যং বিসর্জ্জয়েৎ।
কারণত্বং ততো গচ্ছেদবশিষ্টং তদেমুনিঃ॥ ১৩৯॥"

অপরোক্ষানুভূতির উক্ত একোনচত্বারিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে কার্য্যই কারণ বিসর্জ্জন করিতে হয়, এবং সেই বিসর্জ্জন যদি কারণত্ব দোষের জন্যই করা হয়, তাহা হইলে উক্ত অষ্টাত্রিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে 'বাস্তবেনানুমান' ও 'অবয়ানুমান' দ্বারা কারণ নির্ণয় করিবারই বা প্রয়োজন কি? অপরোক্ষানুভূতির অষ্টাত্রিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে বোঝা যায়, কার্য্যদর্শনেই কারণাবধারিত হইয়া থাকে। কার্য্যই কারণ নির্ণয়ের অবলম্বন বলিয়া, অন্ত কার্য্যই কারণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। অপরোক্ষানুভূতির একোনচত্বারিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে কার্য্য বিসর্জ্জন করিলে, অবশিষ্ট কোন্ বস্তু মুনি হন? কার্য্য কারণাতীতে অবশিষ্ট যাহা থাকেন, তাহাই আত্মা, এরূপও যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই নির্ব্বিকার আত্মার আবার মুনি হইবারই বা প্রয়োজন কি? আত্মা কারণ-উপাধি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার আবার মুনিত্ব উপাধি বিশিষ্ট হইবার প্রয়োজন কি? 'অবশিষ্টঃ ভবেন্মুনিঃ' বলায়, আত্মা যে মুনি ছিলেন না, এবং তিনি মুনি নহেন, ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, সুতরাং মুনিত্ব নিশ্চয়ই নিত্য নহে, সুতরাং মুনিও অনাত্মা, সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? অতএব শ্রুতি ও বেদান্তমতে যে আত্মা নিত্য-সত্য নির্ব্বিকার, তাঁহার অনাত্মা-মুনি হইবার প্রয়োজনই নাই।

চতুঃষষ্টি নিদান

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতে—

"ভাবিতং তীব্রযোগেন যদ্যস্ত নিশ্চলাত্মনা।
পুমাংস্তদ্ভি ভবেচ্ছীঘ্রং ভৃঙ্গঃ ভ্রমরকীটবৎ ॥১৪০॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে তীব্র যোগ-দ্বারা 'এক' অন্যকে ভাবিলে, সেই 'এক' অন্য হইতে পারে বোঝা যায়। ঐ দৃষ্টান্তানুসারে তীব্র যোগ-দ্বারা জীব ব্রহ্ম-ভাবনা করিলে, জীব ব্রহ্ম হইতে পারে যদি বুঝিতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মনামাবলী মালার একবিংশ শ্লোকানুসারে 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' কখনই বলা যাইতে পারে না। কারণ ঐ শ্লোকানুসারে জীব-ব্রহ্ম অভেদ স্বীকার করিলে, জীবকে তীব্র যোগ-দ্বারা ব্রহ্ম ভাবিয়া, ব্রহ্ম হইতে হইবে কেন? কারণ শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্মই ত জীব। তবে আর জীবকে ব্রহ্ম ভাবিয়া, ব্রহ্ম হইতে হইবে কেন? কেহ কি আপনাকে ভাবিয়া আপনি হয়? অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের চত্বারিংশাধিকশত শ্লোকে ভ্রমর-কীট ব্যতীত অন্য কোন্ কীট সেই ভ্রমর-কীটকে ভাবনা করিয়া সেই ভ্রমর কীট হয়, ঐ শ্লোকে তাহার উল্লেখই করা হয় নাই। উক্ত চত্বারিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে ভ্রমর-কীট অন্য কোন্ কীটকে ভাবনা করিয়া অন্য কোন্ কীট হয়, কিম্বা অন্য কোন্ প্রকার কীট সেই ভ্রমর-কীটকে ভাবনা করিয়া সেই ভ্রমর কীট হয়, তাহা নিশ্চিত বুঝিবার উপায় নাই। ঐ শ্লোকে কেবল 'ভ্রমর-কীটবৎ' বলা হইয়াছে।

পঞ্চষষ্টি নিদান

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতে :—

"অদৃশ্যং ভাবয়েন্নিত্যং সর্ব্বদেহ চিদাত্মকম্
সাবধানতয়া নিত্যং স্বাত্মানং ভাবয়েদ্ যুধঃ ॥ ১৪১ ॥
দৃশ্যমদৃশ্যতাং নীত্বা ব্রহ্মাকারেণ চিন্তয়েৎ।
বিস্মারিত্বা সুধে তিষ্ঠেদ্বিদ্যাচিত্রমপূর্ব্বকা ॥ ১৪২

অপরোক্ষানুভূতির একচত্বারিংশাধিকশত শ্লোকের অর্থ এই প্রকার বুঝিতে হয়;—"বুধ সতত সাবধানতার সহিত চিদাত্মক সর্ব্বদেহস্থ নিত্য অদৃশ্য আত্মাই ভাবিবেন"। শঙ্করাচার্য্য একবিংশ শ্লোকে 'আত্মা নিত্যো হি সর্ব্বগো' ও ষট্‌চত্বারিংশ শ্লোকে 'সর্ব্বমাত্মেতি' বলায়, কোন দোষ হয় না। দ্বিচত্বারিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে দৃশ্যকে অব্রহ্ম ও অদৃশ্য ব্রহ্মাকারে চিন্তা করা যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে অদৃশ্য ব্রহ্মাকারকে দৃশ্য অব্রহ্মাকারে চিন্তা করাই বা সঙ্গত হইবে না কেন? শঙ্করাচার্য্যের 'সর্ব্বমাত্মেতি' বলায়, দৃশ্য অব্রহ্ম এবং অদৃশ্য ব্রহ্ম অভেদই বুঝিতে হইবে। উক্ত শ্লোকানুসারে ব্রহ্ম নিরাকারও নন্, ব্রহ্ম সাকারও নন। উক্ত শ্লোকানুসারে ব্রহ্ম আকার। কারণ উক্ত শ্লোকে যে 'ব্রহ্মাকারেণ' শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অনেক গ্রন্থেই ব্রহ্মকে নিরাকার করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত

শ্লোকে তিনি সেই ব্রহ্মকেই যে আকার বলিয়াছেন। সেই জন্যই তাঁহার মতে নিরাকার ব্রহ্ম এবং আকার ব্রহ্ম অভেদ। শঙ্করাচার্য্যের মতেও ব্রহ্মাকার। সুতরাং পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক মতে, আকার উপাসনা কখনই ঘৃণনীয় নহে। উক্ত শ্লোকানুসারে ব্রহ্মাকার বলিলে, ব্রহ্ম সাকার কিংবা নিরাকার বুঝিবার কোন কারণই নাই। ঐ শ্লোকানুসারে ব্রহ্ম কেবল আকারই বুঝিতে হয়। দ্বি-চত্বারিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে দৃষ্টকে অদৃষ্ট বোধ করা যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে আকার নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার বোধ করাও সম্পূর্ণ সঙ্গত। উক্ত শ্লোকে 'বিধান্ নিত্য সুখে চিচ্ছিদ্রপূর্ণধীঃ' বলায়, নিত্য সুখের ন্যায় বিধান্‌ও নিত্য, ধীও নিত্য, এবং চিদ্রন্ধ্রও নিত্য স্বীকার করা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের ঐ অংশের অর্থ, বিধান্ চিদ্রন্ধ্রপূর্ণ ধীতে নিত্য-সুখে অবস্থান করেন। বিধান্ নিত্য না নিত্য হইলে, তিনি কখনই নিত্যসুখে অবস্থান করিতে পারেন না, সুতরাং বিধান্ নিত্য আবার বলা হইয়াছে, বিধান্ চিদ্রন্ধ্রপূর্ণ ধীতে নিত্য সুখে অবস্থান করেন। নিত্য-সুখের ত বিরাম নাই, ঐ নিত্য সুখের সঙ্গেই ত চিদ্রন্ধ্র পূর্ণ ধীতে অবস্থান করার কথা বলা হইয়াছে। সেই জন্য উক্ত কথিত 'ধী' ও 'চিদ্রন্ধ্র' নিত্য স্বীকার করিতে হয়। কাহারও মতে, নিত্য শব্দের অর্থ নিয়ত করিলেও নিত্য সুখের বিরাম আছে, স্বীকার করা যায় না। অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের দ্বি-চত্বারিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে বুঝিতে হয়, দৃষ্টকে অদৃষ্টবোধে ব্রহ্মাকারে চিন্তা করিতে পারিলে, তবে সেই জ্ঞানী চিদ্রন্ধ্র চিদ্রন্ধ্রপূর্ণ ধীতে নিত্য সুখে অবস্থান করিতে পারেন। সুতরাং ঐ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্ট আকারকে অদৃষ্টবোধে ব্রহ্মাকারে চিন্তা করিলে, অবশ্যই সেই অর্জ্জুন জ্ঞানাধিকার চিন্তাবলত, সেই অর্জ্জুন জ্ঞানী চিদ্রন্ধ্র অবশ্যই চিদ্রন্ধ্রপূর্ণ ধীর সহিত নিত্য সুখে অবস্থান করিতে পারেন। দৃষ্ট বলিলে, যাহা কিছু দর্শন করা যায়, সে সমস্তই। দৃষ্ট বলিলে, প্রকৃতিও বুঝিতে হয়। যাহা কিছু দর্শন করা যায় অথবা যে সকল বস্তু দর্শন করা যায় সে সকল দৃষ্টকে অদৃষ্টবোধে ব্রহ্মাকারে চিন্তা করিলে, যদি সেই জ্ঞানী চিদ্রন্ধ্রের চিদ্রন্ধ্রপূর্ণ ধীতে নিত্য সুখে অবস্থান হয়, তাহা হইলে নানা পুরাণ তন্ত্রানুসারে পরমেশ্বরের যে সকল মূর্ত্তাকার পূজা করিতে বলা হইয়াছে, সে সকল পূজা করিলে অবশ্যই কথিত ফলাপেক্ষা অতিরিক্ত ফলই লাভ হইবার সম্ভাবনা।

ষটসপ্তি সিদ্ধান্ত

"এতিশ্চৈঃ সমাযুক্তো রাজযোগ উদাহৃতঃ।
কিঞ্চিৎ শঙ্করভাষ্যোক্তাৎ হঠ যোগেন সংযুতঃ॥
সবিশেষং মনো দেহাং কেবলোহহঞ্চ সিদ্ধিদঃ।
শুদ্ধ দৈবতভক্তানাং সর্ব্বেষাং সুলভো ভবেৎ॥ ১৪৪।"

দ্বি-চত্বারিংশাধিকশত শ্লোকে শঙ্করাচার্য্যও রাজযোগ স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত প্রকার রাজযোগ কোন শাস্ত্রসম্মত নহে। তবে যিনি শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারী, উহা তাঁহারই পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইতে পারিবে। উক্ত শ্লোকানুসারে শঙ্করাচার্য্য-কথিত রাজযোগের অনেকগুলি অঙ্গ আছে অবধারণ করা যায়। বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে ঐ প্রকার যোগকে অনাত্ম যোগ বলা যাইতে পারে; কারণ শঙ্করাচার্য্য কথিত রাজযোগ ত আত্মা নহে। শ্রুতি বেদান্ত মতে আত্মা যাহাতে যাহা, তাহাই অনাত্মা। সেই অনাত্মার বহু বিকাশ আছে বলিয়া, সেই অনাত্মারও বহু অঙ্গ আছে স্বীকার করা যায়। অনাত্মার প্রত্যেক অঙ্গের আবার বহু বিভাগ আছে। শঙ্করাচার্য্য কথিত রাজযোগকেও ঐ অনাত্মার এক প্রকার বিকাশ বা এক প্রকার অঙ্গ বলা যায়। উক্ত চতুশ্চত্বারিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে জানা যায়, যাঁহাদের গুরুতে এবং দেবতাতে ভক্তি আছে, তাঁহাদেরই শঙ্করাচার্য্য-কথিত রাজযোগ সুলভ হয়। সুতরাং জানিতে হইবে শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী হইয়া যোগাঙ্গমত অনুসরণ করিলেও ভক্তি অবজ্ঞেয় নহেন। ঐ শঙ্করাচার্য্যের মণিরত্নমালা নামক গ্রন্থানুসারে মুমুক্ষুগণেরও ঈশ-ভক্তিতে প্রয়োজন আছে। তাঁহার উক্ত গ্রন্থের সপ্তদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শ

॥ শ্রীগায়ত্রী যতি ॥

গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক প্রায় একই সময়ে ভারত-গগনে উদিত হইয়াছিলেন।

প্রত্যেক শিক্ষাবিদের শিক্ষাচিন্তা তাঁর জীবনদর্শন থেকে উদ্ভূত হয়। গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখি না। রবীন্দ্রনাথ বেদান্তবাদীদের মত "আত্মাবস্যং ইদং বিশ্বং" মনে করেন না। পরমাত্মার লীলাক্ষেত্র দেখতে পান বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি অণুপরমাণুর মধ্যে; জীবাত্মার উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই পরমাত্মার উপলব্ধি আসবে ও আলোর সন্ধান মিলবে। তাই বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি তাঁর কাম্য নয়, অন্তর বাহির মাঝেই মুক্তির স্বাদ পেতে চান। তিনি বিশ্বাস করতেন স্রষ্টার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে তাঁর সৃষ্টি; প্রত্যেক মানুষ স্রষ্টার অংশ। সুতরাং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ভেদ থাকলেও সমস্ত মানুষ মূলতঃ একই। তাই বিশ্বমানবতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। আবার বেদান্তবাদীদের মত তিনি জীবনে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্-এর উপাসক ছিলেন, কলো, ব্রহ্মে, শেলীর মত তিনি প্রকৃতির পবিত্র সান্নিধ্যে বিশ্বাসী। বিশ্বপ্রকৃতি কবির কাছে এক জীবন্ত সত্তা, রসমাধুর্যের নিত্য উৎস ধারা। তাই তিনি বলেন—

"বিশ্ব বীণারবে বিশ্বজন মোহিছে
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদীনদে গিরিগুহা-পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সংগীত মাধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরসকবিমা—"

গান্ধীজীর জীবনদর্শন সত্য ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে সত্যের উপলব্ধি। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর শ্রেষ্ঠ উপায় হবে অহিংসা। গান্ধীজী প্রধানতঃ বাস্তববাদী দার্শনিক। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারাকে রূপায়িত করে তিনি যুগান্তকারী বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন। শিশুর কেবল এদিক বিকাশ হলেই চলবে না তার সার্বিক বিকাশ হতে হবে, একার মুক্তি কাম্য নয়, সমগ্র সমাজের মুক্তি-যজ্ঞে তাকে আহুতি দিতে হবে, সমগ্র জীবন-যাপনকে তিনি ব্রতপালনের সমতুল্য করে দেখিয়েছেন, শপথ গ্রহণ করেছেন—

"অহিংসা সত্যম্ অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য অপরিগ্রহ
শরীরশ্রম অস্বাদ সর্বত্র ভয়বর্জন
সর্বধর্মী সমানত্ব, স্বদেশী স্পর্শকাতরা
প্রি এগারটি সেবাব্রতীনরস্তে ব্রত নিশ্চয়ে।"

গান্ধীজীর শিক্ষাচিন্তায় এই দার্শনিক মতবাদের সমন্বয় দেখি। শিক্ষার আদর্শগত রচনায় তিনি প্রকৃতিবাদী, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে তিনি ভাববাদী ও শিক্ষাপদ্ধতি নির্বাচনে তিনি প্রগতিবাদী

কবিকুল-শিরোমণি রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বপ্নময় পরিবেশ থেকে অবতরণ করে ভারতের তথা জগতের অন্যতম শিক্ষাগুরু হিসাবে যে অবদান রেখে গেছেন তার সঙ্গে কটিবাস পরিহিত অর্ধনগ্ন ফকির অথচ বলিষ্ঠ অহিংসা মন্ত্রের পূজারীর শিক্ষাচিন্তার তুলনা করা যেতে পারে।

পল্লীকেন্দ্রিক ভারতের বুকে যথার্থ শিক্ষার প্রয়োজন যে অনুভব পল্লী অঞ্চলে এসেই উভয়েই উপলব্ধি করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ শহর থেকে far from maddening crowd-এ, শান্ত স্তব্ধ পল্লীর বুকে স্থাপন করলেন তাঁর ধ্যানের জগৎ শান্তিনিকেতন, আর গান্ধীজী তাঁর আশ্রম ও কর্মের জগৎ প্রতিষ্ঠা করলেন মধ্যপ্রদেশের পল্লী অঞ্চলে সেবাগ্রামে। রবীন্দ্রনাথ শুধু মনকেই শিক্ষালাভের আদর্শ স্থান বলে মনে করতেন এবং তাঁর বহু কবিতায়

তা মূর্ত হয়ে উঠেছে, যেমন প্রার্থনা, তপোমূর্তি, প্রাচীন ভারত ইত্যাদিতে। তপোবন কবিতায় আমরা দেখি—

'স্রোতস্বিনী তীরে
মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে
শিষ্যগণ বিরলে তরুর তলে
করে অধ্যয়ন প্রশান্ত প্রভাতবায়ে'

এখানে তাঁর কথা, ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে মিল দেখা যায়।

যথার্থ শিক্ষা হবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষাদর্শের অনুসরণকারী একথা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী দুজনেই স্বীকার করেছেন। উভয়েই চিরাচরিত পুরুষ-পরম্পরা শিক্ষা-ব্যবস্থা শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পরিপন্থী বলে নতুন শিক্ষাদর্শনের পথ খুঁজে বার করতে চেয়েছেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে বলেছেন যে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে কেন্দ্র করে তাকে সমাজের বুকে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে প্রতিষ্ঠিত করাই শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "জীবনের ক্ষেত্রকে বড় করিয়া দেখিতে পাই না বলিয়াই জীবনকে বড় করিয়া তোলা এবং বড় করিয়া উৎসর্গ করার কথা আমাদের স্বভাবতই মনে আসে না"।

বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা যে কত নীরস ও ত্রুটি-বহুল এবং ভাবপ্রকাশে কতখানি বাধা সৃষ্টি করে তা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁদের নিজ কণ্ঠের ঘোষণা শুনি মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করতে হবে। তা না হলে শিক্ষা সরস্বতী 'ঘুরপরানো বুটজুতো'র পায়ে পায়ে বাধা পেয়ে নিজস্ব ভাবপ্রকাশের শক্তিকে ম্লান করে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার মূলমন্ত্র হচ্ছে ঐক্যবোধের মন্ত্র। এই ঐক্যের বোধকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনই হচ্ছে শিক্ষা, পূবের জানালা খুলে পশ্চিমের সাংস্কৃতিক হাওয়া প্রবেশ করানই তাঁর উদ্দেশ্য। "দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে" মন্ত্রের উদ্গাতা। তাই প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিকতার সার্থক মিলনই ছিল তাঁর স্বপ্ন। "তাগী শিব যখন একাকী সমাধিস্থ তখনও তিনি অসহায়, আবার সতী যখন তাঁহার পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আসক্ত তখনও দৈন্যের উদ্ভব প্রকট"॥ শিক্ষা-সাধনাকে সার্থক করতে হলে শিব ও শক্তির মধ্যে মিলন ঘটাতে হবে, মঙ্গল ও ঐশ্বর্যকে এক সূত্রে বিধৃত করতে হবে। গান্ধীজীও এই ঐক্যের বোধকে শিক্ষাতত্ত্বের মূলকথা বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর জীবন-দর্শনে সত্যই ভগবান রূপে প্রতিভাত ও সত্যকে জানাই শিক্ষা। তাই তিনি জীবন ব্যাপী শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন।

উভয়েই শিক্ষার আন্তর্জাতিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বিশ্বভারতীর প্রতিটি অনুপরমাণুতে "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্"-এর প্রকাশ দেখি। উভয়েই জীবনের লক্ষ্যকে ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। ত্যাগের মধ্যে ভোগের আনন্দ অনুভব করতে বলেছেন— 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা' ভারতের সেই সনাতন বাণীর অনুশীলনই আজ আনবে জগতের মুক্তি। সহনশীলতা, সহনক্ষমতা ইত্যাদি নিজের জীবনে উপলব্ধির কথা গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন।

গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে শিশুর মনের স্বাভাবিক বিকাশে সহায়তা করতে চেয়েছেন। প্রত্যেক শিশুর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। নেতিবাচক শৃঙ্খলা অপেক্ষা সৃজনমূলক শৃঙ্খলায় প্রত্যাশী।

এই দুই শিক্ষাবিদের শিক্ষাচিন্তায় বহু বিষয়ে নিবিড় সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও বৈসাদৃশ্যের ইসারা খুব কম নয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি মনে পড়ে। টেম্পেস্ট ও শকুন্তলার সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন 'শকুন্তলাও সুন্দরী, মিরাণ্ডাও সুন্দরী; তাই বলিয়া উভয়ের নাসা, চক্ষুর অবিকল সাদৃশ্য কে প্রত্যাশা করিতে পারে...'।

বস্তুতঃ গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও, সমাজ-কল্যাণে আত্মনিয়োগ করলেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ে কবি ও সৌন্দর্য্য পিপাসুর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, কিন্তু গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল কর্মী ও সন্ন্যাসীর। গান্ধীজী কর্মযোগী, তাই তিনি কর্মে শিক্ষার কথাই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ধ্যানযোগী—তাই তিনি

যাতে মানুষের অখণ্ড সত্তাকে দেখেছেন ও তার সামগ্রিক শিক্ষার কথা চিন্তা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা কাজের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন যে 'বিদ্যালয়ের বদ্ধ আবহাওয়ায় যে মানুষ হয়ে সে 'ন যেযৌ ন বযৌ' হয়ে'। জীবনে জীবন যোগ করা না হলে কৃত্রিম পথে প্রাণের পসরা ব্যর্থ হবে—শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। অন্তরাত্মার বিকাশ না হলে কারো শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। ফ্রয়েড-এর মত তিনিও বলেছেন 'শিশুকে পূর্ণভাবে বিকশিত হতে দাও'। তাই তিনি শুশোষন-কেন্দ্রিক শিক্ষার দুর্বহ কৃপণতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক আদর্শের, আনন্দের সঙ্গে সৌন্দর্য্য পিপাসার মিলন ঘটাতে চেয়েছেন। শিক্ষা হবে কর্ম ও ক্রীড়াকেন্দ্রিক, বুদ্ধি ও অনুভূতির বিকাশমুখী আনন্দময় সত্তার উপর নির্ভরশীল, উদার ও প্রগতিবাদী মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার জীবন্ত প্রতিবাদ। এখানে কোন ছাঁদ ঢালাই করার কল বসান হয় নি; স্বাধীনভাবে আনন্দময় পরিবেশে প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে পাঠ দেওয়া হয়। প্রকৃতির সাহচর্য্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা ইন্দ্রিয় শক্তিকে জাগ্রত ও সক্রিয় করার পাঠ, ভাষা সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদান এবং হস্তশিল্প বৃত্তি ও কলাবিদ্যার চর্চ্চা ও পারীর শুদ্ধ তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গ। সর্বোপরি এই জ্ঞান যাতে আহরণ মাত্র না হয়ে অন্তরের সৌন্দর্যলোকে পরিণত হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে বলেছেন। এই আশ্রম ছিল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের প্রাণময়, আনন্দময় ক্ষেত্র। এ বিদ্যালয় তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা—'অলস মনী সন্তানের অশিক্ষের খেয়াল নয়'। তিনি দেখেছিলেন কত মুকুল না ফুটেই ধরণীতে ঝরে পড়েছে, কত জীবন-নদী বিকলতার বিষম আবর্তে বরপথে হারিয়ে ফেলেছে তার ধারা, কত শিশু অতি শাসনে অথবা অতি লালনে অমানুষ হয়েছে। তাই দৈনন্দিন জীবনের রথের রশ্মিকে কোন বরমে টেনে চলবার শিক্ষা তিনি চান নি—তিনি মানসিক দৈন্য থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ সবার উপরে মানুষের বিরাট সম্ভাবনাতে বিশ্বাস করতেন। মানুষ অমৃতের পুত্র, অমৃতের পিয়াসী—তাই 'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি'। মানুষকে তিনি ছোট করে ভাবতে পারেন নি। আশু ফললাভের আশায় কোন সহজ পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন করেন নি অথবা পাঠ্যবিষয়কে অতি সহজ ও অতি সমুজ্জ্বল করে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির উপর অশ্রদ্ধা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর শিক্ষাচিন্তায় ও শিক্ষাদর্শে। তাঁর সমগ্র চিন্তাধারাই ঔপনিষদীয় অধ্যাত্মবোধের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। রবীন্দ্র-মানস সুন্দরের পথে চলে অভিসারে। সৌন্দর্য্যের সাধনা ও আনন্দের উপলব্ধি ছিল তাঁর লক্ষ্য। এর সার্থকতার জন্য মানবজীবনে অপরিহার্য্য হলো বোধির উদ্বোধন—এই বোধির বিকাশ, সৌন্দর্য্যানুভূতি ও আনন্দ-সাগরে অবগাহন ইত্যাদি তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে, বস্তুতঃ তিনি শিক্ষাকে প্রতি দিনের তুচ্ছ চাওয়া পাওয়া ও প্রয়োজনাতিরিক্ত স্তরে স্থাপন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে নিত্যরস আহরণ করে রসাত্মক বাক্য তথা কাব্য বলাই তাঁর পেশা ও নেশা। বিশ্ব-প্রকৃতি তাঁর কাব্যে কখনও জীবনদেবতা ও কখনও বিশ্বেশিনী রূপে বিধৃত।

কিন্তু মহাত্মাজী ছিলেন বাস্তববাদী। তাঁর শিক্ষা সমাজকেন্দ্রিক, সত্য ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেছেন শিক্ষা হবে শিল্পকেন্দ্রিক তথা জীবন কেন্দ্রিক। সমাজের কল্যাণেই শিক্ষার ক্ষেত্র রচিত হবে, শিক্ষার উদ্দেশ্যই হবে বাস্তবমুখী—শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ তৈরী। গ্রামকে কেন্দ্র করে শিক্ষা ধারা সম্পূর্ণভাবে আবর্তিত হবে। গান্ধীজী প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল ধার্মিকতা বিরোধী কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।

গান্ধীজী শিক্ষার সঙ্গে প্রয়োজনের জগৎকে, প্রতি দিনের চাওয়া পাওয়ার জগৎকে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। মুখ ফুটে বলতে পারেন নি।

"তোমায় কিছু দিতে চায় যে আমার মন
নাই বা তোমার থাকল প্রয়োজন।"

তাই শিল্প এখানে কেবলমাত্র সৃষ্টিধর্মীই নয়, উৎপাদন-শীলও বটে, সামাজিক চাহিদার মোটা ভাগের সঙ্গে জড়ান। শিক্ষার মাধ্যমে জীবনের সঙ্গে জীবিকার যোগ চেয়েছিলেন, তাই শিল্পের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর নিঃসঙ্গ পদসঞ্চার শুনতে পাই।

গান্ধীজীর শিক্ষাচিন্তায় ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ গীতার প্রভাব বিশ্লেষণ করেছে। হিংসার চেয়ে অহিংসা তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে। সাথে সাথে বড় হয়ে উঠেছে কর্মের আদর্শ এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে কর্মী। গান্ধীজী এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথনির্দেশ করেছেন, তাঁর ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সাধনাকে অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রসারিত করেছেন। প্রত্যেকে সহযোগিতা করে নিজের জন্য, অপরের জন্য বাঁচবে এটাই মানুষের জীবনের কথা এককেন্দ্রিক শিশুকে সমাজ-কেন্দ্রিক মানুষে পরিণত করাই হবে শিক্ষার মূলমন্ত্র। গান্ধীজীর ও ডিউইর শিক্ষাচিন্তার বহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা উভয়ের জীবনে বাস্তবমুখী।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের অপূর্বকে যুক্ত করে শিল্পকে আনুষঙ্গিক হিসাবে পাঠ্যক্রমে স্থান দিয়েছেন। আত্মপ্রকাশের পথ হিসাবে নৃত্য, গীত, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি স্থান পেয়েছে এবং যে জিনিষটি বড় হয়ে উঠেছে সেটা হল—"A thing of beauty is a joy for ever"—সৌন্দর্যের আনন্দ-মূল্যে বৈষয়িক প্রয়োজনের বিচার নেই।

তাই অনেকে মনে করেন যে কবি জীবনযাত্রার বেড়াগুলি ডিঙিয়ে ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে প্রবেশ করতে পারেন নি বলে আক্ষেপ করেছেন—

"যে আছে মাটির কাছাকাছি
সেই কবির বাঁশী লাগি কান পেতে আছি"...

গান্ধীজীর মধ্যে যেন এই মাটির কাছাকাছি মানুষের সন্ধান পাই। ষ্টেনকোঁও যথার্থই বলেছেন—Beauty was for Tagore what Truth was for Gandhiji। অবশ্য Keats-এর ভাষায় Beauty is truth, truth beauty—দুটো একই চুম্বকের দুই প্রান্তরেখা এবং এই দুইএর অভিব্যক্তি দুজনের জীবনে হয়েছিল ভিন্নরূপে যাদের সান্নিধ্যে ভারতের মাটি হয়েছে ধন্য।

প্রার্থনা

॥ শ্রীদিবাকর ঘোষ ॥

আমাকে দিয়েছো তুমি সংসারের ভার :
তুমিই সে কর্তব্যের লক্ষ অঙ্গীকার
নিয়ে তাই পথ চলা ; শোক দুঃখ যতো,
আঘাত, সংঘাত, ব্যথা, বেদনা নিয়ত
সমগ্র অস্তিত্বে আনে কী আগ্নেয় জ্বালা ! ।
খুঁজে ফিরি তাই যেন একটু নিরালা,
নিভৃত শান্তির ধারা ; যেন এ-মনস
এ-সত্তায় চায় কারো স্নিগ্ধ পরশন।

হৃদয়ের সবটুকু ব্যাকুলতা দিয়ে
তোমাকে স্মরণ করি ; চলো প্রভু নিয়ে
সে-আনন্দলোকে মোরে ; যেখানে সংসার
তোমা সাথে হোয়ে ওঠে নিত্য একাকার।

তোমারই সংসারে প্রভু, তব দেওয়া ব্যথা
সহিতে শকতি দাও জীবন দেবতা ॥

সাময়িকী

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও প্রতিকারের উপায়—ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সামগ্রিক অবস্থার কথা ভাবিতে বসিলে সামনে গভীর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। বিশেষ ভাবে পশ্চিমবঙ্গের আজ গভীর সমস্যাসঙ্কুল। পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ ভৌগলিক অবস্থানের কথা সম্মুখে রাখিয়া ইহার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করিলে হতাশায় মুষড়াইয়া পড়িতে হয়। এমন দুর্যোগ ইতিপূর্ব্বে স্বদূর অতীতে দেখা দিয়াছিল কিনা, জানা যায় না। উৎকট খাদ্য সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে উৎকট আকারে রাজনৈতিক সংকট, সামাজিক সংকট, সাংস্কৃতিক সংকট, অর্থনৈতিক সংকট—সর্ব্ব সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গ। এখান হইতে বাঙ্গালীর উদ্ধারের পথ কি এবং পথপ্রদর্শকই বা কে, চোখে পড়ে না। এমন একটা অবস্থার দিকে আমরা দ্রুত ধাবিত হইতেছি যে স্বয়ং বিধাতা পুরুষ বাঙালীকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে এমন কোন ধারণাই আজ অন্তর্হিত। যে যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের নিকট জনগণ অনেক কিছুই প্রত্যাশা করিয়াছিল সেই যুক্ত ফ্রন্টের মধ্যেই আজ ভেদবুদ্ধি, কলহ প্রবেশ করিয়াছে। যে ১৩ দফা কর্মসূচী লইয়া ১৪টি দলের মিলিত সংস্থা ক্ষমতায় আসীন হইয়াছে আমাদের বিচারে এই মিলিত শক্তির মধ্যেই সকল সমস্যার সমাধান পাওয়া যাইত, যদি সকল দলগুলির মধ্যে সহভাব, সহযোগ বিরাজিত থাকিত। কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য কংগ্রেস-বিদ্বেষের উপর দাঁড়াইয়া কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করা হইয়াছে বটে কিন্তু সেই বিদ্বেষই দলীয় স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পরের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হইয়াছে। বিদ্বেষ এমনই বস্তু যে উহা যারা সকলকে ঐক্যবদ্ধ করিতে গিয়া বিদ্বেষকারী নিজেই বিষে জর্জ্জরিত হয়। আজ অনাবশ্যক যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে বাহির হইতে কটূক্তি বর্ষিত হইতেছে এমন কি ফ্রন্টের অভ্যন্তরের একদল অন্য দলের দোষারোপ করিতেছে। ইহা শোভনও নয়, সঙ্গতও নয়।

যুক্তফ্রন্ট সরকার পরিচালনার দায়িত্ব মাত্র ৩মাস পূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছেন। এই দেশের বর্ত্তমান বাস্তব অবস্থা এতই ভীষণ যে এই অল্প পরিসর সময়ের মধ্যে তাঁহারা খাদ্য সমস্যার সমাধান, দুর্নীতি, চোরাকারবারী, মুনাফাবাজীর বিরুদ্ধে কার্য্যকরী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া দোষারোপ করার সময় এখনও আসে নাই। আর তাছাড়া কাকে কি বলে সেটাও বিচার্য্য। যে দুর্নীতি চোরাকারবারী, মুনাফাবাজী ইংরেজ আমল হইতে সুরু হইয়াছে উহা সাড়ে বারোশত ২০ বছরের কংগ্রেসী শাসনের আমলে অজস্র ডালপালা গজাইয়া গোটা জাতিকেই ধ্বংসের মুখে আনিয়া ফেলিয়াছে। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে সর্ব্বব্যাপী এই দুর্নীতি, চোরাকারবারী, মুনাফাবাজী, জোচ্চারীর বিরুদ্ধে কার্য্যকরী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করিতে পারার জন্য ৩মাস বয়সের যুক্তফ্রন্ট সরকারকেই কেবলমাত্র দোষারোপ করা চলে না—বিশেষভাবে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে তো নয়ই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর এই জানিয়াছি যে দোষ বাহিরে নয়, দোষ অন্তরে। সুতরাং আমাদের আত্মানুসন্ধান করা উচিৎ, কোথায় আমাদের দোষ ছিল, কোথায় আমাদের ত্রুটি ছিল যাহার ফলে "এক জাতি, এক প্রাণ, একতার" আদর্শে বিশ্বাসী আমরা, আমাদের মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ, পরিবারে পরিবারে ভেদ, দলে দলে ভেদ, প্রদেশে প্রদেশে ভেদ, ভাষার প্রশ্নে ভেদ—এক কথায় সর্ব্বস্তরে এমন ভেদবুদ্ধি পাইয়া বসিল, আমরা আন্তর্জাতিক-প্রীতি লাভ করিয়া বসিলাম।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে সকল রাজনৈতিক দল দেখিতেছি ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে উহার

অধিকারেরই অন্ত হয় নাই। তখন কংগ্রেসই ছিল একমাত্র প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা আশ্রয় ও অভিব্যক্তির স্থান। পরবর্তী সময়ে যেন এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ ও মতবিশিষ্ট দলের সৃষ্টি হইল তাহার পেছনকার মনস্তত্ত্বগত কারণ জানিবার চেষ্টা করা উচিত। গত ২০ বছরে দেশে একটা অপ্রতিহত বঞ্চনা, বৈষম্য, জড়তা ও সঙ্কীর্ণ আচরণের জন্ত যে নগ্ন কাড়াকাড়ি চলিয়াছে ইহা তো সর্ব্বজনস্বীকৃত। ইহার ফলে সারা দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে হতাশা, দুঃখ ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বহু দলের জন্মের পিছনের ইহাই কি মনস্তাত্ত্বিক কারণ নয়? সুতরাং বিশেষ কোন দল বা কতিপয় দলকে দোষারোপ করিয়া লাভ কি? ইহা তো আমাদেরই চিন্তা ও কর্ম্মের ফলশ্রুতি

তিলক, গোখেল, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষ, জওহরলাল, মৌলানা আজাদ ও আরও বহু বহু দিকপালগণের অনুপ্রেরণায় লালিত কংগ্রেসের পতাকা তলে বসিয়া বহু একনিষ্ঠ আদর্শবান দেশসেবক দেশকে, দেশের মানুষকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিল, আত্মাভিমানের পাশ হইতে দূরে থাকিতে শিখিয়াছিল, একটা ব্যাপক ও গভীর জীবনের আস্বাদন পাইয়াছিল, কংগ্রেসকে অত্যন্ত আপন বলিয়া বোধ করিয়াছিল। যে কংগ্রেসের সঙ্গে বহু মানুষের কিশোর বয়স হইতেই গভীর সম্পর্ক ছিল, হঠাৎ কি হইল, শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে ১৯৪৯ সনে তাহাদের মুখের উপর কংগ্রেসের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। যেহেতু কংগ্রেসকে ভালবাসিয়াছিল, কংগ্রেসের আদর্শে লালিত পালিত সঞ্জীবিত হইয়াছিল, সেইহেতু কংগ্রেসের বন্ধ দুয়ারের পাশেই তাহারা বসিয়া রহিল, অন্ত কোন দলেই যোগ দিতে পারিল না। গত আঠার বছরের মধ্যে এই মনোভাবিশিষ্ট বহু বিপ্লবী দেশকর্ম্মী, কংগ্রেসকর্ম্মী unhonoured and unsung মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িল। শত শত আদর্শবান চরিত্রবান কর্ম্মী বাস্তবের আঘাতে আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। পরবর্ত্তী বংশধরেরা চোখের উপর দেখিতে পাইল আদর্শবান নীতিপরায়ণ দেশপ্রেমিক হওয়ার ফল কি

মার্কসীয় দর্শনে জনিষ্ঠাকে জনতা (Mass) রূপার ভেলার ন্যায়—তাহাকে যেমন খুশি mould করা যায়। জনতাকে তৈয়ারী করা যায় যেমন সত্তা, আবার জনতা সচেতন পরীক্ষকও বটে জনতাও নেতৃত্ব সৃষ্টি করে। কাজির বিচারের এখানে অভাব তাই দেখিতে পাইতেছি যে-কংগ্রেস প্রায় ৬০ বৎসর ভারতবর্ষের মুক্তির জন্ত সংগ্রাম করিয়াছে, যে-কংগ্রেসের নামে ও ডাকে সারা ভারতবর্ষ উদ্বেলিত হইয়া উঠিত সেই কংগ্রেসের নেতৃত্ব ভারতবাসীর সামনে এমন কোন দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত হইতে পারিল না যাহার দ্বারা সকল বঞ্চনা, সকল বৈষম্য দূরীভূত হইতে পারে। জনতার কাছে পরীক্ষায় অধিকার কংগ্রেস উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। জনতার অন্তর হইতে তাঁহারা ক্রমশঃ দূর হইয়া যাইতেছেন। এই সব দেখিয়া ইহা আমরা ধ্রুব সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি যে "যৎ যৎ আচরতি শ্রেষ্ঠঃ তৎ তৎ এব ইতরো জনঃ, স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তৎ অনুবর্ত্ততে"। ইহা ছাড়া নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার নাস্তঃ পন্থাঃ। অপরের দোষ দর্শন করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যায় না, আচরণের দ্বারাই প্রমাণ করিতে হইবে।

যুক্ত ফ্রন্টে কংগ্রেস ছাড়া আর সকল দলেরই সমাবেশ হইয়াছে। যদিও এই ফ্রন্ট কংগ্রেস-বিদ্বেষের উপর জোর দিয়া চলিয়াছে তথাপি জনতার ইচ্ছা ও চাপে ইহার সমাবেশ হইয়াছে এবং ইহাকে অত্যন্ত সুলক্ষণ বলিয়াই আমরা মনে করি। অযুতলের মধ্য দিয়া মঙ্গল আসে. এই যুক্ত ফ্রন্টের আকাঙ্ক্ষীর গোলযোগ যতই থাক জনসাধারণের ইচ্ছা ইহা টিকিয়া থাকুক। জনগণের ইচ্ছার সঙ্গে সুর মিলাইয়া ইহাকে টিকাইয়া রাখার নীতি গ্রহণ করা হইবে কিনা তাহাদের সকল ঘটনাগুলিকে উৎসাহ দিয়া ইহার পতন ঘটাইয়া তৎ পরিবর্ত্তে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করার নীতি গ্রহণ করা হইবে এই কথাটি আমরা সকলকে পুনঃ পুনঃ ভাবিয়া দেখিতে বলি।

কাল গণতন্ত্রের বর্ত্তমান ধারণা যাহা আমরা পশ্চিম হইতে পাইয়াছি উহার অর্থকথা সংখ্যাগুরুর শাসন। সংখ্যাগুরুর শাসনের বাস্তব প্রণালীর রূপ-রেখা আমরা ইংরেজের দেশে ও আমেরিকায় দেখিতে পাই। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তো পৃথিবীর মানুষের কাছে এক বিভীষিকা স্বরূপ। ইংরেজের গণতন্ত্রের ফল তো ভারতবর্ষ হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে। আবার বিপরীতপক্ষে এক নায়কত্ব সামন্ত যুগ হইতেই পৃথিবীর মানুষ দেখিয়া আসিতেছে এবং আজও ism-এর coating এ বস্তুই নিজেকে আবৃত করুক না কেন একনায়কত্ব মানুষের কাছে ঘৃণ্যই থাকিবে।

ভারতবর্ষের প্রচলিত শব্দগুলির মধ্যে একটি শব্দ দেখা যায় যাহা শত শত বর্ষ ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ শব্দটি হইতেছে "সঙ্ঘ"। ভারতবর্ষ এই "সঙ্ঘ"এর উপাসক। এই শব্দটির একটি মহৎ তাৎপর্য্য আছে। পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বদলকে লইয়া একটি অখণ্ড দল রচনার দায়িত্ব যদি গণতন্ত্রের নতুন রূপ প্রকাশিত হয় তবে পশ্চিমবঙ্গ পৃথিবীর মানুষের কাছে পথ প্রদর্শক হওয়ার সৌভাগ্য ও গৌরব অর্জ্জন করিতে পারিবে। দলীয় রাজনীতি, দলীয় শাসন আজ সমাজ-দেহকে বিষাক্ত করিয়া ফেলিতেছে। ইহা হইতে ত্রাণের পথ বাহির করিতেই হইবে। সেই কারণেও দলের মধ্যে থাকিয়াও দলের উর্দ্ধে উঠিতে যে ধৈর্য্য ও সংযম প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করা ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই। যে দুর্নীতি আজ পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিয়াছে তাহাকে নষ্ট করিতে যে দলই শক্তির হউক জনসাধারণ তাহাদের ক্ষমা করিবে না।

আজ ইতিহাস প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে প্রচলিত গণতন্ত্র কিম্বা একনায়কত্ব ইহার যে কোন একটি সকল মানুষের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা, তাহাদের সকল দাবী পূরণ করিতে অপারগ। গণতন্ত্রের দেশ আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি এবং একনায়কত্বের দেশ স্পেন, চীন প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন 'I am a cosmopolitan'—আমি বিশ্বনাগরিক। আবার তিনি লিখিয়াছেন, আমি বিশেষ কোন দলেরই নই অথচ আমি সকল দলের হিতাকাঙ্ক্ষী। সকল দলই আমাকে প্রেম-ভক্তি দান করিয়া থাকেন। সকল দল লইয়া আমার এক অখণ্ড দল। পশ্চিমবঙ্গে আজ কংগ্রেস ব্যতীত অন্যান্য সকল দল যেখানে একত্রিত হইয়াছে (কংগ্রেসকেও ইহার মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিলে পরিপূর্ণ হইত।) সেই মিলিত শক্তির প্রতিটি অংশ যদি বিশ্বনাগরিকত্বের বোধ লইয়া দলের মধ্যে থাকিয়াও দলের উর্দ্ধে থাকিতে পারিত এবং সকল দলকে সকল মানুষকে প্রেম ভক্তি দান করিতে পারিত, সকল দল লইয়া একটি অখণ্ড দল রচনা করিতে পারিত, তবে উহার দ্বারা দিয়াই সকল সমাধান আসিত।

জীবন বস্তুর ধর্ম্ম হইতেছে 'Every cell must live for itself as well as for the whole organism'। এই জীবন্ত সমাজদেহেরও ঠিক ঐ একই ধর্ম্ম। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ এমন একটি গঠন তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যেখানে Democracy ও Dictatorship-এর মিলিত ব্যবস্থা, প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি দল যেখানে will live for itself as well as for whole society। ইহা সম্ভব করিতে হইলে ঘরসমাজ হইতে হইবে যেখানে উভয় পদার্থই প্রধান। বিজ্ঞানও বলিতেছে প্রতিটি বস্তু antagonistic and at the same time compliwentary। আমরা কি অন্ধ বাদুর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্টের নিকট, যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দলের নিকট এই আবেদন আশা করিতে পারি না? আমরা কি আশা করিতে পারি না দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে উঠিয়া পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া মধ্য দিয়া জগৎকল্যাণে প্রতিটি দল নিজেদের উৎসর্গ করিতে পারেন?

আমরা আবার মনে করাইয়া দিতেছি বিধাতার ইচ্ছায় জনগণের দ্বারা যুক্তফ্রন্ট গঠিত হইয়াছে। বাস্তব আজ যেরূপ উৎকট হইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাকে শান্ত প্রশমিত করিতে হইলে বিশ্বনাগরিকত্বের আদর্শ ও ধারণা, সকল দল লইয়া অখণ্ড দলের আদর্শের মধ্যে সংযম সহভাব, সমন্বয়ভাব গ্রহণ ব্যতিরেকে আর

অন্য কোন উপায় নাই। এই আদর্শ ও আচরণে যাহারাই বাধা হইবেন তাঁহারা সমাধানের গৌরব অর্জনে হে, বার্থ হইলেনই, পরীক্ষক জনসাধারণও তাহাদের ক্ষমা করিবেনা, তা তিনি যে-ই হোন। – শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস।

ছাত্র সমস্যা: বর্ত্তমান যুগে সমস্যা সর্বত্র—ঘরে বাইরে, যুবে কাছে সমস্যা, সব জায়গায় সমস্যা। কেন এমন হইল? প্রথম কারণ বর্ত্তমান যুগটাতে বস্তুর সত্যতা তাহার সামগ্রিক রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যুগ। অর্থাৎ কোন একদিক হইতে বস্তুকে দেখিলে চলিবে না, কোন একদিকের মানদণ্ডে কাহারো বিচার হইবে না। ইহার দ্বিতীয় কারণ—সব গুলি দৃষ্টিকোণ হইতে যেমন সত্যকে, বস্তুকে দেখিতে হইবে, তেমনি প্রত্যেকটী দৃষ্টিকোণকে যথাযোগ্য মূল্য দিয়া বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ-যোগ্য উহাদের একটী সামঞ্জস্য তো বাহির করিয়া লইতে হইবে? ঐকদেশিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের মনবুদ্ধির কাছে এই সামঞ্জস্যময় চলার পথটা ধরা পড়িতেছে না—তাই সমস্যা জটিলতর হইতেছে। ইহারও পরে সমস্যা আরও জটিল হইতেছে এই জন্য যে, আজকের দিনে ছোট বড় কোন মানুষেরই নিষ্ঠা বলিয়া—ব্রত-নিষ্ঠা বলিয়া—যেমন কিছু নাই তেমনি সততা, শ্রদ্ধা, বিনয়, অপরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বুঝিতে চেষ্টা করা—এ সমস্তই আজ যুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। এই রকম পরিপার্শ্বিকে আমাদের ছাত্র-সমস্যা যে অত্যন্ত জটিলতর হইবে—তাহাতে আশ্চর্য কি। এই ছাত্র-সমস্যা তাই খুব ভাবনার বিষয় আজ সকলেরই কাছে। অনেকেই অনেক রকম করিয়া ভাবিতেছেন।

প্রবীণ শিক্ষক ব্রহ্মে শ্রীযতিচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয় তাঁহার পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে সম্প্রতি তাঁহার মতামত লিখিয়াছেন। উহা এইরূপ—

"উচ্চশিক্ষাব্রত ১৩৬২ সনের ফাল্গুন মাসের সংখ্যায় সম্পাদিকা ছাত্র-সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ সম্বন্ধে অন্যান্য কারণের সঙ্গে লিখিয়াছেন অভিভাবকবর্গের অবাঞ্ছনীয় জীবন-যাপন প্রণালী এবং কু দৃষ্টান্ত স্থাপনও ছাত্র-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার অন্যতম প্রধান কারণ। তা ছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গের অধিকাংশের চরিত্রগত যোগ্যতার অভাবও ছাত্র-সমাজকে উক্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে ব্যর্থ হইয়াছে।

এই লেখক বিগত পঞ্চাশ বৎসর শিক্ষা-বিভাগে কর্মরত থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে তাহাতে দেখা যায়—বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিক ও আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা, শিক্ষকবর্গের শোচনীয় দারিদ্র্য, পাঠ্যপুস্তকের বাহুল্য, ছাত্র ও শিক্ষকবর্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভাব, বাহিরের রাজনৈতিক প্রভাব, কম্যুনিজমের প্রসার, দুর্নীতির উগ্র প্রচার অভাব, দুর্নীতিমূলক গল্প-উপন্যাসের ব্যাপক প্রচার, সিনেমার আবেদন প্রভৃতির মিলিত প্রভাবই ছাত্র-সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

বর্ত্তমানে অধিকাংশ শিক্ষকবর্গ পূর্বোক্ত পারিপার্শ্বিকে শিক্ষা দীক্ষা লাভ করায় তাহাদের অধিকাংশের চরিত্রগত যোগ্যতা এবং উচ্চ আদর্শের অভাব থাকিবেই ইহার অন্যথা আশা করাই অবাস্তবতা।

বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ফলেতে অভিভাবকবর্গের সম্মুখে যে সব সামাজিক সঙ্কট আবির্ভূত হইয়াছে তাহার অন্যতম হইল প্রাইভেট টিউশনির অসহনীয় চাপ। এই চাপে অনেকেই বিব্রত। এই প্রাইভেট টিউশনি হইতে দুর্নীতির প্রসার হইতেছে, শিক্ষক প্রান্তে ও ছাত্রে টিউশনির চাপে শ্রান্ত ক্লান্ত হওয়ায় বিদ্যালয়ের ক্লাসে কর্তব্য পালনে অক্ষম হইতেছেন।

অধিকাংশ স্থলে ছাত্র-সংখ্যা অত্যধিক, এক একটি শিক্ষিত এবঘণ্টায় অনেক কম, অথচ সময়ে এত বেশী সংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষাদান ব্যাপারটি প্রহসনে পর্য্যবসিত।

পাঠ্য বিষয়ের বাহুল্য, পাঠ্যপুস্তকের বাহুল্য এবং বিদেশী ভাষায় শিক্ষায় শ্রম-বাহুল্য ছাত্রবর্গের পক্ষে এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। অধিকাংশ বিষয় এমনকি মাতৃভাষা পর্য্যন্ত উপেক্ষিত হইতেছে। এই অত্যধিক বিষয় শিক্ষার চাপে ছাত্রবর্গ হতাশ হইয়া পরীক্ষা ঘরে অবৈধ উপায় অবলম্বনে বাধ্য হইতেছে।

ছাত্র প্রয়োজন না পাইলে শিক্ষকের প্রাইভেট টিউশনি টিকিবে না, তাই নিজগৃহে শিক্ষকবর্গ পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া কেন তাহা ছাত্রদের পাশ করাইয়া দেয়। এই ভাবে অযোগ্য ছাত্র প্রয়োজন পাইয়া উপরের ক্লাসে উঠে কিন্তু পড়া চালাইতে পারেনা। ইহার ফলে অধিকাংশ ছাত্রের পাঠাবিষয়ে মনোযোগ থাকে না। তাহারা হট্টগোল করে, শিক্ষকের পক্ষে তিনি-দিন রাখা কঠিন হয়। পাঠাবিষয়ে মনোযোগহীন, হট্টগোলের পরিবেশে স্কুলে ছাত্র যে মনোবৃত্তি লাভ করে তাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা, দুর্ভদ্রতা, অবিনয় বৃদ্ধি পাইবে ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি?

পূর্বনির্দিষ্ট সমস্যার প্রতিকার করিতে হইলে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন।

যদি আশ্রমিক ব্যবস্থায় শিক্ষাদান চলে, যদি ছাত্র ও শিক্ষক একত্র বাসের সুযোগ লাভ করে, যদি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐ আশ্রমে কেবল শিক্ষাদান নহে খেলা-ধুলা আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা থাকে তবে ছাত্র-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হইবে। পূর্বোক্ত আশ্রমিক ব্যবস্থায় ছাত্র শিক্ষক এক সঙ্গে বাস করিবে। শিক্ষকবর্গ প্রাইভেট টিউশনি করিবে না সুতরাং বেতন বৃদ্ধি করিতেই হইবে। এ জন্য বহু টাকার প্রয়োজন। গভর্নমেন্ট শিক্ষা কর বসাইয়া এই অর্থ সংগ্রহ করিবে। শিক্ষক অভাবমুক্ত থাকিলে ক্লাসেই পড়া শিখাইতে পারিবেন, ক্লাসের ছাত্র-সংখ্যা কখনও কুড়ি জনের বেশী থাকিবে না।

উপরি লিখিত গঠনমূলক ব্যবস্থায় যে পরিস্থিতি হইবে তাহাতে বাহিরের রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাস পাইবে, ছাত্র শিক্ষকের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইবে, উচ্ছৃঙ্খলতা, অবিনয়, অভদ্রতা হ্রাস পাইবে, অভিভাবকবর্গ প্রাইভেট টিউটারের ব্যয়মুক্ত হইবে এবং সর্বোপরি প্রকৃত শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হইবে। পরিপূর্ণ আশ্রমিক ব্যবস্থা অসম্ভব হইলে অর্ধ আশ্রমিক ব্যবস্থা চলিতে পারে অর্থাৎ ছাত্র ও শিক্ষকবর্গ রাত্রে নিজ নিজ বাড়ীতে থাকিবে, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় দশ ঘণ্টা আশ্রমে থাকিবে, সেখানেই খাওয়ার, আমোদ-আহ্লাদ খেলাধূলার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

প্রবন্ধের পণ্ডিত মহাশয় ছাত্র-সমস্যা সম্বন্ধে যে সকল কারণ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সবই যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নাই। বর্তমান অভিভাবক ও শিক্ষকবর্গকে যে আক্ষেপে মাতৃষ হইয়াছেন তাহাতে তাহাদের নিকট হইতে শিশুদের জন্য অধিক কিছু আশা করাও অর্থহীন তিনি বলিলেন। তবে সমস্যা হইতেছে—অভিভাবক এবং আশ্রমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা হইলে প্রধানতঃ শিক্ষকগণ যদি আদর্শ ও চরিত্রবান না হন তাহা হইলে যে কোন ব্যবস্থাই কি বানচাল হইয়া যাইবে না? আশ্রমিক ব্যবস্থায় তো ছাত্রগণ মোটামুটি সবটা সময়ই শিক্ষকদের সঙ্গে থাকিবে, তাহাদের জীবন-ই তো ছাত্রদের প্রভাবিত করিবে—তাই তাহাদের তো সুন্দর জীবনের অধিকারী হইতেই হইবে। পরিবর্তিত ব্যবস্থায় প্রাইভেট টিউশনির চাপ বা অতিরিক্ত ছাত্র একই ক্লাসে না থাকায় তাহাদের শিক্ষকতার দিকে মনোনিবেশ করায় অনেক সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষ হিসাবে যদি তাঁহারা সৎ ও কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন না হন তাহা হইলেও তো মুস্কিল থাকিয়াই যাইবে, কেননা ফাঁকি দেওয়ার স্বভাব তো থাকিয়াই যাইবে। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার যে আমূল পরিবর্তন দরকার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এত বড় বিপ্লব কে ঘটাইবে? প্রাইভেট টিউশনীর চাপ, ক্লাসে অতিরিক্ত ছাত্র, প্রাইভেট টিউশনী বন্ধ রাখিতে অনুপযুক্ত ছাত্রকেও পাশ করাইয়া দেওয়া—এ সব গেলেও অনেক লাভ সন্দেহ নাই। বর্তমানে শিক্ষকদের বেতন আগের থেকে তো অনেক বাড়িল, তাহাতে কি টিউশনী কমিল? বর্তমান বাজারে বেতন বাড়াতেও এমন সুবিধা হইল না যে টিউশনী না করিয়া কেহ পারিবে। ক্লাসে অতিরিক্ত ছাত্রসংখ্যা কমান খুবই উচিত এবং যে কোন সময়েই তাহা করা চলে যদি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকে এবং শিক্ষাদানই যদি তাহাদের উদ্দেশ্য হয়। আমূল পরিবর্তনের আন্দোলনটা কিভাবে আনা যায়? আজ অধিক সংখ্যায় ছাত্র-ভর্তির

দাবী হইতে বিরত রাখার দরুণ যে রকম ছাত্র-বিক্ষোভ চলিতেছে ইহাতে ছাত্র-সমস্যার কোনই সমাধান হইবে না। সব সময় সব ঘটনার মনে রাখিতে হইবে যে সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের প্রবৃত্তি অপেক্ষা পশু-প্রবৃত্তি প্রবল—একবার উচ্ছৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা ছন্দহীনতা আশ্রয় করিয়া দিলে সে প্রবৃত্তি ক্রমেই ধ্বংসাত্মক দিকে চলে, তখন সংগঠনাত্মক মনোভাব আনা খুবই কষ্টকর হইয়া পড়ে। এমন যদি হইত, আন্দোলনের সময় ছাত্র শিক্ষক সকলেই এটা ওটা আন্দোলন করে, কিন্তু পড়িবার বা পড়াইবার সময় সেই ফাঁকি দেয় না—নিজ কাজটুকু অতি মনোযোগের সঙ্গে করে, তাহা হইলে তো অনেক কিছু সমস্যাই কমিয়া যাইত। মনুষ্যত্বের যে স্তরে ইহা সম্ভব আমাদের গণমানসের স্তর সেখানে নাই নিজের নিজের কাজ না করা, যত কম কাজে করা যায় তাহার চেষ্টা করা, ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করা—আমাদের দেশের লোকের ইহা যেন মজ্জাগত প্রবৃত্তি। তাহার গোড়ায় রহিয়াছে 'কর্ম বন্ধন'—ভারতীয় শাস্ত্রের এই ব্যাখ্যার প্রতিক্রিয়া। এখানে সকলেই বলিবে 'গোবিন্দ, এই কর্ম-ভোগ কবে কাটবে'! কর্ম-কথাকে এদেশের লোক দুর্ভোগ মনে করে। কর্ম যে বিশ্ব-সৃষ্টিকে আমাদের করার পথ, কর্ম যে বিশ্ব-প্রেমকে উপলব্ধি করার উপায়—এ কথা ভারতের বর্ণাশ্রমীয় শাস্ত্র কোনদিন বলে নাই। তাই আমরা—ভারতবাসীরা—এত কর্মকুণ্ঠ, এত কর্ম-ফাঁকিতে ওস্তাদ। এই জন্যই ছাত্রদের প্রধান যে কর্ম মানুষ হইয়া উঠা এবং তাহার প্রধান পথ যে লেখাপড়া—সে কাজে যাহাতে তাহারা ফাঁকি দিতে না পারে সেই মনোবৃত্তি আনিতে আমাদের—অর্থাৎ অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের—তো সেই রকম হইতে হইবে। প্রয়োজন মিটিলে বা নিরাপত্তার অভাব না হইলে বা সুযোগসুবিধা থাকিলেই যে মানুষ যেমাত্রায় কর্তব্য-পরায়ণ হয় তাহা তো সত্য নয়। ওটা অনেক খানিই আলাদা জিনিষ। কর্তব্যপরায়ণ করিবার জন্যই আলাদা প্রয়াস সদা দরকার। প্রয়োজন মিটাইলেই বা নিরাপদ করিয়া দিলেই কর্তব্যপরায়ণ হইবে না, হইবে না। সমস্ত কর্মের পিছনের মনোবৃত্তি বদলাইতে হইবে। ভারত-বর্ষের লোকের কাঁকি-চেতনা বা দেশকে ভালবাসার মনোবৃত্তি বলিয়া কোনদিন কিছু ছিল না। হাজার হাজার বৎসর সে পারমার্থিকের ধ্যানে কাটাইয়াছে, ব্যবহারিক জগৎকে মিথ্যা মায়াময় বলিয়া উড়াইয়া দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে আর সে-ই পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছে অমনি পরমার্থকে মিথ্যা করিয়া দিয়া এমন বীভৎসরকমভাবে স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছে যে চারিদিকে তাহার নগ্ন মূর্তি আজ দেশকে একদিন দিয়া নরকে পরিণত করিয়াছে। তাই আমাদিগকে সকলের আগে মানুষ হইতে হইবে। সে মনুষ্যত্বের মাপকাঠি সামগ্রিক জীবন-চেতনায় সামঞ্জস্যপূর্ণ ছন্দ। ছাত্র-সমস্যা সমাধানের জন্য আর যত রকম ব্যবস্থা অবলম্বিত হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, তবু অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদিগকে আগে মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে হইবে—ইহা প্রথম হইতে শেষ অবধি মনে রাখিতে হইবে।

(এদেশে) সন্ন্যাসী মেলে অথচ কর্মী মেলে না—এর কারণ এই যে সন্ন্যাসীর উপাস্য যেমন বিপ্লবের দেবতা, উপাসনাও তেমনি বিপ্লবের: আর কর্মীদের উপাস্য বটে বিপ্লব, কিন্তু তারা পন্থাটি চাচ্ছে ঠিক বিষয়ীদের মত আরামের। এ যাবৎ তাই কোন সঙ্ঘ দাঁড়ায় নি, দাঁড়াবেও না যে পর্য্যন্ত কর্মীবৃন্দ খাওয়া-পরা, শোয়া-বসায় সন্ন্যাস গ্রহণ করতে না পারবে।

—শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দ

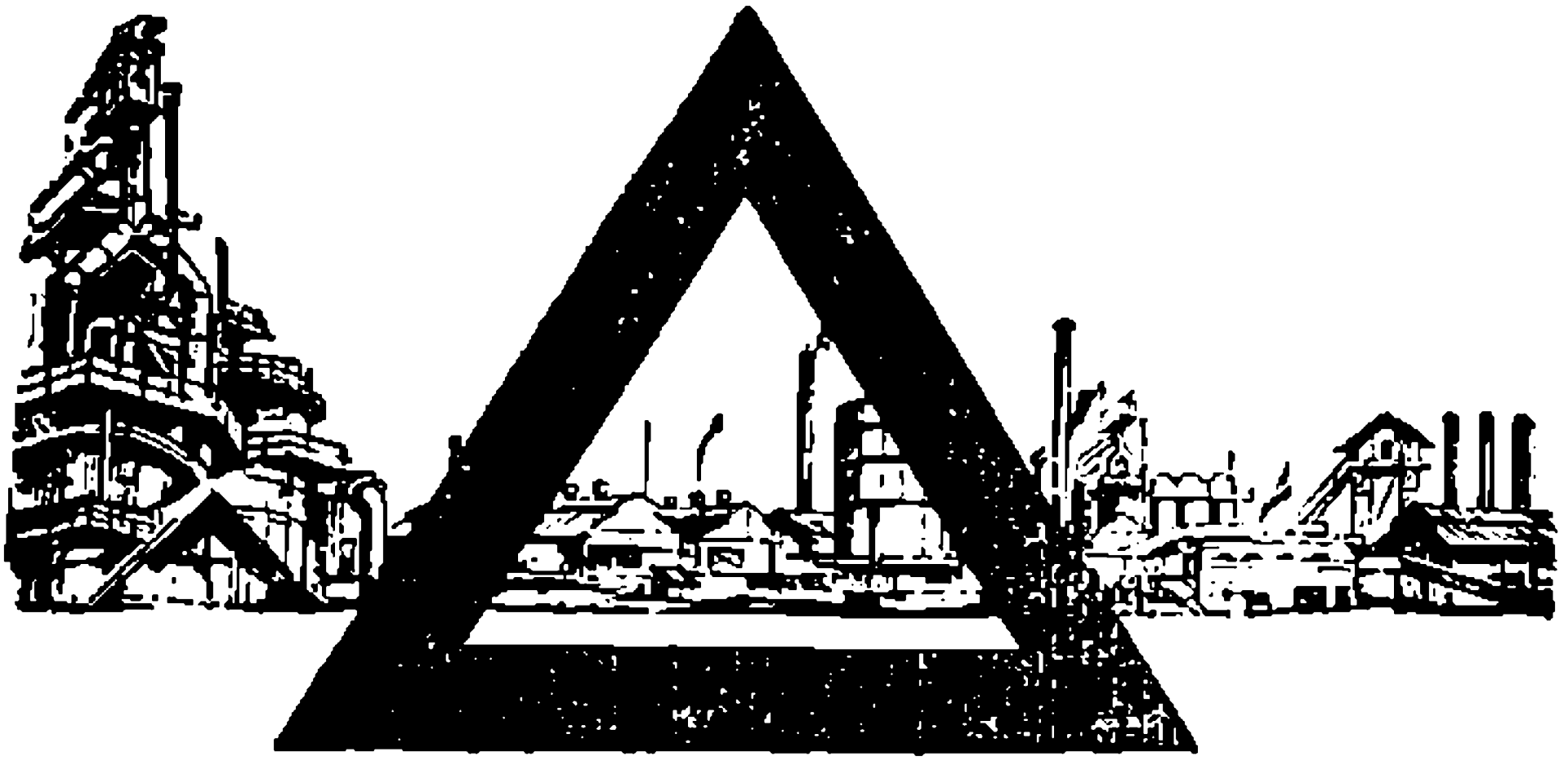

জামশেদপুরে কাজের একটি দিক হল নিরাপত্তা

কলকারখানায় শতকরা পঁচাত্তরটি দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলা যায় কারণ, দেখা গেছে, কর্মীদের অসাবধানে ঝুঁকি নেওয়ার ফলেই বেশীর ভাগ দুর্ঘটনা ঘটে। তাই টাটা স্টীলে খুব কড়াকড়ি বন্দোবস্ত, প্রত্যেক কর্মীকে নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিয়মিত ডালিম দিয়ে নেওয়া হয়।

ইস্পাত কারখানায় ঢোকার পর প্রথমে যা শিখতে হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে নিরাপত্তার বুনিয়াদি শিক্ষা। শুরু থেকে একের পর এক সতর্কতামূলক পর্যায়ে তালিম দিয়ে হাতে-কলমে বানিয়ে নেওয়া হয়। নিয়মিত কারখানা পরিদর্শন, পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তার যন্ত্রপাতি কাজে লাগানো এবং সেই সঙ্গে সেফটি কমিটির বাঘা গোকেদের হুঁসিয়ার দৃষ্টি এই সব মিলিয়ে দুর্ঘটনার মুলোচ্ছেদ সম্ভব হয়, কর্মীরা নিরাপদে কাজ করতে পারেন। এ ছাড়া বাঁধা স্টাফে পড়াশুনো, প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা এ সবেরও ঘন ঘন বন্দোবস্ত করা হয় যাতে নিরাপদে কাজ করা কর্মীদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়।

১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৬ সালের হিসেব একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে এ সব প্রচেষ্টা কতখানি সফল হয়েছে। টাটার কারখানায় দুর্ঘটনার হার পড়ে প্রতিবছরে ২৪৯ থেকে ১৪২তে নেমে এসেছে। আর ১৯৬৬ সালের ১লা জুন থেকে ১৪ই জুনের হিসেব দেখলে তাজ্জব হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই —এই ক'দিনে চল্লিশ লক্ষ শ্রমঘণ্টা কাজ হয়েছে অথচ একটিও দুর্ঘটনা ঘটেনি। নিরাপত্তায় টাটা স্টীল ভারতের ভারী শিল্পে একটি সর্বকালের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

জামশেদপুরে কাজের একটা দিক হল নিরাপত্তা —এখানে শিল্প শুধু জীবিকা নয়, জীবনের অঙ্গ।

টাটা স্টীল

The Tata Iron and Steel Company Limited

TH 3617A

উৎকলভারত

আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৬৭ — বিংশ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

মাতৃ-বন্দনা

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

লইলাম অন্নপূর্ণে তব পদাশ্রয়ঃ
হয়েছি কাতর অতি দীন মা অভয়,
কৃপা কর কৃপাময়ী ঈশানী আনন্দময়ী
তুলি না কখন যেন জননী তোমায়,
তোমার শ্রীপদে যেন শুদ্ধ ভক্ত হয়

তুমি পরমা প্রকৃতি পরম পাবনী,
অনাদ্যা অন্নদা তুমি অনন্তরূপিণী,
তুমি সত্যা সনাতনী নিরিহারা নিরঞ্জনী
ভৈরবী ভবানী তোমে তুমি ভুবনমোহিনী
তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব জানি না ভাবিনী।

সদানন্দময়ী দিবে শক্তিবারিণী
স্নেহময়ী আদ্যাশক্তি তুমি যে জননী
বিশ্বময়ী বিশ্বেশ্বরী তুমি যে পরমেশ্বরী
তুমি অপরূপা অনুপমা জ্যোতিরূপিণী।
কলুষনাশিনী কালী ত্রিকালব্যাপিনী।

কে আছে আনন্দময়ী তোমার মতন ?
তুমি সর্ব্বশক্তিমতী প্রভাময়ী প্রভাবতী
আদ্যাশক্তি মহাকালী তুমি মহাসতী
অপার মহিমা তব কে জানে পার্ব্বতী ?

তুমি গণেশজননী মহেশমনোমোহিনী
ত্রৈলোক্যতারিণী তারা নগেন্দ্রনন্দিনী,
মহেশমোহিনী মহামায়া মহেশ্বরী
জগদ্ধাত্রী জগদম্বা তুমি যোগেশ্বরী
তুমি চৈতন্যরূপিণী ভক্তি-মুক্তি প্রদায়িনী,
শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী তুমি শুভঙ্করী,
পরেশী পরমেশ্বরী শিবানী শঙ্করী।

পদতলে প্রভাকর তালে চন্দ্র মনোহর
নয়নে বহিছে দিবা প্রেমের পাথার,
তাহাতে উঠিছে কত লহরী সুন্দর।

নিত্যানন্দময়ী নিত্যা সত্যা সনাতনী,
শশাঙ্কধারিণী শ্যামা শশাঙ্কবরণী,
উমে, উজ্জ্বলবরণী, নীল নীরদবরণী
আদ্যাশক্তি মহাকালী, মুণ্ডমালিনী
অনন্তরূপিণী অন্নপূর্ণা আদ্যোপিনী

রণরঙ্গিণী

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ॥

(৪১ বৎসর পূর্বের লেখা পুনর্মুদ্রিত)

শোন বিশ্বের চির-উপেক্ষিত, চির-লাঞ্ছিত, চির-অস্পৃশ্যের দল, মায়ের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অভয়া বেদবাণী—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি॥

শোন, কাণ পেতে শোন, সকল দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে শোন, শুনতে শুনতে তাই হয়ে যাও। এতদিন পৌরুষাভিমানী মধুকৈটভের দল, ধনাভিমানী মহিষাসুরের দল, পাণ্ডিত্যাভিমানী রক্তবীজ শুম্ভনিশুম্ভের দল যে শরণ্যা তোমাদের অস্ত্র নেতে নেখেছিল, যে শরণ্যার ভয়ে তোমরা ক্লীবত্ব, অমনুষ্যত্বের অন্ধকারের গভীর গুহায় মরণের নিকট হাত শুনতে শুনতে মৃতপ্রায় হয়ে যাচ্ছিলে, আজ তা রণরঙ্গিণীর ঐশ্বরভাষীর অন্তরণে বর্জ্জন ক'রে এখন রণসাজে উন্মাদ হতে হবে যে, সমগ্র জগৎ দেখবে, বুঝবে, আস্বাদন করবে মা কে, মায়ের স্বরূপ কি, মায়ের অভয়-বাণীর গূঢ় রহস্য কোথায় এবং কতটুকু। আর চোখের জল ফেলবার অবকাশ নেই, আর তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে আকাশ-বাতাস বিষাক্ত করবার সুযোগ হবে না, আর অনাহারে-অত্যাচারে, অশাসনে-নারকীনির্য্যাতনে শেষের দিনকে ব্যাকুলভাবে আহ্বান করবার দুঃসাহস পোষণ ক'রনা, সকল নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে অট্টহাস্যে হাস, সকল জড়তা অবসন্নতা পা'য়ে দ'লে যেই যেই ক'রে নাচ, হতের সকল মরণ পান করতে প্রাণ খুলে অমৃতময়ীর গান কর, তোমার অস্তিত্বের যাবতীয় স্পন্দনকে দিব্যোন্মাদ-যোগে যুক্ত করে একবার বিশ্বের সামনে প্রকট কর। ওগো, তোমাদেরও আর কাম-উপভোগের যন্ত্র হলে চলবে না। মায়ের রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি যে তার পরিচয় ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, তোমায় যে রণ করতেই হবে, বিনা রণে আত্মসমর্পণ করবার অধিকার যে মা কবেই কেড়ে নিয়েছেন! তুমি পাবে? সে আশা দুরাশা। ত্রৈলোক্য ও অখিল দেবগণকে পরাভূত ক'রেও যেদিন শুম্ভের উদ্ধত সাধ মিটল না, দেবতার প্রাপ্য যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেও যেদিন শুম্ভের লোভ বাড়ল বই কমল না, ত্রৈলোক্যের শ্রেষ্ঠ রত্ন, দেবেন্দ্র-বাহন ও ক্ষীরোদ সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবঃ আহরণ করার পরেও যেদিন বিশ্ব-জননী গৌরী-শক্তির ভর্ত্তা হবার জন্য শুম্ভের প্রবল কাম জেগে উঠল, সেদিন মায়ের যে রণরঙ্গিণীরূপ বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছিল, তা আছে, আছে গো আছে, এখনও তা তোমার হৃদয় মাঝে লুকিয়ে আছে, শোন তার আহ্বান শোন, মানদার মান-দানকারী আহ্বান শুনে তার মাকে কাঁদা দিয়ে যেন মায়ের যোগ্য সন্তান হও। পালিয়ে বাঁচতে পারবে না, পালাবার পথ নেই, এ যে যুদ্ধের দেশ, এখানে বিনা যুদ্ধে কেউ কোন দিন কিছু করতে পারে নি ওগো, তোমরা কাকে কর্ত্তা বানিয়ে তার চরণে কানের ডালি দিচ্ছ? কে তোমার কর্ত্তা? চেন কি? পরীক্ষা করেছ কি? কর্ত্তৃত্বের দাবী করছে যে সব শুম্ভের দল, তারা কি তোমাদের সংগ্রামে জয় করেছে? তারা কি তোমাদের দর্প চূর্ণ করেছে? তারা কি তোমাদের প্রাণের সামনে দাঁড়াবার সামর্থ্য রাখে? বিনা পরীক্ষায় কর্ত্তা মেনে সব লুট হয়ে গেছে, আজ তুমি ব্যভিচারিণী, সব দিকে তাই তোমার মরণ। বীরের অভিনয় করলেই বীর হয় না, অস্ত্রশস্ত্র থাকলেই যোদ্ধা হয় না, মেসিনগান্-এরোপ্লেনের গরব আর কতটুকু? এ দেশ বহুবার অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্‌ঝনি শুনেছে, আজও তা কাণে শুনছি। কিন্তু এদেশে তা সবই ব্যর্থ

হয়ে গিয়েছে, সবই হাওয়ায় বিলীন হয়ে গিয়েছে। কত সাহস, কত বীরত্ব, কত তেজস্বিতা, কত গৌরবের ইতিহাস এ দেশের বুকে লেগে রয়েছে, এ দেশের কাছে কে আবার নূতন ক'রে কি দেখাবে, শোনাবে ও চমক লাগাবে? যত দেখা এ দেশ দেখেছে, যত শোনা এদেশ শুনেছে, যত রক্তস্রোত এ দেশের বুকের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, যত জয়-পরাজয়ের কাহিনী এ দেশের বুকে ঘুমিয়ে আছে, এ দেশের ইতিহাস সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস কার সাধ্য এর সামনে দাঁড়িয়ে নূতন ইতিহাস রচনার কল্পনা করে?

বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষিতি, অপ্, তেজ, চন্দ্র, সূর্য, নদ-নদী, সবাই ত যুদ্ধ-ঘোষণা ক'রে যে যার বিশিষ্টত্ব রক্ষা করছে, তারা ত কেউ মানবের কামের সামনে বিনা যুদ্ধে আত্ম-সমর্পণ করে না। আর তুমি কিনা মানব—হও তুমি নির্ধন, হও তুমি অকুলীন, হও তুমি মূর্খ, হও তুমি প্রভা, হও তুমি কামিনী,—তুমি কিনা যার-তার সামনে তার প্রবঞ্চনার মিথ্যা শক্তির মিথ্যা হুমকিতে ভীত ত্রস্ত হয়ে, থর থর ক'রে কেঁপে দেহ-মন-প্রাণ সব তাদের কাম-সেবায় লাগাচ্ছ? এর চেয়ে মায়ের অপমান কি কেউ করেছে? বিশ্বের কে না ডেকে বলছে—আমার ভর্তা হতে চাও? আমায় জয় কর। পৃথিবী ডেকে বলছে—'যো মাং জয়তি সংগ্রামে,' তেজ-বারি ডেকে বলছে—'যো মাং জয়তি সংগ্রামে', আকাশ-বাতাস হাক দিয়ে বলছে—'যো মাং জয়তি সংগ্রামে'। আর তুমি কিনা বিনা রণে অনুকম্পোগ্যা হতে চলেছ! রণ-সজ্জায় বিশ্বের যাবতীয় তত্ত্ব সব সজ্জিত। পরিবার, সমাজ, জাতি যে পর্যন্ত না এই রণ-কৌশল শিখবার জন্য লোলুপ হচ্ছে, যে পর্য্যন্ত না মহাপ্রকৃতির আহ্বানের মাঝে খণ্ড প্রকৃতি অর্থাৎ প্রজার দল, মেয়ের দল ঝাঁপ দিচ্ছে, সে পর্য্যন্ত কোথাও প্রেম-প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নেই। অত্যাচারীর কাম অত্যাচারিতের সংগ্রাম ঘোষণার ভিতর দিয়েই প্রেমে পরিণত হয়। অত্যাচারিতের ক্লীব আত্মদানের ভিতরে অত্যাচারীর কাম সকলকে শিক্ষা দিয়ার ক'রে বিশ্বকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। আজ সমাজের প্রতি স্তর থেকে ধ্বনি উঠুক—যো মাং জয়তি সংগ্রামে। স্ত্রী স্বামীকে শোনাক—যো মাং জয়তি সংগ্রামে; পুত্র পিতার কাণে কাণে বলুক—যো মাং জয়তি সংগ্রামে; প্রজা রাজার দরবারে সহস্র সহস্র স্থানে ঘোষণা করুক—যো মাং জয়তি সংগ্রামে, শিষ্য গুরুর পদতলে ব'সে জপ করুক—যো মাং জয়তি সংগ্রামে। গুরুগিরি, রাজগিরি, পিতাগিরি, স্বামিগিরি সব চূর্ণ হয়ে যাবে, সকল কামের উদ্দীপ্ত হুতাশন জপ করে নিতে যাবে। সংগ্রামকে যতই আমরা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র থেকে দূরমন বলে নির্ব্বাসিত করতে যাচ্ছি, যতই আমরা শান্তির ভিত্তিতে পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র গড়তে ছুটেছি, ততই পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সব রসাতলে যাচ্ছে। রণং দেহি, রণং দেহি, রণং দেহি—এই ত প্রকৃতির একমাত্র ঘোষণা। বিনা রণে ভগবান ভক্তকে, ভক্ত ভগবানকে, পুত্র পিতাকে, পিতা পুত্রকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, রাজা প্রজাকে, প্রজা রাজাকে, পাবে না, পেতে পারে না. তাই অত্যাচারীর মুখ থেকে যখন ঘোষিত হয় শান্তির কথা, কল্যাণের কথা, তখন তাকে সর্ব্বতোভাবে তামসিক উক্তি বলে বর্জ্জন করো। বল—যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ চাই। রক্তের ভিতরে যে যুদ্ধ চলছে, তাকে কি থামিয়ে দিতে পার? বিনা যুদ্ধে রক্ত চলে না, বিনা যুদ্ধে রক্ত লাল হয় না, বিনা যুদ্ধে রক্ত জীবন দেয় না। আর তুমি কিনা বিনা যুদ্ধে পরিবার চালাতে চাও, পরিবারকে প্রেমের মক্ষিম আকার সুন্দর করতে চাও, সমাজকে চঞ্চল জীবনের অন্তপ্রেরণায় জীবন্ত করতে চাও! যুদ্ধ করতেই হবে; যুদ্ধ এড়াতে চাইলে যে বিশ্রী, ঘৃণিত তাড়স যুদ্ধ তোমার কালাপাহা করবে, তা কি আজ তোমার চতুর্দ্দিকে ফুটে উঠছে না? আজ কোন্ পরিবারে, কোন্ সমাজে, কোন্ জাতিতে বিশ্ব-বিদ্রোহী রণের আয়োজন চলছে না? এই বিশ্ব-বিদ্রোহী যুদ্ধের মূলে প্রবর্ত্তিত করতে হবে রণরঙ্গিণী মায়ের শ্রীচরণনিঃসৃত সত্য-ন্যায়-পরমার্থসূত যুদ্ধ-কৌশল। সব আবার আসবে, সব আবার খেলবে, সব আবার বাঁচবে। মায়ের কাছে বর চাও, শুধু "রণং দেহি, যশো দেহি, বিত্তং দেহি" ব'লে চেয়ো না, বল "রণং দেহি, বীর্যং দেহি, ব্রহ্ম

দেহি"—চাই বল, বিশ্বের প্রতি অণুতে পরমাণুতে বল, নারী-নরে বল, রাজা-প্রজায় বল, ভক্ত-ভগবানে বল। বল, বল, বল, সর্ব্বত্র বল।

কিন্তু কোন্ পথে যুদ্ধ করতে হবে? যে পথে বর্ত্তমান সভ্যতা ধনিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের, রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের, কুলীনের বিরুদ্ধে অকুলীনদের, পুরুষের বিরুদ্ধে মেয়েদের ক্ষেপিয়ে তুলছে, সে পথ অনার্য্য, অধমতর, ওতে বীর্য্যলাভ:ত দূরের, বীর্য্যহীনতাই একমাত্র পুরস্কার। নিরস্ত্রকে অস্ত্রহীন দেখে এদেশ কখনও যুদ্ধ চালায় নি, অস্ত্রহীনকে অধিকতর অস্ত্রহীন ক'রে এদেশ ক্লীবের মতন যুদ্ধের আয়োজন করেনি। যুদ্ধ হয় বীরের সঙ্গে বীরের, যুদ্ধ মনুষ্যত্বের প্রকাশ, যুদ্ধ পাঠতা নয়, যুদ্ধ short-cut policy নয়। বর্ত্তমান ভীরু, কাপুরুষ, ক্লীব যুগ মনুষ্যত্বের যুদ্ধকে অস্ত্রে টেনে এনে যুদ্ধবিদ্যার যে অপমান করছে, এমন অপমান কেউ করেনি। মেসিনগান, ডুবোজাহাজ বিজ্ঞানের মহিমাপ্রচারক হতে পারে, কিন্তু যুদ্ধ-কৌশলের যে মহা অপমানকর, তা কি নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে না? মা তাই বলছেন—যো মে প্রতিবলো লোকে। যার 'প্রতিবল' হবার সামর্থ্য আছে, সেই দর্প চূর্ণ করতে পারে, সেই কর্ত্তা হতে পারে। রাম ছিলেন রাবণের 'প্রতিবল', কৃষ্ণ ছিলেন কংসের 'প্রতিবল', প্রহ্লাদ ছিলেন হিরণ্যকশিপুর 'প্রতিবল'। রাবণের বল ছিল দশ মাথা, বিশ হাত; রামের বল ছিল বিরাট প্রাণ। রাবণের বলের পরিচয় হল সীতা-হরণে, দেবশক্তির অবমাননায়; রামের বল ফুটল সরযূর উচ্ছিষ্ট জলে, কাঠবিড়ালীর সেবাগ্রহণে, ভক্ত-হনুমানকে কোল দানে। রাবণের বল 'বুদ্ধি ও কর্ম', রামের বল 'প্রাণ'। রামের বলই সার্থক। 'বল' শব্দের অর্থ পাণিনি দিয়েছেন "বল প্রাণনে" অর্থাৎ বল অর্থ হল প্রাণ। রাবণ প্রাণহীন, শোষণে তার গতিবিধি, রাম প্রাণনাথ, পোষণেই তাঁর লীলা। বর্ত্তমান অসুর যুগ অত্যাচারীর সেবণের সঙ্গে লড়তে গিয়ে অত্যাচারিত্বকে শিখিয়ে দিচ্ছে ঐ অত্যাচারীর রণকৌশল। ইংলণ্ডে কয়লার খনির ধনিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে যখন শ্রমিক দল ৭ ঘণ্টা খাটবে, না ৮ঘণ্টা খাটবে এই নিয়ে লড়াই করছে, তখন তারাও যে ধনিকের হাতে পুতুলের মতন ধনিকদের অস্ত্র-সাহায্যেই তাদের সঙ্গে খেলছে, তা কি তারা বুঝতে পাচ্ছে? ধনিকদের পক্ষে দেশ, কাল, পাত্র সবই অনুকূল: অত্যাচারিত্বের সহায় হল দেশ-কাল-পাত্রের অতীত ঐ প্রাণসত্তা, যার ভিতরে দেশ-কাল-পাত্র ত আছেই, আরও আছে এদের উপরে দাঁড়িয়ে এদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ওদের দর্প চূর্ণ করবার সামর্থ্য। 'বুদ্ধির' প্রতিবল 'প্রাণ'। বুদ্ধির সহায় বাইরের অস্ত্রশস্ত্র, প্রাণের পোষক অন্তরের মনুষ্যত্ব, বহিঃপ্রকৃতির প্রাণের আলোড়ন। বুদ্ধি শূন্যগর্ভা, প্রাণ পূর্ণগর্ভ। বুদ্ধি বিশ্বের বিশ্বত্বকে অস্বীকার করে হঠাৎ চরমে পৌঁছাতে চায়, প্রাণ বিশ্বের জটিলা-কুটিলাকে মেনে নিয়ে লীলাবিলাসীর লীলারসাস্বাদন করতে চায়। বুদ্ধির মীমাংসা ক্ষণিক, অংকোশ, 'বিবর্ত্তন পরোমুখবৎ'; প্রাণের মীমাংসা পারমার্থিক, সত্যের মতন সহজ, সরল, নিরেট অটুট।

ওগো আমার ভারতবর্ষ, বিশ্বের উপেক্ষিততম, লাঞ্ছিততম, অস্পৃশ্যতমদের মূর্ত্ত বিগ্রহ, তোমারই কোলে না একদিন রণরঙ্গিণী মা 'প্রতিবল' হবার সাধনা শিখিয়ে দেবার জন্য প্রকট হয়েছিলেন? তুমি তোমার সকল পরিবারে, সকল সমাজে, সকল রাষ্ট্রে ফিরে এই রণ-যজ্ঞকে বরণ ক'রে কি আজও নেবে না? দীর্ঘ্যহীনের যুদ্ধ করতে করতে বিশ্ব যে মলিন, বীভৎস ক্লীবত্বের লীলাভূমি হতে চলেছে, এই দুর্দ্দিনে কে আছে তুমি ছাড়া যে বীরের মত যুদ্ধ-যাত্রা করবার শক্তি, সাহস ও কৌশল জানে? তুমিই বিশ্বের ধরণী, তুমি বিশ্বের তরণী, তুমিই বিশ্বের মা। বিশ্বে আজ যুদ্ধের ধরণী কেউ নেই, বিশ্বে আজ পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-তরণী তুমি ছাড়া কেউ হবার সামর্থ্যও রাখে না, সম্ভবও নয়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তোমার ইতিহাসে অতি তুচ্ছ কথা। তোমার প্রতি স্পন্দনে ফুটে উঠতে পারে কিম্বা ফোটাবার দিকে চলেছে যে আত্মারাম-ভাব ও ভক্তি-প্রকাশ, তা যে বিশ্বে এক অতুলনীয় সম্পদ। এই নিজের ঘরে নিজে থেকে এবং পরের

ঘরে পরকে থাকবার সুযোগ দিয়ে নিজের সঙ্গে পরের যে ভক্তি-মিলন, এ যে তোমারই দান, এ যে তোমারই সিদ্ধি, এ যে তোমার ভুবনমোহন লীলাবিলাস। তোমার কর্ত্তা কেউ নেই, তোমার দর্প চূর্ণ করার দুঃসাহস যারা করে বসে মনে করে, তারা বাতুল। অচিরাৎ তাদের শক্তির দর্প চূর্ণ হবে। তুমিই তোমার কর্ত্তা, তুমিই তোমার কর্ম্ম, তুমিই তোমার করণ, তুমিই তোমার সম্প্রদান, তুমিই তোমার অপাদান, তোমার বিরাট রূপের সঙ্গেই তোমার বরাট রূপের সম্বন্ধ, তুমিই তোমার অধিকরণ। তুমিই বিশ্ব-ভারত, তুমিই উদ্ভিদ-ভারত। বিশ্বের যাবতীয় জাতি—ইংলণ্ড, ফরাসী, জার্মেনি, রাশিয়া, আমেরিকা, প্রতি সমাজে, প্রতি রাষ্ট্র-চেতনা স্পন্দনে, তোমারই জয়। বন্দে মাতরম্।

স্বপ্ন দেখো

॥ শ্রীভারতী ॥

চতুর্দিকে অপর্য্যাপ্ত কুশ্রীতার স্তূপ ;
মেদে মাংসে স্ফীততার আস্ফালে ঐশ্বর্য
লুপ্ত। এর মাঝে বাঁচো যদি
স্বপ্ন ছাড়া গতি নেই ; স্বপ্নের আলোতে
রাখো মাথা। স্বপ্ন দেখো কালো রাতে
নিমীলিত চোখে, স্বপ্ন দেখো
জাগ্রত প্রহরে। তবে যদি বাঁচো।
বাঁচাই জীবন স্বপ্ন, বাঁচাই প্রতিজ্ঞা ;
সে বাঁচা আত্মার বাঁচা ; সূক্ষ্ম সুষ্ঠু
মানস সৌন্দর্যে। চতুর্দিকে ধ্বনি বাজে
বিভীষিকা মূর্ত্ত আবরণ। তাতে স্বপ্ন,
সত্য যেন টুঁটি ধরে নাড়া।
তবু স্বপ্ন প্রাণময়, রাখো তাকে বুকে
চোখের কাজলে আঁকো স্বপ্নময় ভাষা ;
প্রহরে প্রহরে আনো স্বপ্ন রাশি রাশি
সহজ সুন্দর স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখো
পরিবেশ সহজ সরল। প্রাণ আত্মা কথা কয়
নিরঙ্কুশ অবারিত ঘরে।
সুগভীর স্বপ্ন দিয়ে
বর্ত্তমান পাষাণ প্রাচীরে
আঁকো যদি সভ্যতার মানুষের মুখ
আঁকো যদি আত্মার বিস্তার
সে স্বপ্নই সত্য তবে। সেই স্বপ্ন
বুকে নিয়ে ঘুমাও সহজে।
একদিন এই স্বপ্ন রূপ পাবে
ধরণীর প্রতি ক্ষেতে মাঠে
বিশ্বাসের সেই স্বপ্ন আঁকা থাক বুকে।

মায়ের পূজা

॥ রেণু মিত্র ॥

আবার পূজা—দুর্গাপূজা—আসিয়া পড়িল। আজকাল-কার আমাদের কাছে পূজার কোন আবেদন আছে কি? কত কত বৎসর ভারতবর্ষে এই পূজা করিয়াছে, জানে করিয়াছে, অজানে করিয়াছে, বুঝিয়া করিয়াছে, না বুঝিয়াও করিয়াছে। আজও করে। কিন্তু এই-ই কি পূজা? পূজাকে অবলম্বন করিয়া জাতির জীবনে আজ যে তামসিকতা চলিতেছে, তাহা কি কোন দিক দিয়া কল্যাণ করিতেছে? এ কথা ভাবিবার আজ সময় আসিয়াছে। ভাবনা চিন্তা না করিয়া অতীতকে হুবহু পুনরাবৃত্ত করার দিন আজ নাই। আজ যদিও অতীতের বলিয়াই সব বাদ দিব তাহাও নয়, আবার তাহাকে হুবহু চালাইতে চাহিব তাহাও নয়। আজ আমরা সার্বিক জীবনবোধের আলোকে জাগিয়া দেখিব অতীতকে কোন্ রূপে গ্রহণ করিলে তাহা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে আজ কল্যাণকর হয়। পূজার নামে তামসিকতা যত শীঘ্র দূর করা যায় তাহার চেষ্টা করা আজ ততোধিক প্রয়োজন। মাত্রাহীন কুৎসিৎ সাজগোজ, ইলেক্ট্রিক আলোর চমকানি, মাইকের বিরামহীন চিৎকার (উহাকে সঙ্গীত না বলাই শ্রেয়:) প্রভৃতি উৎকট বহির্মুখীনতা যেমন এক রকমের তামসিকতা, তেমনি পূজার অর্থ না বুঝিয়া শুধু ঘরে বসিয়া মন্ত্র পড়িয়া যাওয়ার অন্তর্মুখিনতাও আর এক রকমের তামসিকতাই। পূজার অর্থ বুঝিয়া সে অর্থকে জীবনে রূপ দিবার চেষ্টাসহ যে পূজা, তাহাই পূজার্থ-বাচ্য। আজ আমাদিগকে প্রথমে পূজার অর্থ বুঝিতে হইবে, তাহার পর দুর্গাপূজার অর্থ বুঝিতে হইবে। পূজার কয়দিন সেই অর্থকে ধ্যান করিতে হইবে, আচরণে আনিবার জন্য শক্তি অর্জন করিতে সংকল্প লইতে হইবে—সারা বছর ভরিয়া এজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে। তবেই সত্যিকারের পূজা হইবে।

পূজার অর্থ কি? আমরা বাহিরে কোন তত্ত্বকে, কোন তত্ত্বঘন মূর্তিকে বন্দনা করা, তাহার সামনে নত হওয়া, বিনত হওয়া—নিজেকে নোওয়াইয়া দেওয়া। কেন নোওয়াইয়া দিব? উহাকে আমার মধ্যে প্রবেশ করাইবার জন্য—তাঁহার বড়ত্বকে আমার মধ্যে ধারণ করিবার জন্য। এই জিজ্ঞাসু, গ্রহণেচ্ছু মনোভাব না থাকিলে শুধু উপকরণ বাহুল্যে পূজার অনুষ্ঠান করার অর্থ কিছুই নাই। কিন্তু আজিকার দিনের মানুষের কাছে জ্ঞান লাভের সহজ রাস্তা শুধু বই পড়া। বই পড়িয়া কিছু ভাষা আয়ত্ত করাই ত আজিকার দিনের মানুষের জ্ঞানের সীমানা। আজিকার মানুষের অক্ষর জ্ঞানটুকু হইলেই তাহার পর আর অপরের নিকট শিখিবার কিছু থাকেনা। তখন নিজের বুদ্ধিতে যাহা যতটুকু বুঝিতে পারে, তাহার বাহিরে আর কিছু জানিবার আছে, শিখিবার আছে, গ্রহণ করিবার আছে তাহা তাহাদের ধারণায় আসে না। তাই পূজা বলিয়া তাহারা কিছু বোঝে না মানে না। কিন্তু বই পড়িয়া জানাই যে জানার সবটুকু পথ নয়—আমার চেয়ে বৃহত্তর মহত্তর সত্তাকে পূজা করিয়াও অর্থাৎ তাঁহার কাছে নিজেকে নোওয়াইয়া দিয়াও যে কিছু জানা যায়—এ কথাটা আজ সাধারণভাবে মানুষের কাছে হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু জীবনের যে ইহা একটা বিশেষ কথা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা ভাল। মনস্তত্ত্বগতভাবেও ইহা সত্য যে, নিজেকে কোথাও প্রস্থাপন করার জন্য, নিজেকে নিঃশেষে দিবার জন্য মানুষের মধ্যেই একটা আকুতি আছে, যতই মানুষ বুদ্ধিমান হউক না কেন, আর যতই মানুষের সত্তা বিকৃত হউক না কেন। কোন বড়র কাছে নিজেকে নোওয়াইয়া দিলে, বিনত করিলে মানুষের অবশ্যই কল্যাণ হয়ই। তাই পূজার প্রয়োজন মানুষের জীবনে আছেই।

কাহাকে পূজা করিব? পূজা সব কিছুকেই করা যায় ইহা বৈজ্ঞানিক যুগে বসিয়া নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস করিতে পারিব। একটা ষটর দানার মধ্যে যে অতবড় এ্যাটমিক শক্তি আছে ইহা কি আমরা আগে জানিতাম? আজিকার বিজ্ঞান আমাদের জানাইয়াছে। এইখানে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল লিখিত প্রায় ৩০ বৎসর আগের কথার অর্থ বোঝা যায়—'দারুতে ব্রহ্ম নয়, দারুই ব্রহ্ম'। জড়ই যে শক্তি ইহা বুঝিতে আজ কাহার বিলম্ব? অণুপরমাণুগুলির এক রকমের বিন্যাসে যাহা জড়, সেইগুলিরই আর এক রকমের বিন্যাসে তাহাই শক্তি, জড়াতীত সত্তা। তাই যে কোন কিছুকেই পূজা করিতে পারি বটে। কিন্তু ষটর দানার মধ্য হইতে এ্যাটমিক শক্তিকে বাহির করিবার কলা কৌশল যেমন সকলে জানে না, তেমনি কাঠ পাথরের মধ্য হইতে ব্রহ্মকে বাহির করিয়া আনাই কি সকলের পক্ষে সম্ভব? তাই ব্রহ্মত্ব যেখানে মানুষের মধ্যে রূপ লাভ করে, মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ, সেই মানুষকে পূজা করিলেই তাঁহাকে আমার মধ্যে ধারণ করা সহজ হয়, আমি সহজে ব্রহ্ম-স্বভাব লাভ করিতে পারি। আজ মানুষ-পূজার দিন। বার্ণার্ড শ'-এর এই কথাটা আজিকার মানুষের জন্যই, 'Beware of those whose God is in the skies'। প্রত্যক্ষ সেই বড়, সেই মহত্ত্বের আমাকে আমার ক্ষুদ্র আমিত্বের আবর্ত্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া উত্তীর্ণ করাইয়া লন—যাহা আমার ব্যক্তিগত চেষ্টায় মোটেই সহজসাধ্য নয়। যিনি কোনটাকে অতি মূল্য দেন না, আবার কোনটাকে বিনামূল্যে অবজ্ঞাভরে অপব্যয়ও করেন না, কোন কিছুর প্রতিই আসক্তি কিংবা বিদ্বেষ যাহার বিচার বিবেচনাকে, চলার পথকে আচ্ছন্ন করে না, বিশ্বাস্তার বিরাট প্রেমকে হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাহাই মানুষের দুয়ারে উপস্থিত করিবার জন্য যিনি চির পথিক, এমন বড়র কাছে নিজেকে নোওয়াইয়া দিলে, নিজেকে বিনত করিলে মানুষ সত্যিই কল্যাণ লাভ করে। যাহা হউক, বর্তমান আলোচনা সেই প্রত্যক্ষ বড়র পূজা সম্বন্ধে নয়। ভারতবর্ষ সেই সুপ্রাচীন কাল হইতে কতকগুলি তত্ত্বকে কতকগুলি অনুষ্ঠানের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছে—দুর্গাপূজা এই রকম একটী তত্ত্বের অনুষ্ঠান। আজ সেই দুর্গাপূজার কথাই ভাবিয়া দেখিব।

প্রশ্ন হইতে পারে প্রাচীন এই সকল অনুষ্ঠান আমরা পালন করিব কেন? করিব এইজন্য যে, সত্য মানুষের স্বাভাবিক স্বভাব এই যে সে তাহার দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সীমাহীন কালের মাঝে মাঝে উৎসবানন্দের বাতি জ্বালাইয়া তোলে। এ স্বভাব হইতে তাহার মুক্তি নাই। বিভিন্ন যুগে এই উৎসব অনুষ্ঠানের রূপ বা স্বরূপের পরিবর্তন দেখা দিলেও উৎসব মানুষের আছেই। অতীতের অনুষ্ঠানগুলি যদি আমাদের আজিকার জীবন-চেতনার পক্ষে বাধাস্বরূপ হয় তবেই সেগুলি আমাদের পক্ষে পরিত্যাজ্য, কিন্তু যদি তাহাদের মধ্যে বর্তমান যুগ-চেতনার তত্ত্ব খুঁজিয়া লইতে পারি তাহা হইলে সেই অতীতকে বাদ দিবার পক্ষে যুক্তি কোথায়? অতীতকে ইচ্ছা করিলেই তো আর গায়ের জোরে বাদ দেওয়া যায় না, অতীত যে আমাদের রক্তের মধ্যে। অতীতকে বর্তমান করিয়া লইব—যাহাতে সে আমাকে, আমার অগ্রগতিকে বাধা না দেয়।

এই দুর্গাপূজা আমাদের বহু প্রাচীন। কত মহৎ প্রাণ কত রকম করিয়া ইহাকে বুঝিয়াছেন—আজ আমরা কি রকম করিয়া বুঝিলে আমাদের বর্তমান যুগের জীবন সে বোঝাবুঝি আনন্দপূর্ণ এবং সার্থক হয় আসুন সেই রকম করিয়া ভাবিয়া দেখি। দুর্গাপূজার তত্ত্ব কি? সুপ্রাচীন এই অনুষ্ঠানটীর পিছনের পরিকল্পনা ও তত্ত্ব খুব বড়—গভীরতায় ও ব্যাপকতায় দুই ভাবেই। এই মাতৃ-পূজাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালী তাহার সমাজ-জীবনকে গভীরভাবে আস্বাদন করিয়াছিল। সমাজের প্রতিটি মানুষ সারা বছর ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিত—পূজা কবে? পূজায় আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হইয়া খাওয়াদাওয়া গল্পগুজব যাত্রাথিয়েটার যাইচ খেলা প্রভৃতি কত কি করিবে—তাহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত। আয় এজন্য ব্যবসা বাণিজ্য পূজার সময়ে খুব প্রখর হইয়া উঠিত। এই সমাবেশের উপলক্ষে সমস্ত

সমাজকে সে আকর্ষণ করিত। ইহা গেল এক দিক। ইহা ছাড়া মায়ের পূজাতে যে সকল উপকরণ লাগিত তাহাও সমস্ত সমাজকে আকর্ষণ করিত—সাত নদীর জল হইতে বারবণিতার বাড়ীর মাটি হইতে কত কি যে লাগিত তাহার আর ইয়ত্তা নাই। অর্থাৎ মায়ের পূজায় সকলের ডাক পড়িত। সামাজিক সমাবেশের দিক হইতে এ পূজা তাই পরম অপেক্ষার বস্তু হইয়া সার্থকই হইয়াছে।

এখন দুর্গাপূজার তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

আমার বাহিরে যে বিরাট শক্তির প্রকাশ রহিয়াছে বিশ্লেষ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃষ্টিতে তাহাকে আমা হইতে পৃথক মনে করিয়া, আমার সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা অর্থাৎ তাহাকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা অতএব তাহাকে ভয় করা—ইহা মনের একটা অবস্থা; আবার তাহাকে আমা হইতে একেবারেই বাহিরের মনে না করিয়া, নিজেকে তাঁহারই মধ্যে স্থিত মনে করিয়া তাঁহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে মাতৃ সম্বোধনে নিজের সেই বিরাটের কাছে নিতান্ত মনে করা—ইহাও মনেরই একটা অবস্থা। ভারতবর্ষের দার্শনিক বিশ্ব-শক্তিকে এই শেষোক্ত দৃষ্টিতে দেখিয়াই অভয় হইয়া জীবনকে আনন্দিত করিয়াছে। শক্তিকে মাতৃ সম্বোধন এই জন্যই সার্থক। বলা যাইতে পারে সবই তো মনের কল্পনা—কোন কল্পনা যদি আমাকে বিরাট শক্তির কাছে হীন বোধে আমাকে শক্তিহীন নিরানন্দময় করে, তাহা হইতে কোন কল্পনা যদি আমাকে বিরাট শক্তির আত্মীয় বোধে আমাকে বিশ্ব সহ বিশ্বতে আনন্দিত, তৃপ্ত, প্রসন্ন ও নির্ভয় করে, তাহা হইলে এই দ্বিতীয় কল্পনাই কি অধিকতর উৎকৃষ্ট নয়? প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব, তত্ত্ব বা বিশ্বে হিংসা হইতে তো আনন্দ, তৃপ্তি, প্রসন্নতা, নির্ভয়তা কোনটাই মিলে না—এ গুলি মিলে শুধু ভালবাসার বিশ্বাসে। সে বিশ্বাসে ব্যাপকতার গভীরতার যুক্তি থাকিলেই হয়। তাই বিশ্বের মধ্যে ভিতরে বাহিরে ওতপ্রোত যে শক্তি তাহার বিরাটত্বের কাছে ভীত হইয়া নিঃশক্তি হওয়া অপেক্ষা তাহাকে আপনজন বোধ করিতে পারার মধ্যে যে মানসিক বীর্য ও সুস্থতা আছে, প্রাচীন ভারতের সাধকের এ সুস্থতা ও বীর্য প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

তাই তিনি মা।

তাই বৎসরে বৎসরে মায়ের পূজা।

পূজায় মাকে কি বলিব? প্রাচীন ভারত কি বলিয়াছিল?

বিশ্বস্রষ্টার কাছে সৃষ্টি-কৌশল শিখিতে চাহিয়াছিল। মানুষকে প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি করিতে করিতে বাঁচিতে হয়। এ বিশ্বের প্রতি মুহূর্তে কিছু ভাঙিয়া যাইতেছে, কিছু নূতন হইতেছে—তাহা যেমন সত্য, তেমনি আইতিহ্যও। যাহা গড়িতেছে, তাহাকে ভাঙিয়া ফেলিয়া অথবা তাহারই মধ্য হইতে নূতনকে সৃষ্টি করিতে করিতে মানুষকে বাঁচিতে হয়। আমার ইহারই মধ্যে সেই শক্তিময়ী শক্তিময়ী মায়েরই একটী চিরন্তন রূপও আছে—যাহা নিত্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও অপরিবর্তনীয়।

ভালবাসা মানুষকে আসক্ত করে। কেবল ভালবাসাই আসক্ত করে না—হিংসা বিদ্বেষ ক্রোধ সব কিছুও মানুষকে আসক্ত করে। বিতাড়িত রাজা ও বৈশ্য দুই জনেই অবাক হইয়া ভাবে—যাহারা ধন-লোভে তাড়াইয়া দিল তাহাদেরও জন্য মন পোড়ে কেন? চিত্ত বাধিত হয় কেন? হৃদয় আকুল হয় কেন? হৃদয়ের যে এই ব্যথা ইহা জীবনের স্তরে অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষ শুধু জীব নয়, সে আরও কিছু—তাই তাহারই মধ্যে প্রশ্ন জাগে কেন এমন হয়—কেন ব্যথা পাই? ব্যথা না-পাওয়া কি হয় না?

ভারতবর্ষে যত রকমের চিন্তাধারা সংমিশ্রিত হইয়া ভারতীয় মানসকে সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। কিন্তু এই যত রকমের চিন্তাধারার মধ্যে আত্মীয় পরিজন বা কিছুর জন্য হৃদয় যে ব্যথিত হয়, মানুষ যে কাহাকেও আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়—এই বৃত্তিটাকেই নিন্দিত করিয়াছে যে শঙ্করীয় বা বর্ণাশ্রমীয় চিন্তাধারা তাহাদের কথা বলিতেছে—এই হৃদয়, এই আসক্তি মানুষকে কেবল দুঃখই করে, কেবল মোহগর্তে নিপাতিত করে, কেবল গভীরতার অন্ধকারেই লইয়া যায়, তাই এ বৃত্তি সর্বথা বর্জনীয়।

আসলে এই মনোভাবটী কিংবা এই মতটী মানুষের একদিক মাত্র। হৃদয়ের এই বৃত্তি যেমন প্রবল করে, আসক্ত করিয়া মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে তেমন অন্যদিকে সুন্দর করিয়াও তোলে এই জগৎকে। বস্তুগুলির ভাল না মন্দ, সুন্দর না কুৎসিৎ, তাহা বলিতে পারে হৃদয়—তাহারই চোখে বিশ্ব মধুময়। মানুষের যেমন হৃদয় বৃত্তি রহিয়াছে তেমনি বিচার-শক্তিও দিয়াছেন—কতখানি হৃদয় দিতে হইবে, কোথায় দিতে হইবে, কেমন করিয়া দিতে হইবে—মনুষ্যত্বের এই বিশ্লেষণ করিবার শক্তিও মানুষকে দিয়াছেন। সাধারণ মানুষ এই কতখানি, কোথায়, কেমন করিয়া প্রভৃতি কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবার ক্ষমতা রাখে না বলিয়া হৃদয়ই বেশীর ভাগ হইবে, তাহা কেন? হৃদয় ধরিয়াও রাখে, আবার বিচারের মধ্যে যুক্তিও দে দিতে পারে—এ কথা জানিবার বুঝিবার ইতিহাসই মনুষ্যত্বের ইতিহাস।

রাজা ও বৈদ্যের আসক্তি-বর্জ্জন বিষয়ে চিত্তকে মেধস মুনি শুনাইলেন যে মহামায়া যোগনিদ্রার শক্তি-ধারা এ বিশ্ব ওতপ্রোত—তাঁহার পূজা কর—তাহা হইলে কেন আসক্তি ক্লিন্ন করে তাহা বুঝিতে পারিবে, সে বোধ হইতে মুক্তি পাইবে।

মুনিবর হৃদয়-ধর্ম্মের এই বৃত্তির ক্লেদ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মানুষ বলিয়া একটী বড় কিছু জানিয়া উদ্ভাসিত করিলেন যাহা আমার সঙ্গে একই স্তরে নাই। মায়ের পূজা করিলে বিষয়াসক্ত মনের আসক্তি জনিত বাধা দূর হইবে। স্বপ্ন তখনই দূর হইতে পারে যখন যাহাদের মধ্যে স্বপ্ন তাহাদের প্রত্যেককে যথোপযুক্ত মান মর্য্যাদা ও স্বীকৃতি দান করা সকলের সামঞ্জস্যময় একটী অবস্থার খোঁজ পাওয়া যায়। ইহা স্বপ্নসংক্ষুব্ধ ব্যক্তি-মনের পক্ষে সম্ভব হয় না—তাই যাকে আনিয়া ফেলিতে হয় যিনি প্রত্যেকের মাপ রাখেন, প্রত্যেকের মাপ অনুযায়ী মর্য্যাদা দিতে পারেন—আর সামগ্রিক সামঞ্জস্য-বোধ যাঁহার আছে। তাই মায়ের পূজার প্রয়োজন ছিল

রাজা ও বৈদ্যের স্বপ্ন ছিল—হৃদয় রস-বৃত্তিতে আসক্ত হয় কেন? বলিতেছিলাম আসক্ত হওয়া বৃত্তির সহিত ধর্ম, কিন্তু ইহার বৃত্তি সম্বন্ধে কোন কথা নয়—তাহা হইলে মীমাংসা [illegible]—সে না থাকাই চিরন্তন সত্য। বলিতেছিলাম হৃদয় বৃত্তিকে ছোট করিয়া দেখা বলিয়া জানিতাম বলিয়াই মন হইতে ফেলিয়া দিতে পারিতাম না। কিংবা ভাবান্তরে—আসক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিচার করিতে হইবে কতটুকু আসক্ত হইব, কোথায় আসক্ত হইব, কেমন করিয়া আসক্ত হইব এবং আসক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসক্ত হইব না ইহাও সত্য জানিতে হইবে। এতখানি করিয়া জানিতে জানিতে মন না ধরা পড়িতাম না বলিয়াই সেই আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে। এতখানি করিয়া জানিলেই আসক্তির ক্লেদ আর থাকে না, তাহা আর আবর্ত্তের সৃষ্টি করে না—তখন হৃদয়-বৃত্তির চোখ দিয়া বস্তু-জগৎ সুন্দর হয়, আনন্দের খোরাক জোগায়

এই কথা লিখাইতেই দুর্গাপূজা।

তিন দিন কি লিখিলাম? কি জানিলাম?

বলিয়াছিলাম প্রতি মুহূর্ত্তে মানুষকে সৃষ্টি করিয়া বাঁচিতে হয়। পূজার মধ্যে এই সৃষ্টি করিবার কৌশল শিখি। প্রথম দিন অতীতের স্মৃতি সংস্কার—যাহারই নাম বলুনেতে দেহ মনের নূতন সৃষ্টি করিতে বাধার সৃষ্টি করে—সেই অতীতের স্মৃতি সংস্কার হইতে মুক্ত হইবার কৌশল শিখি। দুর্গাপূজার কাহিনীতে আদি স্রষ্টা ব্রহ্মা নূতন সৃষ্টির পথে প্রথম বাধা এই অতীতের সংস্কার মহাকালী মূর্ত্তির পূজার ছেদ করিয়া সামনে আসাইয়া চলেন। প্রত্যেক নূতন সৃষ্টির প্রথমে মানুষের চোখে যে অনিশ্চয়ের ভীতি আর সংশয় থাকে, তাহারই ফলে মায়ের মহাকালী রূপ ভীষণা রূপ। কিন্তু একটা পরিবর্তনের মধ্য হইতেই নূতন সৃষ্টি—সেই পরিবর্তনের পটভূমিকায় মায়ের রূপ ভীষণা তো হইবেই—তখনও যে তাঁহাকে চিনিতে পারা যায় নাই, তখনও যে তয় ভাবনা বিধা সন্দেহে বুক দুরুদুরু—কি হইবে আর কি হইবে না তখনও যে তাহা জানা যায় নাই। তাই মা ভীষণা। কিন্তু মায়ের প্রতি গভীর শরণাগতির ভূমিতে শক্তিমান মানুষ যখন অনিশ্চয়ের অন্ধকারকে ভয় পাইয়া পিছাইয়া গেল না—তখন সে এক ধাপ অগ্রসর হইল। নূতন

কিছু সৃষ্টি হইল।

তখনই মায়ের মূর্তির পরিবর্তন—কেননা আমারও অস্ত্র তখন অধিকতর প্রবল, নূতন সম্ভাবনার উপলব্ধিতে অধিকতর শক্তিমান—তাই তখন মায়ের মহালক্ষ্মী মূর্তি। ইহা অষ্টমী পূজা দিনের মাতৃমূর্তি। কিন্তু বিশ্ব জুড়িয়া যে শক্তি বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত—সেখানে প্রতি পদে বাধা। এক বাধা উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম—সৃষ্টি হইল—আবার বাধা। এখন সব বিচ্ছিন্ন। বিচ্ছিন্নতার তামসিকতাকে জয় না করিলে সৃষ্টিকে রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সৃষ্টিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে—কেননা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ার তাড়না প্রতি বস্তুর অন্তরে নিহিত রহিয়াও সেই সঙ্গেই মিলিত হইবার প্রেরণাও তাহাতে প্রতিনিয়তই খোঁচা দেয়। মানুষের মধ্যে আলো—সে একলা হইয়া পড়িতে চায়, আবার মিলিত হইবার তীব্র সংবেগও তাহার সমস্ত সত্তায়। আজ ভারতবর্ষের যে অবস্থা তাহা প্রথম সৃষ্টির পরের এই বিচ্ছিন্নতার অবস্থা। স্বাধীনতার পরে সকলেই বিচ্ছিন্ন—ধর্ম বর্ণ, জাত বেদ—আবার প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের সংহতিকে কত রকম ভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে। মহালক্ষ্মীর সঙ্ঘবদ্ধতার পূজায় এ বিচ্ছিন্নতা আমাদের বিনষ্ট করিতেই হইবে—আমাদের মিলিতেই হইবে। মহিষাসুর এই বিচ্ছিন্নতারই প্রতিমূর্তি। তাই অষ্টমীপূজার দিনে মহিষাসুর বধ। নূতন পথে খানিকটা অগ্রসর হইলেই একটা বিরাট অহংতার প্রত্যেকের ভিতরে কেমন করিয়া মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া অপরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বাধাইয়া বসে—কিছুতেই মনে করিতে দেয় না যে প্রতি অন্যায় আমারই অপরাধ। প্রত্যেকেরই যে এ বিশ্বে একটা অনন্যতা আছে তাহা সৃষ্টির পথে প্রথম পদক্ষেপ মানুষকে জানাইয়াছে—কিন্তু আমার অনন্যতা সত্ত্বেও অপরের সঙ্গে মিলিত হওয়ারও যে আমার অন্তরে সমান প্রয়োজন রহিয়াছে এই কথা শিখাইতেই অষ্টমী দিনের পূজা। আমি একই সঙ্গে স্বতন্ত্র এবং পরতন্ত্র—independent and at the same time inter dependent। আমি যদি কেবলই স্বতন্ত্র হই তাহা হইলে আমি উদ্ধৃঙ্খল হইয়া বিশ্বের ভীতি ও শোষণের কারণ হইব—আমি যদি কেবল পরতন্ত্র হই তবে অপরের গোলামী করিয়া চির দিন নিজেকে ও সেই সঙ্গে অপরকেও নীচের দিকে টানিতে থাকিব। তাই আমাকে—বিশ্বের প্রত্যেককে শিখিতে হইবে যে, সে অনন্য হইয়াও সমগ্রের মধ্যে বিধৃত। সঙ্ঘবদ্ধতা ছাড়া সৃষ্টি রক্ষা পাইবে না। আমাদের বিচ্ছিন্নতার মহিষাসুর বধ হইবে বিশ্ব পূজায়—সত্ত্বগুণের ব্যাপকতার দেবতার আরাধনায় যেখানে সকলের মিলন সম্ভব।

সৃষ্টিকে সঙ্ঘবদ্ধ করার পরে আরও এক বাধা আসিয়া সাধকের বিঘ্ন করিবে। সে হইতেছে সৃষ্টিকে নিজের ভোগে লাগান। ভারতের এই বিপদেও আটকাইয়া গিয়াছে—যে স্বাধীনতা সে নিজের দাম দিয়া আনিয়াছিল, আজ তাহাকে সর্বভূত হিতায় না রাখিয়া সে নিজের ভোগে লাগাইতেছে। ব্যক্তি মানুষও এই বিপদে পড়ে। ইহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য জ্ঞানদাত্রী মহাসরস্বতীর পূজা নবমী দিনে। ভোগাকাঙ্ক্ষা জয় করিবার জন্য সর্বভূত-কল্যাণ-বোধ জাগ্রত রাখিতে জ্ঞান প্রয়োজন। সে জ্ঞান শুষ্ক জ্ঞান। জগৎ সাধনা দৈনন্দিন জীবন যাপন হইতে একেবারেই আলাদা কিছু নয়। জগৎ সাধনাই হউক বা দৈনন্দিন জীবন-যাপনই হউক সর্বভূতকে লক্ষ্য না রাখিলে তাহা অকল্যাণ করিবেই—আত্মার মুক্তিও আনিবে না, দেহের সমৃদ্ধিও দীর্ঘদিন রক্ষা করিতে পারিবে না। তাই সৃষ্টিকে নিজের ভোগে লাগানোর মনোবৃত্তি হইতে যাহাতে রক্ষা পাইতে পারি তাহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইলেই পূজা সার্থক।

তখনই আসে বিজয়া। সৃষ্টি করিবার প্রতিটী পদক্ষেপ যদি শুদ্ধ হয় এবং তাহা যদি আমেরিকাকে প্রভাবিত করিতে পারে তাহা হইলে বিজয় লাভ তো হইবেই। বিজয় লাভ হইলেই কোলাকুলি—প্রীতির বাহ্যিক প্রকাশ। আজ যে আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে এত দুর্যোগ তাহার গোড়ার কারণ কি আমাদের পরস্পরের প্রতি, সমগ্রের প্রতি প্রীতির অভাব নয়? তাহার আরও একটা কারণ কি আমাদের সৃষ্টি করার ক্ষমতার অভাবও

নয়? আমরা যদি জাতির পথে, অপ্রীতির পথে, ব্যক্তিগত ভোগের পথে না যাইয়া সত্য সত্য সৃষ্টির পথে, প্রেমের পথে, সামগ্রিক ভোগের পথে—যাহাতেই অপর নাম ত্যাগ, কল্যাণ-বোধ, আত্মীয়তা-বোধ সেই পথে—যাইতাম, তাহা হইলে কি আমাদের এই দুর্দশা হইত? আমরা সৃষ্টি করিব না, আমরা সমগ্রকে ভালবাসিব না—আমরা কী সম্পদ লইয়া বাঁচিব? তাই দুর্গা পূজায় আমরা সৃষ্টি করার কৌশল শিখিব, সৃষ্টি রক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতে শিখিব, সৃষ্টিকে নিজের ভোগে না লাগাইবার বীর্য লাভ করিতে শিখিব—মানুষকে অপ্রীতি করার নৈতি হইতে মুক্ত হইয়া বিজয় লাভ করিব। শ্রীদুর্গা আধ্যাত্মিক দেবী, শ্রীদুর্গা আমাদের বাস্তব জীবনকে সুন্দর ও মর্যাদাপূর্ণ করার দেবী; বাঙালাদেশ শুধুই দুর্গাপূজা যেন না করে। বর্তমান সময়ের সংস্কৃতি-বিপর্যয় অন্ন-বিপর্যয় অপেক্ষা কম দুর্যোগপূর্ণ নয়। শ্রীদুর্গার কাছে আমরা অন্ন সৃষ্টি করার কৌশল, বস্ত্র সৃষ্টি করার কৌশল, আমাদের সংস্কৃতি রক্ষা করার কৌশল শিখিব। অস্ত্র বস্ত্র সৃষ্টি বাদ দিয়া শুধু আধ্যাত্মিক দেবী-পূজায় আজ নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয় লাভ হইবে না। আসক্তি যে স্তরে বিপর্যস্ত করে না—সেই স্তরই বাস্তব প্রয়োজন সৃষ্টি ও সংস্কৃতি সৃষ্টি উভয়কে সম্ভব করিতে পারিবে। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় আসক্তি-মুক্তি ঘটিবে—কেননা বিরাট তিনি, ব্যাপক তিনি, মাতা তিনি—বস্তুর যথোপযুক্ত মূল্যদানের মাত্রা জানেন বলিয়াই আসক্তি-মুক্তি ঘটাইতে পারিবেন। আমরা আজ বিশ্বের এমনই শক্তিময়ীকে ধ্যান করি, অনুধ্যান করি, তাঁহাকে মুহুর্মুহুঃ নমস্কার করি—আমরা যেন শুদ্ধ চিত্ত হই, শুদ্ধ দেহ হই, আমরা যেন সৃষ্টি করার শক্তি লাভ করি, আমরা যেন সর্বভূত-কল্যাণ বাদ দিয়া নিজের কল্যাণ না বুঝি। নমো নমঃ হে শক্তিময়ী, আমাদিগকে শক্তি দাও জয়—সেই শক্তি যাহা কল্যাণী—যাহা শক্তি-মদমত্ততা বর্জিত—যাহা শিব, যাহা সুন্দর—যাহা এক-জগৎ সৃষ্টি করিয়া তুলিবে। নমো নমঃ, নমো নমঃ নমো নমঃ।

দাও আনন্দ আনন্দময়ি

॥ শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ ॥

দুর্গতিনাশিনী জগজ্জননী
এস মা সিংহাসনা ;
অভয় দানিতে এসগো অভয়া
বরি অমৃতকণা।
হাস মা বারেক প্রসন্ন হাসি
হর্ষ জোয়ারে যাই সবে ভাসি
দূর মা ধরার যত ক্লেদ রাশি
অশিবে শোননা !
শারদ শুভ্র অম্বরে দেখা
দাও মা পলক তরে
সুখদা বরদা শুভদায়ি বেশে
অভয় শঙ্খ করে।

দাও আনন্দ আনন্দময়ি
হোক নন্দিত এ নিখিল মহী
মহৎ সতত থাকে মধু বহি
মর্ত্যের ঘরে ঘরে।
সৃষ্টিতে তব হোক পবিত্র
ধরার স্রোতস্বতী
সুধাপ্লুত হোক শস্যের ক্ষেত
লতা ও বনস্পতি।
সুধাময় হোক মানুষের মন
দূরীভূত হোক হিংসা পীড়ন
শোন মা আর্তি মেয়ে আবেদন
দশভুজে পার্বতি।

কালীপূজার তত্ত্বকথা

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

[১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর শনিবার উত্তরপাড়া সর্বজাতিসঙ্ঘের তরফ হইতে শ্রীবিনয় রায় শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজকে কালীপূজা উদ্‌যাপন করিতে লইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীশ্রীকালীতত্ত্ব এবং সর্ব ধর্ম ও সর্বজাতি সম্মেলন সম্বন্ধে শ্রীমৎ স্বামিজীকে ভাষণ দিতে বলায় তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।—স—উঃ তাঃ]

অন্নাভাবে ঘতোঽধ্বরাদিষ্বয়ভন্চার্থেষ্বিজঃ স্বরাট্
যেন ব্রহ্ম হরা য আদিপুরুষো মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।

ভাগবত ১।১।১

...নারায়ণীং নমোঽস্তুতে...

সর্বজাতিসঙ্ঘকে অভিনন্দন জানাই। চিরকাল মায়ে, মায়ের ছেলেমেয়ে ভালবেসেছি—চিরদিন মানুষকে চেয়েছি। চেয়েছি কেন? এই মায়ের কথা মানুষকে শোনাব বলে—মায়ের শক্তি, মায়ের ভক্তি যাতে মানুষ পেতে পারে, পেয়ে সত্যিকারের মানুষ হতে পারে।

কালীমাতার পূজা দীর্ঘদিনের। স্বাধীনতার পূর্বের কালীপূজায় মা শুধু মুক্তিদাত্রী—ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তিই ছিল তখন প্রধান কথা। আজ মুক্তির সঙ্গে ভোগ এসেছে—আজ শুধু মুক্তি দিলে চলবে না, আজ অন্ন দিতে হবে—তাই চণ্ডী বললেন—ভোগাপবর্গদেবী নারায়ণীং নমোঽস্তুতে। তন্ত্র বলছেন—

যত্রাস্তি ভোগঃ ন চ তত্র মোক্ষঃ
যত্রাস্তি মোক্ষঃ ন চ তত্র ভোগঃ।
শ্রীসুন্দরী পূজনতৎপরাণাং
ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব॥

পাশ্চাত্য ভোগবাদী, মোক্ষ নেই—এদিকে মোক্ষবাদী ভারতবর্ষ ২০০ বছর ইংরেজের জুতো খুলেছে। মুক্তি চাই, কিন্তু সকলে মিলে খেতেও চাই—তাই ভোগাপবর্গ যে দেবী তাঁকে চাই, তাই সর্বভূতেষু মূলা রূপেন সংস্থিতা যে দেবী তাঁকে চাই। তাই জড় অন্নময় সমন্বয়রূপে শ্রীনিত্যগোপালকে আজ চাই—শুধু মুক্তির সাধনা যেমন কল্যাণ দেয় নি, শুধু পাশ্চাত্যও নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। আজ ভোগকে মুক্তির ভাষায়, মুক্তিকে ভোগের ভাষায় গড়ে তুলতে হবে।...অন্নের ক্ষেত্রে মুক্তিকে নিয়ে আসতে হবে...। মুক্তিকে একান্ত ভাবে ভোগ-নিরপেক্ষ করেছে বলে 'ক্ষুধিত পাষাণে'র কাদিনী সতত হয়ে থাকে। ক্ষুধিত জড়বাদ মানুষকে কেমন করে সর্বদা পেছনে টানে তার খবর আজ কে না জানে? ভারতবর্ষের ক্ষুধিত জড়বাদই পাশ্চাত্যকে ডেকে এনেছে। তাই তো গীতাতে বলতে হয়েছিল—।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়র্ভূতি ধ্রুবানীতির্মতির্মম॥

তাই যে দেবীর ভোগ এবং মোক্ষ উভয়ই করতলগত তাঁকে বলি, ভোগ দাও—কিন্তু তেমন ভোগ দিও না যাতে দুর্ভোগে পড়ি, মোক্ষ দাও—কিন্তু তেমন মোক্ষ দিও না যাতে ক্লীব বানিয়ে দেও...। সর্ব জাতি সঙ্ঘকে ধন্যবাদ... মায়ের চরণতলে ব্রাহ্মণ বসবে, অব্রাহ্মণ বসবে...। মায়ের একদিকে বরাভয় একদিকে অসুর...। ভোগদাত্রী মোক্ষদাত্রী মা আমার—ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী... এদেশে ওদেশে মাখামাখি আছে...বাঘ আর ছাগের সমন্বয় হয়—উপনিষৎ বলছেন বহুরূপে তমসাবৃত...। ধর্মহীন অন্নে নীতি থাকে না, ভোগে মাথা খারাপ করে দেয়। অন্নহীন ধর্মে বেঁচে থাকা কিছুনা। মহাকালীর চরণ তলে মাথা রাখলে শুধু মাথা ঠাণ্ডা হয়। আজ স্বাধীনতার সময়ের শাসনতন্ত্র চলবে না, সে সময়ের ধর্ম-ব্যাখ্যা চলবে

না, সে সময়ের সমাজনীতি চলবে না—...ঋষিরা সাবধান বাণী শুনিয়া গেছেন—

'যাত্রাশ্বপ্রা ভূহিত্রা বা ন বিনিক্রামেনো ভবেৎ।
বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি'॥

• • • "

'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি:
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥'

বাঙলার মহাপ্রভুও সেদিন সাবধান করে বলেছেন 'দারবী প্রকৃতি হয়ে মুনেরপি মন'—কাঠের নারীমূর্তি মুনিরও মন হরণ করে—এই যেখানে নরনারীর সম্পর্কের অবস্থা সেখানে কত সাবধান হওয়া দরকার।...অথচ আজ নরনারীর পৃথক ক্ষেত্র নেই—রক্ষা করবে কে কালীশক্তি ছাড়া?...আপনারা যে নেতাদের সব শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে সব আয়গায় ছেড়ে দিচ্ছেন, কি বই দিয়ে দিচ্ছেন তাদের পথ চলায়?...আজ নূতন করে শাস্ত্র গড়তে হবে... নূতন সৃষ্টি গড়ে তুলতে হবে...কালকের মত আজ না—কাল সাপ খেয়েছেন আজ ঙর ছেড়েছে—আজ তাই খাবেন।...মুনি ঋষির স্মৃতির বাইরে আজ সমাজ চলে গেছে...আবেষ্টনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ধর্ম শাস্ত্র গ'ন সাহিত্য যদি না হয় তবে অতীতকে হেঁচড়ে টেনে চলতে চাইলে বর্তমান যুগ চলবে না; সে ধর্ম কেউ মানবে না—আজকের দিনে ধর্মকে এইজন্যই কেউ মানতে পারছে না। প্রয়োজনের তাগিদে নূতন করে দেখা হয়েছে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের জীবন-দর্শনের আলোকে।...নাস্তিক বৌদ্ধকে কৃষ্ণ নাস্তিক রেখেই সার্থক করেছেন। সব মানুষকে একত্র করতে হবে—যা বলছেন যে—অপরাধের প্রসাদ দুনিয়ার প্রবেশেই সার্থক—সব মানুষকে একত্র করতে হবে এই বাণীর চরণ তলে...। দুষ্কৃতীদলভুক্ত হয়েও কি করে ব্রহ্মচারী হওয়া যায় তা কৃষ্ণ-জীবনে আর তত্ত্বে—এই কালীপূজায় পাওয়া যাবে।...সীতার প্রতিবাদ শ্রীরাধা—ভারতবর্ষের শ্রীরাধা। স্বাধীনে স্বাধীনে প্রেমই প্রেম—কালীর চরণতলে সেই কৌশল শিখতে হবে...। শ্রীনিত্যগোপালের আত্মানাত্মা সমন্বয়, অড়াজড় সমন্বয় করে সর্ব সংস্কার মুক্ত না হলে কি করে নরনারীকে একত্র করবেন? বিপরীত না হলে, ব্যক্তিগত জীবন যাপন করলে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ...। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীনিত্যগোপালকে বললেন, তুই এসেছিস, আমিও এসেছি। তিনি শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে আরো বলেছিলেন 'টাকে টাকা আর সমাধি একমাত্র নিত্যগোপালেই সম্ভব' এই কথার সঙ্গে মিল রয়েছে তন্ত্রের এই শ্লোকের—'ভুক্ত্বাপি ভোগঃ... ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব' এবং উপনিষদের এই মন্ত্রের 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'। বস্তুকে world-properly করে ভোগ করতে হবে। বস্তুকে সমস্ত শরীরে বিচরণ করতে ছেড়ে দাও—ব্যক্তিগত ভোগ চলবে না। নিত্যগোপালের I am a cosmopolitan বলার মধ্যে এই তত্ত্বই আছে যে বিশ্বনাগরিক, বিশ্বরূপ হলে মদন মোহন হয়। Spiritual life is at the same time a self life and a cosmic life—আধ্যাত্ম-জীবন তারই যে একসঙ্গে ব্যক্তিগত জীবন ও সমষ্টি জীবন যাপন করতে পারে।...পকৃতীনের কথা এখানে তাহততথই বলতে পারে। পুরুষোত্তম-দর্শনে চুরির definition হচ্ছে বিনের জন্য না হলেই চুরি—যাদের টাকাও তোমার নয় যদি তাদের সঙ্গে ভয় না কর, পিতার mission, পিতার আদর্শ না মান যা সৃষ্টি করি নি, তা নিতে পারি না—ভালবাসা বা প্রেমের সহযোগিতা ছাড়া অপরের জিনিষ নেওয়া যায় না। পরের দ্রব্য নিতে নেই—এই কথায় আপন পর ভেদ বুদ্ধি না জন্মিয়ে সৃষ্টি করবার ক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে হবে।...Whitehead বলেছেন, 'It is as true to say that God is permanent and world fluent, that the world is permanent and God fluent...It is as true to say that God creates the world, as that the world creates God.'...Begotten God—I will create my own God within me...। প্রত্যেক মানুষ কালীর কোলের মধ্যে ব্রহ্ম বালক হবে...। আমার জীবনের ১২ বৎসরের ব্রত—মানুষের ব্রত—শোধ করতে হবে...। প্রভার চরণতলে যে নিজে মুছুট রাখতে পারে সে-ই রাজ-রাজেশ্বর...। First

cosmopolitan হচ্ছেন প্রহ্লাদ—তিনি বলেছিলেন নৈতান্ কৃপণান্ বিহায় বিমুক্তঃ একঃ—এই সব কৃপণদের পরিত্যাগ করে একা নিজের মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করি না।...Escapist mentality মুক্তি নয়—মুক্তি যে চায়, তার মুক্তি হয় না। কৃপণের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে না করে আমার সুখ দুঃখ মুক্তির কথাই কামনায়...। T B Fund-এ টাকা দিন।...আনন্দ যেন উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত না হয়। মাইকের অধিকার চীৎকার—এ কোন্ আনন্দ? এর কোন সময় অসময় নেই, অপরের উদ্বেগ ঘটিয়ে এ আনন্দ কোন্ দত্ত মনের পরিচয়?...রামপ্রসাদ বললেন, মা যখন পর। মা বলেন, লক্ষ লক্ষ ছেলে উপবাস করছে, আমি তাদের বসন না দিয়ে নিজে কি রকম করে বসন পরব? অন্নহীন বস্ত্রহীনকে আগে অন্ন বস্ত্র দাও...। মানে উন্নয়নের অর্থ চরিত্রের মানে উন্নয়ন...। অন্নের মান উন্নয়ন করলে দরিদ্র থাকে না...শ্রমিক ও ধনিকের সমন্বয় করতে হবে ··distribution of wealth। দুটোই অর্থেক—ধনিকও সমগ্র সমাজের অর্ধেক, শ্রমিকও সমগ্র সমাজের অর্ধেক···ধনিকের ধনও সমাজের সম্পদ, শ্রমিকের শ্রমও সমাজের সম্পদ···। স্বাধীন ভারতবর্ষে পণ্ডিত ডাক্তার উকীল—এরা হবে missionary···। মা এসেছেন—সব জাতিকে এক থালায় বসে খাওয়া শেখাও—সব কিছু বন্টন করে নিতে শেখাও...। মা তো সর্বভূতের পুষ্টি···একলার কাছে পুষ্টি মা নন···। তোমার ছেলেকে এত করে সাজাচ্ছ—আর একটী ছেলে যে পাশে তার মুখে দাঁড়িয়ে আছে তা কি তুমি দেখতে পাও না?··· India will go on for ever—পবিত্র ভারতবর্ষ—কৃষ্ণ-পাদস্পৃষ্ট ভারতবর্ষ কি বর্তমান বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাবে না?...কালীর চরণতলে এই প্রার্থনাই করব—দহনাবহতু...। ভাগবত মানুষের পূজা করে গেছেন, ধাতবের পূজা করে গেছেন···। রন্তিদেবের কাহিনী শুনুন—রাজা তিনি—দেশে দুর্ভিক্ষ···ছাতুজল খাচ্ছেন—তাও একজন এসে চাইল—দিয়ে দিলেন তিনি। মৃত্যুর আগে বললেন—ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাম্···

আমি বিশ্বের আত্মিত প্রণত—আমি জগৎ প্রণত নই—অখিল দেহধারী জীবের আত্মিত আমি প্রণত...। মায়ের সেবার চেয়ে বিশ্বের সেবা অনেক বড়...। পাড়ার ঘরে ঘরে সকলের খবর নিন—একটা unity গড়ে তুলুন···। ছেলেকে খাওয়ালে মা সুখী হয়—মানুষের সেবা করলে মানুষকে ভালবাসলে জগতের মা সুখী হবেন...। মা, তোমাকে ভালবাসার শেষ কথা তোমার বিশ্বকে ভালবাসা। অখিলধাত্রী মা আমার, we will create new Bengal, New India, new world···। বলি যুগে সঙ্ঘ ছাড়া জগৎ সেবা হয় না...। দুর্গাপূজা একা একা হয় না—সকলকে নিয়ে সর্বসমন্বয়ের পূজা এটা...তান্ত্রিকের মত পূজা করবেন না···। সকলের দুঃখ সকলের হউক, সকলের বেদনা সকলের হউক ..। মা, সন্তান হব, সন্তানে সঙ্ঘ গড়ে তুলব..। কালীরই another aspect কমলা।··· মা জাতিতে জাতিতে ভেদবুদ্ধি দূর করে দাও।—তিনি সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে—সকলের মঙ্গল তিনি, শুধু ভারত-মঙ্গল নন, পরিবার-মঙ্গলও নয়—সর্বমঙ্গল। সর্বজাতি হয়ে দেবী নারায়ণী নমস্তস্তে ··সকলের আত্তি হরণ তুমি···তোমায় নমস্কার···।"

(এদেশে) সন্ন্যাসী মেলে অথচ কর্মী মেলে না—এর কারণ এই যে সন্ন্যাসীর উপাস্য যেমন বিপ্লবের দেবতা, উপাসনাও তেমনি বিপ্লবের; আর কর্মীদের উপাস্য বটে বিপ্লব, কিন্তু তারা পন্থাটি চাচ্ছে ঠিক বিষয়ীদের মত আরামের। এ যাবৎ তাই কোন সঙ্ঘ দাঁড়ায় নি, দাঁড়াবেও না যে পর্য্যন্ত কর্মীবৃন্দ খাওয়া-পরা, শোয়া-বসায় সন্ন্যাস গ্রহণ করতে না পারবে।

—শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দ

নিঃসঙ্গ নায়ক বিদ্যাসাগর

॥ শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ॥

মানুষের জীবনেতিহাস আলোচনা করলে অনেক সময়েই দেখা যায় যে, চিন্তার জগতে যাঁরা মানুষ, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা নিঃসঙ্গ এঁরা সমাজে যাঁরা বিপ্লব সৃষ্টি করতে আসেন, তাঁরা সর্ব বিষয়ে সময়ের অগ্রগামী হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেন। আদর্শের ঋজুতায় সেই সব অনন্য পুরুষ, সমকালীন পৃথিবীর কুটিলতায় যাঁরা নিরন্তর বিক্ষুব্ধ, জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তাঁরা নমনীয় হ'তে রাজি ন'ন। সংঘাতে যেমনই ব্যক্তিগত জীবন ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেলেও তাঁরা এগিয়ে চলেন।

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"তাঁহার মত লোক পারমার্থিকতন্ত্রেই বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, চতুর্দিকের নিঃসাড়তার পাষাণস্তূপে বারংবার আহত প্রতিহত হইয়াছিলেন বলিয়া, বিদ্যাসাগর তাঁহার কর্মসঙ্কুল জীবন যেন চিরদিন যুদ্ধিতে কুণ্ঠভাবে যাপন করিয়াছেন। তিনি যেন সৈন্যহীন বিদ্রোহীর মত তাঁহার চতুর্দিককে অবজ্ঞা করিয়া জীবনরণরঙ্গভূমির প্রান্ত পর্যন্ত অসহায় নিজের স্কন্ধে একাকী বহন করিয়া লইয়া গেছেন"।

বিদ্যাসাগর চরিত্রের এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে তৎকালীন দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে দারিদ্র্য আভাস দেওয়ার প্রয়োজন আছে। বিদ্যাসাগর যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন দেশে ইংরাজী শিক্ষার চলন ছিল না। বিরাট বহির্জগতের সঙ্গে মানুষের কোন পরিচয় হওয়া সম্ভব ছিলনা। সাধারণ মানুষের মনে ধর্মান্ধতা এতই প্রবল ছিল যে, সেই অন্ধতা ভেদ করে' মানবতার কোন বোধ মানুষের মনে প্রবেশাধিকার পেত না। সংস্কারের বেড়াজালে এবং মন্ত্রে মাওয়া, ঘুণ-ধরা মানসিকতায় মানুষের মনে সৎ চিন্তার ও স্বাধীন চিন্তার কোন অবকাশ ছিল না।

রাজা রামমোহন রায় ও মনীষী ডিরোজিওর চেষ্টায় এক শ্রেণীর মানুষ নতুন ভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করতে লাগ্‌লো। এই অধঃপতিত ও বিপর্যস্ত সমাজকে বাঁচানো অসম্ভব বিবেচনা করেই রামমোহন ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা করলেন। ইয়ং বেঙ্গলের দল পড়লো ইংরাজিয়ানার মোহে। তাদের কাছে হিন্দুসমাজের সব কিছুই ঘৃণার্হ অতএব পরিত্যাজ্য। আর সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ-সমাজ তখন পালন করছে অন্ধ আচারনিষ্ঠা, বহুবিবাহপ্রথা, এবং ব্যভিচারে বিধবা নারীর জীবনে কৃচ্ছ্রতার অবর্ণনীয় নির্যাতনকে। বিধবা নারী বলতে যাঁরা সাবালিকা যুবতীর কথা ভাবেন, তাঁরা ভুলে গেছেন যে সে যুগে মেয়েদের একবছর দুবছর বা পাঁচবছর বয়সেও বিবাহ দেওয়া হ'ত ফলে তিনবছর বয়সের শিশুও বিধবা। আর সত্তর বছরের বাপ যখন কামনা বাসনাকে পরিপূর্ণভাবে আত্মগত করেছেন, তখন তিনিই তাঁর তিন বছরের শিশুর ওপরও সেই নির্যাতনের ধারাকে প্রয়োগ করতে কঠোর ও নির্মম।

সমাজের মানসিকতা যখন এই ত্রিভুজ কোণে বিচ্ছিন্ন তখন ঈশ্বরচন্দ্র বেরিয়ে এলেন এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে। ঈশ্বরচন্দ্র এলেন সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত বিদ্যাসাগর হ'য়ে। সবদিক থেকে পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলেই ঈশ্বরচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হ'য়েছিল এই অবাঞ্ছীর্ণ সমাজের মূল ধ'রে টান দেওয়া।

কিন্তু কোথায় পেলেন ঈশ্বরচন্দ্র সেই বজ্রদৃঢ় অনমনীয় মনোভাব যা তাঁকে বিদ্রোহী সেনানায়কের মতই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল! ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে যে ক'টি বিশেষত্ব অনন্য হ'য়ে চোখে পড়ে, সেগুলিকে আলোচনা করা যাক্।

প্রথম বলা যায় (এবং কবি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলা

যায়) গোটা বাংলাদেশে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্রাহ্মণ। কি কি গুণ থাকে ব্রাহ্মণের ? ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন নিঃসাগ্নি অর্থাৎ সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন অভিমানী, কারও দ্বারে হাত পাতবার মত মন তাঁর ছিলনা, দারুণ জীবনে এত বাধের জন্যেও কোথাও মাথা নত করেন নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মত এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারিনা"। কিন্তু এই অধমা দেশ তাঁকে বারবার বিপদের মুখে ঠেলে নিয়ে গেছে, নিঃসঙ্গ করেছে এবং পরম বন্ধুকেও তাঁর প্রতি বিরূপ করে তুলেছে কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র কোনদিনও ভ্রষ্ট হন নি পথ থেকে ; বারেকের জন্যও ফিরে তাকান নি পেছনের দিকে।

দ্বিতীয়ঃ ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ে ছিল মানুষের প্রতি সহজাত ও অপরিমেয় করুণাবোধ এই করুণার প্রবাহ স্বতঃ উৎসারিত ছিল। বিচার বোধে বা অভিমানে আঘাত হানি কখনও। বুদ্ধের ভাষায়

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সর্বভূতেষু
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

এই মানবমুখীনতাই তাঁকে বিদ্রোহী করেছে, প্রচলিত ব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন সমাজের গোড়াপত্তন করেছেন তিনি। প্রাহ্য করেননি কোন প্রতিবন্ধতা। "কেবল আপনার প্রাণের জোরে, কেবল আপনার বেদনার উত্তাপে একাকী"...মানুষের হিতের জন্য কাজ করে গেছেন।

তৃতীয়তঃ সকল সার্থক বিপ্লবীর মত তিনি ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামী। আদর্শের সঙ্গে সোঁদামিল চলে না, অসত্যের সঙ্গে আপোষ চলেনা—এই ছিল তাঁর মনোভাব। তাই পরম বন্ধু যখন তাঁকে ত্যাগ করে গেছে তখন তিনি দৃঢ়। একমাত্র পুত্রকে পরিত্যাগ করেও অকাতর, পরমপ্রিয় ভাষাতাত্ত্বিক অপ্রিয় করেও নির্বিকার। ভাইয়ের সঙ্গে বনে নি। এমনকি চিরকালের জন্য দেশ-ত্যাগী হতেও তিনি দ্বিধান্বিত হননি।

চতুর্থতঃ ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন আত্মস্থ সত্যনিষ্ঠ। তাঁর এই সত্যবোধ বিচারহীন ছিল না, যুক্তিসাধ্যও নয়। সংস্কারমুক্ত, সহজ, ও মানবপ্রেমী মনের অনুভব। শাস্ত্র বিচার করেছেন এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। সমাজকে এমনকি গুরুকেও অগ্রাহ্য করেছেন এই সত্যকে অন্তরতীয় মত বহন করে নিয়ে যেতে। অন্যায়কে ও অসত্যকে বর্জন করতে কোথাও পলকের জন্যও দ্বিধাগ্রস্ত হননি, কিন্তু সত্যকে সন্ধানে তুলে ধরবার চেষ্টায় জীবন পণ করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রের এই বিশেষত্বগুলিই তাঁকে সর্বজনপূজ্য নায়কের সম্মান এনে দিয়েছে, তবু তাঁর সমসাময়িক জীবনে এই অনন্যতাই মনোভাবই তাঁকে নিঃসঙ্গ ও একক করেছে। সারা জীবনে ঈশ্বরচন্দ্র শুধু বেদনাই বহন করে নিয়ে গেছেন। "আমরা তাঁহার কথা, তাঁহার ব্যথা বুঝিলাম না। সমুন্নত শির লইয়া জীবনের বন্ধুরময় পথে সিংহ একাই চলিয়া গেলেন। কেহ তাঁহার সঙ্গী হইলো না।"

[শরৎচন্দ্রের রায় চৌধুরী]

"সমুন্নত ও নমিত শির" নিয়ে জীবনের বন্ধুরময় পথে তিনি যে সিংহের মতই চলে গেছেন তার পরিচয় তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে।

একুশ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্টউইলিয়ম কলেজের হেডপণ্ডিত নিযুক্ত হ'লেন। তখন এই কলেজের সেক্রেটারী ছিলেন মার্শাল সাহেব। ইংলণ্ড থেকে সে সময়ে যে-সকল ইংরাজ তরুণ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরিতে যোগদান করতে আসতো তাদেরকে এই কলেজ থেকে বাংলা হিন্দী উর্দু ও ফারসিতে শিক্ষা নিতে হ'তো। কিন্তু দেশীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে না পারলে তাদের আবার নিজের দেশে ফিরে যেতে হ'ত। বলাবাহুল্য এতদূর থেকে এসে অকৃতকার্য হ'য়ে ফিরে যাওয়া তাদের কাছে শুধু লজ্জার নয়, হতাশা ও দুঃখের বিষয় ছিল। কাজেই মার্শাল সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রকে বললেন যে, তিনি যেন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলি শক্ত না করেন। আর তাদের খাতাগুলিও উদার মনোভাব

নিয়ে দেখেন। বলাবাহুল্য ঈশ্বরচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন যে, মার্শালসাহেবের দরকার হ'লে আর একজন হেডপণ্ডিত খুঁজে নিতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রকে যেন এমন নির্দেশ কখনও না দেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যজীবনে চরম কৃচ্ছ্রতা সহ্য করে পড়াশুনা করেছেন। তাঁর পারিবারিক অবস্থা অত্যন্ত দুঃস্থ। পঞ্চাশটাকা মাইনের এই চাকুরি তাঁর জীবনে ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ। কিন্তু যে কোন সৌভাগ্যের চেয়ে আত্মসম্মান যাঁর কাছে অনেক বড়, তিনিই এমনি অবহেলায় চাকরির মোহ কাটাতে পারেন।

মার্শাল সাহেব অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও বিবেচক ছিলেন এ'কথা ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই উল্লেখ করেছেন। তবুও তিনি নমনীয় হননি। একদিন খবর পেলেন ঈশ্বরচন্দ্র যে তাঁর তৃতীয় ভাই শম্ভুচন্দ্রের বিয়ে মা চিঠি দিলেন— বাড়ী চলে এসো, বিয়েতে তোমায় থাকা চাই। কিন্তু ছুটি দিতে রাজি হ'লেন না মার্শাল। ঈশ্বর বললেন— আপনি যদি ছুটি দিতে রাজি না হন, তাহলে আমার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করুন। For the sake of my service, I can not suffer my mother to shed tears। এ'কথায় হতবাক মার্শালের ছুটি না দিয়ে উপায় রইল না।

১৮৪৬ সাল, ঈশ্বরচন্দ্রের বয়েস তখন ছাব্বিশ বছর। সংস্কৃত কলেজের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী হিসাবে তিনি কলেজের কাজে যোগ দিয়েছেন। রসময় দত্ত সেক্রেটারী হ'লেও কলেজের কোন কাজে বিদ্যাসাগরের ওপরে কথা বলেন না। এই সময় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন কার নামে এক ইংরাজ ভদ্রলোক। ঈশ্বরচন্দ্র একদিন কোন প্রয়োজনে কারসাহেবের ঘরে গেলেন। সাহেব তখন একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে টেবিলের ওপর জুতোসমেত দুই পা তুলে দিয়ে সম্ভবতঃ বিশ্রাম করছিলেন। কোন কালা আদমীকে দেখে ভদ্রলোকের মত উঠে বসার প্রয়োজন তিনি বোধ করলেন না। এমনকি ঈশ্বরচন্দ্রকে বসবার জন্যও বললেন না। তিনি সেই ভাবেই অর্থাৎ টেবিলের ওপর পা-তোলা অবস্থাতেই কথা বলতে লাগলেন।

কয়েকদিন পরে ঈশ্বরচন্দ্র আবার বিদ্যাসাগরের ঘরে যেতে হ'ল। কার আসছেন খবর পেয়েই ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর চটিজুতো সমেত পা-দুটো টেবিলের ওপর তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। এবং ওইভাবে বসেই কারের সঙ্গে কথা বললেন। ঘরে আর বসবার জায়গা ছিল না। কারণ কার আসতে তিনি চেয়ার ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই ব্যবহারে কার সাহেব অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন, এবং শিক্ষাবিভাগের সচিব ডাঃ মোয়াটের (Dr. Mouat) কাছে রিপোর্ট করলেন: 'তার' এর নালিশে মোয়াট ঈশ্বরচন্দ্রের লিখিত কৈফিয়ৎ তলব করলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তখনই উত্তর দিলেন এই বলে যে কার-এর মত একজন সভ্য ইউরোপীয় ভদ্রলোকের কাছেই তিনি ভদ্রলোকের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, তার শিক্ষা পেয়েছেন তাঁর প্রদত্ত উত্তর নিজেই কৌতূহলজনক। "I thought that we (natives) were an uncivilised race, quite unacquainted with refined manners of receiving a gentleman visitor. I learned the manners of which Mr. Karr complains, from the gentleman himself, a fewdays ago, when I had an occasion to call on him. My notions of refined manners being thus formed from the conduct of an enlightened, civilised European, I behaved myself as respectfully towards him, as he had himself done."

সে যুগে কোন ইউরোপীয় অফিসারের কথামাত্র করুণা লাভ করলেও যে কোন লোক নিজেকে ধন্য মনে করতো। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন এক অদ্ভুত ব্যতিক্রম। আত্মসম্মান বোধ তাঁর এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, কোন উচ্চপদাসীন ব্যক্তির অনুগ্রহ কামনা তাঁর কাছে অবমাননীয় ছিল। সমগ্র জাতির চিত্তে স্বাধীনতা বোধের আদর্শকে তিনি প্রতিষ্ঠিত ক'রে যেতে পেরেছিলেন। ভারতীয়

হোক আর ইউরোপীয়ান হোক—যখন উচিত মতামতকে তিনি কোথাও নত হ'তে দেন নি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনের এই বিচিত্র রূপরেখা থেকে আমি কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ঘটনার মাত্র উল্লেখ করছি। এই ঘটনাগুলি থেকে বোঝা যায় যে পরবর্তী জীবনে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্র ও সমাজ সংস্কারের শ্রেষ্ঠতম নেতা তাঁর জীবনের সূচনার মুহূর্ত থেকেই যে অনন্য-সাধারণ আত্মমর্যাদাবোধ ও দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিয়েছেন, তারই ফলবিকাশের ফলে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন তবু নিঃসঙ্গ হ'য়ে ওঠেনি, তাঁকে বারবার আঘাত পেতে হ'য়েছে। সে আঘাত এসেছে তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে, স্বজনের কাছ থেকে, এমনকি তাঁর নিজের কাছ থেকেও। তাঁরা একদা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিল তাঁরা সরে গিয়েছে দূরে। যারা পরম উপকার পেয়েছে তাঁর কাছ থেকে তারাই হ'য়ে উঠেছে শত্রু। এমন কি তাঁর জীবনীকারও সুবিচার করতে পারেনি তাঁর প্রতি। কেমন করে সে কথাই আমরা আলোচনা করতে চাচ্ছি।

সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী রসময় দত্ত ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর চেষ্টা ও আগ্রহেই ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদকের চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু এ চাকরিও বেশীদিন করা সম্ভব হ'লো না। কতকগুলি ব্যাপারে তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পাদক রসময় দত্ত অনুমোদন না করায় ঈশ্বরচন্দ্র পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন। তাঁর পদত্যাগে রসময়বাবু ও তাঁর মোসাহেব দুজনেই বিস্মিত হ'য়ে তাঁকে ঐ পত্র প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু রাজি হ'লেন না ঈশ্বরচন্দ্র। তাঁরা উদ্বিগ্ন হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন—চাকরি ছেড়ে দিলেন, আপনার চলবে কি করে? সগর্বে উত্তর দিলেন তিনি—ব্যবসা করবো।

অতঃপর দীর্ঘদিন বাইরে থাকার পর ১৮৫০ সালের মে ডিসেম্বর কলেজের অধ্যক্ষ হ'য়ে ফিরে এলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৫ সালে তিনি শিক্ষা বিভাগের বিশেষ পরিদর্শক নিযুক্ত হ'লেন। তাঁর মোট বেতনের পরিমাণ হ'ল পাঁচশো টাকা।

কিন্তু সরকারী চাকরিতে আরাম থাকবার জন্য বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়নি। যে মানুষ আপন ব্যক্তিত্বে সমগ্র হিন্দুসমাজের বুকে বিপ্লব সৃষ্টি করে, সরকারী অফিসের বিধিনিষেধের বেড়া তার জন্যে নয়। ১৮৫৬ সালে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর হ'য়ে এলেন ফ্রেডারিক সিডিলিয়ন গর্ডন ইয়ং। অনভিজ্ঞ অথচ উদ্ধত এই ইয়ংকে অগ্রাহ্য করলেন বিদ্যাসাগর। ফলে বিরোধের সূত্র। ১৮৫৭ সালের ৩১শে আগষ্ট ডেটিলাট হ্যালিডের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন বিদ্যাসাগর। পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে দিলেন, কারণ (তাঁর ভাষাতেই) nothing is more valuable in this world than self respect।

পরবর্তী হ্যালিডের মুখের কথাতে নির্ভর করে তিনি নদীয়া, বর্দ্ধমান, হুগলি ও মেদিনীপুরে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ক'রেছিলেন। ইয়ং এগুলির খরচ মঞ্জুর করতে রাজি হ'লেন না। বিদ্যাসাগর চাকরী ছেড়ে দিয়েও এই বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেন না। বরং এগুলি পরিচালনার সমস্ত দায়ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। উদ্বিগ্ন হলেন, এলো প্রচুর দায়িত্ব। একক শক্তির ওপর নির্ভর ক'রে নিজের কাঁধে এ দায়িত্ব তুলে নিলেন পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর।

মূল সুপারিশগুলির পরিপ্রেক্ষিতে

কোঠারী কমিশন

।। শ্রীগায়ত্রী যতি ।।

প্রস্তাবনা

ভারতের ভাগ্য শ্রেণীকক্ষের মাধ্যমেই মূর্ত হয়ে উঠছে এবথা কেবল মাত্র আলঙ্কারিক সত্য নয়। বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত জগতে শিক্ষাই সকল দেশের অধিবাসীদের সুখ, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার পরিচায়ক। কোন দেশের জাতীয় পরিকল্পনা করতে গেলে ও সেই দেশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে গেলে দেশের বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রত্যাগত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ও তাদের শিক্ষার মান পর্যালোচনা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রয়োজন হবে (১) শিক্ষার কাজ কি ঠিক করা (২) শিক্ষার পরিবর্তনশীলতাকে স্বীকার করা (৩) শিক্ষার পরিকল্পনাগুলি বাস্তবে রূপায়িত করা।

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষা ও জাতীয় জীবনের লক্ষ্য—শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজনীয় গোড়ার কথা হল শিক্ষাকে জীবনের সাথে যোগ করা, মনগড়ের আশা আকাঙ্ক্ষা, চাহিদাকে রূপ দেওয়া এবং জাতীয় লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে যে সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন প্রয়োজন তার বাহন হিসেবে শিক্ষাকে গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষাকে উৎপাদনাত্মক হতে হবে, সামাজিক ও জাতীয় সংহতি বজায় রাখতে হবে, গণতান্ত্রিকতার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে হবে, আধুনিকতার নব মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে, সত্যম্ শিবং সুন্দরমের রসাস্বাদন করতে হবে।

উৎপাদনাত্মক শিক্ষা—শিক্ষাকে উৎপাদনাত্মক করতে হলে কতকগুলি কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। যেমন প্রথমেই ধরা যাক বিজ্ঞান শিক্ষার কথা (১) বিজ্ঞান শিক্ষা বিদ্যালয় স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়া উচিত। (২) কর্মের অভিজ্ঞতা সব শিক্ষার মূল অঙ্গ হবে (৩) এই কর্মের অভিজ্ঞতা কৃষি, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষাভিত্তিক হবে। (৪) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তি শিক্ষার সূচনা হবে এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃষি ও কারিগরী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

সামাজিক ও জাতীয় সংহতি—আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য হল সামাজিক ও জাতীয় সংহতি রক্ষা। জাতীয় সচেতনতা ও ঐক্যসূত্রকে সবল করতে হলে আমাদের (১) সর্বসাধারণের জন্য একই রকম বিদ্যালয়ের কথা চিন্তা করতে হবে (২) প্রত্যেক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য সমাজ-সেবা আবশ্যিক করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সামুদায়িক জীবনের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। (৩) সমাজ-কল্যাণের জন্য গঠনমূলক কাজে প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে অংশ গ্রহণ করতে হবে। (৪) জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীতে যোগ দিতে হবে। (৫) জাতীয় সংহতির জন্য একটি ভাষা গ্রহণ করতে হবে (৬) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। (৭) বিশ্ব বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এই সুপারিশগুলিকে দশ বছরের মধ্যে রূপায়িত করতে হবে। (৮) বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সহায়তায় এই মঞ্জুরী কমিশন পুস্তক রচনা করবে ও বিজ্ঞানের ও কারিগরী শিক্ষার পদগুলিকে আঞ্চলিক ভাষায় রূপায়ন করবে। (৯) সর্বস্তরের প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষাদান চলবে, পরে অবশ্য হিন্দী এই স্থান পূরণ করবে। (১০) আঞ্চলিক সংগঠনের তাগিদে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হবে। (১১) বিদ্যালয় স্তর থেকেই ইংরাজী শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে

(১২) পৃথিবীর কতকগুলি প্রয়োজনীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। (১৩) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজী সংযোগকারী ভাষা হিসাবে থাকবে। (১৪) হিন্দী ছাড়াও যে কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষার বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা চলবে। (১৫) জাতীয় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সর্ব ভারতীয় দর্শন ধর্ম ও ইতিহাস শিক্ষার জন্য শিল্প, কলা, স্থাপত্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাটক ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। প্রত্যেককে নাগরিকত্বের দীক্ষা দিতে হবে। (১৬) জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিক সচেতনতার মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

গণতান্ত্রিকতার জন্য শিক্ষা—গণতান্ত্রিকতার লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে (১) শিক্ষাকে সংবিধানের ৪৫ নং ধারা অনুযায়ী ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত আবশ্যিক হতে হবে। এর সঙ্গে বয়স্ক শিক্ষাও থাকবে যার উদ্দেশ্য হবে কেবল মাত্র আক্ষরিক জ্ঞান দান নয়, সুনাগরিক হওয়ার জন্য কিছু বৃত্তি শিক্ষাও দান ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন করা। (২) সমস্ত স্তরে নেতৃত্ব শিক্ষা দিতে হবে। (৩) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, সহনশীলতা, জনস্বার্থ রক্ষা, জনসেবা, সৃঙ্খলা, আত্মনির্ভরশীলতা ও কর্মে আনন্দ ইত্যাদি জাগ্রত করতে হবে।

শিক্ষা ও আধুনিকতা—জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এবং এই পরিবর্তনই শিক্ষার নব কলেবর ধারণের আভাস দেয়। শিক্ষা এখন কেবলমাত্র বৌদ্ধিক বিকাশ নয়, অর্জিত জ্ঞানের সঞ্চয়ন নয়, শিশুর সার্বিক বিকাশ ও চরিত্র গঠনই শিক্ষা। শিক্ষা-পদ্ধতি ও শিক্ষক-শিক্ষণের মধ্যেও আধুনিকতার পরশ পাওয়া যাবে।

সমাজের সর্বাধুনিক অধ্যায় হল সমস্ত মানুষের শিক্ষা এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে থেকে এমন বুদ্ধিজীবী মানুষ তৈরী করা যাঁরা হবেন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

সামাজিক, নৈতিক, ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ—প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা-ব্যবস্থার সাথে সাথে সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। তবে কোন একটি বিশেষ ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া চলবে না, ধর্ম সম্বন্ধে উদার হতে হবে, তবেই পাশাপাশি সবার সাথে বাস করা চলবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষা-ব্যবস্থা, শিক্ষার কাল ও মান—(১) শিক্ষা পিরামিডের সংযোগ রক্ষাকারী বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ (২) শিক্ষা-কাল অতিরিক্ত করার মোট সময় (৩) শিক্ষক, পাঠক্রম, পদ্ধতি, মূল্যায়ন ইত্যাদির মান (৪) সুযোগের সদ্ব্যবহার ইত্যাদির ভিত্তিতে শিক্ষা-ব্যবস্থা নির্ণয় করে ২। মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। ৩। এখন শিক্ষা হবে

১—৩ বৎসর প্রাক্‌প্রাথমিক স্তর।

৭ অথবা ৮ বৎসর নিম্ন প্রাথমিক বা উচ্চ প্রাথমিক

৩ „ ২ নিম্ন মাধ্যমিক

২ „ উচ্চ

৩ ডিগ্রী কোর্স

২ ৩ „ রিসার্চ কোর্স

৪। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার বয়স ৬+

৫। প্রথম দশ বৎসর শিক্ষার পর পাবলিক পরীক্ষা হবে।

৬। নবম শ্রেণী থেকে প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয় পাঠের সুযোগ পাবে।

৭। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (১) দশ বছরের শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে ও (২) এগার বা বার বছরের শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে।

৮। প্রত্যেক বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক করা হবে না। মোট বিদ্যালয় যতগুলি আছে তার এক চতুর্থাংশ উচ্চ মাধ্যমিক হবে।

৯। ১১ বছরের শিক্ষা মোটামুটি সন্তোষজনক তাই ১২ বছরের শিক্ষা চালু করা চলবে।

১৯৭৫ থেকে ৭৬ সাল নাগাদ প্রাক্‌বিদ্যালয় শিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে। এই কাজের ভার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উপর দেওয়া হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শুরু করার দায়িত্ব রাজ্য শিক্ষা বিভাগ নেবেন। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের পুনর্গঠন হবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব নেবেন।

মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রথম ডিগ্রী কোর্স তিন বছরের কম হবে না, দ্বিতীয় ডিগ্রীকোর্স ২-৩ বছরের হবে।

কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইনর ডিগ্রীর জন্য তিন বছরের কোর্স খোলা হবে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার কোন ফাঁক থাকবে না। উচ্চ শিক্ষালাভে প্রলুব্ধ করার জন্য বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে উচ্চতর প্রবেশে তিন বছরের প্রথম ডিগ্রী কোর্স শুরু হবে।

কতকগুলি সুযোগের সদ্ব্যবহার—(১) শিক্ষা সংস্কারের জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে তার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। (২) বিদ্যালয়ে ৩৯ সপ্তাহ পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং কলেজে ও প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৬ সপ্তাহ পড়ার ব্যবস্থা থাকবে। (৩) পড়ার দিনগুলির মধ্যে ২১ দিন বিদ্যালয়ে ও ২৭ দিন মহাবিদ্যালয়ে পরীক্ষা ইত্যাদির জন্য ব্যয় করা হবে। (৪) ছুটিগুলিতে বিদ্যার্থীরা সমাজ-সেবার কাজ নেবে, বয়স্ক শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করবে (৫) বিদ্যালয়ে কাজের দিন বাড়ল কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজে পড়ার সুযোগ বাড়াতে হবে (৬) লাইব্রেরী, লেবরেটারি, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি সারা বছর ব্যবহার করা উচিত।

অপচয় বাঁচানোর জন্য প্রথম দশ বছর শিক্ষার গুণগত মানের উন্নতি করতে হবে।

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে part time শিক্ষার সুযোগ করে দিতে হবে। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে একই নাম প্রযোজ্য হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষকের মর্যাদা—(১) শিক্ষকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পেশাগত মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ও প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তিকে শিক্ষকতা কার্যে আকৃষ্ট করার জন্য বিরামহীন গভীর চেষ্টা প্রয়োজন।

(২) শিক্ষকদের বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি প্রয়োজন।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য বেতনের মান নির্দিষ্ট করে দেবেন এবং উচ্চতর হারে বেতন দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে সাহায্য করবেন।

(৪) একই শ্রেণীভুক্ত সমস্ত শিক্ষক বিভিন্ন পরিচালকমণ্ডলীর অধীনে কাজ করলেও একই বেতন পাবেন।

(৫) কোন নীতিকে কার্যকরী করার জন্য রাজ্য-সরকার তৎক্ষণাৎ চেষ্টা করবেন কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় তাহলে পাঁচ বছরের কার্যসূচী গ্রহণ করতে পারেন।

(৬) কমিশন অনুমোদিত বেতনের হার (১) যে শিক্ষক মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে করে শিক্ষকতার জন্য ২বছর ট্রেনিং নিয়েছেন—

বেতন সর্বনিম্ন—১৫০৲ সর্বোচ্চ—২৫০৲ (১০ বছরের মধ্যে পাবে) Selection grade—২৫০-৩০০৲

(for about 12 p. c. of the cadre)

(২) এক বছরের শিক্ষণপ্রাপ্ত স্নাতকদের জন্য—

সর্বনিম্ন—২২০৲ সর্বোচ্চ—৪০০৲ (২০ বছরের মধ্যে পাবে) Selection grade—৪০০৲—৫০০৲

(for about 15 p. c. of the cadre)

(৩) স্নাতকোত্তর শিক্ষাগত মান আছে ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কাজ করছেন এ রকম শিক্ষকদের ৩০০৲—৬০০৲

(৪) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধানদের—বিদ্যালয়ের মান, ছাত্রসংখ্যা ও শিক্ষকের শিক্ষাগত মান ইত্যাদির উপর নির্ভর করবে।

(৫) সরকার অনুমোদিত কলেজের শিক্ষকদের—

জুনিয়ার স্কেল—৩০০—২৫—৬০০৲

সিনিয়ার ,, —৪০০—৩০—৬৪০৲

প্রিন্সিপ্যাল ১ম —৭০০—৪০—১১০০৲

,, ২য় —৮০০—৫০—১২৫০৲

৩য় —১০০০—৫০—১৫০০৲

(৬) সরকার অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের

লেকচারার — ৪০০—৪০—৮০০৲

— ৮০০—৫০—১৪০০৲

হিতাং — ৭০০—৪০—১২৪০৲
প্রবেশার — ১১০০—৪০—১৩০০৲
১৩০০—৩০—১৬০০৲

(৭) বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বর্দ্ধিত হারে বেতন দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করবেন; ৮০% কেন্দ্রীয় সরকার, ২০% রাজ্যসরকার বহন করবেন। প্রাইভেট কলেজের বেলায় কেন্দ্রীয় সাহায্য ১০০%

(৮) বেতন বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষকের শিক্ষার মান উন্নত হবে ও শিক্ষক নির্বাচনীর উন্নতি হবে।

(৯) ভালো প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক নির্বাচনে স্বাধীনতা থাকবে

(১০) তিন স্তরে বেতন বণ্টন হবে (১) যে শিক্ষকগণ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে একবছর ট্রেনিং নিয়েছেন তাদের জন্য (২) শিক্ষা প্রাপ্ত স্নাতকদের জন্য (৩) স্নাতকোত্তর শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য।

(১১) মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত না করলে কেউ প্রাথমিক শিক্ষক হতে পারবে না। উচ্চ প্রাথমিক ও নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হতে হলে শিক্ষা-প্রাপ্ত স্নাতক হতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমান বেতন হবে।

(১২) যথাযথ গুণসম্পন্ন শিক্ষককে বর্দ্ধিত হারে বেতন দিতে হবে।

(১৩) বেতনের দিক থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন একদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।

(১৪) স্নাতক বিভাগের প্রথম শ্রেণীর জন্য ও স্নাতকোত্তর বিভাগে ১ম ও ২য় শ্রেণীর জন্য increment-এর ব্যবস্থা থাকবে।

(১৫) শিক্ষকের পদে নিয়োগ করার জন্য যথাযথ ভাবে বিজ্ঞাপন দিতে হবে এবং নির্বাচক মণ্ডলীর সামনে হাজির করতে হবে।

(১৬) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যদি যোগ্য গুণাবলী সম্বলিত শিক্ষক থাকেন তবে তিনি প্রধান শিক্ষক বা পরিবর্তন পদে উন্নীত হতে পারেন।

(১৭) মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও কোন স্নাতক শিক্ষক যদি অন্ততঃ প্রশংসনীয় কাজ করে থাকেন তবে তাঁকে স্নাতকোত্তর স্তরের বেতন দেওয়া উচিত।

(১৮) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা যোগ্যতাসম্পন্ন তাঁরা মহাবিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়েও নিযুক্ত হতে পারেন।

(১৯) অত্যন্ত মূল্যবান কাজের জন্য অগ্রিম বর্দ্ধিত হারে বেতন দেওয়া চলবে।

(২০) বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও মূল্যবান অবদানের জন্য কোন শিক্ষককে নূতন পদ দেওয়া চলবে যদি তখন প্রমোশন দেওয়া সম্ভব না হয়।

(২১) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পরামর্শে কোন যোগ্য শিক্ষককে ১২০০৲—১৮০০৲ স্কেলে বেতন দিতে পারেন।

(২২) পাঁচ বছরের মধ্যে শিক্ষকদের বেতন হারের উন্নতি করতে হবে।

(২৩) শিক্ষকদের মঙ্গলের জন্য শিক্ষকদের কাছ থেকে ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে একটি তহবিল তৈরী করতে হবে।

(২৪) শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য প্রয়োজন।

(২৫) অবসর গ্রহণের পর সব শিক্ষককে সমান সুবিধা দেওয়া উচিত।

(২৬) Triple benefit—(pention, P. F., gratuity) সমস্ত শিক্ষকদের দিতে হবে।

(২৭) ষাট বছর বয়সে সমস্ত স্তরের শিক্ষক অবসর গ্রহণ করবে এবং আরও ৫ বছর কাজ করার অধিকার থাকবে।

(২৮) Provident fund এর জন্য উন্নত পদ্ধতি চালু করা উচিত।

(২৯) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের কাজের সর্ত্তাবলী এমন হওয়া উচিত যাতে তারা প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ পায়।

(৩০) প্রত্যেককে কাজের সুযোগ প্রতিষ্ঠানকে করে

দিতে হবে।

(৩১) শ্রেণীতে পাঠদান ছাড়াও শিক্ষকের অন্যান্য কাজের জন্য বিবেচনা করে দেখতে হবে।

(৩২) পাঁচ বছরে একবার ভারত ভ্রমণের জন্য সব শিক্ষকের বিনা ভাড়ায় রেলযোগে ভ্রমণের অধিকার থাকবে।

(৩৩) সরকারী কাজে নিযুক্ত শিক্ষকদের জন্য পৃথক বদলির নিয়ম ও আচরণ বিধি থাকবে (৩৪) শিক্ষকতা করার সর্ত্তাবলী প্রাইভেট ও সরকারী বিদ্যালয়ে একই থাকবে।

(৩৫) গ্রামে শিক্ষকদের থাকার জন্য আবাসিক ব্যবস্থা থাকবে।

(৩৬) ১৫ বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মহাবিদ্যালয়ে আবাসিক ব্যবস্থা থাকবে। (৩৭) যে ছাত্রকে আলাদা পড়ান প্রয়োজন তার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (৩৮) বিশ্ববিদ্যালয়ে part time গবেষণা করার সুযোগ থাকবে।

(৩৯) শিক্ষকদের নাগরিক অধিকার থাকবে।

(৪০) মহিলা শিক্ষিকা—সমস্ত স্তরেই মহিলা শিক্ষিকা নিযুক্ত করতে হবে। (৪১) গ্রামে আবাসিক ব্যবস্থা থাকবে। (৪২) বয়স্ক মহিলা শিক্ষার প্রয়োজন। (৪৩) correspondence কোর্সের ব্যবস্থা থাকবে। (৪৪) যে মহিলা শিক্ষিকা গ্রামে কাজ করবেন তাঁদের special allowence দেওয়া হবে। (৪৫) যে শিক্ষক নিম্নবর্ণের মধ্যে কাজ করবেন তাঁরও speciel alloweuce থাকবে। (৪৬) শিক্ষকদের শিক্ষাগত মান বাড়ানর জন্য রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য নেওয়া উচিত। (৪৭) শিক্ষকদের জন্য সংসদ থাকবে যারা শিক্ষকদের আর্থিক সম্বন্ধে চিন্তা করবেন। (৪৮) শিক্ষকদের জাতীয় পুরস্কার যারা কাজে উৎসাহিত করা হবে।

৪র্থ অধ্যায়

শিক্ষকদের শিক্ষা—শিক্ষা-পরিকল্পনার গোড়ার কথা হল শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ান ও তার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অর্থসাহায্য করা।

শিক্ষকদের শিক্ষা ব্যবস্থা জন্য সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে হবে না। বিদ্যালয়ের সঙ্গে ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

শিক্ষক-শিক্ষণের বিচ্ছিন্ন ভাব দূর করতে হলে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার সঙ্গেই এই শিক্ষক-শিক্ষণ যুক্ত করা জরুরী মনে করতে হবে। ও শিক্ষক-শিক্ষণের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহিত করতে হবে। এ ছাড়াও প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Extension Service Department খুলতে হবে যেখানে শুধু প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর এই তিনটি বিভাগ থাকবে। সুযোগ ছাত্রদের নিয়ে একটি সংঘ গড়ে তুলতে হবে যেখানে তারা শিক্ষা সম্বন্ধে উন্নত পন্থার নির্দেশ দেবে। শিক্ষকদের পাঠদান অভ্যাসের জন্য বিদ্যালয়ের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। কিছু দিনের জন্য বিদ্যালয় ও শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বিনিময় করা চলতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষণের মধ্যেও ব্যবধান আছে—যেমন যারা সেকেন্ড পাঠদানের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করেন, আবার যারা শিল্প কাজের জন্য শিক্ষণ গ্রহণ করেন, আবার যারা শারীরিক শিক্ষার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই ব্যবধান দূর করতে হবে।

শিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়নের জন্য—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক স্তরে সুপরিকল্পিত subject orientation দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা ও পেশাগত শিক্ষার জন্য integrated course থাকবে। ভারতীয় পরিবেশে এরকম অনুকূল এরকম পেশাগত মান উন্নয়নের জন্য গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে। ছাত্ররা নিজে পড়ে জানবে এ রকম পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন করতে হবে। শিক্ষকদের পাঠদান অভ্যাস-এর উন্নতি সাধন করতে হবে। কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে। সমস্ত স্তরের পাঠ্যক্রম-এর পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি সাধন করতে হবে।

প্রাক স্নাতক যারা মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন তাঁদের জন্য দু'বছর ও স্নাতকদের জন্য একবছরের শিক্ষণ

কাল হবে। শিক্ষকদের জন্য অন্ততঃ ২৩০ দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজের দিন ধার্য্য হবে।

রাজ্য সংস্থা শিক্ষক-শিক্ষণের কার্য্যসূচী পর্য্যালোচনা করে পাঠ্যক্রম ইত্যাদির পরিবর্ত্তন সাধন করবে। প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও পরিচালক মণ্ডলীর জন্য পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কার্য্যসূচী সুপরিকল্পিত ও পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ হবে।

শিক্ষকদের শিক্ষামান উন্নয়নের জন্য আরও বলা হয় যে-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষা গ্রহণ করবেন, সেই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের দুটো ডাক্তার ডিগ্রী থাকতে হবে, কিন্তু সংযোজন ভুক্তিতে থাকবে অথবা orientation course নিতে হবে। মনোবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও গণিত শাখার যেই যদি বিশেষ পারদর্শী হন তবে তাঁদের শিক্ষণ ক্ষেত্রে নিযুক্ত করা চলবে। গ্রীষ্মাবকাশে কোন কোন বিশেষ বিষয়ে শিক্ষকগণের training এর ব্যবস্থা থাকবে। ডিগ্রী কোর্স পর্য্যন্ত যে বিষয় বিশেষভাবে কেউ পড়বে না তাকে সেই বিষয়টি শিক্ষাদান সম্বন্ধে শিক্ষালাভের জন্য বিশেষভাবে নিতে দেওয়া হবে না। কলেজ পর্য্যন্ত যে বিষয় পড়েছেন তাঁকে বিদ্যালয়ে সেই সেই বিষয় পড়াতে দেওয়া হবে। যদি কাউকে অন্য বিষয় পড়াতে হয়, তাহলে তাকে special course নিতে হবে। শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকারের জন্য বহু শ্রেণীর ছাত্র বেছে নিতে হবে এবং তাদের বৃত্তি দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণক্ষেত্রে কোন বেতন দেওয়ার রীতি থাকবে না। বরং তাঁদের স্টাইপেণ্ড অথবা অর্থ সাহায্য দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় থাকা উচিত যেখানে আদর্শ পাঠদানের ব্যবস্থা থাকবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য যে শিক্ষণ কেন্দ্র থাকবে সেখানকার শিক্ষকদের মাষ্টার ডিগ্রী থাকতে হবে, বি. এড্. ডিগ্রী থাকতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ জ্ঞান থাকতে হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাউকে শিক্ষকতা কাজে নিয়োগ করার সময়ে দেখতে হবে তাঁর দশ বছরের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে কি না। অবশ্য মহিলা ও অনুন্নত শ্রেণীর বেলায় অন্যভাবে বিবেচনা করা হবে। যদি কোন প্রাথমিক শিক্ষক নিজের শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য ছুটি চান তবে তাকে পড়ার জন্য ছুটি মঞ্জুর করা হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যদি কোন স্নাতক কাজ করতে চায় তবে তাদের জন্য special course এর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ কাল হবে দু'বছর। প্রাথমিক শিক্ষকদেরও ডিগ্রী দিতে হবে ও আবাসিক ব্যবস্থা হবে এবং এই শিক্ষকদের জন্য পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় থাকবে।

ট্রেনিং এর সুযোগ সুবিধা বিস্তার—প্রত্যেক রাজ্যে ট্রেনিং এর সুযোগ সুবিধা দানের জন্য পরিকল্পনা করা উচিত। Part time শিক্ষণের সুবিধা দিতে হবে। অনেক untrained শিক্ষক আছেন, তাঁদের সকলকেই চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালের মধ্যে ট্রেনিং নিতে হবে।

কর্মরত অবস্থায় শিক্ষা—বেশী সংখ্যক শিক্ষক যাতে কর্মরত অবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতি পাঁচ বছরে কমপক্ষে ২।৩ মাসের ট্রেনিং নিতে হবে। Summer institute এর পর follow up programme নিতে হবে।

উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রস্তুতি—উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকের কিছু orientation প্রয়োজন। নতুন লেকচারার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নিজেদের খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করবেন। ভালো শিক্ষকদের বক্তৃতা শুনতে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষকদের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার চেষ্টা করবেন। এর জন্য চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন একটি তহবিল প্রস্তুত করবেন। U. G. C শিক্ষার মান ঠিক রাখার জন্য শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটা কমিটী গঠন

করবেন। কেন্দ্রীয় সরকারও শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য একটি তহবিল প্রস্তুত করবেন।

৫ম অধ্যায়

শিক্ষার্থী ভর্তি ও নির্বাচন—শিক্ষার সুযোগ সুবিধার জন্য মূল নীতিগুলি হবে প্রত্যেক শিশুকে ভালো এবং কার্যকরী সাধারণ শিক্ষা কম পক্ষে ৭ বছর দিতে হবে। উচ্চ শিক্ষার জন্য ছাত্র নির্বাচিত হবে। কারিগরী ও বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মেধাবী ছাত্রের সম্যক বিকাশ সাধনের চেষ্টা করতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য গণশিক্ষার প্রসার করতে হবে। প্রত্যেকের জন্য শিক্ষার সুযোগ এক রকম হবে।

১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৮১-৮৬ সালের মধ্যে সাত বছরের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবে। স্থানীয় চাহিদা, বিদ্যালয়ের ক্ষমতা ও শিক্ষার সুযোগের উপর নির্ভর করে ছাত্র ভর্তি করা হবে। মেধাবী ছাত্ররা যাতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষা পায় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে জাতীয় লক্ষ্য ও আদর্শে পৌঁছাতে হলে যে রকম শিক্ষণ প্রাপ্ত মানুষের প্রয়োজন সে রকম ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তি করা উচিত। তপশীলভুক্ত উপজাতিদের শিক্ষার জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কিছু আসন নির্দিষ্ট থাকবে। একটা কমিটি থাকবে যারা কত মানব শক্তির প্রয়োজন তার হিসাব রাখবেন। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে সমস্ত বিভাগে ছাত্র ভর্তি করবেন। মেডিকেলের স্নাতকদের জন্য এক বছরের internship এর ব্যবস্থা আছে। এটা অন্য স্নাতকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। বিশেষ বিভাগে কাজের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগের সমতা—বেতনহীন শিক্ষার প্রতি আমাদের দেশের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পূর্বে প্রাথমিক স্তরে বেতন রোধ করা উচিত। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরটা পঞ্চম পরিকল্পনার আগেই বেতন-মুক্ত করা উচিত। আরও দশবছর ধরে মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরকে বেতন-মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। গরীব ছাত্রদের জন্য বইয়ের ব্যাঙ্ক ও বিনা পড়ার বই দিয়ে সাহায্য করা উচিত। মেধাবী ছাত্রের জন্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষা বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ক্লাশ VII অথবা VIII এর ছাত্রদের শতকরা ১০ জনকে অন্যান্য বৃত্তি দেওয়ার চেষ্টা করবেন। বিদ্যালয়ে প্রতিভাবান ছাত্রদের নানারকম সুযোগ করে দিতে হবে। প্রতিভাবান ছাত্রদের জন্য সমৃদ্ধ পাঠ্যক্রমের প্রচলন করতে হবে। প্রতিভাকে বিস্তীর্ণ অর্থে ধরতে হবে; অঙ্ক, ভাষা, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, গবেষণামূলক কাজ ইত্যাদিতে পারদর্শী হলে তাদের প্রতিভাবান মনে করতে হবে।

প্রাক স্নাতক স্তরে ১৯৬৭ সালের মধ্যে শতকরা ১৫ জনকে ও ১৯৭১ সালের মধ্যে শতকরা ২৫ জনকে বৃত্তি দিতে হবে।

স্নাতকোত্তর স্তরে ১৯৭৬ সালের মধ্যে শতকরা ২৫ জনকে ও ১৯৮৬ সালের মধ্যে শতকরা ৫০ জনকে বৃত্তি দিতে হবে।

যারা হোষ্টেলে থাকবে ও যারা বাড়ীতে থাকবে তাদের জন্য দু রকমের বৃত্তি থাকবে। হোষ্টেলের খরচ কমানোর জন্য নিজেদের খাবার নিজেরা পরিবেশন করবে। প্রাক স্নাতকদের জন্য ৭৫ ও স্নাতকদের জন্য ১৪০ মাসিক হবে। ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের মধ্যে শতকরা ৫% ও ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে ১০% ছাত্রকে জাতীয় পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে থেকে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে ১০% প্রাক স্নাতক বিভাগে ও ২০% স্নাতকোত্তর বিভাগে বৃত্তি দানের বন্দোবস্ত থাকবে। স্নাতকোত্তর স্তরে গবেষণার জন্য ব্যবস্থা থাকবে।

বৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের জন্য কর্তৃপক্ষকে আরও উদার সমতাবোধ সৃষ্টি রাখতে হবে। কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশের জন্য যে পরীক্ষা সেটা ইংরেজী

ও আঞ্চলিক ভাষায় করতে হবে। বিদ্যালয় স্তরেও বৃত্তি শিক্ষার জন্য ৩০%, উচ্চ স্তরে ৫০% ছাত্রকে বৃত্তি দিতে হবে। বিদেশে পড়ার জন্য বছরে ৫০০ ছাত্রকে পাঠানোর জন্য জাতীয় কার্যসূচী থাকবে। যদি কাউকে বৃত্তি দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে ঋণ হিসাবে টাকা দেওয়া চলতে পারে। এই টাকা যাদের দেওয়া হবে তারা বিজ্ঞান ও সেনাদপ্তর কোন বিষয় পড়তে চাইবেন। শিক্ষকতা কাজে যোগ দিলে পর প্রতি বছর ১/৮ অংশ ঋণ মকুব হয়ে যাবে। ঋণ দেওয়ার ব্যাপারটার হিসাব নিকাশ করার জন্য একটা বোর্ড থাকবে।

দিনের বেলায় পড়াশুনা করার জন্য কতকগুলি কেন্দ্র খোলা উচিত। সাইকেল করে বা হেঁটে দূর থেকে ছাত্ররা আসতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত মেয়েদের জন্যও বৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগের ব্যবস্থা করা উচিত।

বিভাগ স্তরে বৃত্তিদানের দায়িত্ব থাকবে রাজ্য সরকারের উপর ও উচ্চ স্তরে থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর।

বিকলাঙ্গ শিশুর শিক্ষা শিক্ষা-ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়া উচিত। ১৯৮৬ সালের মধ্যে ১০% বিকলাঙ্গ শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা করা উচিত ও তার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করে ভাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই শিশুদের জন্য কার্যসূচীর উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা চলবে। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করতে হলে কতকগুলি বিশেষ কেন্দ্র থাকতে হবে, শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রে এ বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষাগত বৈষম্য দূর করার জন্য এক একটা জেলাকে এক একটা Unit ধরা হবে।

মহিলা-শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করতে হবে, সমস্যা-গুলোকে পরীক্ষা করতে হবে। স্ত্রী-শিক্ষার উপর জাতীয় কমিটি থাকবে, তাদের সুপারিশগুলিকে গ্রাহ্য করা হবে। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে একটা সংস্থা থাকবে যা স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে কাজ করবে। অর্ধ শিক্ষিত ও শিক্ষিত মহিলাদের জন্য part time কাজের ব্যবস্থা থাকবে।

তপশীলভুক্ত উপজাতিসমূহের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য ছাত্রাবাস করতে হবে। পরিবহন কমিশন ও N. C. E. R. T.'র সুপারিশগুলি গ্রহণ করতে হবে। এদের জন্যও পাঁচ বছরের শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে।

মাধ্যমিক স্তরে আবাসিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ান উচিত। উপজাতি ছাত্রছাত্রী বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। এদের মধ্যে নেতৃত্ব জাগাতে হবে, সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধন করতে হবে। এদের বিষয়ে গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন একটি তহবিলের ব্যবস্থা রাখবেন।

৭ম অধ্যায়

প্রাক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কে প্রাক প্রাথমিক স্তর।

প্রাক প্রাথমিক স্তর—যে শিশুর গৃহ-পরিবেশ অনুকূল নয় তার ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, সৌন্দর্যবোধ বিকাশের জন্য এই প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা অত্যন্ত মূল্যবান। ১৯৮৬ সালের মধ্যে ৩-৫ বছরের শিশু ১০% ও ৫—৬ বৎসরের শিশু ৫০%কে শিক্ষার আওতায় আনতে হবে।

আগামী দশ বছরের মধ্যে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য প্রত্যেক রাজ্য-শিক্ষাসংস্থার ও প্রত্যেক জেলায় কতগুলি কেন্দ্র খোলা হবে যার কাজ হবে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা পরিবর্তন করা ও পরামর্শ দেওয়া। প্রাক্টিস-ইন-এড ইত্যাদি দিয়ে জনসাধারণকে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহিত করতে হবে। কম খরচে যাতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে। শিশুর জন্য বিদ্যালয় সংলগ্ন ক্রীড়াকেন্দ্র খুলতে হবে। প্রাক প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, সেখানে ক্রীড়াকেন্দ্র গবেষণাগার ইত্যাদি থাকবে। প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের সমস্ত প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে একটা সংগতি থাকবে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার—সংবিধান অনুসারে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সব শিশুর শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৭৪-৭৬ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের ও ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে ৭ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে হবে।

প্রত্যেক রাজ্যে তার জন্য পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। অপচয় বাঁচাতে হবে যাতে ৮০% শিশু সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা পায় ও নাগরিক হওয়ার শিক্ষা পায় তা দেখতে হবে। যারা সপ্তম শ্রেণির পর কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চায় তাদের জন্য বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিকল্পনা ও কার্যাসূচী এমন হবে যাতে প্রতি এক মাইলের মধ্যে নিম্ন প্রাথমিক ও তিন মাইলের উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকবে। ১০ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি করতে হবে ও অপচয় বন্ধ করতে হবে। অপচয় বন্ধ করতে গিয়ে প্রথম শ্রেণীতে ফেলাছেলে শিক্ষা দিতে হবে। অল্প শিক্ষামাত্রার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, part time শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে এমন ১১-১৪ বৎসর বয়সের শিশুর জন্য পড়াশুনার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করতে হবে এবং পরিকল্পনাটি স্থানীয় অধিবাসীদের জানাতে হবে।

যারা নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছে তাদের জন্য part time শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে।

সংবিধান অনুসারে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। উপজাতিদমূহের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য যোগ্য শিক্ষক ও আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার—মাধ্যমিক শিক্ষা আগামী ২০ বছরের মধ্যে (১) বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন, (২) শিক্ষার মান বজায় রাখা, (৩) ভালো ছাত্র নির্বাচন করার কাজে মন দিতে হবে। প্রত্যেক জেলায় দশ বছরের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিমূলক করতে হবে, নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ২০% ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৪০% ছাত্রের বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। নানা প্রকার part time ও full time বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে যাতে শহরের ও গ্রামের ছাত্রছাত্রী যোগ দিতে পারবে। এই বৃত্তিশিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য আশা উচিত। part time শিক্ষা-ব্যবস্থা নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ২০% ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ২৫% থাকা উচিত। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করা উচিত। মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন উচিত। তাদের আবাসিক ব্যবস্থা, বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সবই পৃথক ভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত।

বিদ্যালয়ের স্থান-নির্বাচনে তৎপর হওয়া উচিত। কতকগুলি গ্রামের জন্য একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠা উচিত। মাধ্যমিক বিদ্যালয় অতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্য করা উচিত নয়। বৃত্তি-শিক্ষার এই বিদ্যালয়গুলি শিল্প কারখানার নিকট হওয়া উচিত।

৮ম অধ্যায়

পাঠ্যক্রম—বর্তমান কালের বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে অনেকে পাঠ্যক্রমের আমূল সংস্কারের কথা উপলব্ধি করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ ক্ষেত্রে, রাজ্যশিক্ষা সংস্থা ইত্যাদিতে গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন সাধন করা চলতে পারে। প্রয়োজন মত পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার জন্য পাঠ্যক্রম পরিবর্তন সাপেক্ষ হবে ও বিদ্যালয়ে এ বিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকবে। যে বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আছে সেখানে উন্নত পাঠ্যক্রম চালু করা উচিত।

বিষয় শিক্ষকদের একটি সংস্থা থাকা উচিত এবং এটি হবে রাজ্যশিক্ষা ও N. C. E. R. T.-র সাহায্যে পুষ্ট যাঁরা পাঠ্যক্রমের উন্নতি বিধান করতে সাহায্য করবেন।

১০ বছরের শিক্ষা সকলের জন্য সমান হবে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রবণতা অনুসারে নানা বিষয়ে পাঠের সুযোগ দেওয়া হবে।

নিম্ন প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যক্রমটি সহজ সরল হবে ও ভাষা, অঙ্ক-শিক্ষা ইত্যাদির দ্বারা অযথা ভারাক্রান্ত হবে না। নিম্ন প্রাথমিক স্তরে পড়তে লেখায় উপর বেশী জোর দিতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যক্রমটি সুসংবদ্ধ, সুবিস্তৃত ও গভীর হবে; শিক্ষা পদ্ধতিও পাঠ্যক্রমের অনুরূপ হবে।

বিশেষদের জন্য সুসমন্বিতপূর্ণ পাঠ্যের বিকাশের

অন্ত মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমের অর্ধেক সময় নির্বাচনী বিষয়গুলিতে দিতে হবে, এক চতুর্থাংশ সময় ভাষা শিক্ষার জন্ত এবং এক চতুর্থাংশ শারীরিক শিক্ষায়, শিল্প, চিত্রাঙ্কন নীতি ও ধর্ম শিক্ষায় ব্যয়িত হবে।

যেখানে সম্ভব সেখানে সাধারণ ও অগ্রসর ছাত্রের জন্ত দু রকমের শিক্ষা-ব্যবস্থা থাকবে।

ভাষা শিক্ষা—ভাষা শিক্ষার জন্ত বিশেষ সতর্ক হতে হবে। অনির্দিষ্ট কাল ধরে আমরা ইংরাজীর উপর গুরুত্ব আরোপ করে এসেছি। প্রথমে মাতৃভাষা, তারপর হিন্দী প্রাধান্ত পেয়েছে। ইংরাজীর কাজ চালানো জ্ঞান থাকলেই চলবে। ভাষা শিক্ষার উৎকর্ষতা শিক্ষক ও সুযোগের উপর নির্ভর করছে, ভাষা শিক্ষার জন্ত নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে অল্প সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করলেই চলবে, একসঙ্গে দুটো ভাষার বেশী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন নাই। যখন যে প্রয়োজন হবে তখনই হিন্দী অথবা ইংরাজী ভাষা শিক্ষা সুরু করা যাবে। কোন স্তরেই চাপটে ভাষা আবশ্যিক থাকবে না।

এখানে থাকল মাতৃভাষা official ভাষা ও আধুনিক ভারতীয় অথবা বিদেশী ভাষা। নিম্ন প্রাথমিক স্তরে মাতৃ-ভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা শিখবে এবং নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা অথবা official ভাষা এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিখবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কেবলমাত্র দুটো ভাষা আবশ্যিক থাকবে।

ইংরাজী ও হিন্দীর পরিবর্তে যে কোন আধুনিক ভাষা শেখার জন্ত কোন কোন বিদ্যালয়কে অনুমতি দেওয়া চলবে। উচ্চ শিক্ষার ভাষা-শিক্ষা আবশ্যিক থাকবে না। ঐচ্ছিক ভিত্তিতে হিন্দী শিক্ষা চলতে থাকবে। ভাষা শিক্ষার বোঝা কমানোর জন্ত দেব নাগরী ও রোমান লিপি প্রচলিত হবে। পঞ্চম শ্রেণীর পূর্বে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করা হবে না। অষ্টম শ্রেণীর পর প্রাচীন ভারতীয় ভাষা হিসাবে সংস্কৃত ও আরবী শিখতে পারবে।

অঙ্ক ও বিজ্ঞান সাধারণ শিক্ষার অংশ হিসাবে শিক্ষা দিতে হবে। নিম্ন প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতির মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা চলবে। চতুর্থ শ্রেণী থেকে ইংরাজী অঙ্কও শিখবে তাদের শেষে সমস্ত বিষয়ের বিজ্ঞানের ধরন রাখতে হবে। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে যুক্তি তর্কের অবতারণা করতে ও সাধারণ সিদ্ধান্ত গঠন করতে সাহায্য করতে হবে। প্রত্যেক শ্রেণী কক্ষের একটী অংশে নানা প্রকার জিনিষ সংগ্রহের মধ্য দিয়ে শিশুর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গী আনয়ন করা যেতে পারে

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান মনের একটি পৃথক শৃঙ্খলা বলে গৃহীত হবে। এই স্তরেই প্রতিভাবান ছাত্রদের দিকে মনোযোগ দিতে হবে, তাদের লেবরেটারি ব্যবহার করতে দিতে হবে। বিজ্ঞান গ্রামের শিক্ষার কৃষির সঙ্গে ও সহরের শিক্ষায় কারিগরী বিদ্যার সঙ্গে যেন যুক্ত হয় দেখতে হবে। অঙ্ক শিক্ষার জন্ত বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। অঙ্কের আধুনিক পাঠক্রম চালু করতে হবে। বিজ্ঞান ও অঙ্ক শিক্ষার জন্ত আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। শিক্ষকদের তালোভাবে তৈরী থাকতে হবে ও উন্নত লেবরেটারি তৈরী করতে হবে।

সমাজ-বিদ্যা ও সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন হবে কারণ আমরা শিক্ষার মাধ্যমে পরিপূর্ণ নাগরিক তৈরী করতে চাই। মানবতা বোধ ও জাতীয় ঐক্য স্থাপন করবার জন্ত পাঠ্যক্রম বিশেষভাবে প্রস্তুত করতে হবে। সমাজ-বিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করার চেষ্টা থাকবে।

কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন কারণ মানুষকে সমাজের নিয়মকানুনের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। নিম্ন প্রাথমিক স্তরে হাতের কাজ, উচ্চ প্রাথমিক স্তরে শিল্প কাজের মাধ্যমে কর্মের অভিজ্ঞতা লাভ করবে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে workshop training এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কর্মের অভিজ্ঞতা দিতে হবে। কম খরচে বিদ্যালয় যাতে workshop এর জিনিষ পত্র কিনতে পারে তার দিকে নজর দিতে হবে শিক্ষক-শিক্ষণেও এই workshop এর ব্যবস্থা থাকবে।

সমাজ-সেবার জন্ত নির্দিষ্ট বয়সের ছেলেমেয়েরা নানাভাবে কাজ করবে। সমাজ-সেবা শিবির ইত্যাদির

মাধ্যমে কাজ করবে।

শারীরিক শিক্ষা—শারীরিক শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা ও কার্য্যসূচী গ্রহণ করতে হবে।

নীতি শিক্ষা—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে; সপ্তাহে একটি বা দুটি নির্দিষ্ট থাকবে যখন পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কিছু নীতি-শিক্ষা দেওয়া হবে।

সৃজন শক্তি বিকাশের জন্য সৃজন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সৃজন শিক্ষা বিষয়ক গবেষণার ব্যবস্থা থাকা উচিত। নানা প্রকার সহপাঠ-ক্রমিক কার্য্যকলাপের ব্যবস্থা থাকবে যাতে প্রত্যেকে নিজস্ব ভঙ্গীতে নিজস্ব সত্তার বিকাশ সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

বালক ও বালিকাদের জন্য বিভিন্ন পাঠ্যক্রম রচনা করা উচিত। মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, গান ইত্যাদি থাকবে। বিজ্ঞান ও অঙ্ক শিক্ষায় জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা ও নতুন পাঠ্যক্রম—বুনিয়াদী শিক্ষায় উৎপাদনাত্মক কাজের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। শিল্প শিক্ষার স্থান এখানে নির্দিষ্ট ও শিল্পকে কেন্দ্র করে অনুষঙ্গ প্রণালীতে পাঠদানের কথা বলা হয়েছে। এই শিক্ষা হচ্ছে জীবনব্যাপী শিক্ষা তাই কোন একটি নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষার নাম বুনিয়াদী শিক্ষা দেওয়া যায় না।

পাঠ্যক্রমের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নত শিক্ষা দান পদ্ধতি ও মূল্যায়ন-এর উন্নতি প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থানের জন্য সংগঠন ও পরিচালনা অনেকখানি দায়ী।

ভালো শিক্ষা-ব্যবস্থা বলতে এটা dynamic, পরিবর্ত্তন-সাপেক্ষ এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষককে বিভিন্ন দিকে বিকশিত হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। এই পরিবর্ত্তনশীলতা সম্ভব হবে যদি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সংস্কারের প্রকৃত অনুকূল পরিবেশ থাকে। পরীক্ষামূলক কোন কাজে শিক্ষকদিগকে উৎসাহিত করতে হবে।

শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে ভালো পড়ার বই ও অন্যান্য সাহায্য দিতে হবে। গ্রন্থাগার শিক্ষা বিভাগ পাঠ্য বইগুলির মূল্যায়ন করবে। ছাত্রদের সমবায়ের ভিত্তিতে ঐ বইগুলির বন্টন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকলেই প্রতি বিষয়ের অন্ততঃ ৩৪ টা করে বই থাকবে। বইগুলো বিক্রয়ের দ্বারা লাভ করার প্রচেষ্টা থাকবে না। শিক্ষা-বিভাগ ভেন্ডিং ও পুস্তিকার দ্বারা ছাত্র ও শিক্ষকদের সাহায্য করবেন। বেতার প্রচারের দ্বারা শিক্ষককে কর্মসূচী পাঠ পরিকল্পনার সাহায্য করা যায়। মূল্যবান প্রদীপন ব্যবহার না করাই ভালো। শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা খুব বেশী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নিম্ন প্রাথমিক স্তরে ৫০ জন, উচ্চ প্রাথমিক ও নিম্ন প্রাথমিক স্তরে ৪৫ জন এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৪০ জন ছাত্র পাঠ গ্রহণ করবে। শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে।

বিদ্যালয়-গৃহ—বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের জন্য একটি নির্দিষ্ট তহবিল থাকবে; সরকার ধার অথবা grant-in-aid দিতে পারেন। বিদ্যালয় গৃহটির জন্য পরিকল্পনা ও স্থান নির্বাচন করার জন্য যত্ন সহকারে করা উচিত। গ্রামের দিকে অনেকে নিজের চেষ্টায় বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিয়ে থাকেন। গ্রামে পঞ্চায়েতের উপর ও শহরে মিউনিসিপ্যালিটির উপর গৃহনির্মাণের ভার ন্যস্ত করা হবে। P.W.D. একটি বিভাগ গৃহনির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট হতে পারে।

পরিচালনা ও পরামর্শদান—Guidance and Counselling ব্যবস্থা প্রাথমিক স্তর থেকেই থাকা উচিত। প্রথমে কোথায় ছাত্রের অসুবিধা জানতে হবে। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নানান সমস্যা দূর করতে শিক্ষকদের সাহায্য করতে হবে। কর্মরত অবস্থায় শিক্ষকদের শিক্ষণের সুযোগ দিতে হবে। নানা প্রকার কাজের খোঁজ দিতে হবে। শিশু ও তার পিতা মাতাকে উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দিতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে কিশোর ছাত্রছাত্রীর বিভিন্ন আগ্রহ ও সামর্থ্য অনুসারে শিক্ষা-ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শিক্ষণ প্রাপ্ত পরামর্শদাতা থাকবেন পরামর্শদাতার কাজ হবে প্রত্যেক শিক্ষককে ছোটখাটো guidance এর কাজে

সাহায্য করা ও ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা Guidance এর জন্য সাজ সরঞ্জাম, প্রদীপন, বই ইত্যাদি তৈরী করতে হবে ও গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে।

সৃষ্টিকারের প্রতিভাবানকে খুঁজে বার করতে হবে এবং তার বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করতে হবে। এদের জন্য সমৃদ্ধিশালী পাঠক্রম থাকবে।

অনগ্রসর শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা করতে হবে এবং যার ৭৫ I Q তার সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি করান যাবে না; এদের জন্য পৃথক স্কুলের ব্যবস্থা করতে হবে। অনগ্রসরত্বের জন্য নির্ণয়কারী পরীক্ষা নিতে হবে, Guidance clinic-এর সাহায্য নিতে হবে ও অভিভাবক-শিক্ষক-সংস্থা গড়ে তুলতে হবে।

মূল্যায়ন—মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি। শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে মূল্যায়নের লক্ষ্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ছাত্রদের পাঠের অগ্রগতি, শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদির উপর মূল্যায়নের প্রভাব দেখতে পাই। সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি করতে হলে মূল্যায়নের উন্নতি প্রয়োজন। এইজন্য মূল্যায়ন পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা (Relia bility), সত্যতা (Validity), নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity) ও ব্যবহার মূল্য থাকা উচিত। আমাদের দেশে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের রীতি প্রচলিত। যদিও আমরা জানি লিখিত পরীক্ষার দ্বারা ছাত্রদের বিকাশ ঠিকমত জানা যায় না তবুও এই লিখিত পরীক্ষার মধ্যে নির্ভরযোগ্যতা সত্যতা নৈর্ব্যক্তিকতা ইত্যাদি আনার চেষ্টা করতে হবে।

নিম্ন প্রাথমিক স্তরে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হবে যাতে শিশুর কুশলতা ও সহযোগিতা গড়ে ওঠে তা দেখা। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষা থাকবে। শিক্ষক নির্ণয়মূলক পরীক্ষা দ্বারা ছাত্রের অসুবিধা দূর করবার চেষ্টা করবেন; সর্বাত্মক লিপির মাধ্যমে শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের দিকে নজর রাখবেন। প্রাথমিক স্তরের শেষে বহিঃ পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। ফলে সমস্ত বিদ্যালয়গুলির মান মোটামুটি জানা যাবে। প্রাথমিক পরীক্ষার শেষে সার্টিফিকেট ও সর্বাত্মক লিপি দেওয়া হবে। প্রতিভাবান ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা থাকবে।

বহিঃ পরীক্ষার মান উন্নত করার জন্য পরীক্ষকের বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন, প্রশ্ন পত্রের উন্নতি সাধন প্রয়োজন, নাম্বার দেওয়াতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করা প্রয়োজন। আজকাল যন্ত্রের সাহায্যে নাম্বার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে

বোর্ড সার্টিফিকেট দেবেন কিন্তু বিদ্যালয়ের সর্বাত্মক সাবিক লিপিকেও যথেষ্ট মূল্য দেওয়া হবে। কোন ছাত্র যখন কোন বৃত্তিশিক্ষার জন্য যাবে অথবা কোন উচ্চ শিক্ষা নিতে যাবে অথবা যে কোন কাজে যোগ দিতে চাইবে তখন এই সার্টিফিকেট ও সর্বাত্মক লিপি দুইই বিশেষ ভাবে বিবেচনা করে দেখা হবে।

পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়—কতকগুলি বিদ্যালয়কে তাঁদের ছাত্রদের মান নির্ণয়ের অধিকার দেওয়া যেতে পারে। দশম শ্রেণীর পর বিদ্যালয় পরীক্ষা গ্রহণ করবে বা বহিঃ পরীক্ষার সমান মূল্য হিসাবে ধরা হবে। বিদ্যালয় থেকে কৃতকার্য ছাত্রের নাম জানান হলে State Board সার্টিফিকেট দেবেন। একটা কমিটী থাকবে যারা বিদ্যালয় নির্বাচন করবেন বিদ্যালয়ের অবশ্য পাঠ্যক্রম, পাঠ্য পুস্তক ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর স্বাধীনতা থাকবে। বিদ্যালয় অন্তঃ অন্তবর্তী মূল্যায়নের জন্য লিখিত পরীক্ষা নেবেন ও সর্বাধিক মূল্যায়নের চেষ্টা করবেন।

দশম অধ্যায়

সমস্ত বিদ্যালয় এক রকম পদ্ধতির আওতায় আসা উচিত। এর জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের বৈষম্য দূর করতে হবে। সকল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করতে হবে। স্থানীয় প্রচেষ্টাগুলির সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। কতকগুলি বিদ্যালয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে আর কতগুলি বিদ্যালয় বঞ্চিত হবে এ রকম না হবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সাধারণতঃ সরকারী ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিক্ষা

ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রন করে। এটা দূর করার জন্য স্থানীয় লোকজনদের কমিটীতে স্থান দিতে হবে। কালো প্রাইভেট বিদ্যালয়ও অটোনমিক হয়ে গেলে সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার আওতায় এসে যাবে। প্রতিবেশী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ১০ বছর পরে ১০% বিদ্যালয়কে উচ্চতর বিদ্যালয়ে পরিণত করা উচিত।

পরিদর্শন—রাজ্যশিক্ষা বিভাগ সমস্ত শিক্ষার দিকের দায়ী—শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা, বিদ্যালয় পরিদর্শন, রাজ্য মূল্যায়ন সংস্থা পরিচালনা করা, শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করা, রাজ্য-শিক্ষা-সংস্থা স্থাপন করা, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কারিগরী ও বৃত্তিশিক্ষার সংযোগ সাধন করা ইত্যাদি। এসব কাজের জন্য district education officer থাকবেন যিনি বিদ্যালয়ের সমস্ত সমস্যার সমাধানে রত থাকবেন। খুব সাধারণভাবে সঙ্গে প্রধানশিক্ষক নির্বাচন করতে হবে।

পরিদর্শন হচ্ছে শিক্ষাসংস্কারের মেরুদণ্ড। এই পরিদর্শন দ্বারা শিক্ষা সংস্কার নবজীবন লাভ করবে বিদ্যালয়ের সংগঠন ও পরিচালনার জন্য District School Bord দায়ী থাকবেন ও বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য District Education Officer দায়ী থাকবেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সহযোগিতা থাকবে। বিদ্যালয় পরিদর্শন বছরে একবার অথবা প্রতি ৩ বছরে একবার হতে পারে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যেন শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা ও guidance service-এর ব্যবস্থা থাকে তা পরিদর্শক বিশেষ ভাবে দেখবেন। রাজ্য শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে কর্মরত অবস্থায় শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকবে।

রাজ্য সরকার স্থানীয় সংস্থাগুলির উপর নজর রেখে উচ্চ প্রাথমিক স্তরের শেষে, নিম্ন প্রাথমিক স্তরের শেষে ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শেষে শিক্ষার মান নির্ণয় করবেন। রাজ্য মূল্যায়ন সংস্থাকে পরামর্শ ও সাহায্য করার জন্য একটি কমিটী থাকবে ও তার একজন চেয়ারম্যান থাকবেন। বোর্ড নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পরে বহিঃ পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার জন্য একটি কমিটী থাকবে যার অর্ধেক সদস্য বিদ্যালয় স্তরের প্রতিনিধি হবেন ও অপর অর্ধেক বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের প্রতিনিধি। দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য উচ্চ মানের পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করতে হবে, এদের জন্য জাতীয় মানের ভিত্তিতে পাঠ্যক্রম নির্দ্ধারণ করা হবে।

এই কমিশন মনে করেন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের আজ প্রয়োজনীয়তা আছে যাকে শিক্ষা-বিপ্লব বলা চলতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও কারিগরিতার মধ্য দিয়ে শিক্ষা সংস্কারের কাজ সুরু; সাধারণ শিক্ষার একটা অঙ্গ হবে কার্যের অভিজ্ঞতা, মাধ্যমিক শিক্ষা হবে বৃত্তি-শিক্ষানুসরণ, শিক্ষকদের গুণগত মান উন্নয়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ও গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ, কৃষি বিষয়ক ও বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা প্রভৃতি বিষয়ে অধিক মনোযোগ

'মানুষের জন্য ধর্ম এবং ধর্মের জন্য মানুষ—দুই-ই সত্য হইতে পারিত যদি ধর্ম বলিতে বিশেষ কোন ধর্ম না বুঝাইয়া সর্বধর্মসমন্বয়ই বুঝাইত। সর্বধর্মসমন্বয়ই মানুষের স্বধর্ম। প্রতি মানুষ এই হিসাবে স্বধর্মী, সর্বধর্মী। .....ইহাও সত্য যে প্রত্যেকটি ধর্মই স্বয়ংপূর্ণ, উহা ঐ সম্প্রদায়ের সকল স্তরেরই আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও তুল্যভাবেই সত্য যে, কোনও বিশেষ দেশ-কাল-পাত্র বা বিশেষ দৃষ্টিকোণের মধ্যে সমগ্র মানবসমাজকে, এমন কি কোনও বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানুষকেও আটকাইয়া রাখা যাইবে না। সব বিশেষত্বকে ছাপাইয়া অখণ্ড বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানব ও মানবসমাজ আগাইয়াই চলিয়াছে, চলিবেও।'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-কৃত মহাত্মাজীর গঠনকর্ম পদ্ধতি

চৈতন্য দেবের প্রেম-ধর্ম্ম

।। জনাব রেজাউল করীম ।।

আজ দেশের এক শ্রেণীর শুভবুদ্ধির অন্তর থেকে ধর্মভাব প্রায় চলে গেছে। তারা বলতে আরম্ভ করেছে যে, এই বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের দিনে ধর্মের কোন আবশ্যকতা নাই। তারা প্রত্যেক সমাজে যুক্তির দোহাই তোলে। ধর্ম-সম্বন্ধে আরও নানা প্রকার প্রশ্ন তুলে থাকে। ধর্ম কি সামাজিক সুশিক্ষায় হতে পারে? সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব সৃষ্টি করতে পারে? ধর্মের মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সব ধর্মেই এই প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার উত্তর আছে। এশিয়াতে যুগে যুগে বহু মহা-মানবের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁদের ধর্ম্ম ও জীবন-দর্শনের মধ্যে এমন একটা মহান ও সর্ব্বজনীন আদর্শ আছে যা বিশ্ব-সমস্যার সমাধান করতে পারে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি বিশ্বধর্মের মধ্যে মূলতঃ ভিন্ন বিধা এমন একটি ঐক্য ও সামঞ্জস্য আছে যা দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। কেবল মনে মনে ভাবি এত ঐক্যাদর্শ থাকা সত্ত্বেও কেন জগতে ধর্ম্মের নামে এত বিরোধ ও হানাহানি হয়ে থাকে? যদি ধর্ম্মের আদর্শকে ঠিক ভাবে উপলব্ধি করা হয় তবে সমস্ত দ্বন্দ্ব বিরোধের অবসান হয়ে যায়। কিন্তু তাদের বিষয় সাধারণ মানুষ তা করে না, তাই ধর্ম্মের নামে এত বিরোধ ও দ্বন্দ্ব।

আজ এই প্রবন্ধে এমন এক মহাপুরুষের কথা বলব যিনি ধর্ম্মকে ভক্তি, প্রেম, সেবা ও যুক্তির সহিত যাচাই করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর নাম শ্রীচৈতন্য। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙলার মাটিতে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। তিনি এমন এক সময় আবির্ভূত হ'ন যখন ধর্মান্ধতা ধর্ম্মের আত্মাকে গ্রাস করতে বসেছিল, আর অপর দিকে ধর্ম্ম-বিশ্বাস নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর ত্যাগ-পূত জীবন দিয়ে মানুষের মনে ধর্ম্ম-বিশ্বাস ফিরিয়ে আনলেন, আর অপর দিকে ভক্তির মধ্যে আবেগ স্থাপন করে ধর্মান্ধতাকেও দূর করে দিলেন। বস্তুতঃ চৈতন্যদেবের আদর্শ ভক্তি প্রেম ও যুক্তির সমন্বয়ে গঠিত। এদেশে এমন কোন যুগ ছিল না যখন বিশ্বাস ও যুক্তি একত্র মিলিত হয় নি, এমন যেন ছিল না যেখানে বিশ্বাস ও যুক্তি একত্র মিলিত হয় নি। অভাব ছিল প্রেম ও ভক্তির। চৈতন্যদেব সেই যুক্তির ধর্ম্মে ভক্তি ও প্রেমের আদর্শ দিয়ে মানুষের ধর্ম্ম-বোধকে নূতন ভাবে সঞ্জীবিত করে তুলেন। চৈতন্যদেবের প্রেম এত ব্যাপক যে তা সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করতে পেরেছে। তাঁর এই আদর্শের মধ্যে প্রাদেশিকতা সাম্প্রদায়িকতা বা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার কোন স্থান ছিল না। তাঁর আদর্শ সর্ব্বব্যাপী বিশ্ব-মানবতাই তাঁর আদর্শের মর্ম্মকথা।

শ্রীচৈতন্যদেব একজন মহাপুরুষ যিনি ধর্ম্মের সঙ্গে প্রেম প্রীতি ভক্তি ও যুক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন; এবং সারা দেশে প্রেমের প্লাবন বইয়ে দিয়েছেন। এদেশে এমন কোন যুগ ছিল না যখন ভক্তি ও যুক্তি একত্র মিলিত হয়েছিল। চৈতন্য দেবের আদর্শ যুক্তি-সঙ্গত, নীতি-সঙ্গত এবং আধ্যাত্মিক. "প্রেম-ধর্ম্ম" এই একটি কথাতেই তাঁর সমস্ত আদর্শ ফুটে উঠেছে। তাঁর এই আদর্শ এত ব্যাপক যে তাতে কোন ফাঁক নাই, ত্রুটি নাই, কোন প্রকার প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা তা সীমিত নয়। সমস্ত জীবের প্রতি তাঁর ছিল স্বার্থহীন অকুণ্ঠ প্রেম। সকল ধর্ম্মের সার শিক্ষা তাঁর নীতির মধ্যে নিহিত। জগতের সকল ধর্ম্মেই বিশ্বাসের সহিত যুক্তির সম্পর্ক আছে। উপনিষদ, বাইবেল, কোরান, সব ধর্ম্ম-শাস্ত্রই যুক্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে। যুক্তির আবেদন দ্বারা মানুষের মনকে ধর্ম্মের দিকে আহ্বান করেছে। উপনিষদ বলে "চিন্তা কর, সব কিছুকে বিবেচনা করে দেখ"। বাইবেল, কোরানও সেইভাবে মানুষের যুক্তি-

শক্তিকে আশ্রয় করতে চেয়েছে। গীতাতে দেখি প্রশ্নোত্তরের মধ্যে নানা দিয়ে আলোচিত হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ধর্ম-গ্রন্থে যুক্তির আবেদন আছে; কিন্তু যুক্তিই সর্বস্ব নয়। যুক্তির সঙ্গে ভক্তি ও বিশ্বাসের সমন্বয় চাই। ভক্তিহীন যুক্তি অভিশাপের নামান্তর। ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে আছে ভক্তি যুক্তি হৃদয় ও মনের সমন্বয়। এই ধর্মাদর্শ শ্রীচৈতন্যদেব মানুষকে দিয়েছেন। আজ বিজ্ঞান নূতন নূতন গবেষণা করে পৃথিবী সম্বন্ধে বহু নূতন আবিষ্কার করেছে। কিন্তু এই বিশ্ব প্রকৃতির অন্তরালে যে একটা যৌলিক সত্তা আছে, তার আবিষ্কার বিজ্ঞান করতে পারেনি। এই সত্তা এই রিয়ালিটি অন্ধকারে আলো দেয়, সমস্ত সন্দেহ ও দ্বিধার অবসান ঘটায় এবং বিশ্বাসের ভূমির সুনিশ্চিত লোকে মানুষকে স্থাপন করে। বিজ্ঞান সব সত্তা দিতে পারে না। তা দিতে পারে ভক্তি ও প্রেম।

শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্মের যে আদর্শ প্রচার করেন তাতে বাহ্যিক আচরণ (form) অপেক্ষা অন্তরের প্রেম-ধর্মের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আসল সত্তা সম্বন্ধে কেবল তত্ত্বমূলক বিচার বিশ্লেষণ বড় কথা নয়। Life Eternal-কে জানতে হ'লে, বাস্তব গভীর মর্মস্থলে প্রবেশ করতে হলে এ কেবল বুদ্ধির বিষয় নয়। এ হবে ভক্তের প্রাণের অন্তর অনুভব। মানুষ যদি এই আসল সত্তার পরিচয় পায় তবে তার দেহ মন সবই রূপান্তরিত হয়ে যাবে। সে নূতন মানুষে পরিণত হবে। চৈতন্যদেব সার্বজনীন ধর্মের যে আদর্শ স্থাপন করেছেন তার ভিতর ছিল এমন একটা শক্তি যা একদিন সারা ভারতে প্রেমের বন্যা বইয়ে দিয়েছে।

মানুষ সত্য সন্ধানে সতত ব্যস্ত। বিজ্ঞান দর্শন শিল্প সাহিত্য জ্ঞানের সকল বিভাগই সত্যানুসন্ধান করে, কিন্তু আসল সত্য ও ভাবে পাওয়া যায় না। এমন সত্যও আছে যা জ্ঞানের অতীত, ভাষার অতীত। সুতরাং যে সত্য কথায় বুঝান যায় না সে সত্য কোন পুস্তকে পাওয়া যাবে না। কোন বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্কে তার অবস্থিতি নয়। এ সত্য পাওয়া যাবে মহাপুরুষের সংস্পর্শে, তাঁদের সান্নিধ্যে। এ এমন জিনিস যাকে অন্তরে উপলব্ধি করতে হবে, দেহে মনে প্রাণে প্রতীতি করে তুলতে হবে। আমরা বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরকে বুঝবার চেষ্টা করি। কিন্তু সেই বোধাতীতকে কেমন বুদ্ধি দিয়ে বুঝা যা পাওয়া যায় না। বুদ্ধি-প্রাপ্ত জ্ঞানকে ও ঈশ্বর-বোধকে জীবনের সার সত্যে রূপান্তরিত করতে হবে। হৃদয়ের অনন্ত অন্ধকার দিয়ে তাকে আপনার ক'রে তুলতে হবে। এজন্য চাই অক্লান্ত কৃচ্ছ্র সাধনা। এই যে সাধনার মার্গ তা একদিকে যেমন কঠিন অন্যদিকে তেমনি সহজ। এই সাধনার সহজতম পন্থা হচ্ছে ভক্তি ও প্রেম। ভক্তি ও প্রেম এত গভীর হবে যা পরিশেষে কোন ভেদাভেদ স্বীকার করবে না এবং মানুষ এমন একটা আদর্শ সত্তার পরিচয় পাবে যার মধ্যে একাত্ম হয়ে মিশে যাবে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে ecstasy বা উল্লাস। মানুষ যখন প্রেম ভক্তিতে আনন্দের রসে বিহ্বল হয়ে উঠে তখনই সে পায় সেই ecstasy। এই আবির্ভাব হলে হৃদয় মনে দেহে আসে একটা মত্ততা, সেই মত্ততায় মানুষ তখন নিজেকে বিলীন করে দেয়।

এই যে ecstasy-র কথা বলা হল তার চরম উদাহরণ হচ্ছেন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি ছিলেন প্রকৃত ভক্ত। তাঁর ছিল প্রকৃত বিশ্বাস, প্রকৃত প্রেম তাই তিনি সে যুগের সকল মানুষের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। তাঁর মত ঈশ্বর-প্রেম ক'জনের ছিল? তাঁর ভেদাভেদ-শূন্য মন ক'জন পেয়েছিল? শ্রীচৈতন্যদেব সাধনার সর্বোচ্চ শিখরে উঠে দেখলেন পৃথিবীতে কোন ভেদাভেদ নাই। প্রেমের পরশে তা এক হয়ে গেছে সমাজ থেকে তিনি কৃত্রিম ভেদবুদ্ধি দূর করে দিলেন আজ আমাদের জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের সেই মহান আদর্শের একান্ত প্রয়োজন।

পৃথিবীতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নাই—এই কথাটা আজ সর্বত্র প্রচার করতে হবে। আমরা সকলেই সেই একই মূল ও স্থান থেকে উদ্ভূত হয়েছি। আমরা সমাধিস্থ বিশ্ববিধাতার সন্তান—সেই বিরাট নিত্য সত্তার উল্লাস থেকে এসেছি। তবে কেন থাকবে শত্রু মিত্র ভেদ, কেন থাকবে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব, কেন থাকবে

প্রাদেশিকতার সীমারেখা, জাতীয়তার গণ্ডি? যে লোক শ্রীচৈতন্যের আদর্শ বিশ্বাস করে সে কিনা বিধায় এই সব কৃত্রিম ভেদ রেখা বিলুপ্ত করে দিবে ও দিনকে দিনকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হতে দিবে না: "যুক্ত করহে সবার সনে মুক্ত করহে বন্ধ" কবির এই আহ্বান ধ্বনি শ্রীচৈতন্যেরই মর্মবাণী। আজ যদি কেউ সারা বিশ্বে world state গঠন করতে চায় তবে তাকে প্রেম-ধর্মের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। অন্তরে প্রেম-ভাব জাগ্রত না হলে কেবল অর্থনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা বিশ্ব-প্রেম সার্থক ও সফল হবে না। সেই প্রেম-ধর্মের আদর্শ শ্রীচৈতন্য বিশ্ব-মানবকে দিয়েছেন।

মানব প্রেমের মধ্যেই ঈশ্বর প্রেম। আমার সেই সঙ্গে চাই ঈশ্বর প্রেমের মধ্যে মানব প্রেম। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ঐশ্বরিক ভাব আছে। সেই ভাবটা বিস্মৃত হয়ে গেলে তার মানব-প্রেম ব্যর্থ হয়ে যায়। যে ঈশ্বর ও মানুষকে জানবাসে,—ঈশ্বরের মধ্যে মানুষকে দেখে আবার মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে সেই খাঁটি বৈষ্ণব। ইসলামের ইতিহাসে দেখতে পাই যে ঈশ্বর-প্রেমের আতিশয্যে মহাত্মা মনসুর বলে উঠলেন; "আমিই খোদা", "আমিই ঈশ্বর"। মানুষ ও ঈশ্বর ভেদ-রেখা তাঁর অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল। এই মহান সাধক ছিলেন আসল বৈষ্ণব। শ্রীচৈতন্যদেব যে আদর্শ স্থাপন করেছেন তাও সেই বৈষ্ণবের আদর্শ। অপর পক্ষে যে-ব্যক্তি মানুষে মানুষে ভেদ জ্ঞান করে, সে কেমন ক'রে ঈশ্বর লাভ করবে? সে ব্যক্তি বাহ্যিক নিয়মাবলী যতই পালন করুক না কেন সে আসল বৈষ্ণব হতে পারে না। চৈতন্যদেব এমন একটা আদর্শ দিয়েছেন যা সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। আজ যদি ভেদ-বুদ্ধির দ্বারা শতধা বিভক্ত মানুষ শ্রীচৈতন্যের আদর্শকে বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করে, ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা হৃদয়গত করে, নীতি ও কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করে এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির দ্বারা নিজেদেরকে রূপান্তরিত করে, তবে সত্যই জগতে নূতন যুগ উপস্থিত হবে। বিধা কেটে যাবে। তখন সকল মানুষ একই স্থানে দাঁড়িয়ে অন্তর দিয়ে বিশ্বমানবকে বন্দনা করবে। চৈতন্যদেবের প্রেম-ধর্মের আদর্শ সার্থক ও সফল হোক, এই প্রার্থনা করি।

আমি অমৃতের অধিকারী

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

সভ্যতার ছদ্মবেশে এই যে নিষ্ঠুর বর্বরতা,
সত্য ধর্ম ন্যায় নীতি বিসর্জন দিয়ে একেবারে
বারেবারে নেমে আসে পৃথিবীতে; ঘোর অন্ধকার
চারিদিকে—সব আলো সব গান নিমেষে নিঃশেষ।

মুমূর্ষুর হাহাকার, অসহায় অসংখ্য জীবন
বলি এই হত্যাযজ্ঞে, জনপদ নিশ্চিহ্ন শ্মশান:
প্রেতভূমি সে-শ্মশানে শকুনীর ক্ষুব্ধ কোলাহল,
অশ্রুমুখী ধরিত্রীর বেদনার্ত নিঃশব্দ বিলাপ।

এর শেষ হবে না কি? এ কোন্ সভ্যতা মানুষের?
এ তো শুধু ছদ্মবেশ; বহিরঙ্গ নানা রঙ দিয়ে
সাজানো, ভিতরে সেই আদিম পশুর লীলাভূমি,
বরং আরও ক্রূর, আরো হিংস্র সে যুগের চেয়ে।

এ পশুত্ব নাশ করে জাগাতেই হবে সে মানুষে,
যে বলবে সগৌরবে, আমি অমৃতের অধিকারী।

জ্ঞানবিজ্ঞান-তপস্বী রামেন্দ্রসুন্দর

॥ অধ্যক্ষ শ্রীমিথিলরঞ্জন রায় ॥

বিজ্ঞানে ও সাহিত্য সাধনার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল প্রজ্ঞাবান রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনচর্যায়। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর এ বিষয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং আচার্য জগদীশচন্দ্রের সমধর্মী এবং সমগোত্রীয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "সাহিত্য সরস্বতীর বরপুত্রকে বিজ্ঞানলক্ষ্মী হরণ করে নিয়েছেন"। বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞানের অনুশীলনের প্রথম সূত্রপাত করেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা "পদার্থবিদ্যা", "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয়"। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকে বাংলা সাহিত্যকে বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় সমৃদ্ধ করেছেন। আজ মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা, বাণিজ্য শাস্ত্র, আইন ইত্যাদির পঠন-পাঠনের প্রস্তাব করা হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনায় পূর্ব সূরী রামেন্দ্রসুন্দরের অবদান আমাদিগকে বহুল পরিমাণে সাহায্য করবে

রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা তিন বছরের, আর স্বামী বিবেকানন্দ অপেক্ষা মাত্র এক বছরের বয়োকনিষ্ঠ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্ম হয়েছিল ১৮৬৪ সনে। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে উনিশ শতক, আর বিশেষ করে তার শেষ তাপটা যেন মহাজন্মের এক মাহেন্দ্র যুগ। সেই মাহেন্দ্র যুগেই মনীষী রামেন্দ্রসুন্দরের আবির্ভাব। শুভ্র পূত চরিত্র, জ্ঞান-তপস্যা এবং স্বাধর্মনিষ্ঠ কর্ম-সাধনায় রামেন্দ্রসুন্দর বাংলার নবজাগরণের ঋষিবরগণের অন্যতম। রামেন্দ্রসুন্দরের ত্যাগ-পূত, মনীষা-সমুজ্জ্বল ও কর্ম-দীপ্ত জীবন-কথা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়। আজ একশো বছর পর বাঙালী তার পিতৃপুরুষের ভক্তি-তর্পণের যে আয়োজন করেছে তারই সামান্য উপচার হ'ল এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ।

রামেন্দ্রসুন্দরের ছাত্র-জীবন এক অনবদ্য কৃতিত্বের কাহিনী। গ্রাম্য পাঠশালা হ'তে বাঙ্গী হাইস্কুল এবং তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করেন রামেন্দ্রসুন্দর। মাত্র একবার বাঙ্গী হাইস্কুলের কোন এক শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান ছাড়া অন্য সব পরীক্ষাতেই সসম্মানে প্রথম ভিন্ন অন্য স্থান তিনি অধিকার করেন নি। সসম্মান শাস্ত্রে এম এ পাশ করে তিনি প্রেমচাঁদ, রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করলেন। এই বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের পুরস্কার স্বরূপ দুর্লভ সরকারী চাকুরী পেয়েও কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর স্বেচ্ছায় তা প্রত্যাখ্যান করলেন, গ্রহণ করলেন শিক্ষাব্রত। তৎকালীন রিপন কলেজে দীর্ঘ পঁচিশ বছর কাটালেন অধ্যবসায় ও অধ্যক্ষতায়,—১৮৯২ থেকে ১৯১৭ সন অবধি। সরকারী চাকুরীর সুনিশ্চিত সম্মান ও আর্থিক স্বাচ্ছল্যের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প আয়ের শিক্ষাব্রত গ্রহণের পিছনে ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনাদর্শের অনুপ্রেরণা। রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন অ-বাঙ্গালী বঙ্গজ-গোত্রীয় ঋষিকৌশিক ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত। কিন্তু কায়মনোবাক্যে তিনি ছিলেন বাঙ্গালী। জীবনের লক্ষ্য ছিল কলকাতায় অবস্থান করে বঙ্গ-ভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করা। ১৯০৩ সনে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের পর রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, এবং তাঁর আমলেই কলেজের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির সম্প্রসারণ এবং নানাবিধ উন্নতির জন্য অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রচেষ্টা নিরলস ও নিরবচ্ছিন্ন। শিক্ষাব্রতী হিসাবে রামেন্দ্রসুন্দরের স্বাধীন চিন্তা ছিল উল্লেখ্য। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও গভর্ণিং বডির সভাপতি ছিলেন দেশ-পূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। তাঁরই দুর্বিনীত পুত্র অবনীকরকে দুষ্কৃতির জন্য কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর। তিনি ছিলেন প্রশাসক হিসেবে

কঠোর নিয়মানুবর্তী। আবার শিক্ষকরূপে তিনি ছিলেন সুনিপুণ আচার্য এবং দরদী ছাত্রবন্ধু। এই বিচিত্রমুখী গুণাবলীর অপূর্ব সমাবেশে রামেন্দ্রসুন্দরের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিল মহিমাময় ও মাধুর্যে অনুপম। কঠোরতা ও কোমলতার এমন সুন্দর সমন্বয় খুব সচরাচর দেখা যায় না।

বিজ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমেই রামেন্দ্রসুন্দরের তত্ত্বপিপাসু জীবনচর্যার সূত্রপাত। তিনি ছিলেন একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং সাহিত্যসেবী। তাঁর আজীবন সাহিত্যানুরাগের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, বান্ধব, নবজীবন, ভারতী প্রভৃতি তৎকালীন পত্র পত্রিকার পুরানো পাতায়। এই সকল পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত ত্রিবেদী মহাশয়ের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ ও আলোচনাগুলি যেমন সরস ও প্রাঞ্জল, তেমনি তথ্যনিষ্ঠ। আজকাল আমাদের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে বাংলায় বিজ্ঞানের যে সব বই প্রচলিত। এগুলি হয় কলেজ নয় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকগণের রচনা। ব্যবসায়ীর মতলব নিয়ে এরা বই লেখেন। ফলে বইগুলির বেশীর ভাগই হয় নীরস ও দুর্বোধ্য ইংরেজীর আক্ষরিক অনুবাদ ছাড়া কিছু নয়। বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় যে কয়জন লেখক মৌলিকতার ও সরসতার পরিচয় দিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁদের অন্যতম এবং অগ্রগণ্য। ক্রমশঃ বিজ্ঞান থেকে রামেন্দ্রসুন্দরের ঝোঁক পড়ল দর্শনের দিকে। পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্র ছেড়ে তিনি ঝুঁকে পড়লেন প্লেটোর (Plato) অধিবিদ্যার (metaphysics) দিকে অর্থাৎ ব্যবহারিক বিজ্ঞান থেকে শাশ্বত, পারমার্থিক সত্যের দিকে। বিজ্ঞান-চর্চাকে তিনি ভোগসুখ অর্জনের যন্ত্র হিসাবেই দেখেন নি। বিজ্ঞানকে তিনি মহত্তর সত্যোপলব্ধির সোপান রূপে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের সততা ও সদাজাগ্রত মননশীলতায় বিজ্ঞান ও দর্শনের পারস্পরিক সম্বন্ধটি অল্পেই প্রকটিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক উইল ডুরাণ্টের (Will Durant) কয়েকটি কথা আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

'Philosophy is in the flight to-day before the Sciences, one after another of which have run away from her into the productive world, until she is left chill and alone, like a forsaken mother with the vitals gone from her and almost all her cupboards empty.

But every science starts in philosophy and ends in art. Philosophy is the outer trench in the siege of truth, science is the captured territory."

ব্যবহারিক বিজ্ঞান হতে দর্শন এবং অধিবিদ্যার দিকে রামেন্দ্রসুন্দরের ঝোঁকের একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় উইল ডুরাণ্টের উপরোদ্ধৃত উক্তিতে।

কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন-সাধনা এবং কর্মকৃতি কেবলমাত্র দর্শন বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক অনুশীলনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর জীবনের প্রধানতম এবং সর্বাধিক গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি হ'ল বাংলা সাহিত্যের সেবা। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থই বলেছিলেন, 'রামেন্দ্র দেশ-হিতের জন্য তিনটি অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন —একটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন এবং সাহিত্য পরিষদের নিজস্ব গৃহ'। ১৮৯৪ সনে সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হ'তে আমরণ তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত—প্রথমে সম্পাদক, পরে সভাপতি। সাহিত্য পরিষদের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষণটি উল্লেখযোগ্য :— "বাংলা সাহিত্যই বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালীর একমাত্র গৌরবের বস্তু। এই পতিত জাতির যদি উদ্ধার সাধন হয় তাহা সাহিত্যের বলেই হইবে, একথা ধ্রুব সত্য।"

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর কার্য বিবরণীতে রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছিলেন :—'জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য জাতীয় ঐক্যবন্ধন রক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়, এই ঐক্য বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য বর্ষে বর্ষে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন নগরে সাহিত্য সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্যসেবীদের মিলন সাধন ও

বাঙ্গালার প্রাদেশিক ভাষা সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস ও বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা চলিতে পারে"।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের গভীর অনুরাগ প্রায় ভাষা ও সহমের সম পর্যায় ভুক্ত। তৎকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দান ছিল নিয়ম বিরুদ্ধ। এই আইনের প্রতিবাদে তেজস্বী রামেন্দ্রসুন্দর বারবার দু'বার বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে ছিলেন। শেষটায় উপাচার্য দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর হস্তক্ষেপে সে বিধি নিষেধ শিথিলীকৃত হওয়ায় রামেন্দ্রসুন্দরই প্রথম "বৈদিক যজ্ঞ" বিষয়ে বাংলা ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দান করেন। পরে দেশ-বরেণ্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সে নিয়ম পরিবর্তিত হয়, এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণ দান করেন বাংলায়।

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।"—এ জগতে জ্ঞানের মত পবিত্র জিনিষ আর নাই। গীতায় শ্রীভগবান আবার বলছেন :—

"কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোক-সংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন কর্তুমর্হসি॥

জনক প্রভৃতি মহাপুরুষগণ কর্মসাধন দ্বারাই জ্ঞান লাভ করেছিলেন। লোকশিক্ষার জন্য তোমার (অর্জুনের) কাজ করা উচিত।

গীতায় এ উপদেশ যেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর জীবন ও চরিত্র ছিল একাধারে জ্ঞান ও কর্মের মহৎ সমাবেশ। এই অনন্য পুরুষ বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ সেবাব্রতের যে সমুজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা আমাদের এক অমূল্য ও অক্ষয় জাতীয় সম্পদ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই মনীষীর প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন তার প্রতিটি কথায় ভিতর দিয়ে মানুষ রামেন্দ্রসুন্দরের স্বরূপটি যথার্থ ফুটে উঠে "সবজন প্রিয় তুমি মাধুর্য ধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর"।

"সবার উপরে মানুষ সত্য। হিন্দু তখনই সত্যকার হিন্দু, যখন সে 'মানুষ'; মুসলমানও তখনই সত্যিকার মুসলমান যখন সে মানুষ। মানুষ একান্ত হিন্দুরও 'উপর', একান্ত মুসলমানেরও 'উপর'। হিন্দু যখন সঙ্কীর্ণ হিন্দু-উপাধি ডিঙ্গাইয়া মানুষের স্তরে আসীন হইবে, তখনই সে সত্য বাস্তব হিন্দু; মুসলমানও যখন সঙ্কীর্ণ মুসলমান-উপাধি পরিত্যাগ করিয়া মানুষের স্তরে উন্নীত হইবে, তখনই সে সত্য বাস্তব মুসলমান। দুই দুই থাকিয়া, দুই-এর বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া এবং তিন তিন থাকিয়া, তিন-এর বিশেষত্ব অটুট রাখিয়াও যেমন ছয়-এর মাঝে এক হইতে পারে, ঠিক তেমনি মানুষের মাঝেই হিন্দু-মুসলমান স্ব স্ব পারিবারিক সামাজিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া এক হইতে পারে। হিন্দু-মুসলমান যদি এই কৌশলের খোঁজ না রাখে, বুকে বুক মিলাইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য প্রাণপণ না করে, তবে হিন্দু মানুষও নয়, হিন্দুও নয়, মুসলমান মানুষও নয়, মুসলমানও নয়। সহজ মানুষকে জানিয়া, সহজ মানুষ বনিয়া গিয়া হিন্দু-মুসলমান নিজকে জানো, আত্মস্থ হও। * * মানুষ-রাজ প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের ধ্যানের বস্তু—হিন্দু-রাজও নয়, মুসলমান-রাজও নয়। * * *"

রবীন্দ্র-ধর্মচিন্তার একদিক

॥ ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ॥

ধর্মের সম্পর্ক ব্যতীত জীবনের কোন মহৎ কার্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে না, জীবনে যাহারা মহতী সাধনায় অনুযুক্ত হ'ন, প্রত্যক্ষভাবেই হোক, কিংবা পরোক্ষ ভাবেই হোক, ধর্ম তাহারও লক্ষ্য থাকে। অবশ্য ধর্ম কথাটি এখানে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হইতেছে। ইহার মধ্যে আনুষ্ঠানিক ধর্ম ব্যতীতও ধর্মের একটি স্বকীয় অনুভূতি প্রত্যেকের মনেই সক্রিয় থাকে, তাহাই তাহার কর্মের মধ্যে শক্তি দেয়, চিন্তার মধ্যে শৃঙ্খলা আনে, তাহাই কর্মীকে কর্মে সাফল্য এবং সাধককে সাধনায় সিদ্ধি দিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যেও এমনই একটি ধর্মবোধ সক্রিয় ছিল, তাহা কদাচ আনুষ্ঠানিক ধর্মের আড়ম্বরের মধ্যে প্রত্যক্ষগোচর ছিল না এ কথা সত্য, তাহা তাঁহার অন্তরের নিজস্ব অনুভূতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহার সঙ্গে তাঁহার সমগ্র কবি-জীবনের সিদ্ধি জড়িত হইয়া আছে, সুতরাং তাহা যথাযথ উপলব্ধি করিতে না পারিলে তাঁহার কবি-জীবনের রহস্যও উপলব্ধি করা যাইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের প্রভাবধারা পরিপুষ্ট হইয়া ছিলেন, এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এ কথা সত্য তাঁহার পারিবারিক জীবনের আনুষ্ঠানিক ধর্ম উপনিষদের উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঔপনিষদিক আনুষ্ঠানিক কোন ধর্মাচরণের সঙ্গে তাঁহার আন্তরিক কোন যোগ ছিল বলিয়া অনুভব করা যায় না। আনুষ্ঠানিক ধর্মই সাধারণ মানুষ পালন করিয়া থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রচিন্তায় মানুষের একটি বিশেষ সত্তা এবং তাহার মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়া কোন আনুষ্ঠানিক ধর্মের স্বীকৃতি যেমন তিনি তাঁহার কাব্যেও স্থান দেন নাই, তেমনই জীবনেও স্বীকার করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের জীবন এবং তাঁহার কাব্যে কোনও পার্থক্য ছিল না। জীবনে যাহা অনুভব করিতেন, তাহাই পালন করিতেন এবং কাব্যেও তাহাই প্রকাশ করিতেন। সুতরাং কাব্যের মধ্যেই তাঁহার ধর্মচিন্তার অভিব্যক্তি দেখা যায়, জীবনে তাহার স্বতন্ত্র কোন প্রকাশ অনুভব করা যায় না।

এ কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন, 'খেয়া' কাব্য রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ধর্মচিন্তার বিকাশ দেখা যায় নাই। এখানে ধর্ম শব্দটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে, অর্থাৎ এখানে ধর্ম বলিতে ঈশ্বর-বোধ। এ কথা সত্য 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থ রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের মনে ঈশ্বর-বোধের জন্ম হয় নাই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ কথা বলা যায় না যে 'খেয়া' রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ধর্মবোধের জন্ম হয় নাই মানবতাবোধও একটি ধর্মবোধ বলিয়াই স্বীকৃত হইতে পারে। যদি তাহাই হয়, তবে 'খেয়া' রচনার বহুপূর্বে এমন কি, 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচনার যুগ হইতেই যে রবীন্দ্রমানসে মানবতা-বোধের জন্ম হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। এখন মানবতাবোধই রবীন্দ্রমানসে ঈশ্বরবোধে রূপান্তরিত হইয়াছে কি না তাহাও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

'চিত্রা' কাব্য রচনাকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মানবতাবোধ প্রবল পরিলক্ষিত হয়, ইহার পূর্বেই 'সোনার তরী' রচনার যুগেই তাঁহার মধ্যে এক অলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাসের কথা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। 'সোনার তরী' কবিতার মধ্যে যাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তিনি কে? কেহ বলিয়াছেন, তিনি জীবন-দেবতা। এই জীবন-দেবতার অনুভূতিটি একটু অস্পষ্ট। কবি বলতে চাহিয়াছেন, জীবন-দেবতা তাঁহার জীবনের নিয়ামক। বিশ্বজীবনের সঙ্গে তাঁহার জীবন-

দেবতার কোন সম্পর্ক নাই, তাঁহার নিজের জীবন-চেতনার সঙ্গেই তাঁহার সম্পর্ক। কবি নিজে অন্তরের গভীর হইতে একটি অদৃশ্য শক্তি তাঁহার জীবনের সকল কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এই শক্তিটিকেই তিনি তাঁহার নিজস্ব জীবন-দেবতা বলিতে চাহিতেছেন। সাধারণভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার এই জীবন-দেবতার পার্থক্য এই যে, ঈশ্বর সকলের, জীবন-দেবতা তাঁহার নিজস্ব, তাঁহার অন্তর্যামী। তবে তিনি নিজের জন্যই কবির সাধনাকে সফল করিয়া রাখিতেছেন। সুতরাং আমরা ঈশ্বর বলিতে যাহা বুঝি তাহা তিনি নহেন, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে যে তাঁহার পার্থক্যটি কোথায় তাহাও সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা-বোধের সঙ্গে তাঁহার মানবতাবোধের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক অনুভব করা যায় না, একটি অপ্রত্যক্ষ স্বকীয় অনুভূতির উপলব্ধি, আর একটি প্রত্যক্ষ জীবন হইতে প্রেরণা-লব্ধ।

'সোনার তরী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের এই প্রকার এক অলৌকিক শক্তির উপলব্ধির নিদর্শন আরও কয়েক স্থানে পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যায়, প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বর-বোধ না হইলেও সংস্কারমুক্ত মানুষের মনে ঈশ্বরচিন্তা যে ভাবে ক্রমে অস্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হয়, 'সোনার তরীতে' রবীন্দ্রমানসে সেই ভাবেই ঈশ্বরচিন্তার প্রথম বিশ্বাস দেখা দিয়াছিল। যাহাকে তিনি জীবন-দেবতা বলিয়াছেন, তাঁহার যে গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরেরই গুণ, আত্মকেন্দ্রিক চেতনায় রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই তাঁহার জীবন-দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। ঈশ্বর সকলের, কিন্তু একান্ত আত্ম-ভাব-প্রধান কবি সর্বদাই নিজেকে সকলের নিকট হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া ভাবিতেন, সেইজন্য তাঁহার এক স্বতন্ত্র নামকরণ করিয়াছেন, সব জনের সঙ্গে একাকার হইয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করেন নাই এই মাত্র।

জীবন-দেবতারূপী ঈশ্বর চিন্তার আবির্ভাবের পূর্বে রবীন্দ্রমানসে মানবিকতাবোধ প্রবল প্রভাব স্থাপন করিয়াছিল। কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁহার 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' হইতে আরম্ভ করিয়া 'চিত্রা' রচনা পর্যন্ত এবং নাটকের ক্ষেত্রে 'বাল্মীকি প্রতিভা' হইতে 'মালিনী' রচনা পর্যন্ত সাধারণ ভাবে তাঁহার মধ্যে মানবিকতা-বোধ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। মানবিকতা বোধের সঙ্গে কোন অলৌকিক অনুভূতির সম্পর্ক নাই, সুতরাং ইহার সঙ্গে জীবন-দেবতাই হউক কিংবা ঈশ্বর-বোধই হউক কাহারও কোন সম্পর্ক নাই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মানবিকতাবোধ যে ঈশ্বর-বোধে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহাও নহে, তবে এ কথা সত্য, যে যুগে তাঁহার মধ্যে ঈশ্বর-বোধ প্রবলতর হইয়াছে, সেই যুগে তাঁহার মধ্যে মানবিকতা বোধের চেতনা অনেকখানি ম্লান হইয়াছে। তবে একথা সত্য তাঁহার জীবনের কোন পর্বেই তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায় নাই। একটি কথা এখানে স্বীকার করিতেই হয় যে, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের কাব্যে সাধনায় জীবন-দেবতাবোধ এবং ঈশ্বর-বোধ কখনও স্পষ্ট এবং কখনও অস্পষ্ট, এমন কি কখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার মধ্যে মানবিকতা বোধ কোন মুহূর্তেই সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায় নাই। মানবিকতা-বোধ তাঁহার মধ্যে কোন ধর্মের প্রেরণায় সৃষ্ট হয় নাই, এ কথা সত্য, ইহা তাঁহার কোন ধর্ম-সাধনের অন্তর্গত ছিল না, ইহা তাঁহার কবি-মানসের সহজাত প্রেরণায়ই সৃষ্ট ছিল। কিন্তু জীবন-দেবতা বোধ এবং ঈশ্বর-বোধ জীবনের বিশেষ কোন কোন পর্বেই তিনি অনুভব করিয়াছেন মাত্র, সামগ্রিক ভাবে তাঁহার সাধনার সঙ্গে ইহাদের কেহই প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত হইয়া থাকিতে পারে নাই।

আধ্যাত্মিক ধর্মের প্রেরণাই আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, কিন্তু প্রতিভাবান পুরুষের অন্তরের মধ্যে গোপনে যে এক অধ্যাত্মশক্তি তাহার সকল কর্মের সিদ্ধি দিয়া থাকে, তাহার সম্পর্কে আমরা বাহির হইতে সন্ধান থাকিতে পারি না। সমস্ত জীবনের কর্ম এবং ধ্যানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে সিদ্ধি দেখা দিয়াছে, তাহার মূলে জীবনের মধ্যে একটি সুগভীর শৃঙ্খলা তিনি অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাও ধর্মের ভারতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী তাঁহার জীবনেরই ধর্ম বলিতে পারি। যদিও পাশ্চাত্য

সংজ্ঞা অনুযায়ী ইহা ধর্ম নহে। ধর্মের পাশ্চাত্ত্য সংজ্ঞা অনুযায়ী অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসের নাম ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা চেতনায় এবং ঈশ্বর-বোধে তাঁহার অলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাসের পরিচয় মূর্ত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায় তাঁহার 'গীতাঞ্জলি' কাব্যে এবং 'রাজা' নাটকে। এই দুইখানি রচনাই ইহার জীবনের একই পর্বে সমসাময়িক কালেই প্রকাশিত হয়, ইহাদের একটি অন্য একটির পরিপূরক। ইহাদের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-বোধের সম্যক বিকাশ দেখা যায়। তবে গীতাঞ্জলিতে ভক্তির ভাব প্রবল, রাজা-তে প্রেমের ভাব প্রবল। গীতাঞ্জলিতে ভগবানের নিকট আত্মনিবেদনের বিনিময়ে নিত্য বোধের আত্মিক আনন্দের বিকাশ দেখা যায়, রাজা নাটকে শ্রীরাধিকার মত প্রণয়িনী রূপে আত্মনিবেদনের মধ্যে তৃপ্তি দেখা যায়। 'রাজা'র ভগবান রাজা অর্থাৎ তাঁহার মধ্যে ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য উভয় রূপেরই সংমিশ্রণ দেখা যায়, গীতাঞ্জলিতেও ভগবানের ঐশ্বর্যরূপ যে অনুপস্থিত তাহা বলিতে পারা যায় না তবে 'রাজা'র মত তাহা এত প্রবল নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের কেবল মাত্র মাধুর্যরূপ ধ্যান করিয়াই তৃপ্তি পান নাই। তাঁহার মধ্যে ঐশ্বর্যরূপেরও তিনি কল্পনা করিয়াছেন। জীবের প্রতি তাঁহার যে প্রেমই একমাত্র সত্য তাহা নহে, ভ্রান্ত জীবকে তিনি কঠিন দণ্ড দিয়া তাহার ভ্রান্তি দূর করেন, সেখানে তিনি নিষ্ঠুর এবং হৃদয়হীন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রাজা পরিকল্পনার মধ্যে একদিকে তাঁহার যেমন প্রেমিক রূপ অনুভব করিয়াছেন, তেমনই আর একদিক দিয়া তাঁহার নিষ্ঠুরতারও একটি দিক লক্ষ্য করিয়াছেন। অবিমিশ্র প্রেমের অরূপণ দাক্ষিণ্যেই তাঁহার আশ্রিত জীব জীবনে চরিতার্থতা লাভ করিতে পারেনা; তাহার ভক্তি এবং বিশ্বাসে কোন শৈথিল্য দেখা দিলে তাহাকে নিষ্ঠুর হাতে দণ্ড দিয়া নিজের পথে আনিয়া থাকেন। সেই জন্যই ঈশ্বরকে সেখানে তিনি রাজা বলিয়াছেন, যাহার নিষ্ঠুরতা এবং করুণা উভয়ের সংমিশ্রণেই রাজা-চরিত্রের সৃষ্টি। প্রয়োজনে তাহাকে কঠিন হস্তে দণ্ড দিবারও আবশ্যক হয়; কিন্তু দণ্ডলাভের মধ্য দিয়েই ভক্ত সত্য চেতনায় জাগ্রত হইয়া উঠে।

'গীতাঞ্জলি' এবং 'রাজা' রচনার পর্বে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে ঈশ্বর-চেতনার উন্মেষ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনে দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিল না। পুনরায় মানবতাবোধ জগৎ এবং প্রকৃতি প্রেমের মধ্যে তাহা বিলীন হইয়া গেল।

পরস্পরের রক্ত স্রোত বহাইয়া, সত্য মানুষের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া হিন্দু-মুসলমান আজ অমানুষের পদবীতে নামিয়া যাইতেছে। আজ বিশ্বও হিন্দু মুসলমানকে স্ব স্বরূপে ফিরাইয়া আনিবার জন্য মহাত্মাজী দৃঢ় সংকল্প। হিন্দু মানুষ হউক, মুসলমান মানুষ হউক; মানুষের মাঝে হিন্দু-মুসলমান গলিয়া গিয়া জমাট বাঁধিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হউক, স্বরাজ লাভ করুক—ইহাই কংগ্রেসের স্বপ্ন, মহাত্মাজীর স্বপ্ন। * * * মানুষ হওয়াই হিন্দু-মুসলমানের স্বধর্ম। হিন্দু-মুসলমান কি স্বধর্ম মানুষ-ধর্ম বিসর্জন দিয়া পরধর্ম ঐ পশুধর্মকে অঙ্গীকার করিবে? কিছুতেই নয়। † † † † † † মানুষই হিন্দুর আত্মা, মানুষই মুসলমানের আত্মা।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

শিশুর দোলা দোলায় যে হাত
অনেক শক্তি ধরে,
সে যে বিশ্ব শাসন করে

॥ শ্রীঅনিলা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

আমাদের দেশে শুধু নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বহুবিধ দার্শনিকের মধ্য দিয়ে বহু লোকেই নিজের ও অন্যের দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করে থাকেন। তাঁদের কর্ম্মতালিকার মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয় গৃহস্থদের সর্ব্বদা সচেতন থাকতে সাহায্য করে যাওয়া যে শুধু সম্ভব তাই নয় সহজও বটে। সে বিষয়টি হচ্ছে "শিশু পালন"—অর্থাৎ শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সকলকে সচেতন রাখা। শিশু পালন সম্বন্ধে প্রায় সকলেই কিছু কিছু বা অনেকটাই জানেন। কিন্তু জানা আর সেইমত করার মধ্যে যে ব্যবধান থেকে যায় সেই ফাঁকেই অনেক সময় ক্ষতিকর জিনিসের প্রবেশ-পথ হয়ে সংসারের দেশের ও পৃথিবীর পর্যন্ত বিপর্যয়ের পথ সৃষ্টি করে। এজন্য "শিশু পালন" সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাটাই যথেষ্ট নয়, যাতে সেই জ্ঞান নিত্য প্রতি কাজে আমরা প্রত্যেকে ব্যবহার করি তারই নিরন্তর চেষ্টার প্রয়োজন। যদি আমরা সুস্থ দায়িত্বশীল নাগরিক-সমৃদ্ধ সমাজে বাস করতে চাই তাহলে আমাদের প্রত্যেকের নিজেদের মধ্যকার জীবশক্তি (animality) ও ধীশক্তি (rationality) -কে আলাদা করে চিনতে হবে, আর যাতে এই ধীশক্তি সর্ব্বদা জাগ্রত থেকে আমাদের কল্যাণ-পথে চালিত হতে সাহায্য করতে পারে—সেই ভাবেই আমাদের ব্যবহার ও আশা আকাঙ্ক্ষার 'রূপদান' করতে হবে। যে গৃহে, যে সমাজে এই আবহাওয়া বিদ্যমান সেই গৃহে এবং সেই সমাজেই আদর্শ শিশুপালন সহজ হয়।

জন্মের সময় যতই অপরিণত হোক শিশুর শরীর সাধারণ ভাবে গঠিত থাকে কিন্তু তার মনের গঠিত হবার সব উপাদান থাকলেও মন তখনও কিছুই গঠিত হয় নি। তার যে সে সময় কথা বলা বা বোঝবার শক্তি থাকেনা সে তো সকলেই জানে। ব্যবহারের বলতে তার কান্না আর ঘুমোনো ছাড়া কি-ই বা আছে? তবু দেখা যায় খুবই অল্প সময়ের মধ্যে তার বা তার ঐ স্বল্প ব্যবহারের মধ্যেই কিছু কিছু বিশেষত্ব উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেন এবং পরস্পরের মধ্যে আনন্দ ও বেদনার আদান প্রদানও যে চলছে সেটাও উপলব্ধি করেন। ক্রমে ক্রমে আসে পাশের অন্য সবলেও লক্ষ্য করেন, উপলব্ধিও করেন। এই ভাবে সকলেই অনুভব করেন যে শিশুর মন গঠিত হোচ্ছে এবং তার ব্যবহারে তার কিছু কিছু প্রকাশ দেখতে পান। গৃহস্থের সংসারের আবহাওয়া (home environment) অনুযায়ীই এই ব্যবহার প্রকাশ পেয়ে থাকে। ক্রমে পাড়া প্রতিবেশী, স্কুল কলেজ, কর্মস্থল প্রভৃতি সব জায়গারই আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে এই মনোবৃত্তির বিকাশ ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তার প্রকাশের কি রূপ হবে। কাজেই আমাদের ঘরের এবং বাইরের শিশুদের ব্যবহারের নিন্দনীয়তা ও প্রশংসনীয়তার মধ্যে আমাদের প্রত্যেকেরই যে কিছু অবদান আছে সেটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এইখানেই মুস্কিল, আমরা সবাই ভাবছি যে আর সবাই ঠিক ঠিক ব্যবহার তো করবেই আমি একটু অন্যরকম করলাম বই বা। এ সেই দুধের পুকুরের গল্পের মত। সেই যে রাজা বলেছিলেন যে রাজ্যের প্রত্যেকটী লোক সেই রাতে এক ঘটি করে দুধ তাঁর সদ্য মাটি কাটা পুকুরে ফেলবে যাতে সকালে তিনি দেখেন যে তাঁর দুধের

পুকুর হয়েছে। আর দশজনে উঠে তাকে ধরতে হয়েছিল পুকুর জলেই ভর্তি হয়েছে কারণ প্রত্যেকেই ভেবেছে যে আর আর সকলে তো দুধই দেবে শুধু সে-ই একটু জল দিলে কিছু ক্ষতি হবে না। আমাদের আজকের অনেক সমস্যার সঙ্গে মিল আছে এই গল্পটির।

আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার। প্রথম থেকেই, মায়ের ব্যবহারের উপর শিশুর মনের গঠনের প্রথম ভিত্তি স্থাপন নির্ভর করে। সেজন্য মায়ের শরীর ও মনের অবস্থা উপেক্ষা করা দারুণ সামাজিক অপরাধ বলে গণ্য হওয়া উচিত। আমরা আজকাল এ্যাডজাস্টমেন্ট (এবং তারই standard বাড়ানোর চেষ্টায়) এতোই অভিভূত আছি যে আমাদের নিজ নিজ মনের অবস্থা সম্বন্ধেই সচেতন হোতে পারছি না—তার উপর মায়ের মন বুঝে চলা একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমাদের দেশে অন্য দেশের তুলনায় কেন্দ্রেই মায়েদের এই রূপই শিক্ষা থাকা আমরা আশা করে থাকি যে সংসারে তাকেই সব সময় অন্যের মন বুঝে চলতে হবে এবং নিজের জন্য সে কিছুই চাইবে না কিন্তু এই না চাওয়ার সীমা ততটাই তো হওয়া দরকার যাতে অন্যের (বিশেষ করে শিশুর) মন বুঝে চলতে পারার ক্ষমতা মায়ের মত অন্ততঃ নিজের নিজত্বটা বজায় থাকে; তার সেই নিজত্বটুকুই সারাক্ষণ সংসারে অন্যের পায়ে মাড়িয়ে অন্যদের সুখ সুবিধে রেখে কল্যাণের পথে চলতে সাহায্য করতে পারে এবং অকল্যাণের পথ থেকে সরিয়ে আনতে পারার মতো অন্ততঃ শক্তিটুকু তার বজায় থাকে। নইলে সংসারের একজন অকল্যাণের পথে চললে যে বিষ-চক্র সুরু হয় সেটা গোটা সংসারের ধ্বংসও আনতে পারে। এই বিষ-চক্রকে আমরা (এবং মায়েরা নিজেরাও) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সমর্থন করে থাকি নিঃস্বার্থতা ও গৃহে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার নাম দিয়ে। আসলে অনেক সময় এটা এক রকম নকল নিঃস্বার্থতা, সেটার সত্য রূপ হচ্ছে সৎ সাহস ও ন্যায় নিষ্ঠার অভাব। অনেক মায়েরা জানেনই না যে শিশুর সংসারের সমাজের ও দেশের কল্যাণ তাঁদের উপর কতটা নির্ভর করে।

এই অবস্থাকে বিশ্লেষণ করছি বাস্তব সংসারে এবং সমাজের মধ্যে যদি দেশীয় ভাগ লোকের কাছেই মায়েদের এই প্রয়োজনের অতিত্ব অস্বীকার্য্য হয় অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে আমরা ধীশক্তি বলিয়ে কেলি তবে সুস্থ দায়িত্বশীল নাগরিক-সমৃদ্ধ সমাজে বাস করার আশা আমাদের সফল হবার নয়। এমন প্রশ্ন হতে পারে ধীশক্তি বলতে আমি কি মনে করছি? আমার উত্তর এই যে আমি উপনিষদে যে "প্রেয়"র কথা বলা হোয়েছে সেই "প্রেয়" পাবার ইচ্ছাকেই ধীশক্তি (rationality) বলছি। এই প্রেয় শুধু যে যেনে চলে তার নিজেরই নয়, তার ধারে কাছের সমাজের এবং দেশেরও সে প্রেয় বিধান করে সুস্থ দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে নিজে সুখী হয়, অন্যকে সুখী করে এবং পরবর্তী যুগেরও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকার সোপান তৈরী করে দিয়ে যায়।

আমাদের শাস্ত্রে সুন্দর উপমা আছে রথ ও রথের অশ্ব, লাগাম, সারথি ও আরোহীর মধ্য দিয়ে। অশ্বগুলি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সুখ (চলার শক্তি—instinct), সারথি হচ্ছে জ্ঞান (ego-strength) ভালোমন্দ বিচার ক্ষমতা, লাগামকে সারথির ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে তুলনা করা যায়, এই সব ছাড়াও জীবনের চলার যে একটি উদ্দেশ্য থাকা দরকার সেটা ঐ আরোহীই নির্দ্দেশ করে। সারথিকে অশ্বের চলার শক্তি ও স্বভাব জানতে হয়, পথের (realities) বিষয় জানতে হয় তার ইচ্ছানুযায়ী যাতে অশ্ব চলে তার শিক্ষা নিজেকে নিতে এবং অশ্বকে শিক্ষা দিতে হয় তবেই সারথি আরোহীর (super-ego) নির্দ্দেশ অনুযায়ী ঠিকানায় আরোহীকে পৌঁছাতে পারে। তাই নয় কি? আমাদের মনুষ্য সমাজও আনন্দময় এবং কল্যাণকর হোতে হোলে শৈশব অবস্থা থেকেই আমাদের শিশুকে তার জীবশক্তি ঠিক ভাবে চালনা করতে শেখাতে হবে, তার ধীশক্তি জাগ্রত রাখার অভ্যাসকে আয়ত্ত করতে সাহায্য করতে হবে। জীবশক্তি বাদ দিতে গেলে অস্তিত্বই থাকে না। তাই বাদ না দিয়ে জ্ঞানের ধীশক্তি লাগামে ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তার ব্যবহার করতে হয়। এই জ্ঞানই বলে দেয় যে

আমার যা কিছু করতে ভাল লাগে (প্রেয়), ভালো লাগে বলেই যে সেটা আমার করণীয় তা নয়। যদি এটা আমার করা উচিত হয় অর্থাৎ যাতে আরও অনেকের ভালো হয় এবং সেই অনেকের মধ্যেই আমিও একজন থাকি, তবেই এটা আমার করণীয়। এই জ্ঞানের কথা দেখা বা বলায় কিছু ফল হয় না। মানব-মন (বিশেষতঃ শিশুমন) অনুকরণশীল ; তাই নিজে পালনের দ্বারাই শিশুমনে এই শ্রেয় বেছে নেবার প্রবণতা জাগ্রত ও সুদৃঢ় করা সম্ভব। আগেকার দিনে ধর্মপালনের মধ্য দিয়েই শ্রেয় লাভের পথ নির্দেশ হোত। কিন্তু সকল ধর্মেরই সারকথা যখন এই শ্রেয় লাভের পথে সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা—তখন ধর্ম নিয়ে অথথা বাদানুবাদ না করে এই শ্রেয়ো ধর্মের মধ্যেই পৃথিবীতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব বলেই মনে হয়। এই শ্রেয় লাভের নির্দেশটী জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই প্রয়োজন।

এ দেশের অতি সাধারণ একজন মা হিসাবে আমার এই বক্তব্য যে, আমাদের কাছে সংসার ও সমাজ যে কাজের অর্থাৎ শিশুপালনের প্রাথমিক পরিচর্য্যা সুষ্ঠুভাবে করার আশা রাখে—আমাদের প্রচেষ্টার ভেবে দেখা দরকার যে সেটা আমরা কিভাবে করে উঠতে পারছি কিনা—যদি না পারি তবে কেন পারি না সেটা ভেবে দেখা, বুঝে প্রকাশ করা আর যাতে পারি সেই ব্যবস্থা করতে দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হওয়াই আজকের দিনে নারী শক্তির সার্থকতা।

স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকল বয়সের সকলেই আমরা শান্তিপূর্ণ সমাজে আনন্দের মধ্যে বাঁচতে চাই। সে সমাজ ও পরিবেশ গঠনের দায়িত্বও তেমনই স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকল বয়সের সকলেরই। আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজেদের এই শ্রেয় লাভের পথটি কি চেষ্টা করে বেছে নিতে পারবো না? পারবো বলেই তো আশা রাখি এবং তা হলেই আদর্শ শিশুপালনের পরিবেশ সৃষ্টি হবে যে শিশুর মন 'প্রেয় ও শ্রেয়' চিনে নিতে এবং শ্রেয়কেই নিজের চলার পথ বলে বেছে নিতে পারবে।

একান্ত নর কিংবা একান্ত নারায়ণ কেহই বর্তমান যুগীয় বিশ্ব-সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। আকাশের নারায়ণ এবং মাটির নর 'সযুজা সখায়া' সহযোগী সখা না হইলে যে বিশ্ব-সমস্যা অসমাহিত অবস্থায়ই থাকিয়া যাইবে, তাহা আজ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান যুগ আকাশ-মাটির, আদর্শ বাস্তবের সমন্বয়ের যুগ। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—ইহা যেমন সত্যের এক দিক, আবার 'নর সমূহের অয়ন' রূপ আরও একটি মহাশক্তির অস্তিত্ব আছে—ইহাও তেমনি তুল্য মূল্য অপর দিক। কোন্ কৌশলে, কোন্ 'psychological line of development' অনুসরণ করিলে নর-নারায়ণ এক হইতে পারেন, দুই এক তনু হইয়া বিশ্বসঙ্ঘ রচনা করিতে পারেন, তাহারই খোঁজ দিবার জন্য নরনারায়ণ আশ্রমের সব কিছু প্রচেষ্টা। উজ্জ্বলভারত তাহারই বাহন। উজ্জ্বলভারত নর-নারায়ণের সমন্বিত দর্শন দিয়া চলিয়াছে এবং তাহারই ছাঁচে সমাজ রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার উপযোগী কৌশলের আলোচনা করিয়া যাইতেছে। বিশ্বজীবনে নর-নারায়ণদেব জয়যুক্ত হউন।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ, অগ্রহায়ণ ১৩৬০

সেকাল আর একাল

॥ শ্রীনারায়ণ চৌধুরী ॥

স্বাধীনতা লাভের পর কুড়ি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই কুড়ি বছরে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দ ছাড়া আনন্দের ভাগে আর বিশেষ কিছু যে লাভ হয়েছে তা তো মনে হয় না। চতুর্দিকে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, জীবনের নৈশ্চিন্তা ও নিরাপত্তার অভাব, আইন-অমান্য প্রবণতা, দুর্নীতি, নানা উপদ্রব। তার সঙ্গে সর্বব্যাপী খাদ্যাভাব যুক্ত হয়ে অবস্থাটিকে নিতান্ত অসহনীয় করে তুলেছে। এমন দুর্বিপাকে ভারতবর্ষ অনেক কাল পড়েনি। রোজ খবরের কাগজ খুললে পাতায় পাতায় কেবল দুঃসংবাদ—খুন অথম রাহাজানি খাদ্যহাঙ্গামা ট্রেন আটকানো বাস পোড়ানো খানা আক্রমণ রেললাইন উপড়ে ফেলা পুলিসের গুলি-বর্ষণের খতিয়ান—সে এক মহাবিপর্যয়ের কাণ্ড তার উপরে ঝড় ও বন্যার তাণ্ডব, খরার খর প্রকোপ, দুর্ভিক্ষাবস্থা, মারী-মড়ক এগুলির ভূমিকাও বড়ো কম সাংঘাতিক নয়। মনে হয় প্রাকৃতিক ও মনুষ্যকৃত সর্ববিধ দুর্ঘটনা যেন ভারতবাসীর জীবন পর্যুদস্ত করবার জন্য হাত-ধরাধরি করে বেরিয়েছে। এ রকম অরাজক অবস্থা, এ রকম স্বাভাবিক জীবন বিঘ্নকারী প্রকারের ঘটনাদির সঙ্গে আমাদের জীবদ্দশায় পূর্বে কখনও মুখোমুখি হতে হয়েছে বলে স্মরণ করতে পারছি না।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে মাৎস্যন্যায়ী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, ইতিহাসে এ রকম পড়ি। রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার লেশমাত্র ছিল না, শেষে রাজা গোপালদেব এসে কঠোর হস্তে বিশৃঙ্খলা দমন করে অরাজক অবস্থার অবসান ঘটান এবং শাসন-ব্যবস্থায় স্থিতি আনেন। গৌড়ে পাঠান বাদশাহের শাসন আমলে বাংলাদেশ আর একবার চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা লিপ্সুদের মধ্যে তখন গৌড়ের সিংহাসন নিয়ে দু'দিন বাদে বাদে খুনখারাপি ও লোকালুকি কাণ্ড চলছিল। গৌড়ের সিংহাসনের এই অধঃপতিত ভাগ্য-বিপর্যয়ে গৌড়-সুলতানের হাবসী সেনাপতিরা এক প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল। পরে সুলতান হুসেন শাহের আমলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি তাঁর অসাম্প্রদায়িক নীতি ও সুশাসনের মহিমায় বাংলায় মোটামুটি একটা স্থিতিশীলতা আনয়নে সমর্থ হন। সেটা মহাপ্রভু চৈতন্য-দেবের আবির্ভাবকাল। চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনের সূত্রে যে ভাবধারার সৃষ্টি হল তার প্রভাবে বাংলার অনেক দুর্নীতি বহুল সঞ্চিত ক্লেদ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল।

বাংলায় আর একবার মাৎস্যন্যায় দেখা দিয়েছিল পলাশী যুদ্ধের কিছুকাল পরে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তারা যখন দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমকে নাম মাত্র নজরানা দিয়ে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার উপর দেওয়ানীর অধিকার বিস্তার করেছিল এবং সর্বপ্রকারে বাংলাদেশকে শোষণ করছিল সেই সময়। সে এক চূড়ান্ত লুণ্ঠন ও পরস্বাপহরণের কাল, যার প্রতিক্রিয়ার ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে এই মন্বন্তরের ছবি আছে এবং সমসাময়িক কালের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে ইংরাজের তৎকালীন নিষ্ঠুর শোষণতৎপরতার মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা যথাসাধ্য অন্যায়কে ঢেকে-ঢেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাতে সত্য চাপা পড়ে নি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এমন একটা বিপর্যয়কর ঘটনা যার মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অন্যায় অনাচারের ক্রূরতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট লোকচক্ষে প্রতিভাত হয়ে পড়েছিল।

তার পরই আজকের দিনের এই অরাজকতা। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের পর লোকে ভেবেছিল স্বাধীনতার সুফল এবার

আস্তে আস্তে জন-জীবনে বাস্তবায়িত হয়ে উঠতে শুরু করবে এবং ইংরাজ জানলে যে সব অসুবিধার মধ্যে বাস করছিলাম ক্রমে ক্রমে তার বিলয় ঘটবে। কিন্তু তা তো হলই না, উল্টো, অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে মুখ রেখে অগ্রসর হয়ে চলেছে। বেপরোয়া অরাজকতা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর জনগণের জীবনে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা আনয়নের একটা সুস্পষ্ট কার্যক্রম ছিল। কিন্তু সে কার্যক্রম আজ যাত বাঁও জলে তলায় তাপা পড়েছে। প্রশাসনিক স্তরে তো বটেই জন-জীবনেও আজ দুর্নীতি উৎকোচ দান ও গ্রহণ লোক ইত্যাদি নিতান্ত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যায় উৎকট, বেকার সমস্যা তীব্রতম। কালোবাজারী, মজুতদারী, ভেজাল ইত্যাদির দৌরাত্ম্যে দেশ ছেয়ে গেছে। অসাধু ও কুক্রিয় উপায়ে অপরিমিত মুনাফা আহরণের প্রবৃত্তি আজ সমাজে এমনই সর্বব্যাপক যে এটা যে অন্যায় ও অস্বাভাবিক এক মনোবৃত্তি, সেই বোধই যেন সমাজ-মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। দুর্বল ও সরলমনা ব্যক্তিদের ঠকাতে পারাটা একদিকে নির্বুদ্ধিতার মাশুল এবং অন্য দিকে বুদ্ধিচাতুর্যের পুরস্কার—এই রকমের একটা ধারণা সমাজে ক্রমশ প্রসার লাভ করে চলেছে। অর্থাৎ বাগে পেলে যে কাউকে ঠকিয়ে নিতে পারা এবং সেই সুযোগে নিজের ট্যাঁক ফাঁপিয়ে তোলা কিছু দুষ্কর নয় এইটেই এখনকার অন্যতম মান্য নীতি।

এ মূল্যবোধের এক প্রচণ্ড বিপর্যয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালেও সংঘটিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ আছে। যদিও একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল থেকেই নৈতিক মূল্য বিপর্যয় প্রক্রিয়ার শুরু। বিগত যুদ্ধ ভারতবাসীর শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে দিয়ে গেছে। আজও তার জের চলেছে। শুধু তাই নয়, ন্যুব্জতা যেন দিনকে দিন আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে।

বিগত ইতিহাসের একাধিক পর্বের সঙ্গে এ কালের তুলনা করলে এটুকু বোঝা যায় যে, উল্লিখিত পূর্ব পূর্ব পর্বে যেমন জীবনের নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল এ কালেও তা-ই হয়েছে। মানুষের জীবন আজ এত সস্তা হয়ে গেছে যে তার যে কোনো দাম আছে সেই বোধটাই আজ অসাড়, তার মর্যাদার প্রশ্ন তো আরও পরের কথা। কথায় কথায় গুলি গোলা ছোঁড়া, বোমা ফাটানো, হত্যাকাণ্ড, অতর্কিত আক্রমণ এ সব এত ঘন ঘন এবং অবলীলায় সাধিত হচ্ছে যে এই সব ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে কিছু অস্বাভাবিকতা আছে তা আজ আর কারও মনে হয় না। আজ জীবনযাত্রা এমনই অনিশ্চিত এবং বেঁচে থাকা এমনই বিপদ-সম্ভাবনাপূর্ণ যে কাজের উপলক্ষ্যে ঘরের বাইরে পা ফেলার সময় ঠিক করে রেখে যাবার উপায় নেই যে ঘরে ফেরাটা সুনিশ্চিত কি না। ঘরে ফেরা হতেও পারে, নাও হতে পারে, কেন না রাস্তার কোনো গোলমাল বা বর্তমান অবস্থায় অহরহ ঘটছে এর সঙ্গে নিজের অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে জড়িয়ে পড়ে মৌলিক প্রাণটি যে রাস্তাতেই রেখে আসতে হবে না তার কোনো স্থিরতা নেই। আপনি হয়তো শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রের আইন মান্যকারী নাগরিক, বীয় কাজের ধান্দায় সরল মনে পথ চলেছেন, কথা নাই বার্তা নাই আপনারই অদূরে আচমকিতে একটি বোমা ফেটে গিয়ে আপনার মূল্যবান জীবনটি শেষ করে কিংবা এমনভাবে আপনাকে জখম করে দিল যে সারা জীবনেও আর আপনার পঙ্গুত্ব ঘুচল না। একটা গোটা পরিবার আপনার উপর নির্ভরশীল ছিল, তারা পথে বসল। আজকাল কিসে থেকে যে কী হয় তা আগে থাকতে কারও বলবার যো নেই। আপাত বিচারে নিতান্ত তুচ্ছ ঘটনা, কিন্তু দেখতে দেখতে তা-ই থেকেই অগ্ন্যুৎপাত ঘটে যায়। সামান্য একটা বিবাদ বা তকরার বা ভুল-বোঝাবুঝি, তাই থেকেই হয়তো একটা বড়ো রকমের সংঘর্ষের সৃষ্টি হল। বাজারে দরদাম নিয়ে বা ওজনের কমতি নিয়ে কথা কাটাকাটিতে যে ঘটনার শুরু তা যে কেমন করে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় দাঁড়িয়ে গেল তার সূত্র নির্ধারণ করা প্রায়শঃ কঠিন ব্যাপার।

এই যেখানে অবস্থা, সেখানে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি, বিশ্ববাসীর চোখে আজ আমরা স্বাধীন জাতির

পরিচয়ে পরিচিত—এই তথ্য সান্ত্বনা বোধ করা যায় না। গত কুড়ি বছর কালের মধ্যে স্বাধীনতাকে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের সত্তা করে তুলতে পারিনি, তা শুধু বিলাতের পার্লামেন্টে গৃহীত 'Indian Independence Act'-এর খাতাপত্রে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। স্বাধীনতালাভ ক্ষমতা হস্তান্তরকালীন একটি রাজনৈতিক সংঘটনমাত্রে সীমাবদ্ধ থেকেছে, তার থেকে আজও আমরা বড়ো রকমের কোনো সুফল আহরণ করতে পারি নি। বরং নানা দিক দিয়েই স্বাধীনতার উত্তর কালে আমাদের আচরণের ও নৈতিকতার মান নেমে গেছে স্বাধীন নাগরিক হিসাবে আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্ভ্রমবোধ থাকবার কথা, থাকবার কথা ছোটোর প্রতি বড়োর স্নেহ ও প্রীতি, বড়োর প্রতি ছোটোর শ্রদ্ধা-ভক্তি, তার লেশও আজ খুঁজে পাওয়া যায় না সমাজের চতুঃসীমার মধ্যে। স্বাধীনতা একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা। বিশেষ, যে জাতি দীর্ঘদিন পরাধীন থাকবার পর স্বাধীনতা পেয়েছে তার স্বাধীনতা তো একটা জাদু প্রভাবযুক্ত নৈব সংঘটনের মতো অসামান্য ব্যাপার স্বাধীন জাতি মাত্রেরই মনে ও শরীরে এই জাদুপ্রভাব মন্ত্রের মতো কাজ করে, কিন্তু তার কি কোনো লক্ষণ দেখা যায় আমাদের কি ব্যক্তিগত কি গোষ্ঠীগত ব্যবহারে?

স্বাধীনতার পরেও যে জাতির জীবনে নবজাগরণোদ্বোধনার হিড়হিড় শিহরণ খেলে যায় নি তার জন্য দিনি বা যাঁরাই দায়ী হোন সেই নিয়ে এখানে আমি আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার চেষ্টা করব না। তা করতে গেলে বিস্তৃত আয়োজন দরকার এবং তা একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হলেই যুক্তিযুক্ত হয়। এখানে যেটা বলবার চেষ্টা করব তা হচ্ছে এই যে, স্বাধীনতার সত্যিকার তাৎপর্যটা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে নি, স্বাধীনতার মানে এক ধরণের স্বেচ্ছাচারিতা, 'স্বাধীন যখন হয়েছি তখন যা-খুশী তাই করতে আমাদের আটকাচ্ছে কে'-জাতীয় মনোভাব অল্পবিস্তর আমাদের সকলেরই হৃদয়মন অধিকার করে বসেছে। স্বাধীনতা মানে যদৃচ্ছ আচরণের নৈরাজ্য নয়, স্বাধীনতা মানে আত্ম-আরোপিত সংযম শাসনে আপনাকে বদ্ধ করা। স্বাধীনতা কথাটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যেই এই অর্থের ব্যঞ্জনা নিহিত আছে। কিন্তু কে কাকে এই কথা বোঝায়? এখন যা স্বাধীনতার মানে দাঁড়িয়েছে তা কয়েকটি পদ বা শব্দসমষ্টির আকারে পর পর সাজালে এই রকমের দেখতে হয়—উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশান্তি, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ, মুনাফাখোরতা, ধনিকের পোয়াবারো, গরিবের সর্বনাশ, শাসক শ্রেণীর জন্য আচরণের এক মান শাসিতের জন্য আচরণের ভিন্ন মান, শাসক শ্রেণী কর্তৃক সর্বপ্রকার গায়েমী স্বার্থের তোষণ ও পোষণ, মন্ত্রিদের ভোগবিলাস ও জনসাধারণের অন্নহীনতা, মাথাভারী প্রশাসন, কৃষির অবহেলা, ভারী শিল্পের অত্যধিক উপাসনা, শিক্ষিত বেকারি, ছাত্র-অসন্তোষ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এরকম অবস্থায় শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতিচর্চার উৎসাহ ও অভিনিবেশ তিমিত হতে বাধ্য আর কার্যতঃ তা-ই হয়েছে। দৃশ্যতঃ লেখাপড়ার চর্চা বেড়েছে, শিক্ষিতের হার ক্রমবর্ধমান, সাহিত্যরচনার পরিমাণ পূর্বের সকল রেকর্ড ম্লান করে দিয়ে উত্তরোত্তর বেড়ে উঠছে, কিন্তু কোথায় যেন ঠিক সুরটি বাজছে না। শিক্ষা বা সাহিত্যসৃষ্টির পরিমাণকীর্তির তলায় প্রকৃত সৃজনী আবেগ চাপা পড়েছে। মাথাগণতির ক্ষেত্রে শিক্ষিতের সংখ্যাধিক্যে বা প্রকাশিত পুস্তকাদির তালিকাবাহুল্যে আসল অবস্থাটাকে ঢাকা দিয়ে রাখা যাচ্ছে না। সে আসল অবস্থা আর কিছু নয়, উদার শিক্ষার আদর্শের ক্রমক্ষীয়মানতা, সর্বপ্রকার প্রযুক্তিবিদ্যা তথা বিজ্ঞান জীবিকা সংস্থানকারী বিদ্যার উপর অনুপাত অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ এবং শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ক্রমাগ্রসরমান ভাবদৈন্য। কিন্তু তার চেয়েও যা আশঙ্কার বিষয়, শিক্ষায় ও সাহিত্যে মূল্যবোধের বিপর্যয়। স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার চর্চা করাতেই যে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তবে কি স্বাধীনতা-পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাওয়ার আহ্বানই এই প্রবন্ধে জানানো হচ্ছে? ইংরেজ আমলে যে অবস্থা-ব্যবস্থা দেশে বর্তমান ছিল তাতে প্রত্যাবর্তনই কি বর্তমানের এই অবস্থা সংকট থেকে ত্রাণ পাওয়ার

একমাত্র উপায়? তা কেন হবে? পরাধীন অবস্থা মৃত্যুর তুল্য অবস্থা। মৃত্যুর অন্ধকারে পুনরায় নিক্ষিপ্ত হবার পক্ষে কেউ কি সজ্ঞানে যুক্তি যোগাতে পারে? কথা তা নয়, কথা হচ্ছে, মৃত্যুর তামসী রাত্রি ভেদ করে আমরা একবার যখন স্বাধীনতার সূর্যালোকের দিগন্তে উত্তীর্ণ হয়েছি, সেই উজ্জ্বল আলোকের দিগন্তকে ক্রম-প্রসারিত করাই এখন আমাদের সবচেয়ে বড়ো কাজ হবে। স্বাধীনতার আশীর্বাদকে যথার্থ অর্থে আমাদের জীবনে সার্থক করে তোলবার জন্য আমাদের কোনো প্রয়াসেই পেছপা হলে চলবে না। স্বাধীনতার দৌড়ুলে অর্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে উপচারের দীনতা বা আয়োজনের আন্তরিকতাহীনতা যেন আমাদের পূজা-প্রয়াসকে ক্ষুণ্ণ না করে। ভারতীয় সংবিধানের অক্ষর-সমষ্টিতে মাত্র নয়, জীবনচর্যার মধ্যে স্বাধীনতাকে সত্য করে তোলার সাধনাই আজকের ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠ সাধনা।

কিন্তু, ঠাট্টা নয়, এক-এক সময় চিন্তা করে দেখলে দেখা যায়, ইংরেজ আমলে কায়িক অর্থে বাঁচাটা আজকের দিনের তুলনায় এমন কি মন্দ ছিল? বরং প্রকৃত কথা এই যে, অনেক ভালো ছিল। সত্য বটে তখন পরাধীনতার মর্মজ্বালা নিয়তির অন্তরকে দহন করেছে, রাজরোষের কবলে কবলিত স্বদেশপ্রেমিকদের লাঞ্ছনা ও দুঃখ বরণের মধ্য দিয়ে আমরা নিত্য অনুভব করেছি বিদেশী শাসনের মৃত্যুপাশে বদ্ধ হয়ে নিষ্ফলায় জীবন যাপন করাটা কত হীনতাগ্লানিতে, কত অপমানকর, আমারই স্বদেশবাসী বীর তরুণ যখন দেশ-প্রেমের মূল্য দিতে গিয়ে ইংরেজের কারাগারে পচেছে বা হাসিমুখে বুলেট বুক পেতে নিয়েছে বা ফাঁসী কাঠে ঝুলেছে, তখন ক্রোধে ক্ষোভে ধিক্কারে প্রতিকারহীন অন্যায়ের যারা কারক তাদের উপর নিয়ত অভিশাপ বর্ষণ করেছি; একটি জালিয়ানওয়ালাবাগ কি একটি হিজলী জেলের ঘটনা গায়ের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার পরেও কথা থেকে যায়। ইংরেজ আমলে কি জীবন ধারণের নানাবিধ অভাব অভিযোগ নিয়ে নিত্য কামড়া-কামড়ি ছিল, নিত্য অসন্তোষ ছিল? ছিল কি যেমন দোকানের কাউ, একশো পঞ্চাশ টাকা চালের মন, নিত্য প্রয়োজনীয় তাবৎ দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা ও অগ্নিমূল্য, বাসপোড়ানো-ট্রেন আটকানো, শিক্ষায়তন বন্ধ করা, ভেজাল-মজুতদারী ও কালোবাজারীর এমন উৎকট দৌরাত্ম্য, দুর্নীতির এতদূর সর্বগ্রাসী প্রসার?

১৫৫০ সালে বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সে তো মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষ—ইংরাজের ইচ্ছাকৃত তাবে সৃষ্টি। তার ফল বাঙালী জীবনের উপর তত্ত্বাবহ হলেও আজকের নিত্য দুর্ভিক্ষাবস্থার সঙ্গে কি তার তুলনা হয়? এখন যে ঘরে ঘরে নিত্য অন্নাভাব। অপুষ্টির অভিশাপে একটা গোটা জাত নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়েছে।

ইংরেজ আমলে সাহিত্য সংস্কৃতির কি এমন দুরবস্থা ছিল? লেখকদের আর্থিক অনটন ছিল কিন্তু তাঁদের জীবন-সংগ্রাম এমন উদ্বেগ সংকুল ছিল না, চিন্তা-স্বাধীনতা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ভয়ে তাঁরা সদা-সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন না, যেমন আজকের দিনে সংবাদ-পত্রের মালিক শ্রেণী ও অন্যান্য নিয়োগকারীদের প্রভুত্বের দাপটে তাঁদের থাকতে হয়। জীবনের নিরাপত্তা ও জীবিকার নৈশ্চিন্ত্যের অভাবে তখন কোনো মানুষকেই আজকের সদাবিদ্যমান বিধা শঙ্কায় কাল কাটাতে হত না। প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ The Autobiography of An unknown Indian গ্রন্থে যে ইংরেজ আমলে বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতির অবস্থাকে আজকের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর সমুন্নত অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন তার অন্তর্নিহিত দাম্ভিক-মনোভাবে আমি সমর্থন করি না কিন্তু তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করি। সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার বর্তমান সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের ঠিক জায়গাটির উপর তাঁর অভ্রান্ত হস্ত রক্ষা করেছেন।

আর নীরদ চৌধুরী বলে কথা কেন, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কি তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে প্রকারান্তরে এদেশে ইংরাজ শাসনের কল্যাণকারিতার পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করেন নি? ইংরেজ শাসন এদেশে সংহতি ও শৃঙ্খলা

আমরা এ কথা কি বলেন নি? বঙ্কিমচন্দ্র যে মনোভাবের বশেই এটা করে থাকুন, এক-এক সময় বর্তমান অবস্থা দূরে থাকবার জোরে ও হতাশায় বাস্তবিক তাতে ইচ্ছা করে, এখন যা দেখে তাণ্ডবলীলাখানা চলেছে সেই তুলনায় ইংরেজ আমল শতগুণে ভালো ছিল। জানি এটা নৈরাশ্যের বেদনাজাত পীড়িত উক্তি, কোনো অবস্থাতেই স্বাধীনতার মুক্ত আকাশে বিচরণের অধিকার ত্যাগ করে আমরা পরাধীনতার সোনার পিঞ্জরে গিয়ে আর ঢুকব না, 'পরাধীনতা অপেক্ষা নৈরাজ্য শ্রেয়:' গান্ধীজীর এই বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করে স্বাধীনতাকেই সর্বান্তঃকরণে আঁকড়ে থাকব, কিন্তু মানে মানে নিজেদের কানে আর এ তত্ত্বেই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব।

কানে যে প্রতিধ্বনি মনে আসে তাকে রোধ করব কী করে? এমনতরো প্রতিধ্বনির আর কোনো সার্থকতা থাকুক আর নাই থাকুক এই সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে যে, তা আমাদের অধিকতর কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করবে, আমাদের দায়িত্ববুদ্ধি আরও বাড়িয়ে তুলবে। স্বাধীনতার আশীর্বাদকে জাতি গঠনের সর্বমুখী রচনাত্মক অভিযানে আমরা যে কাজে কাজে লাগাতে পারতুম তার শতাংশের একাংশ কাজেও আমরা লাগাতে পারিনি এই অক্ষমতার চেতনা আমাদের স্বাধীন নাগরিকের মনকে নিত্য চাবুক হানুক। বাস্তবের প্রকৃত জ্ঞান অন্তরালে

"সর্বক্ষেত্রের মেরুস্তম্ভ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ৭০ বৎসর পূর্বে যে দর্শন বাঙালীর কাছে রাখিয়া গিয়াছেন, আজ তাহাই সর্বক্ষেত্রে—রাজনীতিতে অর্থনীতিতে সমাজনীতিতে—স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। তিনি লিখিতেছেন, 'আমি অদ্বৈতবাদীও বটে, দ্বৈতবাদীও বটে', 'আমাদের বিবেচনায় শ্রীভগবান এক ও বহুর অতীতও বটেন', 'সমস্ত আর্ষশাস্ত্র আলোচনা করিলে এক ও বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে'।

প্রত্যেক ধর্মই সকলের ধর্ম, প্রত্যেক দর্শনই সকলের দর্শন, প্রত্যেক ইষ্টই সকলের ইষ্ট, প্রত্যেক পথই সকলের পথ। প্রত্যেক মানুষ যখন প্রত্যেক ধর্মকে, প্রত্যেক দর্শনকে, প্রত্যেক ইষ্টকে, প্রত্যেক পথকে নিজেরই বলিয়া আস্বাদন করিতে ক্ষমবান হইবে তখনই মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্যকার মিলন সম্ভব। অন্যথা তোমার পথ তোমার, আমার পথ আমার—এ অবস্থায় মিলন একান্তই বাহিরের জিনিস হইয়া পড়ে। সমন্বয় বলিতে এতখানিই বুঝায়। জীবনকে এতখানি গভীর ও ব্যাপক করিয়া দেখিলেই অধ্যাত্ম জগতে ও বাস্তব জীবনে একটি নীতি অনুসরণের ফলে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু বুদ্ধি মানুষকে একই সঙ্গে এতখানি গভীরতা ও ব্যাপকতা দান করিতে পারে না। একমাত্র প্রাণের উদার ঔদার্যের মধ্যেই মানুষ এতখানি বড় হইতে পারে। এই পৃথিবীতে এক সময় মানুষ প্রাণ-সাধক ছিল, কিন্তু সভ্যতার মধ্য দিয়া ক্রমে সে একান্ত বুদ্ধিমান হইয়া উঠে, তাই ডিপ্লোমেসি আজ আর শুধু রাজনীতিতে নাই—পিতা পুত্র ভাইয়ে ভাইয়ে পরিবারে পরিবারে ঘরে বাইরে সর্বত্র। এই ডিপ্লোমেসির স্থলে বুদ্ধিকে পরিপাক করিয়া যে প্রাণ-ধর্ম উপনিষদে কীর্তিত হইয়াছে, সেই প্রাণ-ধর্মকে আজ আবার সভ্যতার মধ্যে আনিতে হইবে। ইহাই শ্রীনিত্যগোপালের জীবন-দর্শন।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ, পৌষ ১৩৬১

অ-মৃত

(একাঙ্কিকা)

॥ নাট্যকার মন্মথ রায় ॥

॥ তৃষা !

॥ কে ?

॥ সেকি ! আমাকে চিনতে পারছ না ?

॥ তুমি।

॥ হ্যাঁ আমি। দেখতেই না হয় পাচ্ছ না, কিন্তু আমার গলার আওয়াজ যত দুর্বলই হোক না কেন আজ, তোমার তো তোমার কথা নয়—যখন পাঁচ পাঁচটা বছর একসঙ্গে ঘর করেছি।

॥ ভুলিনি, ভুলিনি, কি ক'রে ভুলব ?

॥ আমিও তো তাই ভাবি কি করে ভুলবে—যখন জীবনের পরপারে এসেও আমি তোমায় ভুলতে পারছি না। বিশেষ করে কেন যেন মনে হচ্ছিল আজ তোমার কাছে আসা আমার বড়ো দরকার।

॥ আমি জানি যখনই আমি কোনো বিপদে পড়ি আমার কাছে ছুটে আসো তুমি। আজ দু বছর তোমাকে হারিয়েছি কিন্তু মনে হয় তুমি আমার কাছেই আছ—বুকের ভেতর রয়েছ !

॥ এখন কিন্তু আমি তোমার ঠিক সামনেই আছি তৃষা।

॥ অথচ তোমায় আমি দেখতে পাই না ! এ যে আমার কতো বড়ো দুঃখ ! এ কি তুমি বোঝো না অশোক।

॥ কিন্তু শুনতে তো পাও আমার কথা।

॥ হ্যাঁ তা পাই বটে, কিন্তু কখনো কখনো মনে হয় ওটা আমার ভুল। যেটা আমি শুনতে পাই সেটা তোমার বাণী নয়—আমারই বাণী, আমারই বিবেক।

॥ হাঃ হাঃ হাঃ—

॥ অমন ক'রে হেসো না, কেউ শুনতে পাবে, চমকে উঠে ভয় পাবে।

॥ সে ভয় ক'রো না তৃষা। আমার কথা শুনতে পাও শুধু তুমি। হাজার চেঁচালেও শুনবে না আর কেউ। শুধু তাই নয়, দেখবেও না আমাকে কেউ। আমি তো মৃত, জীবিত শুধু তোমার মনে। মৃত্যু শুধু এই একটি জায়গায় হার মেনেছে তৃষা।

॥ তোমাকে আজ আমি বড়ো ভয় পাচ্ছি অশোক।

॥ আমি জানি, আমি জানি। কিন্তু ভয় দিতেই আজ আমি এসেছি তৃষা।

॥ সত্যি বলছ ?

॥ সত্যি বলছি।

॥ মরণ আজ আসছে।

॥ আমি জানি। আমি তাকে দেখছি...বোম্বের প্লেন থেকে সে নেমেছে...গাড়ি নিয়ে ছুটে আসছে...যদিও রাত এখন দশটা।

॥ তুমি জানো—তুমি সব জানো—তুমি সব দেখো—তোমার কাছে আর আমি কি লুকোবো। ওগো, যদি তুমি চলেই গেলে, তবে তুমি আমাকে রেখে গেলে কেন ! যদি রেখেই গেলে তবে আমাকে ভুলে যাচ্ছ না কেন !

॥ কই আর ভুলতে পারছি, তোলাই তো উচিত। ভুলতে পারছি না বলেই না আজ আমার এতো দুর্গতি। জীবিতের কাছে মৃতের আসা—সে যে কি কষ্ট··· তৃষা, ওঃ···বুঝি এরই নাম নরক-যন্ত্রণা।

॥ না না, সে কি ! কেন তুমি আসো, কেন ভুলছ না আমায়, কেন পাচ্ছ এই কষ্ট !

॥ তুমি যদি ভুলতে পারতে, তবে ভুলতে পারতাম আমি তোমায়।

॥ তবে আমি তোমায় ভুলব। আসছে মরণ—দেখো তাকে

আজ আমি কথা রেখে—রেখে পারি। তোমারো, আমারো। হ্যাঁ, ঐ যে সে এসেছে—হ্যাঁ, পায়ের শব্দ পাচ্ছি...এস, এস, ভেতরে এস অরুণ।

॥ ভালো আছ তো তৃষা?

॥ তোমারই পথ চেয়ে বসে আছি অরুণ।

॥ হ্যাঁ, আমি এসেছি। ভেবো না ওরা ছুটি। বললাম, রইল তোমাদের চাকরি। ছুটে এলে যেন বললাম।

॥ সেকি! চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছ তুমি অরুণ!

॥ তুমি যখন ডাক দিয়েছ তৃষা—রুখতে পারবে না আমাকে কেউ। শুধু তুমি আমায় বলো তৃষা—মন তোমার ঠিক হয়েছে কি? কথা দিচ্ছ কি আজ আমাকে তুমি?

॥ হ্যাঁ অরুণ। আজ কথা দেবো বলেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

॥ মন তবে ঠিক করে ফেলেছ তুমি

॥ হ্যাঁ, করেছি। এই একটু আগেও এ জোর আমার ছিল না। কিন্তু এখন আমি জোর পাচ্ছি। আমাকে তুমি জয় করেছ অরুণ, আমাকে তুমি নাও।

॥ তৃষা!

॥ অরুণ!

॥ কালই হোক তবে বিয়ে। কি বল তৃষা?

॥ হোক তাই হোক্।

॥ পরশু তবে রওনা হচ্ছি আমরা বোম্বে।

॥ বোম্বে! বোম্বে কেন?

॥ একটা কিছু করতে হবে তো। বোম্বেতেই হবে আমার কাজের সুবিধে।

॥ ও, তাইতো। এ বাড়ি আমার তবে ছেড়ে যেতে হবে!

॥ এ বাড়িতে থাকতে চাও নাকি তুমি? তা যদি চাও তবে কাজের চেষ্টা দেখি কোলকাতাতেই।

॥ না, না, এ বাড়িতে আমি থাকতে চাই না, চাই না অরুণ।

॥ বেশ তো, তবে বেচে দাও তোমার এ বাড়ি।

॥ বেচে দেবো।

॥ বেচে না দিতে চাও, ভাড়া দাও।

॥ ভাড়া দেবো!

॥ বাড়িটার একটা কিছু করতে হবে তো! বা তুমি বলবে তাই হবে তৃষা। কি করতে চাও বলো।

॥ তুমি হাতমুখ ধুয়ে এস অরুণ—আমি ভেবে বলছি।

॥ যা বলেছ। আসছি।

॥ শুনো, তুমি সব শুনলে?

॥ শুনলাম।

॥ বাড়িটা নিয়ে আমি কি করব?

॥ বাড়িটা বেচে দাও।

॥ তোমাকে ভুলতে হলে তা ছাড়া আর উপায় কি! কিন্তু অশোক, কতো সাধ করে তুমি আর আমি গড়ে তুলেছিলাম এই বাড়ি; এর প্রত্যেকটি ইট যেন আমার এক একটি পাঁজর তোমার অমন সাধের ঐ বাগানটা—ওটা ছিল যেন আমার হৃৎপিণ্ড। এই বাড়ি আমি বেচব! বেচতে পারব!

॥ চেষ্টা করো।

॥ হ্যাঁ চেষ্টা করব। তুমিই যখন নেই—

॥ সে কোন কথা নয়। তুমি তো রয়েছ।

॥ ভুল, ভুল! তুমি নেই বলেই ওর দামটা আজ আমার কাছে এতো বেশি। মারা গেছ বলেই এতো বেশি বেঁচে রয়েছ তুমি আমার মনে—আমার ঘরে—আমার—বাগানে।

॥ ভুল ক'রো না তৃষা। ওটা নিছক একটা রঙীন অনুভূতি। বাস্তব জীবনে এর কতোটুকু দাম! তাছাড়া সে ছেলেমি তুমি ক'রোনা তৃষা—কেউ এসব শুনলে হাসবে। বেচে দাও এ বাড়ি, কিম্বা দিয়ে দাও ভাড়া। ওকে বিয়ে করে চলে যাও ওর সঙ্গে। ভুলে যাও আমাকে। নতুন করে সুরু করো জীবন। সুখী হও, সার্থক হও।

॥ এ কথা বলতে তোমার এতোটুকু বাধল না অশোক?

॥ বাধল না, বাধল না তৃষা। আমি চাই নাকি। তুমি আমাকে ভুলতে পারছ না, তাই ভুলতে পারছি না আমি তোমাকে। তুমি আমায় ভাবছ, আমি তাই

আসছি। এ আষাঢ়ে যে মৃত্যুর কি কষ্ট, জীবিত তুমি তা বুঝবে না।

। আশ্চর্য!

। তা তুমি বলতে পার তৃষা। কিন্তু তবে আমিও তোমায় বলব তৃষা, আমার যদি শান্তির তৃষ্ণা—সুখের তৃষ্ণা রয়েছে তোমারও।

। সুখের তৃষ্ণা!

। হ্যাঁ, সুখের তৃষ্ণা। তা যদি না হবে, কেন তোমাকে ভয় করতে পারল ঐ ভয়ঙ্কর?

। ওটা প্রেম নয় অশোক, ওটা প্রয়োজন। চলে গেলে তুমি—পড়ে রইলাম আমি—সামনে আমার হয়তো দীর্ঘ জীবন—জীবনের কতো না যুদ্ধ, কতো না যন্ত্রণা, প্রয়োজনই বা কতো! কামনা বাসনারও তো শেষ নেই! কে আমাকে দেখে—কে এসে দাঁড়ায় আমার পাশে—কি ক'রে আমি বাঁচি!

। খুবই সত্য তৃষ্ণা। আমি শুধু ভাবি আগেকার বিনের হিন্দু বিধবারা কি করে বাঁচতো তৃষা?

। সে শিক্ষা সে সংযম আজকের সমাজে কোথায়? আগেকার সমাজে বিধবাদের জীবন ছিল গণ্ডী দিয়ে ঘেরা—সে জীবন ছিল অচলায়তন। আজকের সমাজ কি তাই? তবে?

। সে সমাজ যখন নেই—সে শিক্ষাও যখন নেই তাইতো আমি বলছি তৃষা, ভয় পেয়ো না তুমি। এগিয়ে যাও। ওর হাত ছুঁড়ে ফেলো। যে গেছে তাকে ভুলে যাও, যে এসেছে তাকে নাও। ঐ যে, অমর আসছে।

। কি ঠিক করলে তৃষা?

। কি করবো বলো তো?

। বাড়িটা রাখবে, না বেচবে, না ভাড়া দেবে?

। যদি বলি রাখবো?

। বেশ তো, থাক না।

। শোনো অমর, আমি আর এক জনকে ভালবাসি।

। সেকি! কাকে?

। তার নাম আমি তোমাকে বলতে পারছি না।

। ভালবাসবে তাকে, আর বিয়ে করবে আমাকে?

। ভালো তোমাকেও যদি বাসি

। আমি মানছি। কিন্তু বিয়ে তো আর দুজনকে করা চলে না তৃষা!

। সত্যি করে বলো তো অমর, আমাকে ছাড়া এ জীবনে তুমি কি আর কাউকে কখনো ভাল বাসোনি?

। হ্যাঁ···না...তা হয়তো বেসেছি...কিন্তু তাদের আমি ভুলে গেছি।

। কিন্তু আমি যাকে ভালবেসেছি, কিছুতেই তাকে ভুলতে পারছি না আমি

। পারছ না?

। না।

। বিচারিণী হয়ে তবে কি করে বিয়ে করবে আমাকে?

। যা সত্যি তাই আমি তোমাকে বললাম।

। সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ তৃষা। বেশ, আমি চলে যাচ্ছি—যদি তাকে কখনো ভুলতে পারো, আমাকে তুমি ডেকো, আমি আসবো।

। চলে যাচ্ছ অমর!

। হ্যাঁ, চলে যাচ্ছি। যেতেই হচ্ছে!

। শোনো—শোনো—একটু দাঁড়াও—

। বলো—

। কাকে আমি ভালবাসি জানতে চাইছিলে তুমি, আমি বলছি।

। কিন্তু না বললেও চলে তৃষা।

। কিন্তু না, আমি বলছি।

। বলো।

। সে আমার আশোক।

। কিন্তু সে তো মারা গেছে। আর মারা গেছে বলেই না—তুমি আমাকে—

। হ্যাঁ তাও সত্যি। এতো চেষ্টা করেছি, কিন্তু ভুলতে পারছি না তাকে

। থাকে, ভালবাসার এ উষ্ণ'সটা কিছুটা দিন থাকে। তবে দু বছরে যাওয়া উচিত ছিল। তা আছে, থাক।

বাসো তাকে ভালো, আপত্তি নেই আমার।

॥ আপত্তি নেই! এ কথা জেনেও বিয়ে করতে পারো আমাকে?

॥ খুব পারি। যে মৃত সে মৃত। তার করি না তাকে।

॥ তবে ধরো আমার হাত।

॥ হ্যাঁ, ধরছি।

॥ তুমি কি এখনো ওখানে আছো? তুমি কি শুনছ? কাকে বলছ তুমা?

আমার সেই শত্রুকে—যাকে আমি ভুলতে পারছি না, কিন্তু যে আমাকে ভুলতে চায়। আমাকে ভুললে তবে নাকি ওর শান্তি, তবে নাকি ওর মুক্তি। যেমন আমি ওকে সে মুক্তি। হ্যাঁ, ওকে আমি এই শান্তি দিয়েই তোমার সঙ্গে চলে যাব। দেখি কি ক'রে ও শান্তি পায়, কি ক'রে ও শান্তি পায়!

॥ তুমা! তুমা! একি! রামদীন—রামদীন—শীগ্‌গির জল আনো—তোমার দিদিমণি জ্ঞান হারিয়েছে।

[যবনিকা]

ভারতবর্ষ এই দার্শনিক ভিত্তির উপর তাহার পরিবার, সমাজ রাষ্ট্র, নর-নারী সম্পর্ক, উচ্চ নীচ সরকারী বেসরকারী সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবে। এখানে কোন একই বস্তুকে মুছিয়া ফেলিতে, বহুর বহুত্ব ঘুচাইয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' হইতে পারিবে না। এখানের 'একত্ব' সংখ্যার একত্ব (mechanical unity) না, এই একত্ব জীবনগত (organic)। * * সকল বহুর বহুত্ব সম্পূর্ণ অটুট রাখিয়া যে 'এক', সেই 'একোমেবাদ্বিতীয়ম্' একম্-এর কথাই শ্রুতি শুনাইয়াছেন। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি দর্শনসমূহকে খণ্ডন করিয়া বেদান্ত দর্শনের এক ও অদ্বিতীয় হইবার দুঃসাহসের পূর্ণ প্রতিবাদ শ্রীনিত্যগোপাল। শ্রীনিত্যগোপাল বহুদর্শনবাদী ও এক-দর্শনবাদী, প্রভেদদর্শনবাদী ও অভেদদর্শনবাদী। * * *

—শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দ

দার্শনিক নীট্‌শে

।। শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার-রায় ।।

পাশ্চাত্য জগতে দার্শনিক চিন্তাধারা প্রধানতঃ বুদ্ধি-যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বুদ্ধি ও যুক্তির সন্ধানী আলোকে তাঁহারা জগৎ ও জীবনের অর্থ খুঁজিয়াছেন, এবং তাঁহাদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য জগতের দার্শনিক চিন্তার পীঠভূমি জার্মানীতে কাণ্ট ও হেগেল প্রভৃতির দার্শনিক মতবাদ বিশ্বের চরম ও পরম সত্যকে বুদ্ধির দ্বারাই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শন মূলত অনুভূতি ও বোধিমূলক। সাধনার দ্বারা মহাসত্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, পরে যুক্তির দ্বারা তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধারণভাবে পাশ্চাত্য দর্শনকে আরোহ (deductive) এবং প্রাচ্য বিশ্লেষভাবে ভারতীয় দর্শনকে অবরোহাত্মক বলা যাইতে পারে।

কিন্তু তবুও পাশ্চাত্যে এমন কয়েকজন দার্শনিকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাঁহাদের মতবাদকে বহুবিধ অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি সত্ত্বেও বুদ্ধিবাদী অথবা যুক্তিবাদী দর্শনিক গোষ্ঠীতে ফেলা যায় না। এই জার্মানীতেই কয়েকজন দার্শনিকদের সাক্ষাৎ মিলে যাঁহাদের চিন্তা ও মতবাদ বিশ্ববিদ্যালয় অথবা মহাবিদ্যালয়গুলিতে অনেকটা অপাংক্তেয় অর্থাৎ সে বিষয়ে যথেষ্ট চর্চা হয় নাই। শোপেন্‌হাওয়ার ও নীট্‌শের দার্শনিক মতবাদ এই শ্রেণীর। ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁর দর্শনও অনেকটা এই জাতীয়।

দার্শনিক নীট্‌শের যুগে ডারুইনের যুগান্তকারী মতবাদ, 'অতিব্যক্তিবাদ' সমসাময়িক চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ডারুইন-নীতি খৃষ্টধর্মের প্রচলিত অনেক চিরাচরিত বিশ্বাস ও ধারণার মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানে। প্রধানতঃ প্রাণীবিদ্যার সূত্র হইলেও অতিব্যক্তিবাদ ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন নীতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা স্তরে বিদলিত হইল। ডারুইন ছিলেন মূলতঃ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক নন। জীবজগতে অতিব্যক্তি অথবা আন্তবিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলি তিনি ঐতিহাসিক যাথার্থ্যের দিক দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার অন্তর্নিহিত নীতি বা রহস্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা তাঁর অধিকারের বাহিরে ছিল এবং তিনি তাহার চেষ্টাও বিশেষ করেন নাই। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে দার্শনিক ব্যক্তি রহিয়াছে, তাহা তো বাস্তব অতীত লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারে না, ভবিষ্যতের স্বপ্নও দেখে। এই ক্রম-বিকাশের মূলে যাহা রহিয়াছে ও তাহার পরিণতি কি হইবে দার্শনিক চিন্তা তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। শোপেনহাওয়ার বলিলেন সংকল্প বা ইচ্ছাশক্তিই ইহার মূল। অতিব্যক্তিবাদের অন্তর্নিহিত রহস্য হইতেছে ইচ্ছাশক্তি ও বাঁচিবার সঙ্কল্প—the will to live এই ইচ্ছাশক্তিই জীবন ও জগতের সকল কিছুরই মূলে রহিয়া প্রেরণা জাগাইতেছে। "The will is the only permanent and unchangeable element. I hold this thought—that world is will তিনি বলিয়াছেন। শোপেনহাওয়ারের will যেন বেদান্তের 'ব্রহ্ম', প্লেটোর 'ঈশ্বর', লাইবনিৎসের 'Mouad', স্পিনোজার 'Substantia', কাণ্টের 'Diug-au-sich' ও এমার্সনের Oversoul-এর মতো বিশ্বজগতে প্রকটিত; সাংখ্যের প্রকৃতির মতো বিশ্বে ক্রিয়াশীলতাও লীলাময়ী। শোপেনহাওয়ারের আবশ্যিক উত্থান ও পতনের মধ্যে সঙ্কল্পের বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি অদ্বৈতবেদান্তের মোক্ষ-নির্বাণের মধ্যে সঙ্কল্পকে শুদ্ধ করিবার প্রয়াস দেখিয়াছেন।

ডারুইনের অতিব্যক্তিবাদের আনুষঙ্গিক নীতি যোগ্যতমের উদ্বর্তন ও জীবন সংগ্রাম যেন প্রাকৃতিক ও মানবিক জগতে নৈরাশ্য বোধ আনিয়া দিল, তা ছাড়া খৃষ্টধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে হানিল কঠিন আঘাত। সম-

সাময়িক ইয়োরোপ খৃষ্টতত্ত্বের নিরাপদ আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইয়া বিপথগামী হইয়া পড়িল। তাই দেখা যায় এই সময়ে ইয়োরোপের নানাদেশে একদল দুঃখবাদী কবি, শিল্পী ও দার্শনিকদের আবির্ভাব—ইংলণ্ডে বায়রণ, ফ্রান্সে ভিক্টর হুগো, জার্মানীতে হাইনে, রাশিয়ায় লারমনটফ, পুশকিন এবং ইটালিতে লিওপার্ডি প্রভৃতি এবং সুইডেন, চুলিন, সুইটজারল্যাণ্ড এমন কি বেলজিয়মের মধ্যেও সেই ভাব সঞ্চারিত এবং য়োরোপীয় খৃষ্টতত্ত্বের মধ্যে তাহার চরম পরিণতি।

বিজ্ঞান ও খৃষ্টতত্ত্বের মধ্যে এই সংঘাত এবং দুর্ধর্ষ নেপোলিয়নের লোকোত্তর শক্তিতে লক্ষ্য করিয়া বিশ্ব-নিয়ন্তার মঙ্গলময়ত্বের প্রতি মানুষের আস্থা হারানো কিছু বিচিত্র নয়। বিশ্বজন ইয়োরোপ যেন বিশ্বজন জগতেরই প্রতিচ্ছবি। জগতে ঈশ্বরের বিধান যেন কবি কল্পনার নিদারুণ নিষ্ঠুরের মায়া স্বপ্ন। য়োরোপের হিতবাদের এবং মিল বেন্থাম utilitarianism এর মধ্যে সমাধান খুঁজিতে লাগিলেন। ধর্মতত্ত্ব হইতে সমাজতত্ত্বের উপর দৃষ্টি পড়িল।

এই পরিস্থিতির মধ্যে নীট্‌শের অভ্যুদয়। ডারুইন এবং শোপেনহাওয়ারের উত্তর সাধকরূপে জীবন সংগ্রামের নীতির সহিত সহস্রবাদের অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে মিলাইয়া তিনি ঘোষণা করিলেন, শুধু will to live-ই যথেষ্ট নহে, আসল কথা হইতেছে—'will to War, will to Power, will to Overpower। জীবন সংগ্রাম যদি সত্য হয় তবে "শুধু দিন যাপনের গ্লানি"ই জীবনে সার্থকতা আনিবে না। য়োরোপের প্রতিষ্ঠার মূলে রহিয়াছে শক্তির বিকাশ, শক্তিই সাধনা। শক্তিই চরম গুণ, দুর্বলতাই একমাত্র দোষ। মানুষকে প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে।

জর্মানির যাজক পরিবারের সন্তান ফেড্‌রিক নীট্‌শে অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া ধর্মপ্রাণা মহিলাদের মধ্যে লালিত পালিত এবং শেষ জীবন পর্যন্ত প্রায় নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তাঁহার দর্শন তাঁহার ব্যক্তিগত প্রকৃতি এবং মতবাদের মধ্যে সংগ্রামের ফলে খুবই তীব্র এবং উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ (Thus spake Zarathustra) তিনি বলিয়াছেন—What I am not, that for me is God and Virtue। প্রথম যৌবনে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করিতে গিয়া বিশেষ ভাবে আহত হন এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন।

সেই সময়ে তাঁহার প্রথম প্রকাশিত এবং একমাত্র সম্পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ Birth of Tragedyতে তাঁহার মতবাদের প্রথম অঙ্কুর দেখা দেয়। গ্রীক সাহিত্যের বিশেষভাবে tragedyর সমালোচনা প্রসঙ্গে দুইটি বিশিষ্ট ভাবধারা Dionysian ও Apollonian এর বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন প্রথমোক্তটিতে প্রকাশ পাইয়াছে পুরুষোচিত শক্তি ও উচ্ছলতা এবং দ্বিতীয়টিতে স্ত্রীজাতি সুলভ মাধুর্য এবং শৌম্যতা। Apollonian ভাবধারা প্রাধান্য লাভ করায় গ্রীক চরিত্রে এবং গ্রীক সাহিত্যের অবনতি ঘটিয়াছে। এই প্রসঙ্গে জার্মান জাতির চরিত্র আলোচনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন উহা মূলতঃ Dionysian, কিন্তু ফ্রান্স ও ইটালীর Apollonian ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ইহার অবনতি ঘটিয়াছে। আবার তাহাকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। বিঠোফেন ও ওয়াগনারের সঙ্গীতে তাহারই আভাস নীট্‌শে দেখিয়াছেন।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের গৈরিক অধ্যাপনার মতো নীট্‌শের দার্শনিক মতবাদ যেন বিস্ফুরিত হইয়া উঠিল তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Thus spake Zarathustra-এর ছত্রে ছত্রে। নির্জন পর্বতে তপস্যারত জরথুস্ত্র তপস্যান্তে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে জন সমাজে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাঁহার উপদেশ অপেক্ষা সেই স্থানে অনুষ্ঠিত rope dancer-এর নৈপুণ্য দেখিতেই লোকে অধিকতর আগ্রহী। অনবধানতাবশতঃ তাহার পতন ও মৃত্যু হয়। জরথুস্ত্রের চক্ষুর সম্মুখে যেন এক নূতনতর জগৎ ভাসিয়া উঠিল। তিনি তখনই বলিলেন Because thou hast made danger thy calling, I shall bury thee myself'। পূর্বের সকল সাধনা বিস্মৃত হইয়া তিনি প্রচার করিলেন—Live daugerously। অনেক অন্যাচারী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহাকে ঈশ্বরের কথা বলিলে তিনি

করিলেন, সন্ন্যাসী জানেন না যে ঈশ্বর বহুকাল মৃত। তিনি বলিলেন, Dead are all Gods; now we will that Superman live. Man is a something that shall be surpassed। নীট্‌শের অতিমানব এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। বর্তমান মানুষের অতন্দ্র সাধনায় তাহার আবির্ভাব ঘটিবে। ক্রমবিকাশের পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে অতিমানবের আবির্ভাব সম্ভব হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন নাই, কঠোর কর্মের অনুশীলন, উন্নততর প্রজনন ও শিক্ষা-প্রণালীর ফলেই তাহার উদ্ভব হইবে। অতি মানবতা লাভ প্রয়াস ও সাধনা সাপেক্ষ।

নীট্‌শের অন্যান্য গ্রন্থগুলি যেন তাঁহার Thus spake Zarathustra গ্রন্থখানির বিভিন্ন দিকের ভাষ্যস্বরূপ। অতিমানবতার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, Man must be better and eviler এবং Highest evil is part of the highest goodness। তাঁহার Beyond good and Evil এবং The Geneology of Morals গ্রন্থে তিনি দেখাইয়াছেন যে নীতি ধর্মের দুইটি পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে: Herren moral বা উচ্চতর নীতিবোধ ও Heerden moral নিম্নস্তরের নীতি বোধ। শক্তিমানের নীতি ও দুর্বলের নীতি কখনই সমমর্যাদার নয়। প্রচলিত খৃষ্টান ধর্মীয় নীতিবোধ সমগ্র ইয়োরোপের ক্ষতি সাধন করিয়াছে, "Europe is threatened with a new Buddhism...The whole morality of Europe is based upon the values which are useful to the herd"। উচ্চতর পর্যায়ের নীতিবোধ হইতে অতিমানবের নীতিবোধ অবশ্য আরও উচ্চস্তর মার্গের হইবে অর্থাৎ উহা beyond good and evil—পাপপুণ্য ভালমন্দের অতীত।

প্রাচীন যুগে যেমন Apollonian সংস্কৃতি গ্রীক জাতির সৌন্দর্যবীর্য্যের পরিপন্থী হইয়া তাহার অবনতি ঘটাইয়াছিল, পরবর্তী যুগেও সেইরূপ খৃষ্টান ধর্ম বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিশেষতঃ টিউটন জাতির মধ্যে মূল্যবোধের বিকার ঘটাইয়া তাহাকে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। যিশু খৃষ্ট সম্বন্ধে নীট্‌শের অবশ্য শ্রদ্ধা ছিল না (তুলনীয় There was only one Christian and He died on the Cross) কিন্তু খৃষ্টান ইয়োরোপের প্রকৃত অধিক কারণ বলিয়া তিনি মনে করেন। ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতি জার্মান, ফরাসী, রুশ, ইতালীয়, ইংরাজ প্রভৃতির জাতীয় চরিত্র ও অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া ইংরাজদের তিনি নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। গণতন্ত্র ও পার্লামেন্ট প্রথা স্বভাবই তাহাদের অবনতির মূল কারণ।

গণতান্ত্রিক প্রথা অতিমানবতার অভ্যুদয়ের পরিপন্থী বলিয়া নীট্‌শে ইহার উপর খড়্গহস্ত। ঘৃণ্য রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে অতিমানব নিজেকে বলি দিতে পারেন না, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার উদ্ভব সম্ভবও নহে। সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে বুঝিবার সাধ্য কোথায়? নীট্‌শে বলেন 'What is hated by the people, as a wolf by the dogs, is the free spirit, the enemy of all fetters'। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের এক রচনায় তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন—Within fifty years these Babel governments will clash in gigantic war for the market of the world'। নীট্‌শের আদর্শ সমাজে তিনটি শ্রেণী থাকিবে: উৎপাদন-কারী, আধুনিক গোষ্ঠী এবং শাসকশ্রেণী। এই শাসক শ্রেণী হইবেন একাধারে চিন্তানায়ক ও রণনায়ক, শ্রেষ্ঠীর ধার্মনিক রাজনীতিবিদ-এর সহিত সেনানায়কের সমন্বয়। এইরূপ সমাজই অতিমানবতার প্রকৃত ধাত্রী।

সমসাময়িক কালে নীট্‌শে নেপোলিয়ান ও বিসমার্কের মধ্যে অতিমানবতার প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার মতে নেপোলিয়নের দার্শনিক প্রতিভা ও বিসমার্কের বলিষ্ঠ ও বাস্তব রাজনীতি ইউরোপের সার্বিক অভ্যুত্থানের জন্য সহায় হইয়াছিল কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য সে চেষ্টার সার্থক রূপায়ন সম্ভব হয় নাই। বলাবাহুল্য ইয়োরোপে তাঁহারা বীর মানবের উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

নীট্‌শের দার্শনিক মতবাদ বহুবিধ অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি সত্ত্বেও অনন্যসাধারণ এবং পাশ্চাত্য দর্শনে

এক নূতন দিগন্তের সূচনা করিয়াছিল। যুক্তিগ্রাহ্য দর্শনের মধ্যে সহজ প্রাণের সজীব স্পর্শ সঞ্চারিত করিয়া নীট্‌শে সকলকে সচকিত করিয়া দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য দর্শনে অতিমানববাদের তিনিই প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা। দার্শনিকের সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের পরিবর্তে অনুভূতির ভাষ্যময় প্রকাশে তাঁহার মতবাদ অপরূপতা লাভ করিয়াছে। সত্যের হিরণ্ময় পাত্রখানি অপসারণ করিয়া তাহার জ্যোতির্ময় আলোকের সুতীব্র রশ্মিচ্ছটা তিনি দেখিয়াছেন কিন্তু তাঁহার মানস নয়ন তাহা সহ্য করিতে পারে নাই। সেরূপ আধার বা শক্তি তাঁহার ছিল না তাই তাঁহার মানসিক বিপ্লব ঘটিয়াছিল। তাঁহার দর্শন সম্বন্ধে অতিমানবতার ঋষি শ্রীঅরবিন্দের উক্তি প্রণিধান যোগ্য—Nietzsche was a Prophet who ill understood his message। ক্রমবিকাশের ধারাকে তাহার পরিণতির পথে প্রবাহিত করিয়া নীট্‌শে বুঝিতে পারিয়াছিলেন নিজেকে অতিক্রম করাতেই মানুষের এবং সৃষ্টির সার্থকতা। সৃষ্টির স্তর যখন মানুষে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন জীবদের দিক দিয়া আর পরিবর্তনের সম্ভাবনা রহিল না। জীববিজ্ঞানী হাক্সলি (ইনি কবি নহেন) বলিয়াছেন, Biologically speaking man has ceased to be a progressive animal। অতএব বিবর্তনের ধারা অন্তরের দিকে প্রবাহিত হইয়া গেল। পথ ছিল বাহিরে এখন সৃষ্টির ধারা বিবর্তিত হইবে অন্তরে। তাই নীট্‌শের মানুষ অতি মানুষে রূপান্তরিত হইবে এবং তাহার জন্য শক্তি সাধনারও প্রয়োজন। অতিমানবকে সমস্ত দোষগুণের অতীত হইতে হইবে কারণ Ethics is a stage in evolution। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকেও সেই উপদেশই দিয়াছেন :—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
এবং জ্ঞানেতানন্তীত্য ত্রীন্ দেহীদেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যু জরা দুঃখৈ বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥

সমস্ত দোষগুণ ও পাপপুণ্যের অতীত বলিয়া অতিমানব নির্বিকার এবং মুক্ত পুরুষ। কারণ

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাঽপি স ইমাল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

ইহার ধ্বন্যাত্মক অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি নীট্‌শের অতিমানবের মধ্যে শ্রুত হয়।

নিশ্চিন্ত আরাম ও বিলাসের মধ্যে নহে, কণ্টকাকীর্ণ পথে তাঁহার যাত্রা—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

নীট্‌শের কণ্ঠে ইয়োরোপীয় সমাজতন্ত্র বহুবিধভাবে ধিক্কৃত হইয়াছে তাহাও মৈত্রেয়ীর বাণীকে স্মরণ করাইয়া দেয়—

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্?

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, দুর্বলতাই একমাত্র পাপ। কারণ 'আত্মমাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। নীট্‌শেও ইহাই তাঁহার দর্শনে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন।

কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে নীট্‌শে অতিমানবতার আসল স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। প্রাকৃতিক ও জীবজগতে যেমন সংঘাত ও সংগ্রাম আছে তেমনই রহিয়াছে শান্তি, সামঞ্জস্য ও প্রেম বিশেষতঃ অন্ত প্রকৃতির হাতে যদি ছাড়িয়া দিয়া তাহার বশবর্তী হইয়া চলাতেই ক্রমবিকাশের সার্থকতা ঘটে না। তাহাকে বর্শে আনিয়া জয় করাতেই মানুষের সার্থকতা। অন্ত প্রকৃতির জগতে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা তাহার প্রমাণ দিতেছে। অন্তঃপ্রকৃতি অন্তের সুকঠোর সাধনা যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে। অন্ত প্রাণ মনসহ ক্রমবিকাশের পথে মানুষের উত্তরণ অতিমানস চেতনায়। ভাগবত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মানুষের সাধনার চরম লক্ষ্য। নীট্‌শের অতিমানব শ্রীঅরবিন্দের Gnostic being বা দেবমানব নয়। ভারতীয় দর্শনের নানা বিভাগে নানা ভাবে মানুষের চরম লক্ষ্যের কথা বলা হইয়াছে; মানুষ নানা উপায়ে নিজের অহংকে আত্মার মধ্যে নিঃশেষে বিসর্জন দিয়া এই জীবনে ব্রাহ্মী স্থিতি অথবা জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া 'লোকসংগ্রহে'র জন্য অগণিতভাবে কাজ করিয়া আসিয়াছে। বুদ্ধ, খৃষ্ট, শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা উপলব্ধি

হয়া তো দূরের কথা, পোপেনহাওয়ারের Genious, কার্লাইলের Hero অথবা ওয়াগনের Siegfried এর আদর্শও নীট্‌শের অতিমানবের ছিল না। দার্শনিক ক্ষেত্রে রোমান্টিক কল্পনার কতটা স্বপ্নে আবিষ্ট হইয়া নীট্‌শে যে মহিমা তিনি আরোপ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মস্তিষ্কের অভিভূত করিয়া দিয়াছিল; তাহার ফলে তাঁহার superman হইয়া উঠিয়াছে স্বাভাবিক অস্তিত্বের প্রতিমূর্তি আবেগপ্রবণ কবিপ্রকৃতি লইয়া তিনি দর্শনের ক্ষেত্রে দিশাহারা হইয়া বিচরণ করিয়াছেন, তাঁহার জীবনে উন্মাদনার কালো ছায়া নামিয়া আসিয়াছে, তাই তাঁহার জীবন ও দর্শন কোনও প্রখর শ্রেণীর ট্রাজেডির নায়কোচিত ভাবে পরিপূর্ণ। সমসাময়িক যুগের বিভিন্ন দার্শনিক ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা এবং নিজের দুর্বল মনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিয়া এবং ব্যাধি নিঃসঙ্গতা ও ক্রমবর্ধমান অন্ধতার প্রকোপে জর্জরিত হইয়া তাঁহার মতবাদ ক্রমশঃই উগ্রতর হইয়া উঠিয়াছিল নতুবা পরিণত বয়সের বিচার বুদ্ধি দিয়া হয়তো যা তিনি নিজের মতবাদকে সংযত ও যুক্তি-প্রতিষ্ঠ করিতেন।

নীট্‌শের জীবন তাঁহার দর্শনের মতই অনন্যসাধারণ আবেগপ্রবণ এবং চিন্তাশীলতা অপেক্ষা কবিকল্পনার দ্বারা উদ্বেলিত।

সাধু ভাষার ভবিষ্যৎ

অধ্যাপিকা মীরা রায়

সাধু ভাষাকে সম্পূর্ণ বিদায় করবার জন্য আজকাল খুব একটা তৎপরতা দেখা দিয়েছে। এতে মনে হয় নানা ধরণের অসুবিধার, এবং অসুবিধার চেয়েও যা বড়—অকল্যাণের সম্ভাবনা হয়েছে। ছোটদের পাঠ্য বাংলা বইকে সহজতর এবং অধিকতর সমরূপ করবার বাসনায় বঙ্কিম প্রমুখের সাধুভাষায় রচিত সাহিত্যকর্মের (অর্থাৎ এগুলির যতটুকু অংশ পাঠ্য বইয়ে সন্নিবেশিত হয়) সংস্কার, কথ্যভাষায় সেগুলির তর্জমা পুনর্লিখনে কেউ কেউ ব্রতী হতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু ইংরেজ (বা অ-ইংরেজ) যখন Shakespeare এর অপ্রচলিত প্রাচীন ইংরাজীতে লেখা নাট্যাংশ পড়ে, তখন কি তা আধুনিকায়িত করে বোঝার ওপর বোঝাকারী করবার দুঃসাহস কেউ করেন?

যে ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাখ্যামূলক নয়, সে ক্ষেত্রে বাঙালী শিশুর বাংলার বনিয়াদ দৃঢ় করবার জন্য আদৌসব বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের সংস্কৃতানুগ ভাষার সঙ্গে অন্তি অল্পবয়সে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া শিশুদের আমরা কেবলি সহজপাঠ্য, খেলো, অন্তঃসারশূন্য, জোলো আটপৌরে জিনিষ দেই কেন। সেকালের শিশুরা তাদের পাঠ্যবই এর সব সংস্কৃতানুগ বাংলা থেকে কি-রকম আমোদ, রস শিক্ষা পেয়েছে, না কি তারা কোন রকম অনতিক্রম্য অসুবিধারই সম্মুখীন হয়েছে। প্রথম থেকে ঐ ধরণের ভাষার সঙ্গে মানসিক নৈকট্য স্থাপিত হওয়ায় একে কখনোই অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম লাগে নি তাদের।

সহজপাঠ্য বই ছাড়া এতাবৎ কাল সাধুভাষার দ্বিতীয় কেল্লাটি ছিল খবর কাগজে; আর সব জায়গা থেকেই তো সে হতমান হয়ে বিতাড়িত হয়েছে। নিউজ প্রিন্ট-এর অভাবেই হোক আর আধুনিক হবার প্রেরণাতেই হোক খবর কাগজও তাকে নির্মম ভাবে বিদায় করে দিয়েছে।

এর ফলে এ যুগের বাঙালী ছাত্রের কাছে (যাদের সঙ্গে সাধুভাষার শুভদৃষ্টির কোন সময়ই এল না জীবনে) রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার লেখা পর্যন্ত অনায়ত্ত অগ্রহণীয় হয়ে পড়বে—যেন না সে লেখার যাদুর এমন এক ভাষা যাকে আমরা হঠাৎ, ১০।১৫ বছরের মধ্যে পরিণত করে

ভুলেছি একটি obsolete, dead language-এ। নিতান্ত scholarly পড়ুয়া না হলে অপ্রয়োজনে, অকারণে কে আর কষ্ট করে ঐ অবাধ্যের, অচল, অব্যবহার্য ভাষায় লেখা বই আলমারীর শিকলের তার থেকে টেনে বার করে পড়তে যাবে? কষ্টা ছেলে এতে আগ্রহ বোধ করবে? ফলে উনবিংশ শতাব্দীর তাবৎ রচনা-সম্ভার কি কার্যতঃ দুর্বোধ্য এবং অপাঠ্য বোধে পাঠকবিহীন হয়ে পড়বে না?

যতই সরলীকরণ এতীকরণ হোক, জানেছি সব দেশেই ভাষার একটি আটপৌরে, আর একটি পোশাকি নিয়ন্ত্রিত মূর্তি থাকে। (আর আটপৌরে ভাষাকে জাতে তুলে নিয়ে লেখ্য ভাষার পরিণত করলে কি হবে, যখনি সে ভাষা সূক্ষ্ম চিন্তার ও বিশ্লেষণের কাজ করবে, তার রূপান্তর ঘটবে, সে আর আটপৌরে থাকবেই না।)

আমাদেরও তাই থাকাতে দোষ কি ছিল?

এইবার আমার সবচেয়ে বড় আপত্তির কথায় আসি। প্রথমে বৈষয়িক কথাই বলি। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে দেশবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গবাসীর বাস্তব প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছে, অনেকেই তাঁরা এ ভাষার [illegible] সহজ স্বাভাবিক ভাবে বুঝতে পারেন না। (প্রসঙ্গতঃ বলি Browning প্রভৃতির যেমন আলাদা অভিধান লাগে তেমনি দারা অভিধান সত্যেন দত্তের জন্য প্রয়োজন) পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গে সংস্কৃতানুগ ভাষাই ব্যবহৃত হচ্ছে এখনো, আধুনিক হবার মোহ খুব একটা তাদের আক্রমণ করে নি। (পাকিস্তানের জন্মকালে মুসলমানী বাংলা অর্থাৎ আরবী ফারসী মেশানো বাংলার সম্বন্ধে যে উৎসাহ ছিল, এখন, অন্তত বে-সরকারী স্তরে, তা অবসিত। পূর্ববঙ্গবাসী নিজেদের বাঙালীত্ব সম্বন্ধে এখন প্রখরভাবে সচেতন।) বিনোবাজি পূর্ববঙ্গ-সফরান্তে এটি বোঝানোর জন্যই বলেছিলেন যে পূর্ববঙ্গের বাংলা (লিখিত বাংলা) নাকি খাঁটি সোনা। একটি মাত্র উদাহরণেই বোঝা যাবে traditional বাংলার ধারা পাকিস্তানে এখনো কতটা সজীব:—silver screen এর বাংলা পশ্চিমবঙ্গে 'রূপালী পর্দা' কিন্তু পূর্ব-বঙ্গের খবরের কাগজে দেখেছি তা 'রজত পট'।

যাই হোক, পশ্চিম বঙ্গীয় কথ্য ভাষার বই (স্থানে স্থানে দুর্বোধ্যতার জন্য) পূর্ববঙ্গে unpopular হোক, তার কাটতি সেখানে কমে যাক, বাংলা বইয়ের বাজার ছোট হয়ে যাক, (চিরকাল তো নিশ্চয় 'iron curtain'-এর ব্যবধান থাকবে না।) এ নিশ্চয়ই কাম্য হ'তে পারে না। এর প্রতীকারে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য এমন একটা সাধারণ ভাষাকে অবলম্বন করা হবে যা দুই বাংলার কাছেই সমান "কেতাবী ভাষা বা তোলা ভাষা"—যা হবে দুই বাংলার হৃদয়ের যোগসাধনকারী সেতু, যা হবে দুই বাংলায় সমান আপন, সমান পরিচিত।

সরকার প্রকাশিত সঞ্চয়ন খণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলীর কোন এক স্থানে দেখছিলাম কবি বলছেন—(আমার ভাষাতেই তাঁর বক্তব্যটা যথাস্মৃতি উদ্ধৃত করছি)—বঙ্গভঙ্গের কথায় আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়েছিল এই ভয়ে, পাছে দেশভাগের ফলে ভাষার ভাগ (অর্থাৎ অন্তরের বিচ্ছেদ) ঘটে। সেই দেশভাগ হল। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে শুনেছি সত্যিই নাকি কবির আশংকাকে সত্য ক'রে তাই-ই ঘটতে চলেছে। নতুন প্রজন্মের কিছু পূর্ববঙ্গবাসী নাকি তাঁদের আঞ্চলিক বাংলাকে লেখা ভাষার আসনে বসাবার জন্য তোড়জোড় করছেন। দেশভাগ হল—এইবার ভাষা ভাগ হবে—সর্বনাশের আর বাকী কি রইল! অথচ আশ্চর্য এবার-কার এই বঙ্গভঙ্গে, মনোভঙ্গে, ভাষাভঙ্গে আমাদের তো কই আর গায়ে কাঁটা দিচ্ছে না। আগেকার অর্থাৎ সেই প্রথম বঙ্গভঙ্গের দিনের সেই প্রেম, সেই উৎসাহ, ভাষার প্রতি সেই সজীব মমতা, অখণ্ড বঙ্গদেশের সঙ্গে সেই personal, জীবন্ত, তীব্র, একাত্মবোধের চিহ্নমাত্র, স্মৃতিমাত্র আজ কি আর অবশিষ্ট আছে? আমি যত ছোট হই, আমার আমিত্বকে আমি শ্রদ্ধা করব, তাকে অনুভব করব, তাকে নষ্ট হতে দেব না—এ ভাব বজায় রেখেও কি international হওয়া চলত না! রবীন্দ্রনাথের লেখায় 'বাংলা' ও 'বাঙালী' এই শব্দ দুটি যতবার উপস্থিত হয়েছে—ততবার কোন আধুনিক লেখকের লেখায়

কি কল্পনাও করা যায়? কিন্তু এত 'বাংলা' 'বাংলা' করেও তো রবীন্দ্রনাথ শেষটায় প্রাদেশিক হন নি?

যাই হোক, কবি বলেছিলেন—যেহেতু কলকাতা অখণ্ড বাংলার রাজধানী, তাই অতি স্বাভাবিক ভাবেই তার ভাষা standard ভাষা হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু আজকের এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি যদি কবির কল্পনায় থাকত, তবে কি তিনি কলকাতার ভাষার হয়ে plead করতেন? মনে তো হয় না। তখন (দেশবিভাগের আগে) পূর্ববঙ্গের সঙ্গে কোলকাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। এর ভাষার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটত নানা বৈষয়িক প্রয়োজনে। এখন? এখন একটা অন্য রাষ্ট্রের রাজধানীর (ও কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগের অভাব ও ব্যবহারিক জীবনে কাজে না লাগার দরুণ প্রায় ভুলে যাওয়া) মুখের ভাষার superiority সে যদি মানতে না চেয়ে নিজের মুখের কথা, নিজের রাজধানীর ভাষাকেই সম্মানের আসন দিতে চায়—কলকাতা আর তাকে তার ওপর কি ক'রে impose করবে?

যাই হোক নূতন রাষ্ট্রিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, সাধু বাংলাকে অধিষ্ঠিতের স্থান ছেড়ে দেওয়াই মনে হয় শ্রেয়, কাব্য বা সাহিত্যের ভাষার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, তা কেউ ওপর থেকে চাপিয়ে দিতে পারে না। সে ভাষার স্বতঃস্ফূর্তি, স্বাধীন স্বচ্ছন্দ লীলাই সর্বতোভাবে কাম্য। কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাষা কেন সাধু বাংলা হবে না?

বাস্তব সমাধান হিসাবে এটুকুই বলা যায়—পরীক্ষায় হলে, স্কুল-কলেজে যদি সাধু বাংলার ব্যবহার আবশ্যিক হয়, তবে এর অবজ্ঞাত, অবহেলিত, প্রায়-বিস্মৃত নির্বাসন-দশা ঘুচতেও বা ঘুচতে পারে।

সাময়িকী

বিপর্যয়ের অন্তে—বর্তমানে আমরা বাঙালীরা বা ভারতবাসীরা কি অবস্থায় পড়িয়াছি একথা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। কি একটা গভীর বিপর্যয় যে আমাদের চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, একটু ভাবিয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

বিপর্যয় যেমন আজ অন্নের, তেমনি কৃষ্টিরও। আমাদের আজ যেমন অন্ন নাই, তেমনি আমাদের ভারতীয়ত্ব কিংবা আদৌ শুদ্ধ ভাবে আমাদের মনুষ্যত্বও নাই।

এ অবস্থা হইল কেন? এ অবস্থাটা কি আকস্মিক? আবার কি আমাদের পিছনে ফিরিবার সম্ভাবনা আছে? এই সকল অবস্থা ভবিষ্যতে কিসের ইঙ্গিত দিতেছে?

বর্তমান অবস্থাকে আমরা আকস্মিক বলিতে পারি না। আমরা মোটামুটি জানি যে কলিযুগের চেহারা কি রূপ হইবে তাহা আমাদের অনেক শাস্ত্র পুরাণে বিস্তারিত লেখা ছিল। সে সমস্ত বহু বহু বৎসর আগের লেখা, কিন্তু সে সমস্ত কথিত বাণীর অনেকই নাকি মিলিয়া যায়। তবে কি ভাবে ইহা সম্ভব হইল?

সম্ভব হইল এই জন্যই যে সেই আদিম যুগে কি অবস্থা চলিতেছিল তাহা বিশ্লেষণ করিলে পরবর্তী প্রতিক্রিয়াগুলি মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক পথ ধরিয়াই আসিয়া পড়ে। সেদিন সমাজের এক অংশ অপরিমেয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করিত, অপর অংশ তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া নিজে বাঁচিত। উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, ধনিক-শ্রমিক, রাজা-প্রজা, নর-নারী, কুলীন-অকুলীন প্রভৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধ এইরূপ ছিল—একজন প্রভু, অপরে দাস; একজনের স্বার্থ সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়া অপরে বাঁচিত, একজন ছিল মুখ্য, আর একজন ছিল গৌণ। বর্তমানে যুগের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই অবস্থাটা ভাঙিয়া যাইবে—কোন এক অংশ সর্ব কালে সর্ব স্থানে ও সর্ব ভাবে প্রভু, আর এক অংশ সর্বদার জন্য দাস—এ ব্যবস্থা

অধিকার নয়। কলিযুগের বিশেষত্ব এই—মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব শান্তি ও সোয়াস্তিতে নাই, শুধু কলিযুগের এইটাই বৈশিষ্ট্য যে আজ আমরা সকলে ভাই ভাই অর্থাৎ আমরা পরস্পরের জন্য পরস্পরে—তোমার জন্য আমি, আমার জন্য তুমি—তুমি সর্বদার জন্য প্রভু, আমি দাস তাহা নয়। তোমাকে আমি বাঁচাইব, আমাকে তুমি বাঁচাইবে—পরস্পরের জন্য আমরা পরস্পরে বাঁচিব। আমি তোমার দাসও নই, প্রভুও নই, তুমিও আমার দাসও নও, প্রভুও নও। আবার আমি তোমার দাসও, প্রভুও, তুমিও আমার দাসও, প্রভুও। তখন সমাজের একটা বৃহৎ অংশকে—কৃষক, শ্রমিক, নিম্নবর্ণ, প্রজা, নারী অর্থাৎ যাহারা কোনদিন মাথা বা মর্যাদা পায় নাই—পরের জুতা মাথায় বহিয়াই যাহাদের জীবন কাটিয়াছে—সেই অংশকে মানুষ বলিয়াই মনে করা হইত না—বাকি অংশকে দিয়া সমাজের অগ্রগতি বা উৎকৃষ্টতা বিচার করা হইত। এখন সমগ্র সমাজ ধরিয়া বিচার করিতে হইবে। আজ প্রত্যেক মানুষের প্রাথমিক পরিচয় মানুষ হিসাবে—তাহার অন্যদত্ত জাতি, মূল, শীল, বিদ্যা অর্থ কিংবা পদ-মর্যাদা প্রভৃতি কোনটা দিয়াই তাহার পরিচয় নয়। কতটুকু সে সত্যিকারের মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে পারিয়াছে—সেটুকু দিয়াই তাহার সম্মান, মর্যাদা। এমন একটা সর্ব সংস্কার মুক্ত অবস্থা মানুষের সভ্যতার মধ্যে আসিতে চাহিতেছে। এই জন্যই বলা হইয়াছে কলিযুগে মানুষ নারায়ণ-পরায়ণ হইবে। প্রত্যেক মানুষেরই যে নারায়ণকে পূজা করার অধিকার আছে—এটা কলিযুগেরই বৈশিষ্ট্য। আমি সমাজের তথাকথিত নিম্নতম স্তরে জন্মগ্রহণ করিলেও আমি যে শ্রীজগন্নাথের পূজা করিবার অধিকারী, এ অধিকার শ্রীমন্মহাপ্রভু দান করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সে সমস্যার অধিকার সার্বজনিকভাবে তিনি প্রস্থাপন করিয়া যান নাই বলিয়া পরবর্তী কালে নমশূদ্র বাবাজী ও ব্রাহ্মণ বাবাজীতে ভেদ সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। মানুষের সঙ্গে মানুষের man to man relation-এর এই দর্শন শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-প্রদত্ত সূত্রে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই যে মানবের মুক্তি—এ মুক্তি শুধু আমার নয় যে-আমি চিরদিন দাস ছিলাম, এ মুক্তি তাহারও যে চিরদিন প্রভু ছিল—(সর্বদার জন্য প্রভু থাকা কি একটা পরম বন্ধন নয় ?)—এই মুক্তি আনিতে চারিদিকের এ বিপর্যয় তো আজ অপরিহার্য। এ বিপর্যস্ত অবস্থা অধিকতর ঘনীভূত হইয়াছে এই জন্য যে এ মুক্তি যে একটা সামগ্রিক মুক্তি—উভয় পক্ষেরই মুক্তি—ঘটনাটাকে এ ভাবে দেখা সম্ভব হয় নাই। কেননা যাহারা নিপীড়িত ছিল, বঞ্চিত ছিল তাহাদের অধিকার দেওয়াটাই এই মুক্তির তাৎপর্য বিশ্বের ঘটনাবলীতে এই কথাটাই আমাদের দেশের মানুষও বুঝিয়াছে, বুঝাইয়াছে। কিন্তু বাহারা দেশ ও ভারতবর্ষ আজ যতই অধঃপতিত হউক না কেন শুধু আমাদের দেশের তথা বিশ্বের এ বিপর্যয় যে কোন এক পক্ষের অধিকার প্রস্থাপনের আন্দোলন নয়, সমগ্র মানুষের পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার কথাই যে সে বলিতে চায়—একথা বাঙলাদেশ, ভারতবর্ষই বলিতে পারিবে, পারিয়াছে।

পিছনে ফিরিবার কোন উপায় নাই। আমরা ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝিতেছি না—তাই পথ কোথাও দেখিতেছি না। যতটুকু যা বুঝিতেছি, ততটুকু জীবনে আচরণ করিতেছি না—তাই পথ কোথাও দেখিতেছি না। এ অবস্থা আপেক্ষিক নয়। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ পঞ্চাশ বৎসর আগে হইতেই তাঁহার সমস্ত ভাষণে ও তাঁহার সমস্ত রচনায় এ অবস্থা যে আসিবে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন বলিয়াছিলেন 'যখন যন্ত্র-কাল এযাবের মত হল শেষ পুরানো সঞ্চয় নিয়ে কিছু শুধু বেচাকেনা আর চলিবে না', তখন তিনি কোন্ যন্ত্রের নোঙর তুলিতে বলিয়াছিলেন ? দূর হইতে কোন্ মৃত্যুর গর্জন শুনিয়া নূতন সমুদ্র তীরে পাড়ি দিতে বলিয়া ছিলেন ? 'ঐ ক্রন্দনের কলরোল লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল'—এ ছবি কি আমিকার অন্নক্লিষ্ট ক্ষুধার্ত ধরা-পীড়িত, বন্যা-বিধ্বস্ত নরনারীর নয় ? যে বিপর্যয়ে উৎপীড়িত মানবাত্মার অবস্থা কল্পনা নেত্রে দেখিয়াই কি তাঁহাকে বলিতে হয় নাই

'বহ্নিবন্যা ভয়ঙ্কর বেগ

বিষবাষ্প কটিবার নেব
কুতল গগন

মূর্চ্ছিত বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন' ? এ শুধু অন্নের বিপর্যয়ের চিত্র নয়—তাঁহারা দেখিয়াছিলেন নূতন জীবন-বোধ আসার আগে পুরাতন মূল্যবোধ ভাঙিয়া যাওয়ার বিপর্যস্ত সমাজের চিত্র। আজিকার সমাজের সর্বত্র এই ভাঙনের রূপ—

'মরণের গান উঠেছে শুনিয়া পথে
নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে যত দুঃখ পৃথিবীর,
যত পাপ, যত অমঙ্গল
যত অশ্রুজল
যত হিংসা হলাহল
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া'।

সৌন্দর্য—যদি আগেকার দিনের চোখ দিয়া দেখি—সৌন্দর্য কোথায়ও নাই। তবে এ মৃত্যু, এ পতন কোথায় সার্থক ? এই সব ভাঙন সার্থক হইবে যদি নূতন জীবন-চেতনাকে, বস্তুর নূতন রূপকে, মূল্যবোধকে সমাজের সামনে তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে রূপ দিতে পারার প্রচেষ্টায় দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইয়া যাওয়া যায়।

মানুষের পরিচয় আজ মানুষ হিসাবে, এতদিন যাহারা বঞ্চিত অপমানিত ছিল আজ সেই সকলের মর্যাদা পাইবার দিন—আজিকার ইহাই কথা। কিন্তু ইহার এই অর্থ নয় যে এই মানুষ বলিতে একটা উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচারী, অপরের মর্যাদাহানিকারী প্রভৃতি যে সমস্ত দোষগুলি আজিকার মানুষের মধ্যে দেখিতেছি—সেই দোষযুক্ত মানুষ বুঝায়। আজিকার দিনে যে মানুষ সাধারণতঃ দেখিতেছি—এই কি বিধাতার এত সাধের সৃষ্টি মানুষ ? এ মানুষের কতটুকু সৌন্দর্য ? এর কতটুকু মনুষ্যত্ব ? কিন্তু তাই বলিয়া আগেকার দিনের অবস্থাটাই কি কাম্য ? তাহা নয়। যাহাদের কোন অধিকার ছিল না, মর্যাদা ছিল না—তাহারা আজ অধিকার পাইয়া মর্যাদা পাইয়া মাথায় উঠিয়া বসিয়াছে, অপরকে মর্যাদা দিতে ভুলিয়াছে—ইহা প্রতিক্রিয়ার সাময়িক অবস্থাই বটে—এ অবস্থা দীর্ঘদিন চলিতে পারে না, ইহা কাম্যও নয়। নূতন আদর্শ, সামগ্রিক জীবন-চেতনার আদর্শ—সামগ্রিক মনুষ্যত্ব অর্জনের আদর্শ—মানুষের সামনে যদি তুলিয়া ধরিতে পারা যায়, 'চিত্তে নিত্যে আশা অন্তহীন' একমনে এ প্রণয় পারাবার পার হইতে পারা যায়, তাহা হইলে নূতন সৃষ্টির উপকূলে দাঁড়াইয়া 'নূতন বিজয়ধ্বজা' তুলিতে পারা যাইবে।

অন্নের বিপর্যয় কাটাইব কি প্রকারে ? কৃষির ক্ষেত্রে যেমন নূতন সৃষ্টি আমাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে, অন্নের ক্ষেত্রেও অধিকতর অন্ন সৃষ্টি না করিতে পারিলে এ বিপর্যয় কাটিবে কিসে ? অন্ন সৃষ্টি বলিতে সমস্ত বস্তু সৃষ্টি বুঝায় বটে কিন্তু আজিকার শক্তিহীন বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষে যথাযথমূল্যভাবে যন্ত্রশস্ত্র সৃষ্টির ব্যবস্থা না করিলে কিছুতেই এ দুর্যোগ কাটান যাইবে না। অন্ন সৃষ্টি করাইবার আগে অন্নকে শ্রদ্ধা করাইতে শিখাইতে হইবে—উপনিষদ বলিয়া ছিলেন 'অন্নং ন নিন্দ্যাৎ'—অন্নকে নিন্দা করিবে না। অথচ আমরাই অন্নকে নিন্দা করিয়াছি, শ্রদ্ধা করি নাই। যে ভারতবর্ষ কর্মকে শ্রদ্ধা করিতে শেখে নাই, যে ভারতবর্ষ চিরদিন কর্মকে বন্ধনের কারণ বলিয়া জানিয়াছে, যে কাজ করিতে করিতে বলে, 'গোবিন্দ, কর্মভোগ কবে কাটবে' সে কি করিয়া অন্ন সৃষ্টি করিবে ? যে কাজ শ্রদ্ধায় হয় না, সে কাজ কি ফল দান করে ? আমাদের কোন কাজই কি ফল দেয় ? শ্রদ্ধা করিয়া অন্ন সৃষ্টি করিতে হইবে, সমস্ত কাজ করিতে হইবে। একমাত্র শ্রদ্ধাই সৃষ্টি সহস্রগুণ হইতে পারে অর্থাৎ শ্রদ্ধার সঙ্গে অন্ন সৃষ্টির সংকল্প লইলেই সে অন্ন-সৃষ্টি বাস্তব প্রয়োজন মিটাইতে পারে।

বর্তমান সামগ্রিক বিপর্যয় আমাদিগকে 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার'-এ পৌঁছাইয়া দিবে এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া জীবন ও জগতের নূতন মূল্য-বোধসহ নূতন জীবন-চেতনা মানুষের কাছে উপস্থিত করিয়া যাইতেই হইবে। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নাই।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম ঘাওইখাটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি ক্রিষ্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের কার্যধারার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য—
পশ্চিমবংগ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িক পত্রপত্রিকা পড়ুন

পশ্চিম বংগ— সচিত্র বাংলা সাপ্তাহিক। এতে সংবাদ ছাড়াও, নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ, এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি। প্রতি সংখ্যা : ছয় পয়সা।

ষাণ্মাসিক : দেড় টাকা।
বার্ষিক তিন টাকা।

ওয়েস্ট বেংগল— পশ্চিমবংগের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক। প্রতি সংখ্যাতেই নানা তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যা : বারো পয়সা।

ষাণ্মাসিক : তিন টাকা।
বার্ষিক : ছয় টাকা।

শ্রমিক বার্তা— শ্রমকল্যাণ সম্পর্কিত বাংলা ও হিন্দী সচিত্র দ্বিভাষী পাক্ষিক।

বার্ষিক : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

পশ্চিম বংগাল— নেপালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী।

ষাণ্মাসিক : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
বার্ষিক : তিন টাকা।

মগ্‌রেবী বংগাল— সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র উর্দু পাক্ষিক।

ষাণ্মাসিক : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
বার্ষিক : তিন টাকা।

পছিম্‌ বাংলা— সাঁওতালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র পাক্ষিক।

বার্ষিক : এক টাকা।

- গ্রাহক হবার জন্য নীচের ঠিকানায় লিখুন।
- চাঁদার টাকা তথ্য অধিকর্তার নামে পাঠাতে হবে।
- ভি. পি. পি.-তে পত্রিকা পাঠান হয় না।
- পত্রিকা বিক্রীর জন্য ৩৩½% কমিশনে এজেন্ট চাই।

তথ্য অধিকর্তা,
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
পশ্চিমবংগ সরকার
রাইটার্স বিলডিংস, কলিকাতা-১

ডব্লিউ. বি. (আই. অ্যানড পি. আর) এ-ডি-ডি. ১৮৫১২/৬৭

উত্তরভারত

অগ্রহায়ণ-পৌষ. ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৬৭ বিংশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ-স্মরণে

॥ শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ॥

যে মহাপুরুষের জন্মদিনকে স্মরণ করে আজ আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছি, সেই স্বামী পুরুষোত্তমানন্দকে আমি বাংলাদেশের হৃদয়ে এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব বলে মনে করি। আমি প্রণাম করি তাঁকে—যিনি শুধু এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতামাত্র নন। যখন তাঁকে একজন ধর্মগুরু বলে মনে করি, তখন আমরা ভুল করি। কারণ তিনি ছিলেন মানববাদী প্রেমিক। যখন তাঁকে সন্ন্যাসী বলে ভাবি তখনও ভুল করি কারণ তিনি মায়া থেকে মুক্ত হ'য়ে বৈরাগ্য কামনা করেন নি। কিন্তু যিনি প্রেমিক হ'য়েও সন্ন্যাসী, যিনি সাধক হয়েও সমাজসেবক, যিনি সত্যাগ্রহী এবং সংগ্রামী—তাঁকে আমি প্রণাম করি।

আমাদের দেশে মহাপুরুষের মৃত্যুতিথি পালন করার রীতি নেই। কারণ মহাপুরুষের মৃত্যু আছে বলে আমরা মনে করি না। মানুষের চিন্তাধারা যখন সময়ের গতিপথ থেকে পিছিয়ে পড়ে, অথবা বিভ্রান্ত হ'য়ে এক আবর্তের মধ্যে ঘুরতে থাকে তখন দেশ ও জাতিকে গতিপথের নির্দেশ দিতে জন্ম হয় এক একজন নায়কের। তিনি যে কর্মসূচী রচনা করেন তা' সমগ্র সমাজ এমন কি সমগ্র মানবতার জন্যই রচিত হয়। জীবনের গতিপ্রকৃতির সীমার মধ্যে তাঁদের ধ্যান ও ধারণা আবদ্ধ থাকে না। সময়ের বাধাপথ অতিক্রম করে আগামীকালের জন্য পাখা হয় তাঁদের প্রেরণা। তাই তাঁরা সর্বদেশের ও সর্বকালের হয়ে ওঠেন।

স্বামিজীর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করা, অথবা তাঁর সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা আমার সাধ্যের অতীতে। তবু এটুকু বুঝতে পারি যে, প্রচলিত ধ্যান ও ধারণার ক্ষেত্রে তিনি নতুন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের অগণিত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন, তাই তাঁর জীবন আলোচনায় আমরা দেশ ও জাতি সম্বন্ধে সম্যক দৃষ্টি লাভ করতে পারবো বলে মনে করি।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ—যিনি সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে নরেন্দ্রকুমার ঘোষ নামে খ্যাত ছিলেন—তিনি কেন যে অনন্য সাধারণ ছিলেন, তা জানতে হ'লে তাঁর কর্মজীবন নিয়ে সামান্য আলোচনা করা দরকার। বরিশালের একটি গ্রামে বালক নরেন্দ্রকুমারের জীবনের সুরু। একটি লাজুক অন্তর্মুখী বালক, যে পথের বাউলদের গান গাইতে দেখলে অবাক হ'য়ে যায়ে, ভীষ্টমীয়াদের পদাবলী শুনলে যার মন উদাস হ'য়ে যায়, সে একা একা আপন মনে গেয়ে বেড়ায় "আমার সংসারের মায়া ছাড়বে একবার..."; তারপর দুর্গাপূজার বিসর্জনের সমাপ্তি হ'লে তাদা মণ্ডপে বসে ফুলে ফুলে কাঁদে। এ' বালকের চরিত্রে কোন অসাধারণত্বের ছাপ আঁকা নেই, কিন্তু বোঝা যায় তার হৃদয়ে এমন একটা আকুতি আছে যা সাধারণ সংসারের জন্য নয়। সে ছোট ঘাট প্রাপ্তির মধ্যে নিজেকে জড়ায় না। জীবন তার জন্য কোথাও, জন্য কোনখানে কি একটা সন্ধান করে ফেরে। নিজের সম্বন্ধে সে উদাসীন, কেননা তার মনে তখন একটা বড়

বেদনা। সে ও নিজেও বোঝে না, সে কি চায়? সে নিজেও জানে না কেন এত ব্যথা? তবু সাপ যেমন খোলস ছাড়বার আগে ছট্‌ফট্ করে বেড়ায়, সেই অস্থিরতায় সে-ও চঞ্চল।

আরও কিছুকাল আগে আর এক মহাসন্ন্যাসীও ঠিক এমনই অস্থিরতায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। বালক নরেন্দ্রনাথও তার বৈদেশে ছুটে বেড়িয়েছিলেন—একবার ব্রাহ্মসমাজের আসরে আর একবার দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবও সাধনমন্ত্র পাওয়ার আগে এমনি ছটফট করেছিলেন। আসলে লোহাকে তার আকরিক অশুদ্ধতা থেকে মুক্ত করে আনতে হয়। সেই সাধনমন্ত্র, যা' মানুষকে অবিদ্যার হাত হ'তে মুক্তি দেয়, তার উচ্চারণ গুরুর মুখে! গুরু যাকেন দেহরূপে, অগ্রসর করে যেন তিনি শিষ্যকে।

বাইশ বছর যখন বয়েস, তখন শরৎকুমার এলেন এমনই এক গুরুর সান্নিধ্যে। তাঁর নাম শ্রীনিত্যগোপাল।

কে এই শ্রীনিত্যগোপাল?

ইনি সেই আজন্ম সিদ্ধ পুরুষ যিনি সোচ্চার কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন—আমি এই বিশ্বের নাগরিক, এই বিশ্বই আমার মহামঠ।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ যে আন্তর্জাতিক কবি, এই কথাই একসময়ে ইউরোপে ছড়িয়ে গিয়েছিল। বিখ্যাত সাহিত্যিক উইলফোর্ড ব্রুক অন্যান্যবাদকে বোঝা বলে মনে করতেন এবং ভারতীয়দের সম্পর্কে তাঁর এক ধরণের ভীতি ছিল। সে কথা তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করে বলেছিলেন কবিকে। এবং এও বলেছিলেন যে, এই পৃথিবীর চেয়ে বেশী সত্য তাঁর কাছে আর কিছু নেই। কবি তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ মাধুর্যে উত্তর দিয়েছিলেন—আমার কাছেও না। মরিতে চাহিনা এই সুন্দর ভুবনে। মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই॥ ভারতীয় জীবন ও দর্শন সম্পর্কে পাশ্চাত্য জগতের এই যে ভীতি, ঐ ভীতি অহেতুক বা অমূলক নয়। বৌদ্ধ দর্শনের সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে যুগে বেদান্তকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, তার থেকে একথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ জগৎ মায়ামরীচিকা শুধু। সত্য শুধু সেই আকারহীন গুণহীন জলহীন ব্রহ্ম। রজ্জুকে যেমন নিশীথ রাতে সর্প বলে ভ্রম হয়, ঠিক তেমনই এই নশ্বর জগৎকেও সত্য বলে ভ্রম হয়। আসলে জগৎ মায়াপ্রপঞ্চ মাত্র।

পৃথিবী যদি মায়া হয়, কি লাভ তবে এই জড় জীবনে? এই মায়ার বন্ধন থেকে যত শীঘ্র মুক্তি পাওয়া যায় ততই ত' ভাল। কাজেই এ' দেশের মানুষ সার করলো পরলোকের মোক্ষ নামক বস্তুকে উপেক্ষিত হ'লো এই পার্থিব জীবনের স্থিতি। ফলে কর্মজীবনের মূল্যও অস্বীকৃত হ'ল। মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল পারিপার্শ্বিক সমাজ-বন্ধন থেকে

মধ্যযুগের সমাজ-মানসে যে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের লক্ষণ ফুটে উঠলো, সামাজিক অনাচার ও নীতিহীন কুসংস্কারের চাপে মানুষের মনুষ্যত্ব যে লুপ্ত হ'তে বসলো, তার কারণই এই যে, দর্শনকে আমরা পলায়নের দর্শন করে নিয়েছিলাম। জীবনের কোন প্রত্যক্ষ অর্থ আমাদের ছিল না, কারণ পৃথিবীতে বাস করার অর্থ যেন সেই বন্দীজীবন যাপন করা, যার থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্তি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে চিন্তাবিপ্লবের যে প্রচণ্ড সংঘাত এসেছিল তার কারণ যাই হোক না কেন, তার আঘাতে আমাদের জীবনের সর্বস্তরেই নবজাগরণের কাল বৈশাখী ঝড় বেগে দিল। আমাদের ধর্ম ও সমাজ-জীবনেও চিন্তাধারা নতুন খাতে বইতে সুরু করলো। রামকৃষ্ণদেব সর্বধর্ম মন্থন ক'রে ধর্মসমন্বয়ের সুর শোনালেন; বিবেকানন্দ বললেন—আমি নিজের জন্য মুক্তি চাই না, কারণ আমি ত আমিই মাত্র নই আমি যে সমগ্র বিশ্বের মানবতার মধ্যে বিস্তৃত। শ্রীনিত্যগোপাল বললেন, আমি সঙ্কীর্ণ কোন এক বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নই, সমগ্র বিশ্বের আমি; এবং এই বিশ্বই আমার মহামঠ, আমার পরম সাধনার ক্ষেত্র। এই বিশ্বও আমার কাছে উপলব্ধির সত্য।

শ্রীনিত্যগোপালকে উপলব্ধি করতে হ'লে যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন, তা' আমাদের নেই কিন্তু তাঁর

জীবনবেদকে আমাদের কাছে যিনি বহন করে নিয়ে এলেন তিনিই শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ। তাই শ্রীপুরুষোত্তমানন্দকে নিয়ে আলোচনা করতে হ'লে শ্রীনিতাগোপালকে স্মরণ না ক'রে উপায় নেই।

শ্রীনিতাগোপালের পরম স্মরণীয় সেই তরুণ যুবকের মন অন্তরায় মনে যেন চকিত বিদ্যুতের ঝলকানি। শরৎকুমার ধর্মসাধনার নিঃসঙ্গ, বিজনপথ থেকে ফিরে এলেন। তাঁর চোখের সামনে থেকে দীর্ঘ দিনের একটা আবরণ যেন একটু একটু করে উন্মোচিত হ'চ্ছে। তাঁর অন্তর্মুখী মনোভাব ধীরে ধীরে মানবমুখী হ'য়ে উঠছে। শরৎকুমার বুঝতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণজীবনের তত্ত্ব। একটা নতুন আদর্শের আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে লাগলো তাঁর মন। সুরু হ'লো তাঁর উজ্জয়ন্ত জীবন যাত্রা।

আমরা দেখলাম স্কুলের চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন শরৎকুমার—গড়ে তুলছেন নতুন জাতীয় বিদ্যালয়। দেখলাম, সত্যাগ্রহী সেবক ঘূর্ণিঝড়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেশে দেশে—কারণ সংগ্রাম মুক্তির জন্য। না, শুধু মুক্তির জন্য নয়, সংগ্রাম অসত্য ও অন্যায়ের সাথে। যে শোষিত, যে নিপীড়িত, সে মাথা তুলে দাঁড়াবে আপন শক্তিতে; অথচ চোখে তার বিদ্বেষের জ্বালা নেই। হিংসার প্রকাশ নেই।

এই অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই যেন জীবনকে নতুন করে খুঁজে পেলেন তিনি। দেখলাম তাঁকে—যিনি কর্মী এবং ত্যাগী, যিনি সত্যাশ্রয়ী এবং নির্ভীক, যিনি সৈনিক এবং সন্ন্যাসী। গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেলেন পুরুষোত্তম দর্শনের বাস্তব সাক্ষাৎ। তাই এই আন্দোলনের পথেই তিনি নিয়োজিত করলেন নিজেকে।

স্বামিজীর এই দেশভক্তির স্বরূপকে উপলব্ধি করতে হ'লে তাঁর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্যকে কিছুটা জানা দরকার। তাঁর মধ্যে দেশসেবা ও দেবসেবা, জাতীয়তাবাদ ও মানবতাবাদ, ব্যক্তিজীবন সমাজজীবন ও বিশ্বজীবন একাকার হ'য়ে গিয়েছিল। অধ্যাত্মজীবন বাস্তব জীবনের বাইরে নয়। শ্রীনিতাগোপাল যে সমন্বয়ের রূপকে প্রস্ফুটিত করেছেন, শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ সেই সমন্বয়কেই হৃদয়ঙ্গম করেছেন। নিত্য ও অনিত্য, জড় ও অজড়, জ্ঞান ও অজ্ঞান, ব্যক্তি-জীবন বিশ্বজীবন—এই দুই বিপরীতমুখী চিন্তাই তাঁর কাছে সমানভাবে সত্য হ'য়ে উঠেছে। তাই তিনি কখনও দ্বৈতবাদী কখনও অদ্বৈতবাদী। কখনও বস্তু ব্যক্তিসত্তা, কখনও পূর্ণ ব্রহ্ম।

শ্রীকৃষ্ণের পুরুষোত্তমরূপই তাঁর আদর্শ। কারণ শ্রীকৃষ্ণজীবনেই এই বিপরীতমুখী আদর্শের, এই সতত সক্রিয়মান সত্তাবোধের সমন্বয়। যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখানে তিনিই তাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন। যিনি ধর্ম ও অধর্মের অতীতে তিনিই নিজে ধর্মযুদ্ধে নায়কের সারথি সাজেন। যিনি নির্গুণ হয়েও সগুণ এবং এক হ'য়েও বহু।

এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণজীবনের আলোকেই শরৎকুমার জীবন ও জগৎকে নতুনভাবে উপলব্ধি করলেন। নতুন ভাষ্য রচনা করলেন বেদান্তের। ব্যক্তি-জীবনকে সন্ন্যাস-জীবনে রূপান্তরিত করলেন অথচ সংসারত্যাগী হ'লেন না। কিন্তু শ্রীনিতাগোপালের দর্শনকে প্রচার করবার জন্য উদ্যোগী হ'য়ে উঠলেন। তার চেয়েও বড় কথা, এই নব দর্শনের আলোকে এক 'উজ্জয়ন-ভারত' দেখবার আকাঙ্ক্ষায় সাধনারত হ'লেন।

এ'কথা সকলেরই জানা আছে যে বুদ্ধ-দর্শনকে আমরা গ্রহণ করিনি। বুদ্ধ এমন একসময়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, যখন ভারতবর্ষ বৈদিক দেবতার প্রভাবে আচ্ছন্ন। মানুষের দিকে দৃষ্টি ফেরানোর উদ্দেশ্যে এবং মানুষকে বড় করে দেখানোর জন্য বুদ্ধের জন্ম। বুদ্ধ প্রচলিত ধারণায় জগতে প্রচণ্ড বিপ্লব হ'য়ে এসেছিলেন। জীবনকে তিনি গতিপ্রবাহ বলে বর্ণনা করলেন।

কিন্তু আমরা তখন মায়াবাদকে নতুন করে সৃষ্টি করলাম। মানলাম্ না সেই দুরন্ত বিপ্লবী বুদ্ধের অমের রূপায়ণ মানববাদ। আমরা নিতোর মোহে সংএর মোহে স্থিতির মোহে গতিকে, পরিবর্তনকে অস্বীকার করলাম। আমরা জীবন ও পৃথিবীকে মায়া বলে পৃথিবীর অতীতে গিয়ে মোক্ষ কামনা করলাম। ফলে জড় পৃথিবী

তার প্রতিশোধ নিল। আরতরঙ্গ তলিয়ে গেল আত্মাবমানা ও মিথ্যার স্থবিরত্বের মাঝে। স্রোতহীন নদী শুধু পঙ্ক আর শৈবালে ভরে গেল।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ চাইলেন এই দু'য়ের সমীকরণ। তিনি বললেন,—ব্রহ্ম ও জগৎ তুল্য সত্য। এক যেমন সত্য বহুও তেমনই সত্য; স্থাণু যেমন সত্য, চঞ্চলও তেমনই সত্য। জগৎ ও ব্রহ্ম কখনই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। Whitehead-এর ভাষায়—'It is as true to say that the God is transcendental and the world immanent as that the world is transcendental and the God immanent"। স্বামিজীর ভাষায়—"এতদিন পৃথিবী তুলিয়াছে, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহারই সত্য, আজ প্রথম তুলিল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় বিচরণ, বিষয় ভোগও তুল্য সত্য। তবে তাহাকে প্রত্যাহারের আসনে আসীন হইতে হইবে। আমিও দারা ভগ্ন চাহিয়াছি রক্তের সম্বন্ধে ভাবের সম্বন্ধের মধ্যে, সন্ন্যাসকে সংসারের মাঝে, সমাধিকে জাগরণের বুকে পরিণত করিতে"। "একদিকে অহম্ ব্রহ্মাস্মি আর একদিকে আমি বিশ্ব নাগরিক—এই দুটো উপলব্ধি একসঙ্গে রাখতে হবে। আত্মশক্তি ও আত্মনিবেদন এই দুটোকে একসঙ্গে জীবনের পাথেয় করতে হ'বে"।

স্বামিজীর জীবন-দর্শন আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এবং এই ক্ষুদ্র পরিসরে তার সুযোগও নেই। তবু তাঁর জীবন যেন আমাদের কাছে বরেণ্য তা জানতে হ'লে তাঁর জীবন আলোচনা করতেই হ'বে। আর স্বামিজীর জীবনকে তাঁর দর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাই আমি সামান্য একটু ইঙ্গিত মাত্র দেবার চেষ্টা করলাম। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ভারত ও বাংলাদেশ বর্তমানে যে বিপুল বিবর্তনের পথ ধরে চলেছে, তাতে আমরা যদি পরিবর্তনের পথকে স্বীকার করে না নিতে পারি তাহ'লে আমাদের বাঁচা দুষ্কর হ'বে। অর্থাৎ কোন সত্যই একান্ত সত্য নয়। সত্যও পরিবর্তনশীল। আজকের জগতে যা সত্য, কালকের পরিবর্তমান জগতে তা' সত্য নাও হ'তে পারে।

তাই সময়ের আলো চোখে রেখে, দুরন্ত মানবতার রূপ মনে রেখে স্বামিজী সামাজিক রীতি ও নিয়মগুলির পরিবর্তন চাইলেন। গত দু'শতকে মুসলমানের হাতে হিন্দুর যে লাঞ্ছনা ঘটেছে তার কারণ হিন্দুমানসের আত্মমগ্ন সঙ্কীর্ণতা। সমাজ ও দেশকে বাঁচাতে হ'লে হিন্দুকে আজ তার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে সময়ের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে নিতে হ'বে। দারুণ দরিদ্র নারীসমাজের দিকে চেয়ে স্বামিজী বলেছিলেন—ওরা পতিতা নয়। সমাজ যদি আজ ওদের ফিরিয়ে না আনে, তাহ'লে সমাজই পতিত হ'বে। স্বামিজী বললেন আমার রাজনীতি আর ধর্মনীতি একই জিনিষ। যে পীড়িত যে শোষিত, তাকেও পূর্ণ আনন্দের আস্বাদ পেতে হবে। যে মুক্তি বন্ধনের সীমা অতিক্রম করে না সেই মুক্তিই অর্জন করতে হ'বে। মুক্তিও যেমন অনন্ত, বন্ধনও তেমনই অনন্ত।

এই বিশ্ব অনন্ত সম্ভাবনাময়। সম্ভাবনাময় জীবন মানুষের। মানুষ যে আপন শক্তিকে আয়ত্ত করবে না এ'কথা তাঁর পক্ষে কষ্টকর ছিল। সামাজিক বর্ণবিভেদ যে কোন মানুষকে ছোট করবার জন্য নয়, এবং কাউকে ছোট করে অন্যে বড় হতে পারেনা—এ কথা বারবার বলেছেন তিনি। তাঁর ভাষাতেই যদি: "শাকান্নীজল ও মুচির জুতা সেলাই যদি বিশ্বের কাজে সমভাবেই প্রয়োজন, তবে কেন একটি কুলীন হইবে এবং অপরটি অকুলীন হইবে"?

যিনি পুরুষোত্তম, মানুষের কল্যাণকামনা যাঁর ধর্ম, তাঁর আবির্ভাব আছে, মৃত্যু নেই। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের এই পুণ্যস্মৃতিবাসরে আমরা এই প্রার্থনাই শুধু করি যে সকল দ্বন্দ্ব ও কলুষ নাশ করে আমরা যেন জ্যোতির্ময় হয়ে উঠতে পারি।

তিনি আমাদের অনুযোগ করুন॥

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীসুনীতি চক্রবর্তী ॥

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ আমার আচার্যদেব, আমার জীবনের পথ-প্রদর্শক। কার্তিকী কৃষ্ণানবমী তিথিতে তিনি বাংলা মায়ের সার্থক সন্তান রূপে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন। তাঁকে আমার সকল সত্তা দিয়ে বার বার প্রণাম জানাই।

আমি শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের চরণ প্রান্তে কেন এসেছি এর উত্তরে যদি আমি প্রচলিত ধর্ম সংস্কারের কোন প্রেরণায় তাঁর কাছে আসিনি, দেখেছিলাম পুরুষোত্তমানন্দের ভেতরে সাগরের মত বিশালতা আর গভীরতা। একজন ব্রহ্মজ্ঞানী মানুষ, যে ব্রহ্মজ্ঞান এত-দিনকার শাস্ত্রে ছিল মায়াবাদের অতীত অবস্থা সেই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিমূর্তি পুরুষোত্তমানন্দকে দেখেছি আশৈশব প্রতিটি মানুষের প্রতি কী গভীর মমত্ববোধ। মনে পড়ে সেই দিনটীর কথা—হাজার হাজার মানুষের সামনে গৈরিক পরিহিত একজন সন্ন্যাসী কম্বু কণ্ঠে বলে চলেছেন—পরলোকের কোন কথা নয়, পাপ পুণ্যের কোন কথা নয়, স্বর্গ নরকের কোন কথা নয়—বলে চলেছেন মানুষের বেদনার কথা, মানুষকে ভালবাসার কথা, পঞ্চাশোর্ধ্ব এই বিপ্রকে শাস্ত্রোক্ত তৃষিত মরু সদৃশ এই বিশ্বকে ফুলের বিশ্বে গড়বার কথা। সেদিন তাঁর বাণীতে শুনেছিলাম নতুন কথা—এ জগতের প্রতিটি জন্তু জন্মবন্ত। ব্রহ্ম দৃষ্টিতে সব কিছু দেখতে হবে, ভোগ করতে হবে সব কিছু ব্রহ্ম বুদ্ধিতে। নিম্ন বর্ণ, উচ্চ বর্ণ, নারী পুরুষ, ধনিক শ্রমিক সব কিছু সবারই রয়েছে ব্রহ্ম সম্ভব। কোন কিছুরই কৌলীন্য তিনি স্বীকার করেন নি। তিনি যে দেখতে পেয়ে-ছিলেন একই ভাগবতী সম্পর্ক প্রত্যেকের সঙ্গে সমানভাবে বিরাজমান। এই ভাবে দেখেই ব্যক্তি পরিবার সমাজ পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসবে, ভক্তি করবে, সেবা করবে। এই-ই ভগবৎ সেবার প্রকৃত পথ। সেদিন আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, অভিভূত হয়েছিলাম। ভারতীয় ধর্মের প্রকৃত রূপ আমি পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে দেখতে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম।

সমন্বয় মূর্তি ভগবান শ্রীনিতাগোপাল ছিলেন শ্রীপুরুষো-ত্তমানন্দের জীবন দেবতা; তিনি পুরুষোত্তম তত্ত্বমূর্তি। শ্রীনিত্যগোপাল-প্রদর্শিত জীবন ও দর্শনের ছাঁচে বিশ্বকে গড়বার জন্য আজীবন সাধনা করে গেছেন। এই বিশ্বকে ব্রহ্ম-বিশ্বে গড়বার ধ্যান ছাড়া পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে কোন ব্যক্তিগত সাধনা ছিল না। তিনি ব্যক্তি-জীবন বলতে বিশ্ব-জীবন সমন্বিত জীবনই জানতেন। তাই তাঁর মুখে প্রার্থনা শুনেছি "শান্তিং প্রপদ্যে অখিল দেহ ভাজাম্"—বিশ্ব মানবের শান্তি নিজের বুকে উপলব্ধি করবার প্রার্থনাই শুনেছি তাঁর কাছে।

ভগবৎ সাধনার মূল উদ্দেশ্যই অনিত্যতার দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া, আর সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমানন্দের সাধনা দেখেছি দুঃখকে জীবনে বরণ করা। তাঁর কাছে শুনেছি—তিনি একবার বলেছিলেন—"বিশ্বকাল থেকেই আমাকে যেন কাঁদায় পেয়ে বসেছিল। বুকের ভেতরে কিসের জন্য যেন কান্না ছিল। কোন কোন সময় না হবে পেছেন এই কথা মনে হবে নিয়েই কাঁদতাম"। বিশ্বের বেদনাকে তিনি নিজের বুকে উপলব্ধি করবার সাধনা নিয়েছেন, তাই তাঁর সেই চোখের জলের বাঁধ ছিল না। কী মমতা প্রাণ ছিল যা বলবার তা নেই। মনে পড়ে একটি ঘটনা—আমি তখন চা বাগানে ছিলাম। পুরুষোত্তমানন্দ আমার বাসায় গেছেন—সেদিন পৌঁছানর কিছু পরেই তখনকার স্কুলের একজন শিক্ষক আমার শ্বশুরমহাশয়কে (তিনি তখনকার ডাক্তার ছিলেন) জানালেন তাঁর একটি মেয়ের ফুসফুসের রোগ

জীবন সংশয়। পুরুষোত্তমানন্দ সেখানে বসেছিলেন, যেই মাত্র শুনলেন সেই মেয়েটির কথা কী যন্ত্রণা, কী উদ্বেগ! সন্তানের জীবন-সংশয়ে মায়ের যে অবস্থা ঠিক সেই অবস্থা দেখেছিলাম সেদিন পুরুষোত্তমানন্দের মুখে চোখে। সাধু তৎক্ষণাৎ বিশ্রাম করলেন না, একভাবে বসে রইলেন আর আমাকে বার বার পাঠালেন মেয়েটিকে দেখে এসো তো কেমন আছে!—কী আশ্চর্য! হাসপাতাল যিনি দেখেন নি, একেবারে অপরিচিত স্থানে সেবাশ্রমের অপরিচিত একটি মেয়ের বিপদের কথা শুনে পুরুষোত্তমানন্দের প্রাণ যেভাবে অস্থির হয়ে উঠেছিল।

ব্রিটিশ শাসিত ও ব্রিটিশ শোষিত ভারতবর্ষে পুরুষোত্তমানন্দ ভারত মাতার মুক্তির জন্য দেশ-জননীর চরণে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। সেদিন ভারতবাসী বিশেষ করে বাঙালীরা দেখেছে তাঁর বিপ্লবী মূর্তি, শুনেছে তাঁর ওজস্বিনী সমর শোষণের ইঙ্গিতে ভারতবর্ষ করেছেন তিনি এক্ষেত্রে হাতের তেলায় তেলায়, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে, পুরুষোত্তমানন্দের কথা সেদিন পৌঁছেছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তিত নীতি স্থাপনের চেষ্টাই তিনি প্রাণপণ করে গেছেন। তাঁর কথাই ছিল means justifies the end: যেন তেন প্রকারেণ স্বাধীনতা অর্জন করলেই স্বাধীন হওয়া বা স্বাধীন থাকা যায় না—যদি গোড়ায় চিত্তে ব্রাহ্মণত্ব ছন্দ না থাকে।—পুরুষোত্তমানন্দ বলতেন, "আমি রাজনীতি করি না রাধানীতি করি"। রাধা-মাতার জয় মানেই নিপীড়িতের জয়, লাঞ্ছিতের জয়। মনে পড়ে আরেকটী ঘটনা:—রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীজীকে বলেছিলেন I shall fight with Gandhiji in order to maintain his Gandhism। তাই যেদিন বুঝেছিলেন রাজনীতি Gandhism থেকে দূরে সরে যাচ্ছে পুরুষোত্তমানন্দ সেদিন তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে গড়া রাজনীতি ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ালেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর বিশ্ব সেবার ক্ষেত্র বেছে নিলেন নরনারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারীতে পুরুষোত্তমানন্দ লিখছেন, "আমি বিশ্বকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলাম, মাটীর বুকে গোলোক বৈকুণ্ঠের প্রতিষ্ঠা খুঁজিয়াছিলাম ইহাই আমার সারা জীবনের স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত দেখিবার জন্য পথে বাহির হইয়াছিলাম, সব খোয়াইয়াছিলাম। আজও পথে। তোমরা অভিযাত্রি ছিলনা বলিয়া কোনও দলে মিশিতে পারি নাই, দলও গড়ি নাই। সেবাব্রত ছিল জীবনের ব্রত। কংগ্রেসেও থাকিতে পারি নাই, স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া গেল, গৌরাঙ্গগোষ্ঠী চলিল না। আজ নরনারায়ণ আশ্রম আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছি। কিন্তু আমার স্বপ্ন ত আমাকে ছাড়িল না অথচ পূর্ণও হইল না। তোমরা যদি আমার স্বপ্নকে সার্থকতায় গড়িয়া তুলিতে পার, আমি বাঁচিয়া যাইব। আমি দেবতা চাই নাই, চাই মাটীর মানুষে পুরুষোত্তম প্রতিষ্ঠা আমি গোলোক বৈকুণ্ঠের চেয়ে এই ধরাকেই ভালবাসি। গোলোক বৈকুণ্ঠের দেবদেবীর চেয়ে আমার ধরার শোক তাপক্লিষ্ট মানুষই আমার পরম ধ্যেয় তোমরা পুরুষোত্তম হও, পুরুষোত্তম বনিয়া যাও—ইহা আমি দেখিবার জন্য আজিও বাঁচিয়া আছি। তোমরা বিশ্বের সঙ্গে সম দুঃখী হও, বিশ্ব শান্ত হউক, তোমরা শান্ত হও। এই পথে চলিতে পারিলে কংগ্রেসও ঠিক পথে চলিবে। কংগ্রেস আজ অচল হইতে বসিয়াছে। তোমরা অচল কংগ্রেসকে সচল কর"। যে কর্ম ক্ষেত্র প্রাণ দিয়ে রচনা করেছেন সেই ক্ষেত্রে পুরুষোত্তম-দর্শন তথা জীবন দর্শনের কথা ও ভাগবতী ছন্দ যথাযথ পালিত না হলেই সেখান থেকে সরে গেছেন। আসক্তির গন্ধ তাঁর জীবনে ছিলনা। প্রাণ প্রাচুর্য ভরা অথচ মুক্ত বিহঙ্গের জীবন ছিল তাঁর। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই দর্শনের ভিত্তিতে ভারতীয় মানুষ এতদিন সন্ন্যাসের অভিমুখী দিয়ে সংসারকে গৌণ করে রেখেছিল যার ফলে দিকে দিকে পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে আজ যে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তাতে ভারতের বাস্তব জীবন তো অচল হতে বসেছেই, আদর্শ বলতেও আর কিছু আমাদের সামনে নেই। পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর ভাষণে বলছেন "বর্তমান যুগ ভাগবত ধর্মের যুগ, সংঘশক্তির যুগ। মুনি ঋষির ঐকান্তিক শাস্ত্র আজ অচল। মুনি ঋষিরা সহজ সরল অনাড়ম্বর

জীবনের, অন্তরের বেদান্ত বলিয়াছেন। সেই আরণ্যক বেদান্ত শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কুরুক্ষেত্রের বুকে উচ্চারিত হইয়াছিল। আজ আর মনে মনে কোণে বসিয়া বেদান্ত শুনিলে চলিবে না। মানুষের ঘৃণা দিয়া আজ বুদ্ধের সামনে বেদান্ত শুনিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেই বেদান্তই শুনাইয়াছিলেন। আমাদিগকেও সেই বেদান্তই শুনিতে হইবে। সংসার সন্ন্যাস এক করিতে হইবে। অনেকের আদর্শ লইতে হইবে" পুরুষোত্তমানন্দ এই ভাবে সংসার ও সন্ন্যাসের সমান মর্যাদা স্থাপন করে নতুন বেদান্ত আমাদিগকে দিয়ে গেছেন। তাঁর ধ্যানে ছিল ধরার ধূলিকে ব্রহ্ম-ধূলিতে গড়বেন, ধরার মানুষকে ব্রহ্ম-মানুষে গড়বেন।

ছোট ছোট কত ঘটনা মনে পড়ে—ভদ্রলোক ৩।৪টী সন্তানের পিতা; স্বামীজীকে ধরলেন তিনি সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষা চান। স্বামীজী তাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে বললেন, স্ত্রীপুত্র পরিবারের জন্য অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা না করে তার সন্ন্যাস নেওয়া সম্ভব নয়। অন্নহীনের কী করে ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব? ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা হয়ে পড়ে রইলেন স্বামীজীর ঘরের বারান্দায়। আর তিনি কী করলেন আশ্রমের ছেলেদের দিয়ে তার বাড়ীতে প্রসাদ পাঠিয়ে দিতে লাগলেন—ওর ছেলে হুঁশ না খেয়ে থাকবে? আবার ভদ্রলোকের জন্য কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা খুঁজতে লাগলেন। গায়ে তার জামা নেই, পুরুষোত্তমানন্দ জামা তৈরী করে দিলেন। আপনারা সবাই জানেন পুরুষোত্তমানন্দ ও তাঁর নরনারায়ণ আশ্রম আর্থিক দিক দিয়ে কতটা কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। তবুও প্রাণ-পাগল পুরুষোত্তমানন্দ মানুষের দুঃখের সাথী হবার জন্য কি ভেবে যেন প্রস্তুত করেই রাখতেন।

তাঁর জীবন অনন্ত—আমার পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি ও পরিচ্ছিন্ন ভাষা দিয়ে তাঁর কথা বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। সাধ হয় প্রাণ খুলে দেশে দেশে ঘরে ঘরে তাঁর এই জীবন-কথা পৌঁছে দেই দেশ সুস্থ হোক। ধরার মানুষ ব্রহ্ম মানুষ হোক।

আজ পুরুষোত্তমানন্দ-তনু বাসরে আমাদের যেন এই সংকল্পই দৃঢ় হয়—তোমারই পথ পানে চলিব, তোমারই উজ্জ্বল ভারত গড়ার স্বপ্নকে সার্থক করিব।

বর্তমান ভারতবর্ষের মানুষ আমরা আজ কী সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছি তা আর বুঝিয়ে বলতে হবেনা। অন্নহীনতা ও ভ্রমহীনতা আমাদের সমস্ত সমাজকে কুৎসিত ভাবে মলিন করে ফেলেছে। আজকের দিনে প্রতিমুহূর্তে মনে পড়ছে তাঁর জীবনখানির কথা। সেই জীবনের আজ প্রয়োজন যিনি অন্ন ও ব্রহ্মকে সম মর্যাদা দিয়ে জীবনে চলার ছন্দ শিখিয়ে গেছেন। আজ আবার তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে বলি, ধরার ধূলি হোক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম-মানুষ। মানব দরদী পুরুষোত্তমানন্দের জীবন ও দর্শন জয়যুক্ত হোক।

পরস্পরের রক্ত স্রোত বহাইয়া, সভ্য মানুষের মর্যাদা নষ্ট করিয়া হিন্দু-মুসলমান আজ অমানুষের পদবীতে নামিয়া যাইতেছে। আজ বিশ্বস্ত হিন্দু মুসলমানকে স্ব স্বরূপে ফিরাইয়া আনিবার জন্য মহাত্মাজী দৃঢ় সংকল্প। হিন্দু মানুষ হউক, মুসলমান মানুষ হউক: মানুষের মাঝে হিন্দু-মুসলমান গলিয়া গিয়া জমাট বাঁধিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হউক, স্বরাজ লাভ করুক—ইহাই কংগ্রেসের স্বপ্ন, মহাত্মাজীর স্বপ্ন। * * * মানুষ হওয়াই হিন্দু-মুসলমানের স্বধর্ম। হিন্দু-মুসলমান কি স্বধর্ম মানুষ-ধর্ম বিসর্জন দিয়া পরধর্ম ঐ পশুধর্মকে অঙ্গীকার করিবে? কিছুতেই নয়। † † † † † † মানুষই হিন্দুর আত্মা, মানুষই মুসলমানের আত্মা।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

জীবনধর্মী শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

।। শ্রীরাধেশ্যাম মজুমদার ।।

আজ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের চতুস্তম তিরোধিবী। তাঁর এই শুভ তিরোধিনটিকে স্মরণ করে যাঁরা আজ এই সভায় উপস্থিত আছেন তাঁদের সবাইকে সাথে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি।

সমন্বয়-মূর্তি শ্রীনিতাগোপাল থেকে শ্রীগুরুর স্পর্শ পেয়ে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ (তারাপদের পরবর্তীকালের নাম) সমন্বয় ধর্মতে আত্মোপলব্ধি করতে শিখেছিলেন। শ্রীনিতাগোপালের সান্নিধ্য লাভ করার আগে তাঁর মধ্যে ঠিক এই সমন্বয় আদর্শের খোঁজ খুব স্পষ্ট ছিল না। তাঁর জীবনচরিত পাঠ করলে জানা যায় জন্মের পর প্রায় ছয় বৎসর পর্যন্ত ছিলেন তিনি বোবা, তারপর ছিলেন এক কুনো। মা দুর্গা ছিলেন [illegible] শ্রীশ্রীমা তাঁর হৃদয় ও মনকে এমন করে আচ্ছন্ন করে ছিলেন যে মনমৌতে প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় মা মা করে আকুল হয়ে তিনি কাঁদতেন। সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীনিতাগোপালের স্পর্শ লাভ করে পুরুষোত্তমানন্দের জীবনের গতি এক বিরাটের আহ্বানে গেলো। শ্রীনিতাগোপাল তাঁকে দূর হতে চুম্বকের মত আকর্ষণ করলেন। জেগে ছিলেন তাঁর হৃদয়ে সমন্বয় আদর্শের এক শিখা। আজ থেকে প্রায় ৮০ বৎসর আগে শ্রীনিতাগোপাল তাঁর সমন্বয় ধর্মের কথা বলে গেছেন। তাঁর সমন্বয় ধর্মের কথা হল—নিত্য-অনিত্য সমন্বয়, আস্তি-নাস্তি সমন্বয়, জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়, সাকার-নিরাকার সমন্বয়, আকার-নিরাকার সমন্বয়, আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়, জড়-অজড় সমন্বয়, চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়, দ্বৈত-অদ্বৈত সমন্বয়, সর্ব সমন্বয়। অর্থাৎ সকল বিপরীতের সমন্বয়।

আপনারা যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁদের মনে হয়ত এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে সমন্বয়ের অর্থ কি? উত্তরে বলা যেতে পারে সমন্বয় হল মিলন বা সংগতি। মনুষ্য চরিত্রকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার মধ্যে অনেক রকম বৃত্তি রয়েছে—যেমন বলা যেতে পারে রাগ, অহংকার, ভালবাসা, ভয়, মৈথুন ইত্যাদি। আমরা দেখতে পাই এই বৃত্তিগুলো পরস্পর বিরোধাত্মক। এই বৃত্তিগুলো একটি অপরটির উপর প্রভুত্ব করবার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থাকে। মনুষ্য প্রকৃতির আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল যে সে একাধারে একগুণীন এবং বহুগুণীন। যে বৃত্তিগুলো তার মধ্যে রয়েছে একই সময়ে তাদের মধ্যে অন্তর্মুখিনতা এবং বহির্মুখিনতা উভয়েরই উপস্থিতি রয়েছে। তাই কেউ বা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য ব্যস্ত আবার কেউ বা বহির্জগতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। অতীতের দিকে আমাদের মনটাকে একটু ফেরালেই আমরা দেখতে পাব—সেই যুগের দর্শন চিরকাল একথাই বলে আসছিল মানুষের মধ্যে যে বৃত্তিগুলো আছে তারা পরস্পর antagonistic, এবং এটাই একমাত্র সত্য। দুটি বিপরীত বস্তু একই সঙ্গে সত্য হতে পারে না। যুগ যুগ ধরে মানুষের মনের মধ্যে একটি ধারণা বাসা বেঁধেছিল যে ব্যবহারিক ভাবে সংসারের মূল্য থাকলেও পারমার্থিক হিসাবে এটা একেবারেই মূল্যহীন। তাই আমরা দেখতে পাই ভারতীয় দার্শনিক শংকরাচার্য জগৎটাকে মিথ্যা ও মায়া বলে আখ্যা দিয়েছেন। Aristotle বলতেন "A can not be not-A at the same time"। আচার্য শংকরের মতে জগৎটা মিথ্যা বা মায়া, এর কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। তাঁর মতে ব্রহ্মই সত্য। তাই আমরা বুদ্ধের গতিধর্মের সঙ্গে শংকরের স্থিতি ধর্মের কোনও মিল খুঁজে পাইনা। বুদ্ধদেবের মতে যেটা স্থায়ী, নিত্য বা স্থিতিশীল তাই মিথ্যা। তাঁর মতে সত্য হল অস্থায়ী, তাই বুদ্ধদর্শনকে ক্ষণ-বিজ্ঞান

যায় নামে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে কিন্তু আজ আর এই প্রাচীন যুগের সংস্কার বা ভাবনাকে আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে না। নূতন চিন্তাধারার ধারক ও বাহক শ্রীনিত্যগোপাল আমাদের হাতে নূতন পথের সন্ধান পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর মতে মানুষের ভিতরে যে শক্তি গুলি রয়েছে সেগুলো কেবল পরস্পরদ্বন্দ্বী নয় তারা একই সঙ্গে পরস্পরের পরিপূরক। তাই নিত্যগোপাল বললেন এই জগৎ ও জগৎ অতীত সত্তা এরা উভয়ই সত্য আজকের দিনে এই জগৎকে মিথ্যা বা মায়া বলে জগদাতীত সত্তাকে একমাত্র সত্য বস্তু বললে আর কোন কিছুর সমাধান পাওয়া যাবেনা। এই জগৎ যেমন সত্য এই জগদাতীত সত্তাও ঠিক সেইরকম সত্তা। দেহছাড়া যেমন আত্মার কোনও অস্তিত্ব থাকতে পারেনা ঠিক সেরকম আত্মাছাড়াও দেহ মূল্যহীন কিন্তু জগৎ সত্য তখনই সম্ভব যখন মানুষ তার ব্যক্তি আমিকে (Ego) সর্বভূত বা বিশ্বরূপের কাছে শরণাগত করতে পারে। এই মাটির জগৎকে বাদ দিয়ে কেউ বিশ্বরূপ হতে পারে না, এবং বিশ্বরূপ না হলে জগৎ সত্তা এই সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায় না। সব বিপরীতের সমন্বয়ই শ্রীনিত্য-গোপালের মূল কথা। কোন একটি একান্ত ভাবে সত্য হতে পারে না। তাই তিনি দীপ্ত কণ্ঠে নিত্য-অনিত্য, আত্মা-অনাত্মা, জ্ঞান-অজ্ঞান ইত্যাদির সমন্বয়ের কথা বলে গেছেন। তাঁর এই আদর্শ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছিলেন।

স্বামীজীর জীবনের সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল এই, তাঁর কাছে রাজনীতি ও রাধানীতির মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না। তাই আমরা দেখতে পাই সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করার পরও তিনি রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেননি। তিনি সন্ন্যাস অবস্থায় ইংরেজের সাথে অসহ-যোগ আন্দোলন করেছেন, লবণ আইন অমান্য করেছেন, কয়েকবার কারাবরণও করেছেন। ধর্মকে বাদ দিয়ে তিনি কোনদিন রাজনীতি করেননি। সাম্যবাদই তাঁর রাজ-নীতির মূল কথা ছিল। তিনি তাই মার্কস্‌বাদকে অস্বীকার করেননি। মার্কস্‌বাদকে স্বীকার করেও তিনি তাঁর নিজের কথা বিশ্ববাসীর কাছে রেখে গেছেন। কৃষ্ণ-জীবনের মধ্যে তিনি সাম্যবাদের এক নিখুঁত ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তিনি তাই দীপ্তকণ্ঠে বলে গেছেন শ্রীকৃষ্ণ is the communist of all communists। তিনি তাঁর এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করার জন্য তাঁর রচনার মধ্যে ভাগবতের একটি ছোট্ট কাহিনীরও অবতারণা করেছেন। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরকম—"ব্রজধামে ইন্দ্রের যজ্ঞের জন্য সকলে তাদাদের শক্তি নিয়োগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। বিপ্রবী শ্রীকৃষ্ণ নন্দমহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতা, আজ এতসব আয়োজন কিসের? নন্দমহারাজ বলিলেন, আমরা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে আজ ইন্দ্রের নামে যজ্ঞ করিব শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন এই যজ্ঞ করিয়া কি ফল লাভ হইবে? নন্দমহারাজ উত্তর দিলেন ভগবান ইন্দ্র বর্ষণের দেবতা, যজ্ঞের দ্বারা প্রীত হইলে তিনি বারি বর্ষণ করিবেন। সেই বর্ষণের ফলে কৃষি সম্পদে দেশ ভরিয়া উঠিবে, গোবর্দ্ধন পাহাড়ের সমস্ত শরীর তৃণাচ্ছাদিত হইবে, গাভীরা তাহা ভক্ষণ করিয়া প্রচুর দুগ্ধ দান করিবে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া বলিলেন—সুখ, দুঃখ, ভয় এবং কাম এইসব শুধু কর্ম দিয়াই নিষ্পন্ন হয়, কর্মের বাহিরে কর্মের ফলদাতা কোনও ঈশ্বর যদি থাকেন, তিনি ও কর্তার কর্মেরই কামনা করিয়া থাকেন। কর্ম না করিলে তাহাকে যেমন তিনি ফল দান করিতে পারেন না, কর্ম করিলেও তেমনি তাহার ফল তিনি আটকাইতে পারেন না। এমন একজন অকর্মণ্য ঈশ্বরের কাছে অযথা মাথা নোয়াইবার কি প্রয়োজন? কর্মই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তিনি আরও বলিলেন কর্মের দেবতাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে বুদ্ধিমান-কারী কর্মেরই অন্তরে, ঐ কর্মের রূপরূপে। কর্মের বাহিরে কর্মের ফলদাতা কোনও দেবতা নাই। যে বুদ্ধি দিয়া মানুষ অনায়াসে বর্তমানের বুকে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহাই তাহার দেবতা। তিনি পিতৃদেবকে বলিলেন আপনারা ইন্দ্রের যজ্ঞ বন্ধ করুন; আপনারা গো, গোবর্দ্ধন এবং ব্রাহ্মণদের প্রীতির জন্য যজ্ঞ করুন। আপনাদের

যাহার অনধিকারী অর্থ যে সব চতুর ও পণ্ডিত ব্যক্তি এই গ্রন্থে রহিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মানের সহিত অর্চনা করুন, গাভীদের উৎকৃষ্ট খাদ্য দিন এবং গোবর্ধন গিরিকে এইসব উপহার নিবেদন করিয়া আপনারা ইন্দ্রযজ্ঞের সত্য কারণ সার্থকতা আবাহন করুন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে ব্রজবাসীরা তাহাই করিলেন। তাঁহারা তাহাদের সব উপহার গোবর্ধন গিরির নিকট সমর্পণ করিলেন। এদিকে ইন্দ্র খুব কষ্ট হইয়া উঠিলেন, ব্রজধামকে চরম শাস্তি দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অপমানিত করিবার জন্য অনবরত বর্ষণ, ঝড় ও শিলাপাত আরম্ভ করিলেন। নিরুপায় হইয়া ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। ছোটদের সম্মানদাতা শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন গিরিকে উর্ধ্বে ধারণ করিলেন। তখন গোবর্ধনের ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারা নিরাপদ হইলেন। ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ হইল, ইন্দ্র পরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া লইলেন"।

আপাতদৃষ্টে এই উপাখ্যানটি কি পাঁচ হাজার বছর আগেকার প্রবীণ ব্যক্তি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে একজন সেরা কম্যুনিষ্ট বলে প্রমাণ করে না? এই উপাখ্যানের কথা দিয়ে তিনি যে গোবর্ধন পাহাড়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন তাতে এটাই কি স্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠেনা যে তিনি শ্রম বা labour-এর মূল্য বা মর্যাদা দিয়েছেন? ছোটর মূল্য স্বীকার করা কি আজকের দিনের কথা নয়? আজ কম্যুনিজম তো এরথাই বলে যে দেশের যত শ্রমিক, কৃষক ও সর্বহারা আছে আজ তাদের মূল্য স্বীকার করতে হবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ আকাশের ভগবান (ইন্দ্রকে) পূজা না করে ছোটর মূল্য দিয়ে কর্ম করতে ব্রজবাসীকে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। তুমিকে অস্বীকার করে তুমাকে লাভ করার কথা তো শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই। তবে একথা কি বলা সংগত নয় যে তিনি ছিলেন সাম্যবাদী পুরুষ? যুগ যুগ ধরে ভারতবাসী জেনে এসেছে যে মোক্ষ লাভই জীবনের মূল কথা, এবং এই মোক্ষ লাভের উপায় হল সব কিছুর থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে সাধনা করা। ভারতবর্ষ সে সময় কর্মকে বাদ দেওয়ার কথাই ভেবেছিল, কেননা কর্ম হল বন্ধনের কারণ, তাই যতটা পারা যায় কর্মকে বাদ দিয়ে চলতে হবে। শুধু কর্ম-বিমুখতাই একমাত্র কথা ছিল না, বর্ণবৈষম্যও ভারতবাসীকে এমন করে আচ্ছন্ন করে ছিল যে উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে কেবল দূরেই সরিয়ে রেখেছিল। ভারতবাসী সে দিন ভাবে নি যে-নিম্নবর্ণকে তারা দূরে সরিয়ে রাখছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে, পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে", একদিন তাদের কাছ থেকে আসবে বিরাট আঘাত। নিম্নবর্ণেরা সেদিন সমাজে উপযুক্ত মর্যাদা না পেয়ে অন্য ধর্মে গিয়ে স্থান নিয়েছিল। হিন্দু সেদিন নিজের জাতি ও কুলকে রক্ষার জন্য বিকৃত আচার ও নিষ্ঠার মধ্যে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। আজ পাকিস্তান-সৃষ্টি অতীতের সেই বাদ দেওয়া রূপ পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত। যুগ যুগ ধরে মানুষ এক অপরের উপর শোষণই করে এসেছে। এখানে ধনিক শ্রমিককে শোষণ করেছে, রাজা প্রজাকে শোষণ করেছে, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে শোষণ করেছে। আজ সমাজে তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। যে ধনিক বা ধনতান্ত্রিক সমাজ শ্রমিককে তার ধন দিয়ে নিষ্পেষণ করেছিল, শ্রমিকের রক্ত জোঁকের মত শুষে খেয়ে তারা আরও ধনী হয়ে ছিল, আজ শ্রমিকও ক্রোধপরবশ হয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে সেই মুনাফাখোরদের কাছ থেকে। আজ শ্রমিকও শোষণ করছে ধনিককে তার শ্রম দিয়ে। আজ দেশে শ্রমিকের কর্ম-বিরতির জন্য দেখা দিয়েছে দেশের অর্থনৈতিক সংকট। আজ বাংলা দেশের অধিকাংশ শিল্প কেন্দ্রগুলি বিভিন্নরূপে বন্ধ হয়ে আছে, উৎপাদন নেই, সরকারের অর্থভাণ্ডারে অর্থ আসবে কোথা থেকে? দেশ আজ বিরাট দুর্যোগের সম্মুখীন।

তাই বলতে ইচ্ছে করে শ্রমিককে তার শ্রমের উপযুক্ত মূল্য আজ দিতে হবে এটা নিঃসন্দেহে স্বীকার করি, তবে মনে হয় যে আজ শ্রমিক তার শ্রমের মর্যাদা পাবার জন্য যে ধ্বংসমূলক আন্দোলন করছে এটা ঠিক পথ নয়। এটা নিছক একের প্রতি অপরের পাল্টা আঘাত। এতে ধ্বংসই আসবে, কল্যাণ আসবে না, তার নিদর্শন আজ

বাংলা দেশ সহন করে চলেছে। বাংলার উপর এখন যেন রাহুর দশা চলছে। দিন দিন এ দেশটি যেন কর্কট রাশীর মত তিলে তিলে একটি বিরাট ছুর্যোগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আজ ধনিককে বাদ দিয়ে, ধনিককে একেবারে নিঃশেষ করে তার বুকের উপর শ্রমিক কর্তৃত্ব করবে এ ধরণের চিন্তাধারা নিছক বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। একটিকে সমূলে ধ্বংস করে আর একটি তার স্থানে প্রভুত্ব করবে আজকের দিনে অন্ততঃ তত্ত্বতঃ এটা একটি অযৌক্তিক কথা। কম্যুনিজমের ও এটাই গোড়ার কথা। আজ চাই সামঞ্জস্য। ধনিককে তার ধনের অহংকার ছেড়ে দোষ-মুক্ত হতে হবে, আবার শ্রমিককেও তার শ্রমের অপব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। পুরুষোত্তমানন্দের ভাষায় ধনে ও শ্রমে সাম্য ছাড়া ধনিক ও শ্রমিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে না।

ধনিকত্ব বা শ্রমিকত্ব হল এক রকমের মনোবৃত্তি স্বামিজী এ ঘটনাটি ব্যাখ্যা করার জন্য সুন্দর একটি উপমা দিতেন—"mass ও class দুইটি মনোবৃত্তি মাত্র। প্রত্যেকেই এক হিসাবে class, আবার অন্য হিসাবে mass। ব্যাঙের ছাতা হইতে যে অনেক কারিগর মিলিয়া গাড়ীতে উঠিল, সে ছিল এতক্ষণ mass, কিন্তু সে-ই হইল আবার আসনসোলে class, যখন দুয়ারে দাঁড়াইয়া কিন্তু আটকাইয়া বলিতেছে—'জায়গা নহি হ্যায়'। কোনও মানুষই নিছক class বা mass নহে। যাহারা স্থিতি-প্রধান, তাহারাই class-এর সব মানই বিশ্বে বাস্তব-সাম্য"। তাই আজ দরকার মানুষের নৈতিক আদর্শের উন্মেষ সাধন করা। মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে সৎ না হলে আইন করে কোন কিছুকে রোধ করা যাবে না। যত আইনের বেড়া শক্ত করা হবে, কোন না কোন দিক থেকে অজানিতে তাতে ফাঁক বেরিয়ে যাবেই। এতে দেশের দুর্নীতি ও কালোবাজারী বন্ধ হবেনা। তাই দরকার সব কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যের কথাই স্বামিজী তাঁর সমস্ত জীবন ধরে হাজার হাজার মানুষের কাছে বলে গেছেন। তিনি তাঁর এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি উজ্জ্বল ভারতের কল্পনা করে গেছেন। তাঁর গড়া সেই উজ্জ্বল ভারতের এই রকম আদর্শ হবে—একান্ত নয় বা একান্ত নারায়ণ কেউই এখানে প্রধান থাকবেন না। কেননা একান্ত নয় বা একান্ত নারায়ণ কেউই সমগ্র বিশ্ব সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তাই উজ্জ্বল ভারতের ইষ্ট হবেন নরনারায়ণ। তাঁর কল্পিত এই উজ্জ্বল ভারতের ধর্ম হবে সর্বধর্ম সমন্বয়। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি সকল ধর্ম পরস্পরের মধ্যে গলে গিয়ে একধর্মে মিলে যাবে, তখন ধর্ম সম্বন্ধে কারও সঙ্গে কোন বিরোধ থাকবে না। এই উজ্জ্বল ভারতের নর নারীর সম্বন্ধের কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—নর নারীর সম্বন্ধ দুইয়ের সমকক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন একান্ত পুরুষতন্ত্র বা একান্ত নারীতন্ত্র সমাজ কোনও স্থায়ী ফল আনতে পারবে না। পাশ্চাত্য চতুর্বর্ণের সম্বন্ধ নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন এখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের উচ্চতর জীবনের সঙ্গে থাকবে একটি সখ্য ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। এখানকার অর্থনীতির কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন অর্থনীতির প্রেরণা গ্রহণ করতে হবে 'মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্'—উপনিষদের এই মহা বাণী হতে। 'লোভ করো না, ধন কারও একচেটিয়া নয়। ধন বিশ্বের, ধন বিশ্বেশ্বরের'—এটাই ভারতের আদর্শ। উজ্জ্বল ভারত ধনিক শ্রমিক পরস্পরকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে সহযোগিতার দ্বারা নূতন সমাজ গড়ে তুলবে। এখানে শ্রেণী সংঘর্ষ বলে কিছু থাকবে না। উজ্জ্বল ভারত শ্রেণী সমন্বয়ের পথ ধরে চলবে।

সর্বশেষে স্বামীজীর মতে উজ্জ্বল ভারতের 'সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তি হবে পল্লীগ্রাম। সহর থাকবে এখানে পল্লীর সেবক। পল্লীই বাস্তব সত্তা, সহর একটি idea মাত্র। এই পল্লীসভ্যতাকে গড়ে তুলতে হলে অর্থমানবকে কৃষি মানের সেবক রূপে স্থাপন করতে হবে। কৃষিজাত দ্রব্যের মান বাড়িয়ে তুললেই সম্ভব হবে পল্লী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা'।

স্বামীজীর কথা লিখতে বসলে বহু কথাই তুলে ধরতে

ইচ্ছে করে। অল্প সময়ের মধ্যে সব কথা বলা সম্ভব নয়। আজ শুধু বলতে ইচ্ছে করে স্বামীজীর মত একজন ঋষি বাঙলাদেশের এই ছোট গ্রামটির একটি খণ্ডের মধ্যে বহুকাল বাস করে গেছেন, আজ সেই খণ্ডও তাঁর চরণস্পর্শ পেয়ে একটি তীর্থস্থানে পরিণত হতে চলেছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রম—যার বুকে তিনি আজ সমাহিত হয়ে আছেন—একদিন সেখান থেকে প্রচারিত হবে তাঁর সেই বৈদান্তিক বাণী, এ আকাঙ্ক্ষা তিনি রেখে গেছেন। মানুষ একদিন এই অমূল্য রতন খুঁজে বের করতে নরনারায়ণ আশ্রমে আসবে। আমি বিশ্বাস করি তাঁর প্রচারিত ধর্ম এ যুগের মানুষকে সুস্থ ও উন্নত জীবন যাপন করার পথ দেখাবে। মানুষ এই নূতন চিন্তাধারার সন্ধান পেয়ে ধন্য হয়ে যাবে। আজ স্বামিজী আর দেহে না থাকলেও তাঁর অনুরক্তরা তাঁর এই চিন্তাধারাটিকে রক্ষা করে যাচ্ছেন। তাই আজ ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে যে যেখানে আছেন সবাইকে এই আহ্বান জানাই, আসুন আজ আমরা ধনী দরিদ্র জাতি-কুল সব ভুলে গিয়ে এই নূতন ভাবের আহ্বানে সাড়া দিতে মিলিত হই। এতে ধন্য হব আমরা, ধন্য হবে দেশবাসী, ধন্য হবে বিশ্ববাসী।

—অন্তরিন্দু—

পঁচাশীতম জন্মদিনে

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

ওঁ নমঃ ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি
প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে-ভগবৎ-পুরুষোত্তমায়
নিত্যগোপালায়।

ওঁ অজানুলম্বিত ভুজ কনকাবদাতম্
সঙ্কীর্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষম।
বিশ্বেপ্রেমদান নরনারায়ণ-সেবৌ
বন্দে সমন্বয়-গুরুং পুরুষোত্তমানন্দম্ ॥

আপনারা যারা এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজকে আমাদের কুণ্ঠোকুণ্ঠঃ প্রণাম জানাই; যারা আসেন নি—দূরে থেকেও আজকের এই শুভ দিনে যারা তাঁকে স্মরণ করছেন—তাঁদের সঙ্গেও সম্মিলিত হয়ে আমাদের প্রণাম নিবেদন করি। আর প্রণাম করি—আমাদের সবার সত্তার সবটুকু দিয়ে—প্রণাম করি পুরুষোত্তমানন্দ-জীবন-দেবতা সমন্বয়মূর্তি ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যগোপালকে। আজকের এই দিনকে স্মরণ করে যারা এসেছেন তাঁদের আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাই। শ্রীমৎ স্বামিজীকে আপনারা অনেকেই দেখেছেন, অনেকে হয়তো দেখেন নি—তাঁর পবিত্র দেহ নরনারায়ণ আশ্রমের মাটির নীচে সমাহিত হয়ে আছে—তারই উপরে এখানে শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেবের সেবাপূজা হয়ে থাকে। শ্রীশ্রীনিত্য-গোপালেরএই পূজাস্থানে আপনাদের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

ভারতবর্ষ সাধুর ধনি—অথচ ভারতবর্ষের মানুষ সাধারণভাবে অমানুষ একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। আজ যে ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ও অন্নের বিপর্যয়ের সামনে বসা যেতে পারে ঘৃণ্য জীবন যাপন করছে—এ অবস্থা থেকে এত বড় আত্মিক শক্তিসম্পন্ন একটা জাতি রক্ষা পেল না কেন? পেল না কেননা লক্ষ লক্ষ ভারত-বাসী মনে করে থাকেন পারিবারিক সামাজিক বা রাষ্ট্রিক জীবনে যত বড় বিপর্যয়ই আসুক না কেন—ওটা একটা বিপর্যয়ই নয়, ওর জন্য কোন মাথাব্যথার প্রয়োজন

নেই—আত্মার মুক্তি হলেই হল। এ রকম মনে করার কারণ আমাদের জীবনকে যা পরিচালিত করে সেই 'দর্শন'ই আমাদের এই কথা শিখিয়েছিল। মহাত্মা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ ইদানীং কালের মধ্যে সেদিন প্রথম সমাজ ও দেশকে বাঁচবার মন্ত্র শোনালেন। রবীন্দ্রনাথ তাই লিখলেন, 'জীবনে তোমাকে পূজিতে'—ভগবানকে জীবন দিয়ে, জীবনের আচরণ দিয়ে পূজা করতে হবে—বাস্তব জীবনে যদি তাঁর পূজা না হয়—শুধু মনে মনে কোণের সাধনায় মানুষ মানুষ হয় না, যে জন্যই আমরা বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে মানুষ নামের পরিচয় দিতে পারছি না—আমাদের আদর্শ যত বড়ই হোক। বাস্তব কর্মময় জগতে তাকে আমরা রূপ দিতে পারি নি। স্বামী বিবেকানন্দের বজ্র গুরুর আহ্বানও আমরা শুনেছিলাম, ওঠ, জাগ, মানুষ হ। ধর্মকে তিনি অনেকখানি ব্যাপকতর ধারণা দিয়ে জীবনের ক্ষেত্রে এনে দেশের মানুষের কাছে উপস্থিত করে গিয়েছিলেন। আর ঋষি অরবিন্দের Life Divine-এর কথাও এ দেশ শুনেছে। অথচ আজও ভারতবর্ষের মানুষ সাধারণভাবে মানুষ নামের যোগ্য নয়, ভারতবাসীর বাস্তব জীবন আজও ব্যর্থ।

কেন এমন হল? এর কি কোন সমাধান দেওয়া যায়?

সেই সমাধান দিতে আজ থেকে ১১৩ বৎসর আগে যোগাচার্য সমন্বয়মূর্তি ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের আবির্ভাব। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও দর্শনের ব্যাখ্যাতা। সেদিন রামমোহন থেকে পর পর যারা গতিধর্মী বাস্তব জীবনকে মেনে নিয়ে তাকে সুন্দর ও সুন্দর করে গোড়া তোলার কথা বলে আসছিলেন, তাঁদের বাস্তবধর্মী চিন্তাধারার সঙ্গে সনাতন ভারতের বর্ণাশ্রমীয় ধর্মীয় আদর্শের যে পার্থক্য হয়ে গেল—সে পার্থক্যকে তাঁরা কোন দার্শনিক সমাধান দিয়ে তাঁদের চিন্তাধারাকে শক্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে যান নি। তাই বুদ্ধদেবের মত অত বড় গতিধর্মী মহাপুরুষ তাঁর মতবাদ নিয়ে ভারতবর্ষের সনাতনত্বের থাকায় এদেশে টিকে থাকতে পারে নি। সনাতনী আদর্শের স্থিতি-ধর্মী মনিয়াদকে দার্শনিকভাবে ধ্বসাবার চেষ্টা না থাকায় সে মনিয়াদকে তাঁরা বিশেষ নড়াতে পারেন নি। তাঁদের চিন্তাধারা নিয়ে তাঁরা আলাদা সম্প্রদায় স্থাপন করে গেছেন—কিন্তু তথাকথিত সনাতনী বিশাল হিন্দু সমাজ যেমন তেমনটিই রয়ে গিয়ে ছিল। এইখানে শ্রীনিত্য-গোপালের অভিনব আবির্ভাব। তিনি আলাদা কোন মতবাদ বা সম্প্রদায় স্থাপন করতে আসেন নি। তাঁর আগে যারা জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলবার কথা বলবার চেষ্টা করে করে আধ্যাত্মিকতাকে অনেকখানি পরিষ্কার করে আসছিলেন, শ্রীনিত্যগোপাল সেই প্রচেষ্টাকে সামগ্রিকভাবে এবং দার্শনিক ভাবে রূপ দিয়ে প্রস্থাপন করে গেলেন। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের আলোতে বস্তুর যে স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে, তাকে তিনি তাঁর সমগ্র জীবন-দর্শনের মধ্যে এনে পরস্পর বিপরীতের মধ্যে সমন্বয় প্রস্থাপন করে একটা সামগ্রিক দর্শনের সূত্র রেখে গেছেন। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বেদান্ত গীতা ও এদের থেকে উপনিষদের ভাষ্য নিয়ে তাকেই দার্শনিক কাঠামোর মধ্যে রূপ দিলেন। জীবনটাতে পরস্পর বিপরীতের সমন্বয় ওতপ্রোত হয়েই আছে, সমস্ত সৃষ্টি জুড়েই তাই—কিন্তু এই জীবনের দৃষ্টান্তের দিকে না তাকিয়ে ধর্ম বা দর্শন বা আদর্শকে শুধুমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য চিন্তাশীলতার ব্যাপার করে ফেলাতে বাস্তব জীবনটা একেবারে বাদ পড়ে গিয়েছিল—তার বাইরে দাঁড়িয়ে আমরা বড় বড় আদর্শের বুলি আওড়িয়ে এসেছি এতকাল। তাই এক দিক দিয়ে অত্যন্ত উচ্চ চিন্তার অধিকারী হয়েও বাস্তব জীবনে ভারতবাসী নানা ভাবে ব্যর্থই ছিল। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এই ব্যর্থতার দীনতা ঘোচাতে বাস্তব ও আদর্শকে এক সামগ্রিক জীবনবাদের দর্শনের মধ্যে প্রস্থাপন করে একটা বিরাট অভাব পূরণ করে গেছেন।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের থেকে ভারতবর্ষের সামনে সমস্যা অনিবার্য কেননা সে ছিল আকাশের দেবতার উপাসক—বাস্তবকে নিয়ে নিজেকে সে বিস্তৃত করে নি—

হয়তো সেদিন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তার সব জীবন-ধারা একেবারে ওলটপালট হয়ে গেল—আজ তার সব সমাজ রাষ্ট্র বা ব্যক্তি-জীবন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে—এই রকমই চললে কোথায় তার মহত্ত্ব, কোথায় বা তার সৌন্দর্য, কোথায় বা শান্তি! আজ ভারতবাসীর পেটে কেবল যে অন্ন নেই তা নয়, তার কি শান্তি আনন্দ মহত্ত্ব কিছুই আছে? আর প্রাণপণ খেটে যদি সে অন্ন না পেত, সংস্কারে সমষ্টিজীবন যাপন করবার প্রেরণা যদি তার থাকত—তবে অন্নহীনতাই একদিন দোষেরও হত না। আজ পর্যন্ত ভারতবাসী যেমন যে কর্মকুণ্ঠ তা নয়, ব্যক্তির জীবনে সমষ্টি-বোধ তার এখন পর্যন্ত একেবারেই জাগ্রত হয় নি। প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য উভয় সভ্যতার মধ্যে সে বিপর্যস্ত—যেমন বা বহিরঙ্গে সে যতই জড়বাদের সভ্যতার অনুকরণ করুক না কেন, তত্ত্বের ক্ষেত্রে যারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তাদের মত কর্ম-নিপুণতা বা কর্ম-প্রবণতা কিংবা জাতীয়তাবোধ কি ভারতবর্ষ অর্জন করতে পেরেছে? এ কথা আজ মানতেই হবে যে, এতদিন যারা নিপীড়িত ছিল, যতই মর্যাদা ছিল না বলে যারা অপরের স্বার্থরক্ষার জন্যই শুধু বেঁচে ছিল—সেই সব শ্রমিক, নিরক্ষর ও নারী আজ যে প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি ও আচরণ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সমাজবিধ্বংসী উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করছে, এ জীবন কিছুতেই সত্য সুন্দর বা কল্যাণপ্রদ নয় যেমন ছিল না এতদিনকার vested interest-ওয়ালাদের—ধনিক, কুলীন, পুরুষের—শোষণমূলক জীবনাচরণ। এ দুইয়ের সামঞ্জস্য আজ করতেই হবে। এই সামঞ্জস্য করার দর্শনই দিয়ে গেলেন শ্রীশ্রীনিতাগোপাল ও শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমানন্দ।

এই সব সমন্বয়ের চিন্তাধারা ব্যাপক ও গভীর—কিন্তু একে জীবনের মধ্যে, জীবনের চলার বলার খাওয়ার পরার আচারে আচরণে রূপ দিতে পারা অত্যন্ত দুরূহ। স্বভাবের অনুযায়ী বলে এই জীবন-দর্শন যেমন সহজ, আবার মানুষ সাধারণতঃ কোন একটা জায়গায় আটকে যায় বলে এ চিন্তাধারা আয়ত্ত করা খুব কঠিনও বটে। সব সংস্কার-মুক্ত হওয়া অথচ উচ্ছৃঙ্খল না হওয়া, কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম জীবনের এই সব বৃত্তিকে সুসমঞ্জস রূপ দেওয়া, শুধু নিজের জন্য না বেঁচে বিশ্বের মানুষের সঙ্গে সমস্বার্থ হয়ে বাঁচা, বিশ্বেশ্বরের জন্য বাঁচা—এ সব কি সোজা কথা? মুখস্ত করা বুদ্ধি বিদ্যায় তো জীবনে এই ছন্দ প্রস্ফুটিত হয় না—হয় শরণাগতির প্রাণ-প্লাবনের মুক্ত স্রোতে। শ্রীশ্রীনিতাগোপালের এই চিন্তাধারায় শ্রীকৃষ্ণই শুধু বিশ্বরূপ নন, প্রত্যেক মানুষ বিশ্বরূপ। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন সম্ভব এই বিশ্বরূপের স্তরেই। মানুষ যখন তার অন্তর্নিহিত অনন্ত সম্ভাবনাকে রূপ দেবার বিনম্র শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়ে চলে এবং যখন সে জানে যে সমগ্রের সে এমন এক অংশ যে নিজে স্বতন্ত্র হয়েও সমগ্রের মধ্যে স্থিত এবং সে 'সমগ্র' দেশকাল-পাত্রে সীমিত নয়—তখনই সে বিশ্বরূপ হওয়ার পথে দাঁড়াল—এই পথে দাঁড়ালে এই পথের পথিকের সঙ্গেই মানুষের মিলন সম্ভব সত্য ও সার্থক। প্রত্যেক মানুষের নিজেকে প্রস্ফুটিত করে তোলার সাথে সাথে সর্বের সাথে মিলনের প্রচেষ্টা নিয়েই চলতে হবে—প্রথম থেকেই যেমন আদর্শ বাস্তবের সমন্বয়ের পথে চলতে হবে, তেমনি প্রথম থেকেই ব্যক্তি-উন্নতি ও সমষ্টি-উন্নতির মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে।

সর্ব সমন্বয়ের এই ছন্দ রূপ পেয়েছে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক কত মধুময় হতে পারে, তার পেছনে থাকতে পারে কী গভীর প্রশান্তি আর কি গভীর একাত্মতাবোধ আর সেই সঙ্গে প্রতি মানবের প্রতি কী গভীর মর্যাদা দান অথচ সর্বাবস্থায়ই কি গভীর মুক্তি—এই সবেরই এক অদ্ভুত সুষ্ঠাম উদাত্ত ছন্দময় মূর্তিমান দার্শনিক শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত! বর্তমান সময়ের মানুষে মানুষের সম্পর্কের বীভৎস অসম্মানকর চিত্র দেখে দেখে ক্লান্ত পরাণ কেবলই স্মরণ করে শ্রীমৎ স্বামিজীর সেই একাত্মতাময় ও মর্যাদাদান-কারী জীবনকে। আজকের দিনে কারো সঙ্গে কারো মতের মিল তো নেই-ই, মনের মিলও নেই—নেই এতটুকু একাত্মতা, যেমন নেই তেমন শ্রদ্ধা প্রীতি ভালবাসার

ঔদার্য, সর্ব দেশে সেই অপরের প্রতি সেবাবুদ্ধি। এই সব পরিবেশে শ্রীমৎ স্বামিজীর বিশাল উদার হৃদয়ের কথা স্মরণ করি। আজ তাঁর এই ৮৫-তম জন্মোৎসব দিনে তাঁর সেই সত্তাকে স্মরণ করি, প্রণাম করি, তৃপ্ত হই, স্নিগ্ধ হই।

শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজ মানুষকে ভালবেসেছিলেন, কিন্তু এইটুকুই সব চেয়ে বড় কথা নয়। মানুষকে তিনি মর্যাদা দিয়েছিলেন—মর্যাদা দিয়েছিলেন ছোটকে—সেইটাই বড় কথা। বস্তুতঃ, যোগ্যকে মর্যাদা দিতে পারাটা তেমন কঠিন কাজ নয়—যদিও অপরের দুঃখে দুঃখী হতে পারাও সাধনাসাপেক্ষ—তথাপি যারা ছোট, যারা সংসারে অযোগ্য, গৌরব করবার যাদের কিছুই আছে বলে বাইরে থেকে দেখা যায় না, তাদেরও মর্যাদা দিতে পারার মত কঠিন কাজে করার হৃদয়ের বিশালতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ছিল। যাদের গৌরব করার মত কিছু নেই তাদের আবার মর্যাদা দেওয়া কি রকম? আপনার আমার চোখে তাদের কিছুই নেই বটে, কিন্তু মহৎ যে প্রাণ সে প্রাণ কিছু না থাকার আবরণের মধ্য থেকেও ব্রহ্ম-প্রাণকে দেখতে পান, তাকেই মর্যাদা দিয়ে তাকে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পান! অকিঞ্চিৎ-করকে মর্যাদা দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে প্রযত্নশীল শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের সেই মানমানবারী হৃদয়কে স্মরণ করে তৃপ্ত হই, স্নিগ্ধ হই, শান্ত হই।

যাইহোক, জীবনকে দেশকালপাত্রে সীমিত না করে যে বিরাট ব্যাপক পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে দেখবার আহ্বান আজকের আকাশে বাতাসে, 'এক-জগৎ' রচনায় সেই দার্শনিক ভিত্তি-ভূমি ভারতের মাটিতে তৈরী করে দিয়ে শ্রীনিতাগোপাল ও শ্রীমৎ স্বামিজী ভারতবর্ষ তথা বাঙ্গালা দেশকে এক নূতন জগতের দ্বারদেশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছেন।

এ অবস্থাটা বোঝা সহজ নয়; সাধারণ স্তরে এ অসাধারণ। তাই শ্রীশ্রীনিতাগোপাল শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ আজও অপরিচিত রয়েই আছেন—তবে মার্কসবাদকেই শেষ সিদ্ধান্ত ধরে খুঁটি না খেকে যারা সামনের দিকে এগিয়ে আসতে চান, তাঁদের মধ্যে যাঁরাই গতিধর্মী অথচ সংগঠনাত্মক এই চিন্তাধারার সন্ধান পেয়েছেন, তাঁরাই এর অনন্ত অনন্তসম্ভাবনার সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হয়েছেন। দুই শিবিরের বদ্ধ-দ্বার মুক্ত বিশ্ব বাঙ্গালীর হাত থেকে এই চিন্তাধারা পেয়ে সত্তাতার সন্ধিল আবর্তের মধ্যে এক স্থিতিভূমি খুঁজে পাবে। সেইখানে শ্রীশ্রীনিতাগোপাল-শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ধন্য, সার্থক। আমরা যেন তাঁদের জীবনকে আমাদের জীবন দিয়ে গ্রহণ করতে পারি—তাঁদের কাছে আজকের দিনে এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

'মানুষের জন্য ধর্ম এবং ধর্মের জন্য মানুষ—দুই-ই সত্য হইতে পারিত যদি ধর্ম বলিতে বিশেষ কোন ধর্ম না বুঝাইয়া সর্বধর্মসমন্বয়ই বুঝাইত। সর্বধর্মসমন্বয়ই মানুষের স্বধর্ম। প্রতি মানুষ এই হিসাবে স্বধর্মী, সর্বধর্মী। .....ইহাও সত্য যে প্রত্যেকটি ধর্মই স্বয়ংপূর্ণ, উহা ঐ সম্প্রদায়ের সকল স্তরেরই আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও তুল্যভাবেই সত্য যে, কোনও বিশেষ দেশ-কাল-পাত্র বা বিশেষ দৃষ্টিকোণের মধ্যে সমগ্র মানবসমাজকে, এমন কি কোনও বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানুষকেও আটকাইয়া রাখা যাইবে না। সব বিশেষত্বকে ছাপাইয়া অখণ্ড বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানব ও মানবসমাজ আগাইয়াই চলিয়াছে, চলিবেও।'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-কৃত মহাত্মাজীর গঠনকর্ম পদ্ধতি

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও সমন্বয়বাদ

পঞ্চাশীতম জন্মোৎসব দিনে আলোচনা অবলম্বনে

॥ শ্রীহৃষীকেশ সে ॥

রাজা রামমোহন থেকে আরম্ভ করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র পর্য্যন্ত গিয়েছে এক স্বর্ণযুগ। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও সাহিত্যে—বিপ্লব, সংঘাত ও সংঘর্ষের যুগ, কল্যাণময় সংগঠনের যুগ। সেদিন যা ভাঙা হয়েছে পরবর্ত্তী কালে ভারত তাই গ্রহণ করেছে। নেপুণ্য কর্মযোগিনার দেবে যেমন অবসাদ আসে দেশে এখন সেই অবস্থা।

এই বিগত স্বর্ণযুগের একটি সুবর্ণদীপ ছিলেন বাখরগঞ্জ জেলার শরৎকুমার ঘোষ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, রাজনৈতিক বিপ্লবী, ধনদেবক, ধর্ম সংস্কারক, সুবক্তা সুধী, যোগী ও আদর্শ অবধূত। তাঁর বক্তৃতা শুনে দেশবন্ধু বলেছিলেন, 'আপনার বক্তৃতায় সহায়তা পেলে আমি সমস্ত দেশকে আমার পিছনে নিয়ে যেতে পারি।' তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনে মহাত্মাজী বলেছিলেন—'শরৎবাবু আমার চেয়ে সন্ন্যাসী ছিলেন তবে'। সর্বতোমুখী প্রতিভাধর, অক্লান্ত দেশকর্মী, প্রেমময়, সংস্কারমুক্ত ছিলেন শরৎকুমার।

বাখরগঞ্জ জেলার কাঁঠালিয়া গ্রামে ১২৯০ সালে ৪ঠা কার্ত্তিক শরৎকুমার জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নীলকমল ঘোষ, মাতা মুক্তকেশীদেবী। ষোলসে এক প্রেমময় সন্ন্যাসী হয়েছিলেন সেদিন, বাপমায়ের ইচ্ছাকে পূরণ করে বিবাহ করেছিলেন উমাঙ্গিনী দেবীকে ১৩১০ সালের অগ্রহায়ণে। শিক্ষকতা করেছেন, উপার্জন করেছেন। মহাত্মাগান্ধী-কর্মনীতি পরিপূরক রাজনীতি, ও নীতিধর্ম তাঁকে সংস্কারক ও বিপ্লবী করে তুলল। তিনি হলেন রাজনৈতিক কর্মী, বিপ্লবী, বক্তা ও অবদাতক। এর মধ্যেই তিনি পেয়েছিলেন সমন্বয় দীক্ষা লোকাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ (বিদ্যাগোপাল) দেবের কাছে ১৩১২ সালের ১০ই অগ্রহায়ণ। তাঁর সন্ন্যাস নাম হয় অবধূত শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ।

ভারতের সমাজদেহে ধর্ম এমন গভীরভাবে প্রবেশ করেছে যে ধর্মকে বাদ দিয়ে, তাকে উপেক্ষা করে এখানে কিছু করা যায় না। নানা মত ও পথের আধিক্যের হয়েছে। তার অনুবর্ত্তীরা আত্ম, গোঁড়ামি ও সংস্কারবদ্ধতার পরিণামে ধর্মকে করেছে দুর্বল, জীবনকে করেছে অসুখকর, দীনহীন।

অধ্যাত্মচারণ ব্রহ্মসূত্রের যুগ থেকে বলে আসছে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। এ কেমন মিথ্যা তলিয়ে দেখল না অনুবর্ত্তীরা, মায়াবাদে দেশ তামসিকতায় ডুবে গেল। জগৎকে অস্বীকার করার ফলে জগৎও হিন্দু সমাজকে দিল তার প্রাপ্য শাস্তি। এগার শত বৎসর পাঠান, মোগল ও ইংরাজের অধীনে আমরা দুঃখ ও অত্যাচার ভোগ করলাম। আমার ভোগবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে চেয়ে দেখুন সেখানে ঈশ্বরকে cold storageএ পাঠিয়ে মানুষ নিত্য নতুন ভোগ্য পণ্য সৃষ্টি, আরাম ও অধিকারের লালসায় উন্মত্ত, দাও দাও আরো দাও, চাই আরো চাই; আমার যা আমাদের চাই সুখ, ঐশ্বর্য, বিলাস, অধিকার, প্রভুত্ব—বাহিরের জগৎ রসাতলে যায় যাক। তার ফলে হয়েছে অশান্ত বিক্ষুব্ধ জীবন, স্নেহহীন পরিবার, অবহেলিত বার্দ্ধক্য, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, হানাহানি কাটাকাটি। এক পায়ে যেমন চলা যায় না তেমন জগৎকে বাদ দিয়ে কেবল ব্রহ্ম সত্য, আবার ঈশ্বর ও ধর্ম বাদ দিয়ে সুখ ও ভোগের জন্য সব—এর কোনটাই সদ্গতি, সত্যগতি নয়। জীবনের সামগ্রিক অগ্রগতি এতে রুদ্ধ হয়ে যায়।

মনবুদ্ধি যখন বিচার করতে বসে সে তখন সব ভেঙে-চুরে একটা শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চায়। সে বলে—হয় জগৎ সত্য ব্রহ্ম মিথ্যা, নয় জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য। হৃদয় বলে—যদি জগৎ মিথ্যা হবে, তুমি, আমি, আচার্য সবই মিথ্যা তবে ব্রহ্মকে জানছে কে? কে করছে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা? সমন্বয়ী সত্যদ্রষ্টা ঋষি বললেন—দুইই সত্য। জগৎ ঈশ্বরের লীলারূপ তরঙ্গ যেমন সমুদ্রের লীলা। তরঙ্গ পরিবর্তনশীল, জগৎ গতিশীল। সমুদ্রের তরঙ্গ ঈশ্বরের জগৎ। এই দুয়ের যেখানে সমন্বয় তার নাম পুরুষোত্তম অবস্থা—দৈবী মায়া, ব্রহ্ম-মায়া যাই বলুন। একই সাথে জগৎ ও ব্রহ্ম অবিরোধে পূর্ণ সত্য। তেমনি ব্যবহারিক জগতে যাকে আমরা জড় বলি, অনাত্ম অচৈতন্য বলি, যাকে বৈত অনিত্য বলি তা কেবল বোঝার ভুল। আছে এদের সমন্বয় দৃশ্যতঃ বিপরীতের সঙ্গে। শ্রীনিত্যগোপাল ও তাঁর যোগ্য উত্তর সূরী পুরুষোত্তমানন্দ সারাজীবন বলে গিয়েছেন—আছে সমন্বয় নিত্যে অনিত্যে, জড়ে অজড়ে, সাকার-নিরাকারে, চৈতন্য-অচৈতন্যে, ব্রহ্ম-মায়ায় বৈত-অবৈতে। জীবনকে যে অবস্থায় আনতে পারলে এই সত্যের স্ফূর্তি হয় তার নাম পুরুষোত্তম অবস্থা। এই অবস্থার উন্নয় হোলে মানুষ হয় বিশ্ব নাগরিক। এই অবস্থা পরিণত হলে মানুষ হয় সর্ব-সংস্কার মুক্ত প্রেম-স্বরূপ অবধূত। শ্রীনিত্যগোপাল নিজেকে বলতেন "আমি বিশ্ব নাগরিক", তাই তিনি অবধূত।

অবধূতের আদর্শ হচ্ছেন শিব, তিনিই আদি অবধূত, সর্ব সংস্কার মুক্ত প্রেমময় গৃহী-সন্ন্যাসী, যোগী-ভোগী।

ন যোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী
ন বীরো ন বীরো ন বা সাধকেন্দ্র
ন শৈব ন শাক্ত ন বা বৈষ্ণবশ্চ
সর্বত্রৈবধূতো দ্বিতীয়ঃ মহেশঃ ॥

সংসারের আদর্শ হবে শিবের সংসার, সমন্বয়বাদীর মতে। কেবল মাত্র ধর্ম-জগতের সকল নীতির, পথের, মতের সমন্বয় নয়,—রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এতদিন নারী পুরুষের ভোগ্যা, সেবিকা ও দাসী বলে গণ্য হোত। কোথাও বা তাকে আত্মাহীন মনে করা হোত। কোথাও বা তার মূল্য কয়েকটা গরু বা উটের সমান ধরা হোত। ফলে সেই সেই দেশে নারী সাধারণ ভাবে সুসন্তান দান করতে পারেনি। জন্ম হয়েছে মৈথিক শক্তিশালী আধিপত্য লোভী সন্তানের। আবার কোথাও বা পুরুষ কেবল মাত্র নারীর অঙ্গস্পৃহীত তৃপ্তার্থং, সন্তান উৎপাদনের সহায় মাত্র। এখানেও সমাজ অচল, পঙ্গু উন্নতিহীন। স্বপ্রতিষ্ঠ স্বাধীন নর নারীর কথা থেকেই আমরা আদর্শ মানুষের আবির্ভাব পেয়েছি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের পশ্চাতে আমরা দেখতে পাই এক একটি শ্রেষ্ঠ প্রেমময়ী সার্থবাহিনী নারীর বিপুল প্রভাব। কাজেই নারী ও পুরুষ যদি যে যার যোগ্য মানে ও অধিকারে পরস্পরের সঙ্গে প্রেমে, সেবায়, কর্তব্যে ও বীর্যে মিলিত হয়, সেই সমন্বয়ী সমাজ হবে আদর্শ। ধনের ক্ষেত্রেও তাই। প্রত্যেকটি মানুষই এক্যাধারে ধনী ও দরিদ্র। একটা টাকার জন্য মানুষ খুন হয়। অতি বড় সাম্যবাদীও ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য ও সুখের জন্য চেষ্টাপরায়ণ। সাম্যবাদী সমাজের প্রথম পরীক্ষা ক্ষেত্র ও সার্থক প্রয়োগ ক্ষেত্র বলিয়াতেও আজ কোন কোন প্রকারের ব্যক্তিগত সম্পদ রাখতে দেওয়া হয়েছে, সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব খুলতে দেওয়া হয়েছে। যে দেশে শিক্ষা, খাদ্য, বাসস্থান এমনকি ভ্রমণ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা করে, সেখানেও বুদ্ধিমান মানুষ অসুখে বাজেয়ে প্রয়োজনমত ব্যয় করার অর্থ-সামর্থ্যের আবশ্যকতা-বোধ করে। নিত্যকার আয় থেকে ব্যয় বাঁচিয়ে সঞ্চয় করা ছাড়া তা সম্ভব নয়। কেউ যদি আজকের উপার্জন কেলাছড়া করে ভোগ করে উড়িয়া না দিয়ে অলস উপার্জন নিরুপার্জন বা অসুখ বিপদের হিসের জন্য কিছু সঞ্চয় করে, সাম্যবাদী বলিয়া আজ তাকে অপরাধ বলছে না। সে স্বীকার করেছে সকল মানুষের স্বভাব-ধর্ম। তাই বলে একজন বুদ্ধিমান, কৌশলী এবং সুবিধা প্রাপ্ত ব্যক্তি সমাজকে বঞ্চিত করে ধনের পাহাড় তৈরী করে তার উপর থেকে সবার উপরে প্রভুত্ব করবে এত

হওয়া উচিত নয়। এখানেও সমাজের রীতি ও নীতির দৃষ্টি সীমা বেঁধে দেওয়া দরকার। অতি ধনী বা চরমের দারিদ্র্যের মধ্যে কেউ না পড়ে। সমস্ত দেশের সর্বসম্মত জাতীয় আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক মানুষের একটা নিম্নতম জীবন যাপনের মান (minimum standard of life) বেঁধে দিতে হবে। যে যত দুর্বল কর্মী হোক সবাই এটা পাবে, আবার পরবর্তী উত্তরাধিকারীকে মাত্রাহীন ধনী করে রাখবার অধিকারও কারো থাকবে না। এখানেও চাই সমন্বয়।

রাজনীতির ক্ষেত্রে আজ আমরা একটা কথা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত হতে শুনি তা হচ্ছে classless society —শ্রেণীহীন সমাজ এই কথাটার অর্থনৈতিক দিক কি অদ্ভুত বিশ্লিষ্ট তা ইতিমধ্যেই বোঝাতে চেষ্টা করেছি। প্রত্যেকটি মানুষ আজ যে যে-কোন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা, ঝোঁক (propensity), প্রতিভা, সেবার যোগ্যতার পৃথক, অথচ এটা মনস্তত্ত্ব চরিত্রের ভিত্তিগত অভাব যে সে চায় বর্তমান অবস্থা থেকে উন্নতি, নাম-যশ প্রতিষ্ঠা, অধিকতর সুখ ও ক্ষমতা। এই কামনা-গুলি কারো মধ্যে বেশী কারো কম, কারো কোনোটা বেশী অন্যটা কম এমন ' কাম ব্যক্তি বহু কোটির মধ্যে এক আধজন। সবাই যদি কারখানার শ্রমিক, ক্ষেতের মজুর, আফিসের কেরানী বা আরক্ষা বাহিনীর লোক হয় সমান বেতন, সমান আহার পরিচ্ছদ এবং শিক্ষক, গবেষক, নায়ক, শাসক, শিল্পী সংগঠক ও পরিচালকদের অন্যদের সঙ্গে একই বেতন একই অবস্থা ঘটে তাহলে এই লোক-নায়ক শ্রেণীর মানুষ কি তাঁদের কর্তব্য যথাযথ পালন করতে পারবেন, না তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণ, বিপদ বরণ ও কঠোর মানসিক শ্রম করার ইচ্ছা হবে? তাঁরা তখন জল সাগরে গা ভাসাবেন। সে অবস্থায় সমাজের এই অগ্রগতি রুদ্ধ হবে। বিশৃঙ্খলা ও দারিদ্র্যহীনতার সমাজ-জীবন পিছিয়ে যাবে। প্রত্যেক সাম্যবাদী রাষ্ট্রে এই শ্রেণীগুলি আছে এবং তাদের যোগ্যতা, কর্তব্য, অধিকার হিসাবে উত্তরোত্তর পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। কাজেই শ্রেণী স্বীকার করতেই হচ্ছে। তবে গলদ কোথায়? গলদ হচ্ছে যদি কোনো একটা বিশেষ দলের বা শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার, শ্রেষ্ঠত্ব ঘরে পড়ে এবং সেই অধিকার বা শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সে অন্য শ্রেণীর উপর অত্যাচার চালায়, সেইখানে। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এইখানে এক বলিষ্ঠ দার্শনিক কাঠামো রেখেছেন। শ্রেণীর প্রয়োজন অনস্বীকার্য এবং শ্রেণীর মানুষ সংখ্যালঘু। এখানেও সমন্বয় করতে হবে। জনমানবের প্রত্যেকের সামনে শ্রম, দক্ষতা, বুদ্ধি, শিক্ষা, প্রতিভা ও নেতৃত্বগুণের পারদর্শন শ্রেণীতে উঠবার সমান সুযোগ থাকবে শ্রেণীর পরিশ্রমের, প্রভুত্ব ও সুযোগ সাধারণের হবে না, শ্রেণীমানব ও গণমানব পরস্পরের প্রতি কর্তব্য বুদ্ধি ও সেবাবুদ্ধিতে এক অখণ্ড সমাজ গঠন করবে।

মনের যে অবস্থায় এই সমন্বয় সম্ভব হয়, তার নাম পুরুষোত্তম অবস্থা। এই পুরুষোত্তম অবস্থাই মানব-সমাজের আদর্শ এই কথা শ্রীরামকৃষ্ণ আজীবন বলে গিয়েছেন। নিজেও সেই আদর্শ জীবন যাপন করেছেন। সমাজের প্রত্যেকটি এমনকি অধিকাংশ মানুষ কোনদিনই আদর্শ পুরুষোত্তম স্তরে আসবে কিনা ভবিষ্যৎই জানেন। কিন্তু যারা সমাজে কোন কারণেই হোক প্রাধান্য পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে এই সমন্বয়ী অবস্থা প্রধানভাবে কার্যকরী হতে পারে। আগামী দিনের ভারতবাসী এই সমন্বয়ী সমাজে মিলিত হলে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, নিত্যগোপাল পুরুষোত্তানন্দের জীবনব্যাপী সাধনা সার্থক হবে।

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

॥ শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেন ॥

আজ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের পুণ্য আবির্ভাব তিথি স্মরণে এই আনন্দ নিকেতনে আমরা সকলে সমবেত হয়েছি। তাঁর আবির্ভাব উৎসবের এই মহালগ্নে তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করছি। এই শুভদিনে যাঁরা এইখানে মিলিত হয়েছেন তাঁদের সকলকে আমি সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

যদিও তিনি নিত্য স্মরণীয়, নিত্য বরণীয় তবুও বিশেষ ভাবে তাঁকে জন্মদিনের উৎসবের মাধ্যমে স্মরণ করার মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য্য আছে আমরা সংসারের আবিলতার কলাপ-পথ থেকে—সত্যের সান্নিধ্য থেকে—নিয়তই ভ্রষ্ট হচ্ছি। এই পরিবেশে তাঁর পুণ্যচরিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনে শুভ মুহূর্ত্তগুলির সান্নিধ্য কিছুক্ষণ লাভ করতে পারি। এই-টুকুই আমাদের পরম লাভ।

জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগের পরম সমন্বয়ের আধার শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের জীবনাদর্শ এত ব্যাপক ছিল যে এই সামান্য আলোচনার মাধ্যমে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। উদার অনন্ত আকাশের মত তাঁর হৃদয় ছিল বিশাল, অসীম সমুদ্রের মত ছিল তাঁর চিন্তাধারার গভীরতা এবং পর্ব্বতের মত অটুট ছিল তাঁর ঈশ্বরভক্তি।

বরিশাল জেলার কাঁঠেরদহ গ্রামে আজ থেকে ৮৩ বৎসর পূর্বে যে শিশু জন্মগ্রহণ করেন, সেই শিশু পরৎ-কুমার ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ছিলেন মূক। মায়ের সাধনায় তাঁর স্তব্ধ ভাষা কল্লোলিত হয়ে উঠেছিল। শিশু পরৎ-কুমার ঘরের কোণে বসে মা মা বলে আকুল হয়ে কাঁদতেন। সেই আকুলতা—এই অশ্রু তাঁর চিরদিনের সাথী। মানুষের জন্য তাঁর বেদনা স্বামীপুত্রহারা শোকের সমবেদনা, বন্দিতা নারীর সাধনায় তাঁর অন্তরাত্মা আকুল হয়ে কেঁদে উঠেছে। তিনি বলেছেন, "ভগবানকে অযাচিত করুণায় পাইয়াছি, তাঁহার জন্য বেশী কাঁদি নাই, কাঁদিয়াছি শুধু মানুষ মানুষ করিয়া"। মানুষের জন্য এই যে বেদনা নরকল্পী নারায়ণের জন্য এই যে আকুলতা—ইহাই ছিল তাঁর জীবনের পরম পাথেয়।

সে যুগ ছিল অগ্নিযুগ। বৃটিশ-শাসিত অবহেলিত লাঞ্ছিত জন্মভূমিকে বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার জন্য অন্তরাত্মার আহ্বানে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। জন্মভূমির সেবায় নিজেকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন। বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর বজ্রকণ্ঠ গর্জ্জন করে উঠেছিল। অসহযোগ আন্দোলনে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট নেতা। সে যুগে তিনি যে তেজস্বিতা ও বীর্যবত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন স্বাধীনতার ইতিহাসে তা বিশেষ অধ্যায়রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তিনি ছিলেন সে যুগে বরিশালের মুকুটহীন রাজা। তাঁর বাগ্মিতায় তাঁর বলিষ্ঠতায় বৃটিশ শাসনের ভিত্তি-মূল কম্পিত হয়ে উঠেছিল। রাজশক্তি তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিল বার বার। কিন্তু কারাবাস তাঁর মননশক্তিকে রুদ্ধ করতে পারেনি, ফলে সে সময় সৃষ্টি হয়েছে বহু অমূল্য গ্রন্থের।

অসহযোগ আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা শ্রীপরৎকুমার যোদ্ধকে যাঁরা দেখেছেন—জেনেছেন, তাঁরা সেদিনই উপলব্ধি করেছিলেন তিনি শুধুমাত্র বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা নন, তাঁর মধ্যে ছিল প্রচ্ছন্ন এক আধ্যাত্মিক শক্তি। সেই দিব্য শক্তি রাজনীতির সংস্পর্শে এসে তাঁর চিন্তাধারাকে আরো বাস্তবমুখী করে তুলেছিল। তিনি সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন বৃটিশ শাসনের অবসানই শেষ কথা নয়। রাজনৈতিক স্বরাজের চেয়ে জনগণের সামগ্রিক স্বরাজের দিকেই ছিল তাঁর লক্ষ্য। দেশবাসীর মনের উন্নয়ন, হৃদয়ের প্রসারতা, চরিত্রের উন্নতি, স্বাবলম্বন

এবং ধর্মের বিকাশ ছিল তাঁর লক্ষ্য।

তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা শুধু পরিবার, রাষ্ট্র ও সমাজকে কেন্দ্র করে হয় নি, পরবর্তী যুগের নিত্যগোপাল-দেবের প্রিয়তম শিষ্য স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ রূপে অধ্যাত্ম-বাদের ক্ষেত্রেও তিনি বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন।

সমকালে যুগী শ্রীনিত্যগোপালদেবের আদর্শের প্রকৃত ধারক তিনি। বিপ্লবকে তিনি এতটুকু বিকৃত করে স্বীকার করতেন না। আপাতবিরোধের মধ্যে তিনি মিলনের সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। ধর্ম শব্দের অর্থ তাঁর কাছে কলহ নয় শুধু, মিলনও। তাই তিনি বিভিন্ন মতাবলম্বী শঙ্করা-চার্য্য, বুদ্ধদেব, রামানুজ, চার্বাক সকলকে একসূত্রে গেঁথে তাঁর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেছিলেন। প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে তিনি প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর কামনা—ধরার ধূলি হোক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্মমানুষ। প্রচলিত অর্থে মায়ার সঙ্গে ব্রহ্মের কোন সম্বন্ধ নেই। মায়ার অতীত হয়ে ব্রহ্মের সাধনা করতে হয়। তাঁর জীবনদেবতা শ্রীনিত্যগোপালদেবের প্রদর্শিত পথে স্থাপন করে গেছেন তিনি ব্রহ্মময়ী সমন্বিত পথ। দ্বৈতাদ্বৈতে সমন্বয়, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই তাঁর জীবনাদর্শ। ব্রহ্ম এবং জগৎ তাঁর কাছে সমান আকর্ষণীয়, সমান পূজ্য তাঁর কাছে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক সকল শক্তিই পুরুষোত্তম অভিসারের সহায়ক।

তাঁর মতে মানুষের মধ্যে জীবনে রাজনীতি, সমাজ-নীতি, অর্থনীতি ও ধর্মনীতির মধ্যে কোনও ভিন্ন নীতি নেই। আমাদের সমগ্রদৃষ্টি লাভ করতে হবে। সমগ্র-দৃষ্টি লাভের অর্থ শ্রীভগবানকে জানা। জ্ঞানের দ্বারা আমাদের জানতে হবে, বিজ্ঞানের দ্বারা আমাদের জানতে হবে। সবিজ্ঞান এই জ্ঞানকে যিনি জেনেছেন, তিনিই পরমেশ্বরকে জেনেছেন। বর্তমানের যুগযন্ত্রণায় মানুষ আজ বিপন্ন বিধ্বস্ত বিভ্রান্ত। বিজ্ঞানের বিভীষণ আর হৃদয়ের আকুতিতে বর্তমানের মানুষ যখন বিপর্যস্ত, তখন তাঁর এই হৃদয় আর জ্ঞানের সমন্বয়ের পথই আমাদের আশার আলো দান করছে, বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করছে। তাঁর সমন্বিত আদর্শ বর্তমান যুগের একাত্মিকতার অভিশাপ থেকে আমাদের রক্ষা করবে।

তিনি সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাই বলে লোকালয় ছেড়ে বনে যান নি, কিংবা আপন মুক্তিকেই শ্রেয় বলে মনে করেন নি। রবীন্দ্র-নাথের ভাষায় তাঁর কথা যদি বলতে চাই তবে বলব "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, সহস্র বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ মহানন্দময়"। এ বন্ধন দেশ ও ধর্মের সেবার বন্ধন। নরনারায়ণ আশ্রম তারই উদাহরণ।

মানুষের জন্য তাঁর সহজ প্রাণঢালা ভালবাসা ছিল। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এ শুধু তাঁর জীবনের আদর্শ নয়—তিনি জীবন দিয়ে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। 'মদাত্মা সর্বভূতাত্মা' এই ছিল তাঁর মনের ভাব। তাঁর জীবন তিনি পরমেশ্বরে উৎসর্গ করেছিলেন, আত্মসুখ থেকে বহুসুখেই ছিল তাঁর আনন্দ অর্থাৎ তিনি ছিলেন ভক্তচূড়ামণি, দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক তথা বিশ্ব প্রেমিক। সর্বত্রই ছিল তাঁর গভীর প্রীতি আর সেবাবুদ্ধি। তাঁর অকৃত্রিম দেশপ্রীতি ও মানবপ্রীতি ভগবানপ্রীতিরই নামান্তর। স্বর্গ ও মর্ত্যের এই ব্যবধান দূর করে স্বর্গ ও মর্ত্য যে অভিন্ন তা প্রমাণ করে বর্তমান যুগের বিচলিত প্রাণে তিনি আশার সঞ্চার করেছেন। নরের মধ্যেই নারায়ণের বাস, নর ও নারায়ণ যে অভিন্ন সে কথা তিনি সারাজীবন প্রমাণ করে গেছেন। নরের আশ্রয় নারায়ণ, আবার নারায়ণের আশ্রয় নর—এই কথাই তিনি বলেছেন, তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের নাম নরনারায়ণ।

তিনি চেয়েছিলেন দেশের মানুষ সুস্থ, সবল, স্বাবলম্বী ও সুখী হোক। এই বিরাট ভারতের একটী সুন্দর ও মহৎ রূপের প্রতিচ্ছবি তাঁর কল্পনায় স্থান পেয়েছিল। তাঁর মতে শিল্পের বিকেন্দ্রিকরণের মধ্য দিয়ে নয় কৃষি-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেশের উন্নতি সম্ভব। দেশের মানুষ দেশের মাটিকে ভালবাসুক এবং ভোগের মধ্যে ত্যাগের মহিমা উপলব্ধির মধ্য দিয়ে তাদের জীবন সফল হোক, এই ছিল তাঁর কাম্য। জীবনকে সহজ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন

দলেই ত্যাগ তাঁর পক্ষে এত সহজ হয়েছিল।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ছিলেন সত্যকারের সাধক। তিনি যেমন ছিলেন তেজোদীপ্ত বীর্যবান পুরুষ, তেমন ছিলেন মরমী, নিগূঢ়ভাষী, অন্তর্মুখী, মরমী, হাস্যপরিহাসপ্রিয় বিনয়ী পুরুষ। তিনি আমাদের মাঝে দিয়েছেন অমৃতের সন্ধান, জীবনচর্যার জন্য আত্মার খোরাক।

আজ মরদেহে তিনি আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু এই পৃথিবীর মানুষের মধ্যে নারায়ণের আবির্ভাব-আকাঙ্ক্ষা রেখে গেছেন। তাঁর এই আশা সফল হোক। তাঁর উদার ও মহৎ আদর্শ বিভ্রান্ত মানুষকে বিচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা করুক এই কামনাই করি। আর যারা উদ্বোধন ভারত ও নরনারায়ণ আশ্রমের ভার নিয়েছেন তাঁদের হৃদয়ে স্বামীজির সমন্বয়নীতির আলোক দীপ্তিমান চির উজ্জ্বল থেকে তাঁদের প্রেরণা দিক এবং স্বামীজির স্বপ্ন তাঁরা সফল করে তুলুন এই কামনাই করি।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৭১)

দৃষ্টি সাজানো ছিল বিলাসিতা—অন্তরের দিকেই ছিল একমাত্র জোর। বুদ্ধদেবের পর থেকে বাইরের দিকটা স্বীকৃতি লাভ করছে। আমাদের দেশে মরলে পুড়িয়ে সেখানে দুর্বা চাপা দেবে—কেউ যাতে বুঝতে না পারে। মঠ মন্দির তোলা বৌদ্ধ প্রভাব-জাত। দুটো দিককে মেলাতে হবে।...আহার কর মনে কর আহুতি দেই জানা যাবে...আহার করাটা বাইরের দিকের কাজ—আহুতি দেওয়া মনে করা ভিতরের দিক।...আহার করাও সেবা হয়—আমি না খেয়ে যাদের আহুতি দিলে সেবা—। বৈশ্বানররূপে যা আছেন উদরে...। এ রকম না হয়ে আহার করা অর্থ পেটুকতাও হয়।...সংসারের লোকে খাওয়া বলে, আশ্রমে প্রসাদ পাওয়া বলে—এটা আশ্রম—বাসা বা বাড়ী নয়।...এখন সংসারটা তো বিশ্ব হয়েই গেছে. সন্ন্যাসীটাও তাই হয়ে পড়েছে।...সোহাই তোমাদের, সেবা কর; একজনের সঙ্গে আর একজনের কাজগুলি চিন্তাগুলি মেলে না তার মানে সেবা হয় না। দেবার মধ্যে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকলেও বিরোধ থাকে না, হিংসা বিদ্বেষ থাকে না...। নিত্যগোপাল, তোমার অসীমে প্রাণমন নয়ে যতদূরে আমি যাই। সংসার সীমার মধ্যে, আশ্রম অসীমে...বৃন্দাবনের সঙ্গে আজকার বাইরের দেশকালের যতখানি ভিন্ন, তবু বিচ্ছেদ ছিল না...। দেশকাল সেখানে বিচ্ছেদ আনতে পারে না।... মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ...তোমার থেকে যখন বিমুখ হই তখন দুঃখের রূপ যে কত গভীর! সে যুগ ২০০কিট না ৫০০ কিট তা জানি না। আশ্বিন আছে তাই।...সন্তানের জন্য রাত্রি জাগলে দুঃখ হয় না—এই প্রাণ নিয়ে বিশ্বকে দেখলেই হয়।...আপনার পানে যখন চায় মানুষ, দুঃখ তখনই। দুঃখের জন্য দায়ী তুমি...। ভগবানের সেবার জন্যও একটা দুঃখ আছে কিন্তু সে দুঃখের স্বরূপ আলাদা। ...যেই নিজের ভাবার কথা কইতে যাবে অমনি বিরোধ সৃষ্টি হয়ে যাবে...। অন্তর যখনি সংকল্প-হারা...যখনই অন্তরের গ্লানি আর সংশয় আসে, তখনই তাঁকে গালি দিও না, বুঝতে চেষ্টা কর যে তাঁকে, তাঁর স্বরূপকে ভিতরে রাখ নি... প্রণাম অর্ঘ আমার দেহ তোমার অনুগত, আমার মন তোমার অনুগত...। অহংকারীর কর্ম কাম, নিরহংকারীর কর্ম প্রেম...আশ্রমের কর্ম অহংকার

ত্যাগে,…। সুখের থেকে যারা আরম্ভ করে তারা সংসারী, দুঃখের থেকে যারা আরম্ভ করে তারা সন্ন্যাসী…। এত দুঃখ আমি সহ্য করেছি যা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না…। আমার আচরণ অনুকরণ করতে যেয়ো না,…যা বলি তাই করো—সাবধান, আচরণ যেন্তে যেয়ো না…। একটা জগন্নাথ ক্ষেত্র রচনা করতে চাইছি—আমার তোমাদের দেবার জন্য…পরমার্থ সম্বন্ধে ঠুনকো মনোবৃত্তি নাই…। এত মান অভিমান সন্ন্যাসে নাই…। অর্থ বোঝ…। পাগলামী করে সংসার হয় না…তিনি একটা অর্থ দিয়ে সংসারটা গড়েছেন…। গান্ধারী বলছেন, সাপে আঙুল কাটলে সে আঙুল যেমন কেটে ফেলতে হয়, মহারাজ, দুর্যোধনকে তেমনি কেটে ফেল—কত বড় দীর্ঘ—মায়ের চরিত্রে এত বড় দীর্ঘ বস্তু বটে।…মায়ের দৃষ্টিতে অমরত্ব আছে—সে দৃষ্টিবার ক্ষমতা দুর্যোধনের নাই—তাই যুধিষ্ঠির যখন অমরত্ব লাভের উপায় বলে দিয়েছিলেন উলঙ্গ হয়ে মায়ের কাছে যেতে যাতে সর্বাঙ্গে মায়ের দৃষ্টির আশীর্বাদ বর্ষিত হয়—তখন সে কথা দুর্যোধন শুনতে পারে নি।…যুধিষ্ঠির শত্রুকেও ফাঁকি দেবে না, তাই দুর্যোধন কিসে অমর হয় তার সঠিক পথই বলে গেল—কী চমৎকার। যতো ধর্মস্তত্তো জয়ঃ। …পেটে ধরলেই সব দোষ ঢাকতে হবে? রাগদ্বেষ বিমুক্ত হয়ে প্রত্যেকটি ঘটনাকে দেখতে শেখ…। পথের ভুল বললে সংসার বিষাদ করবে…ভেদের পথে যেয়ো না…। এখানে আসতে হলে সংসারের প্রত্যেকের সঙ্গে নূতন করে নূতন অর্থে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, নূতন অর্থে জীবনকে ও জগৎকে বুঝতে হবে।…অসীমের ক্ষেত্রে চললে সব একাকার হয়ে যাবে পদকে…। ভাগবত বললেন জগৎ…। নিত্যগোপাল—প্রেমে গড়া তাঁর সুন্দর দেহ—মন আমার মান অভিমান জ্ঞান আমার…সব নিত্য-গোপাল…। বাইরে কিছু নেই, ভিতরে আছে— একটা অর্থবোধ হয়েছিল বলে এত শূন্যতার মধ্যেও এত সুর আসতে পেরেছি…। নরনারায়ণের তহবিলে ২৫ টাকা আছে—আমি অসীমের উপাসক…।

২৬, ১২, ৫৬।…প্রত্যেকেরই যে যন্ত্র জপ করতে হয় (তান্ত্রিক মন্ত্র) তার শেষে যাহা পদ আছে। যাহা-অগ্নির স্ত্রী, শক্তি। দেবতাকে কোন কিছু আহুতি দিতে হলে যাহা বলতে হয়। নিত্যগোপালের শক্তিই যাহা। তান্ত্রিক মন্ত্র যারা জপ করেন তাদের আরম্ভ অগ্নি থেকে নয়—অগ্নিকে নিত্যগোপালরূপ অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছি।… তিনি সংসারের কর্তা, তিনি এলে বন্ধনায় অনেক, কিন্তু সংসারটা থাকে—স্বরূপে মিথ্যা হয়ে যায় না।…একটা কথাই কিছুদিন থেকে শুধু কইছি—নিজের না-থাকো।… এ জিনিষটার আজ বিশেষ অভাব।…কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ তখনই সত্য হয়ে যখন অগ্নির থেকে আরম্ভ—আমারও অগ্নি আছে, আর পাঁচ জনেরও অগ্নি আছে—প্রত্যেকেই নিজের অগ্নি নিয়ে যখন প্রধান হয়ে উঠবে তখন টক্কর লাগবে—বুদ্ধি-প্রধান হলে আর এক জনের বুদ্ধির সঙ্গে ঝগড়া করতে হবে।… সংঘর্ষে সংঘর্ষে ক্লান্ত হয়ে পড়বে…। গুরুজনের বুদ্ধি না নিলে এ ক্লান্তি দূর হওয়া সহজ নয়।…আজকালকার সংসার ব্যর্থ—প্রত্যেকটি মানুষ অহংকারী, দুর্ভাবিক…।…গোবিন্দের চরণতলেই আমি আমার স্ত্রীকে, স্বামীকে পেতে পারি।…নিত্য-গোপালের এই পথে প্রকৃতি থাকে, কিন্তু তার রূপ বদলায়…বৈষয়িক আমির বদলে একটা সন্ন্যাসী আমির সৃষ্টি হয়।…সেই জন্য ভগবান এসেছেন…নরনারায়ণ আশ্রম এই কথা বলছে।…তাঁকে আসতে দাও—তোমার জীবনে তাঁকে ঢুকতে দাও—কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির বিরোধ কেটে যাবে প্রেমে যখন গলা-জলে পড়ল, তখন তা গঙ্গাজলই হল—পাঁচ জিনিষ মাটিতে ফেল, তা মাটিই হয়ে যাবে—যা তোমার করে রাখলে তাই অন্তর্হিত হয়ে যাবে—বিশ্বের করে দাও তার দোষ কেটে যাবে, বস্তুর ক্ষতি করবার স্বভাব নষ্ট হয়ে তা দোষবিমুক্ত হবে …তৎ জপ অর্থভাবনম্ চ।… অর্থহীন গান কামের কানের ঘণ্টা লক্ষ…মুগয়া অন্ধ বিবাহপ্রথা স্ত্রী মদ নাচগান বৃথা পায়চারী…। প্রত্যেক শব্দের অর্থ বুঝে বুঝে করব—।…ভগবানের প্রতি যে বিমুখ সে সাধনার পথে দুঃখ পেতে বিমুখ…। অর্থ বোঝ—জীবনের অর্থ কি? সব কিছু অর্থ বুঝে কর…। আশ্রমের

ওঠে খেটো—কিন্তু কেনো অহংকার রেখে কেউ কোনদিন বড় কিছু পায় না···। প্রেমের মূল্য কর্ম দিয়ে বিচার হয় না···এতটুকু দিয়েই প্রেম হয়—পরিমাণে দিয়ে নয়।···ভাক্তব্যাহিপ্রস্ত মা যখন বলে, বাবা ভাত খেয়েছ তখন সেইটুকুই মস্ত বড় কথা···একলা কোন কাজ হয় না—সবাই মিলে করতেই হবে···। অহংকার থাকলে কিছু পাবে না—দিনরাত্রি গাধার মত খাটলেও না।···অযাচিত কৃপা নিরহংকারী পাবে—কৃপায় যাহা, নিত্যগোপালের যাহা···

২৮, ১২, ৬৬। ওঁ নমো···ওঁ। ভাগবত ১ম স্কঃ ২য় শ্লোকে বললেন—'বাস্তবমত্র বস্তু দেষ্ম্'—এই ভাগবতে (এই সংসারে) বাস্তব বস্তুকে জানতে হবে।··কিন্তু ভাবুকের মন বস্তুর বাস্তব রূপের ধরে রাখে না—তারা নিজের মত করে ভগবানকে ভাবে, নিজের মত করে বই পড়ে, সব কিছুই নিজের মত করে করে ···এই কর্মই ভক্তিভক্ত খেয়ে নেয়, ভগবানে পৌঁছায় না। শঙ্করাচার্যও বললেন, বস্তুতন্ত্রম্ কবের জ্ঞানম্··· রোগী সেবা করতে রোগীর অনুযায়ী আমাকে চলতে হবে··রান্নায় নিয়মানুযায়ী রান্না করতে হবে···পড়তে গেলে পড়ার নিয়ম মানতে হবে, ঘুমতে হলে ঘুমের নিয়মানুযায়ী চলতে হবে। যখন যা খুশী করাকে ভাবুকতা বলে। বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক নাই—নিজের মত করা—এই কর্ম সেবা নয়, জ্ঞানও নয়।···আম আশ্রমের খেজুর গাছে রস হয়েছে, -কে রস দিতে ফুল হয়েছে···। একটা ঘটনা ঘটাতে হলে বৌদ্ধ দার্শনিক স্বীকার করে নিতে হবে—এড়িয়ে যাওয়া দুর্বুদ্ধি! ঘটনাই সত্য।···রোগী সেবা করতে গিয়ে রাতে ঘুম পাওয়া কি রোগ জনবে? বুদ্ধি তাকেই বলি যা যে কোন অবস্থার মধ্যে respond করে বেরিয়ে আসতে পারে··· (অগ্রহায়ণের উদ্বোধনাবত)···। এখানে সাধনার জন্য আসা···প্রত্যেকে এই সাফাই গায় যে আমার খোঁজ নেবার প্রবৃত্তি বন্ধ করে দিতে হচ্ছে···। ১ ওয়ার্ড দোষ লোভীর, নির্লোভ যে তার চাওয়ার দোষ নেই—চেয়ে খেতে না পারা মূল মনের পরিচয় নয়—অবশ্য যদি সে চাওয়া লোভের খেতে না হয়—পেটের প্রতি হলে সুষ্ঠুর ব্যবস্থা নিজেই করিয়ে নেওয়া—এ না পারা কত বড় অসহযোগিতা। এত দিয়েছে আত্ত ডাক্তারের নিমন্ত্রণ হয় নাই—অথচ তার সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা—আত্ত ডাক্তার আমার পক্ষ হয়ে নিজেকে নিজে নিমন্ত্রণ করতে পারত—আমি তা পারি—প্রাণের স্তরে এইটা লক্ষ্য হয়···নিজের জন্য প্রয়োজনে ব্যবস্থা করবার সাহস রাখা বস্তুতন্ত্রতা··। আশ্রমে এ তোমরা জান যে আমি ঠাকুরের সেই কথা মানি—এলেও খাইব, শুধু না খাইব··· কাজেই কোন কিছু দিতে ত্রুটি হলে নিজেরা নেবে।···কিন্তু প্রয়োজন-বোধটা বিচার করতে হবে—বিচার করতে হবে বস্তুতন্ত্র হয়ে—তোমার খেয়াল বা ভালমন্দ লাগা দিয়ে নয়···এমনকি কোন কিছু পড়তে হলেও বস্তুতন্ত্র হতে হবে···রবীন্দ্রনাথের কবিতা বুঝতে হলে রবীন্দ্রপ্রভাব হতে হবে, নিজের আমিকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে···। এদেশের লোকের খেয়ালে খেয়ালে, ভাবুকতায় ভাবুকতায় কর্ম গেছে, দম গেছে···। নিত্যগোপাল আমার সোনার মানুষ—সকলকে তিনি চরম বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন এখানে এনে—প্রতিভা দেবু, মিনু, বিনু, কালী এখানে এসেছে বলে প্রত্যেকেই পরম আহমা থেকে বেঁচেছে—অনিলকেও বেঁচে যাবে যদি এখানে থাক।···খেয়ালমত কিছু চলে না—ঘটনা স্বাধীন···খাওয়া ঘুমান···সব এখানে তোমার খেয়ালে চলে না।···নিত্যগোপাল সোনার মানুষ, তাঁর চরণে শরণাগত হয়ে থাক···আমার উপরে তাঁর যে আশীর্বাদ তা তোমাদেরও হবে।···

ক্রমশঃ

হারানো দিন

॥ শ্রীমান ॥

[চরিত্রগুলি সবই কাল্পনিক কাউকে লক্ষ্য করে চরিত্রগুলি সৃষ্টি হয় নি।]

(১)

টক্-টক্-টক্-টক্.....

সাগর চৌধুরী দুন এক্সপ্রেসের থ্রি-টায়ার স্লিপার কোচের মধ্যের পথ ধরে জানালার ধারের বার্থে চোখ বুজে শুয়েছিলেন। হাওড়া স্টেশন দুন এক্সপ্রেস ছাড়বার তখনও মিনিট দশেক দেরী আছে

শ্রীচৌধুরী শুয়েছিলেন শরীর ক্লান্ত, বহুত তাহাও নয়, মন তাঁর ক্লান্ত। চোখ বুজে ভাবছেন অতীতের কথা, ভাবছেন সুদূরে দিকে, ভবিষ্যতের পানে। কোথায় যাচ্ছেন, কেনই বা যাচ্ছেন, কি তাঁর আকর্ষণ, কিছুই তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়, তবুও তিনি চলেছেন।

টক্-টক্-টক্ টক্.....

তিনি চোখ মেলে তাকালেন এ যে তাঁর কাছে অতি পুরাতন পরিচিত শব্দ! ভুতোর এ শব্দ ত তাঁর ভুলবার নয়। কতদিন তিনি উৎকর্ণ হয়ে এ শব্দের প্রতীক্ষা করেছেন। সার্থক হয়েছে প্রতীক্ষা! যখনবরে তাঁর ঘরে এসে শব্দ থেমেছে সে ত আজকের কথা নয়। দশ বৎসর আগেকার কথা। সাতাই কি সেই শব্দ!

শ্রীচৌধুরী মাথা তুলে তাকালেন গাড়ীতে বেশি ভিড় নেই। সচরাচর দূরগামী শ্রেণীর থ্রি-টায়ার স্লিপারে যেরকম ভিড় থাকে, সে রকম ভিড় সেদিন ছিল না। দুর্যোগের রাত। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। হয়ত অনেক লোকই রিজার্ভেশন সত্ত্বেও জল ভেঙে স্টেশনে এসে পৌঁছাতে পারেন নি। তাই গাড়ীতে ভিড় খুব বেশি নেই বললেই চলে। সাগর চৌধুরী নিজে এসেছেন রিক্সা করে। পথে আসতে রিক্সা প্রায় ডুবে যায় আর কি! কোন প্রাইভেট গাড়ী বা ট্যাক্সি সেদিন হাওড়া স্টেশনে আসেনি। এসেছে কয়েকটি স্টেশন ওয়াগন, আর রিক্সা।

অতএব সকল গাড়ীতে সকল শ্রেণীতেই লোক কম। সাগর চৌধুরী শব্দ যেদিক থেকে আসছিল সেদিকে তাকালেন।

না, সাগর চৌধুরীর মোটেই ভুল হয়নি। দশ বৎসরের ব্যবধানে। কিন্তু তাহলেও শব্দের গভীরত্ব একই রয়েছে, ক্ষিপ্রতা একটু কমেছে বটে। তিনি তাকিয়ে দেখলেন শর্বরী দত্তকে। শর্বরী দত্ত যেন ঠিক তেমনিই আছেন, মনে হচ্ছিল এক যুগ আগেও তিনি তাঁকে এমনিই দেখেছিলেন।

এত কাছে, অথচ এত দূর। শ্রীচৌধুরী অতীতকে যেন ভুলে গেলেন ভাবলেন ছুটে গিয়ে শর্বরীর হাত দুখানি ধরে জিজ্ঞেস করেন 'কেমন আছ'।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু পারলেন না তিনি এগুতে। বসে পড়লেন বেঞ্চিতে। কোন্ অধিকারে তিনি যাবেন? সাগর চৌধুরী ও শর্বরী দত্ত আজও বর্তমান, কিন্তু এরা কোন্ সাগর ও কোন্ শর্বরী, কে জানে?

শ্রীচৌধুরী একবার ভাবলেন গাড়ী থেকে নেমে যাবেন কিনা। জিনিষপত্রের মধ্যে ত একটি মাত্র হোল্ড অল আর তাঁর সেই পুরাতন ঝোলা। এ আর গুছিয়ে নিতে কতক্ষণ! তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন, গাড়ী ছাড়তে মাত্র দু'মিনিট বাকী! না, এ বয়সে আর চলন্ত গাড়ীতে ওঠানামা না করাই বোধ হয় সঙ্গত। তিনি তাঁর বিছানায় বসে জানালার মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। ইতিমধ্যে গাড়ীতে আরও কয়েকজন লোক উঠে এসেছেন। প্রতি কিউবিকেলেই লোক আছে, তবে ভরতি নয়। পথ বয়ানার সব বার্থগুলি অবশ্য আগেই ভরতি হয়ে গিয়েছিল।

শর্বরীদের মধ্যে কারা আছেন সাগর চৌধুরীর জানতে ইচ্ছা হল। শর্বরীর অভিভাবক বলতে অনেকদিনই ত তিনি মানে ছেলেন, ঠিক পরিচয় না থাকলেও শর্বরীর কাছে বহুদিন তাদের কথা শুনে তাদের সাথে যেন একটা যোগসূত্র তাঁর স্থাপিত হয়েছিল। সে ত আজ অনেক দিনের কথা।

শ্রীচৌধুরী একবার কিউ দিয়ে তাকালেন। শর্বরীদের কিউটিকল খুব বেশি ঘুরে নয়। কিউটিকলের ভেতরে না দেখা গেলেও, একটা রোগ দেখা যাচ্ছিল। শর্বরী ভেতরে, তাকে দেখা যাচ্ছিল না। সাগর একটি মেয়ের চেহারা দেখে অনুমান করলেন শর্বরীর ছোট বোন রূপা মানে, দ্বিতীয় সংস্করণের। সাগর শর্বরীকে ঠাট্টা করে ছোট বোনের উল্লেখ করতেই বলতেন 'দ্বিতীয় সংস্করণ'। সাগরের চোখে জল এসে গেল। তিনি পাশ্চাত্যের হাতা দিয়ে চোখ মুছে খুব ধিক্কার দিলেন। গাড়ীতে সাবধানে তাঁকে থাকতে হবে। একটা বড় স্টেশনে গাড়ী থামলেই তিনি নেমে যাবেন অন্য গাড়ীতে। কিন্তু বড় স্টেশন ত বর্ধমান, সে ত প্রায় দু'ঘণ্টার ব্যাপার। তিনি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। শর্বরীর সাথে তাঁর দেখা না হওয়াই ভাল। তাঁর পরম স্নেহের শর্বরী তাঁকে ভুল বুঝে চলে গিয়েছিল, ভুল শুধরে নিবার অবকাশটুকুও তাকে দেয় নি। শর্বরীর সাথে দেখা হওয়া মানে তার বিরক্তি উদ্রেক করা, শর্বরীর স্বচ্ছন্দ জীবন-গতিতে বাধার সৃষ্টি করা। সাগর তা করবেন কেন? শর্বরী তাঁর পরম স্নেহের জন। অতীতেও ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে কেন তিনি অসুখ জটিলতার সৃষ্টি করবেন? তার চেয়ে যাত্রির অন্ধকারে, এই দুর্যোগের মধ্যে পালিয়ে যাওয়াই ভাল।

কথাটা ভেবে নিতেই শ্রীচৌধুরীর একটি পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল।

সাগরের সাথে শর্বরীর তখন নিবিড় স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সাগর বলেছিলেন, 'শর্বরী, তোমরা ত বম্বে নানাদিকে বেড়াতে যাও। একবার আমাকে বলো, তোমাদের গাড়ীতেই টিকিট কিনব। তোমাদের সাথেই ঘুরে বেড়াব'।

শর্বরী হেসে বলেছিল, টিকিট আমিই কিনতে পারব, সেজন্য চিন্তা নেই, কিন্তু যাবেন ত ঠিক? খুব জ্বালা হবে আপনি গেলে, বেশ বেড়াতে পারা যাবে।

আজ তাঁরা একই গাড়ীতে চলেছেন, সাগর ত কিনেছেন হরিদ্বারের টিকিট। পুরোনো অভ্যাস যদি শর্বরীর থেকে থাকে তাহলে হরিদ্বারের আগেও তারা নামবেই না। হরিদ্বার স্টেশন পার হয়ে যেতে পারে, হয়ত দেরাদুন কিংবা মুসৌরী কিন্তু পটভূমিকা ত সব কিছুর পরিবর্তী।

যাত্রা এত, পরিস্থিতি এক নয়। আজ সাগর ওদের সাথে বলবারও যোগদান করতে পারছেন না, নিজেকে লুকোবার জন্য গাড়ীর দরজার দিকে পিছন ফিরে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন, আর দেখছেন বাইরে অন্ধিকার বাস্তবিকতা। চোখ বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে, সাগর চোখ মুছে মনকে দৃঢ় করে নেন

বর্ধমান কতদূর? গাড়ী হাওড়া বর্ধমান কর্ড দিয়ে ছুটে চলেছে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে রেললাইনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বুঝেছে, তাই এক্সপ্রেস গাড়ী হলেও তার গতি বাঁধিয়েছিল প্যাসেঞ্জার গাড়ীর মতই। কখনও লাল আলো দেখে থেমে পড়ছে, কখনও ধীরে ধীরে পুল পার হচ্ছে, আসানসোলেও মাঠের জল সেখানে লাইনের কাছে এসে পৌঁছেছে, সেখানে ট্রেন চলছে শম্বুক গতিতে। বর্ধমান কখন পৌঁছাবে কে জানে?

সাগর অস্বস্তি বোধ করছিলেন। শর্বরীদের কথাবার্তার যে দু'চারটে টুকরা তাঁর কানে পৌঁছাচ্ছিল, তার থেকে বুঝতে পেরেছিলেন দলে আছেন শর্বাধিনায়িকা বহ্নিবীথি, আর আছেন রিনাদি, শর্বরী ও দ্বিতীয় সংস্করণ রূপা। সাথে চলেছেন দু'জন পুরুষ, একজন মনে হল দ্বিতীয় সংস্করণের স্বামী, আর একজন কে তা সাগর বুঝতে পারছিলেন না। তবে কি শর্বরীর বিয়ে হয়েছে? কই, তিনি ত কখনো শোনেন নি। তিনি যে শর্বরীদের খোঁজ একেবারে রাখেন নি এমন ত নয়। বিয়ে হয়েছে বলে তিনি ত জানেন না। যাক, এসব ভেবে কি হবে!

এখন যথাস্থানে পৌঁছাতে পারলেই হয়।

সাগর ভাবছেন, এমন কেন হল। শর্বরীর প্রতি তাঁর স্নেহভালবাসার তুলনা ছিলেন না! মেয়েটাও ত সব জানত। শর্বরীর কাছে তিনি কোনদিন কিছু লুকোবার চেষ্টা করেন নি। শর্বরীর পক্ষ থেকে বিরুদ্ধ মনোভাব ত কখনও তিনি লক্ষ্য করেন নি। তবে?

তবুও ঘটনা ঘটে গেল। স্পষ্টই সেদিনের কথা সাগরের মনে আছে।

(২)

কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত একটি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক সাগর চৌধুরী। শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি করিমপুরে অবস্থিত। শর্বরী ঐ শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী হয়ে এসেছিল। শিক্ষণকাল নয় মাস

শর্বরী সুন্দরী বাইরে থেকে দেখলে তাকে গর্বিতা অহঙ্কারী, এবং নিজের সম্বন্ধে খুব বেশি সচেতন বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে সে তা নয়। মেয়েটি খুব ভাল। অন্তরটি চমৎকার, সরল সহজ, কিন্তু বুদ্ধু।

শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার মাস খানেক আগে শিক্ষার্থী নির্বাচন পরীক্ষা হয়। তারও কিছুদিন পরে নির্বাচিতদের তালিকা টাঙানো হবার পরে হঠাৎ একদিন একটি পুরোনো শিক্ষার্থিনী শর্বরীর সাথে সাগর চৌধুরীর পরিচয় করিয়ে দেয়। শর্বরী টিপ করে একটি প্রণাম করেছিল।

সাগর চৌধুরীর বয়স যথেষ্ট। অন্ততঃ শর্বরীর তখন কিংবা তারও বেশি, অতএব নিঃসঙ্কোচে তিনি শর্বরীর প্রণাম গ্রহণ করেছিলেন, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন।

তারপর শর্বরী শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে। সাগর প্রেষ্টীতে পড়িয়েছেন। শর্বরীর সাথে ঘনিষ্ঠতা তাঁর কিছু হয়নি। কদাচিৎ দুই একটি কথা, তাও পড়াশুনা নিয়ে, ব্যক্তিগত নয়। এমনি ভাবে দিন চলেছে। শর্বরীকে অধ্যাপক চৌধুরীর খুব ভাল লাগতো, দূর থেকে তিনি শর্বরীর অন্তরটাকে দেখতে পেতেন। আরও বিশেষ করে তিনি জেনেছিলেন ওর সম্বন্ধে আগের বছরের শিক্ষার্থিনী থেকে।

ভাল লাগাই ভালবাসা নয়, কিন্তু ভাল লাগতে লাগতেই ভালবাসা জন্মায়। কিন্তু তাঁর ভালবাসার রূপটা কি? বলা যায়না, হয়ত অধ্যাপক ভুল পথে যেতে চাননি। মনের দৃঢ়তা দিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন।

কিন্তু সে কথা থাক।

শর্বরীর সাথে শেষ দুদিনকার ঘটনার কথা সাগর কোনদিন জীবনে ভুলতে পারবেন না। শুধু কি শেষ দু'দিনের? তার আগেকার দিনগুলি? সব দিনের কথাই তাঁর মনে আছে, সব ঘটনার কথাই রয়েছে তাঁর মনে মুক্তোহারের মত গাঁথা।

শুধু সাগরের কেন শেষ দু'দিনের কথাই বেশি করে মনে পড়ে গেল।

শিক্ষণ সমাপ্তির আর মোটে পাঁচদিন বাকি। শর্বরী করিমপুরে নেই। বাড়ী গিয়েছে। সেদিনই আসবার কথা, আর ঠিক চারদিন বাদে শেষ পরীক্ষার। সাগর উতলা হয়ে আছেন। ১২-৩০এর গাড়ী এসে গিয়েছে। ১৩।২০ মিনিটের মধ্যেই রিক্সায় শর্বরীর এসে পড়বার কথা। একবার সে সাগরের সাথে দেখা করে যাবেই।

সাগর বিছানায় শুয়ে আছেন। শর্বরী যা খেতে ভালবাসে সব তিনি তৈরি করে রেখেছেন। ঘরেই খাবার সাজান, উৎকণ্ঠিত চিত্তে ওর জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন।

শর্বরী এল। যথাসময়ে নয়, বেলা দেড়টার পর। জুতার টক্ টক্ শব্দ এবার খুব দ্রুত।

ঘরে ঢুকেই শর্বরী বলল, অপেক্ষা করব না, একটা কথা বলেই চলে যাব।

সাগর বিস্মিত। একটু চুপ করে থেকে বললেন, তাই, বেও, কিন্তু বসে ধীরে সুস্থে কথাটা বলে যাও।

—বলব না, বলছি কথাটা। সোজাসুজিই বলব। আমি বার দিন পর চলে যাব। এর মধ্যে আপনি দয়া করে আমার সাথে কোন কথা বলবার চেষ্টা করবেন না। এই আমার আপনার কাছে শেষ অনুরোধ।

সাগর চৌধুরী বিস্মিত হলেও বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে

বললেন, তুমি যদি তাই চাও, তবে তাই হবে। কিন্তু কেন, সেকথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি!

—কেন? সে কথা কি আপনি আমার চেয়ে ভাল জানেন না?

—আমি ত কিছুই জানি না।

—না জানেন না। সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকা, ছাত্র ছাত্রীরা বলছেন, আপনি আমার প্রেমে পড়েছেন। আপনার ব্যবহার, চোখ মুখ সবই নাকি তার সাক্ষ্য দেয়। আমরা কয়েকজন মিলে যখন কথা বলি, তখন আপনি কথায় যোগদান করেন না। কেন করেন না? তার কারণ সবাই বুঝতে পারে। বলে আপনি আমাকে ভালবাসেন।

—তোমার অভিযোগ আংশিক সত্য। কিন্তু আমি বেশি কথা বলি না, তা ত তুমি জান, সকলেই তা জানে কিন্তু কথা না বলাটাকেই জোর করেই ভালবাসার লক্ষণ বলে প্রকাশ করা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি।

—তাই যদি হয় তবে কার তাতে আর্থসিদ্ধি হতে পারে?

—তা আমি কি করে বলব। তবে নিশ্চয়ই কারও হচ্ছে, না হলে শুধু একখাটুকুর উপর এরকম ব্যাপার রটবে কেন?

—আমার অভিযোগ আংশিক সত্য বললেন কেন? সাগর চৌধুরী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, তোমাকে ভালবাসি বলে।

শর্বরী ত রেগে আগুন। বলল, এই ত সত্য কথা বের হল। সবাই যা বলে তাহলে তাই ত সত্যি দেখছি।

—না সত্যি নয়, ভালবাসা আর প্রেম দু'টি জিনিস আলাদা। কিন্তু তোমাকে ভালবাসি একথা কি আজ নূতন শুনলে?

—না, নূতন শুনিনি। অনেকদিন শুনেছি। কিন্তু আপনার ভালবাসা শব্দের ব্যাখ্যাও আমি বিশ্বাস করিনি, কখনো মনঃপূতও হয় নি।

সাগর চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সস্নেহে বললেন ভালই করেছ। সে কথা যাক্, তুমি আজ খুব উত্তেজিত, আজ বেশি কথা বলোনা, সুস্থ হয়ে বসে একটু খেয়ে নাও। সেই সাতটায় বের হয়েছ, পেটে অল্পটুকু পড়েনি। খেয়ে সুস্থ হয়ে ঘরে যাও। বিশ্রাম করে পড়তে বসো।

—না, খাবনা।

—খাবে না কেন?

—খেতে ত আসিনি এখানে। তা'ছাড়া আরও অভিযোগ আছে আপনার বিরুদ্ধে।

—বল।

শর্বরী ইতঃস্তত: করতে লাগল।

—বলে ফেল। মনের মধ্যে কোন পুষে রাখতে নেই।

—বলছি। আপনি আমাকে নিয়ে বিকেলে বেড়াতে বার হলেন কেন? সেটা যে লোক-চক্ষুতে কতটা হেয় বলে মনে হতে পারে, সেটা কি আপনার বয়স বুদ্ধিতে ধরা পড়েনি?

সাগর চৌধুরী হয়ত কিছু বলতে পারতেন, কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন।

শর্বরী বলল, তবেই বুঝে দেখুন আপনি কাজটা ভাল খারাপ করেছেন। হোন আপনি শিক্ষক, তবু আপনাকে আমি জীবনে ক্ষমা করতে পারব না। আপনি আমার প্রভূত ক্ষতি করেছেন। আপনি জীবনে আমার কাছাকাছি আসতে চেষ্টা কখনো করবেন না। এই আমি আমার শেষ কথা বলে দিচ্ছি।

শর্বরী কোন কথা শোনেনি। একটা অগ্নি-বৃষ্টি সাগর চৌধুরীর উপর নিক্ষেপ করে সে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। একবার ফিরেও তাকায়নি। অধ্যাপক চৌধুরী আর তারপর থেকে ঘর ছাড়তে সাহস পান নি। বেশ হলেও এমন সময়ে বের হয়েছেন যখন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কয়দিনের ছাড়া আর কেউ থাকে না। অফিসের কাজ থাকত তাই তাঁর মাঝে মাঝে যেতেই হয়।

সাগর চৌধুরীর পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ ছিল, কিন্তু তা তিনি আর কয় অধ্যাপকদের দিয়ে সম্পন্ন করিয়ে নেন।

অধ্যাপক চৌধুরী নিজের উপর খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এ তিনি কি করেছেন?

কিন্তু উপায় ত কোন দিকে নেই। এ অপমানের বোঝা নিয়ে তাঁকে চিরদিন চলতে হবে। অধ্যাপক চৌধুরী ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন শর্বরীর সাথে শর্বরীর শান্ত মুহূর্তে একবার দেখা হোক। তিনি তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলবেন। তাঁর জন্য শর্বরী মেয়ের জীবনে কোনই ক্ষতি হবে না। কিন্তু কি করে বলবেন? যে মেয়ে, সে একবার যা ভাল বুঝেছে, তাই বুঝবে, কারও কথায় নড়বার পাত্রী সে নয়। তবু একবার তিনি চেষ্টা করবেন।

জীবনে অধ্যাপক চৌধুরীর সব কিছু বক্রী, এ ব্যাপারেও তাই হবে তা ত ধরতে গেলে জানাই ছিল। এ ব্যাপার এখানেই শেষ নয়। নিশ্চেষ্টা পরিবর্তিত হয়ে উঠলেই হয়ত চাকুরীটুকুও ছেড়ে চলে যেতে হবে, না হয় নিতে হবে দীর্ঘ দিনের ছুটি। এ অপমান নিয়ে তিনি মানুষের কাছে মুখ দেখাবেন কি করে?

কিন্তু একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। শর্বরীর কোন দোষ নেই, একথা সকলেই নিশ্চয় করে জেনেছে। ভগবান করুন, ওর সুনাম যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। অধ্যাপক চৌধুরী যাই করুন না কেন, ছুটিই নেন, আর চাকুরীই ছাড়ুন, এখন তিনি কি করবেন? একবার শর্বরীর সাথে কি করে দেখা হয়?

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। সবাই চলে যাবে তিন দিন পরে। তিন দিন ধরে চলবে বেড়ান, সিনেমা দেখা, অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের বাড়ী যাওয়া, গান বাজনা, অভিনয় ইত্যাদি। অধ্যাপক চৌধুরী প্রতীক্ষা করে থাকেন সেই পরিচিত জুতোর শব্দের জন্য। অপেক্ষা করতে করতে দু'চোখ জলে ভরে আসে। কেন মেয়েটা তাঁকে ভুল বুঝল। তাঁর অস্থিরতা আরও বেড়ে যায়।

অধ্যাপক চৌধুরীর বাড়ীর কাছ দিয়েই অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের বাড়ী যেতে হয়। শর্বরী ঐ পথ দিয়ে গিয়েছে কিন্তু একবারও মুখ ফেরায়নি তাঁর বাড়ীর দিকে।

শেষ তারিখ। বিদায়ের দিন সকাল বেলা আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদায়ের পালা শেষ হয়েছে। অধ্যাপক চৌধুরী বিদায় সভায় উপস্থিত হয়েই চলে এসেছিলেন। আগের দিনই শর্বরী ছাড়া সকল ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। অতএব সেদিক থেকে তিনি মুক্ত। কিন্তু শর্বরী?

চৌধুরী জানতেন শর্বরী বিকেল ৪টায় গাড়ীতে চলে যাবে। ভাবলেন একবার তিনি যেচেই দেখা করতে যাবেন কিনা। আর করে দেখা হবে কে জানে। জীবনে দেখা হবেই কিনা তারই বা ঠিক কি। নিজের কথাটুকু বলা হল না।

চৌধুরী স্থির করলেন তিনি শর্বরীর সাথে দেখা করবেন। বেলা একটা নাগাদ চৌধুরী মেয়েদের বাড়ীর দিকে রওনা হলেন অনেকটা পথ যেতে হয়। পথে লোকজন ছিল না।

হঠাৎ দেখা গেল শর্বরী আসছে। অধ্যাপক চৌধুরী ভাবলেন শর্বরী বুঝি তাঁর বাসায়ই যাচ্ছে। কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার বাসায় নিশ্চয়ই যাচ্ছ'? কঠিনমুখে শর্বরী বলল 'না'।

না! অধ্যাপক চৌধুরী একটু থেমে বললেন, কিন্তু তোমার সাথে আমার একটু কথা ছিল।

—আমার সাথে আপনার কি কথা?

—আজ তুমি চলে যাচ্ছ, কোন কথাই কি থাকতে পারে না?

—না, কোন কথাই থাকতে পারে না। আপনি কি, তা আমার এতদিনে জানা হয়ে গেছে। আপনার চরিত্র সম্বন্ধে জানা কিছু নেই। আপনি আমার সাথে আর কথা বলতে চেষ্টা করবেন না।

অধ্যাপক চৌধুরী কথা খুঁজে পান না। মনে-প্রাণে ঘৃণা ছিন্ন হত।

শর্বরী বলল, আমি জানি প্রতি বছরের মেয়েরা আপনার বিরুদ্ধে একই রকম অভিযোগ রেখে গেছে। আপনাকে চরিত্রহীন বলব না, কিন্তু আপনার চরিত্রে বাঁধুনি নেই, একথা বলে যাচ্ছি আমরা। যাক সে কথা,

আপনি সকল, পথ দিন, আমি যাব।

অধ্যাপক চৌধুরী কি বলবেন স্থির করতে পারছিলেন না। হঠাৎ বলে ফেললেন, "পথ ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু শুধু একটি কথার উত্তর দিয়ে যাও।"

—কি কথা?

—তোমার সঙ্গে কি কোন অন্যায় আচরণ করেছি? দ্বিধা না করে জবাব দিয়ে যাও

—না, করেন নি।

—এবার যেতে পার।

সর্বরী গেল না, দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ এগিয়ে এসে অধ্যাপক চৌধুরীকে প্রণাম করল।

অধ্যাপক চৌধুরী ঠিক আগের মতই মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "তুমি সুখী হও"।

এর পর আর দাঁড়ানো চলে না। পুচকে মেয়েটার কাছে হয়ত চোখের জল ফেলেই বসবেন। অধ্যাপক চৌধুরী সশব্দে না ফেলে এগিয়ে গেলেন।

সর্বরী কিছুক্ষণ সাগর চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের পথ ধরে চলল।

(৩)

সর্বরীর সাথে দশ বৎসর আগে অধ্যাপক চৌধুরীর শেষ দেখা। তারপর আর তাঁর সাথে কোথাও সর্বরীর দেখা হয় নি। অধ্যাপক চৌধুরী সর্বরীর কলকাতাস্থ শ্বশুরালয়ে কোন দিন যান নি। সর্বরীর চাকুরী স্থল কলকাতা। সেখানেও তিনি যান নি। তবে তিনি সর্বরীর খবর তাঁর অন্যান্য বন্ধু বান্ধব মারফৎ পেয়ে থাকেন এই পর্যন্ত। কিন্তু সর্বরী যে কথা শেষ তাঁকে বলেছিল তা তিনি কখনও ভুলতে পারেন নি, জীবনে ভুলতে কখনো পারবেন না বোধ হয়। কথাটা সর্বরীর মুখ দিয়ে বের হয়েছিল বটে, কিন্তু সত্যি ও কথাটা তার নয়। যাঁরা ও কথা বলেছেন তাঁরা তাঁর বিষয়ে চরম আঘাতই হেনেছেন।

মনে আছে একজন মহিলা সাগরকে একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন স্বাধ্বী, অল্প বয়সে চেহারাটি দেখতে ভাল ছিল বলে মনে হয়, তখন ক'টি মেয়ের মাথা চিবিয়েছিলেন, বলুন ত'।

মহিলাটি কথাটি ঠাট্টা করেই বলেছিলেন। কিন্তু সত্যি কি অধ্যাপক চৌধুরীর জীবনে কোন মেয়ের প্রেম ভালবাসা জুটেছিল? নিশ্চয়ই জোটে নি। অধ্যাপক চৌধুরী বাল্য শ্রেণীতে পড়বার সময় Gray's Elegy পড়েছিলেন। তার মধ্যে দুটো পদ ছিল chill Penury। Penury যে কত chill হতে পারে, তা তিনি ছোট বেলাই বুঝতে পেরেছিলেন। ফলে নিজের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ভালবাসা বা ভালবাসার প্রতিদান দেওয়ার মত মনোবৃত্তি তাঁর হয়নি। হয়ত তার মূলে ছিল ভয়, তাঁর দারিদ্র্যকে কেউ অপমান করতে পারে, এ ভয়েই তিনি সন্ত্রস্ত ছিলেন। জীবনের সঙ্গে বোধহয় তিনি সংগ্রাম করে এসেছেন। তাই তাঁর মন বাঁধা হয়নি। মানুষ মনে করেছে তাঁকে হতাশ প্রেমিক, তাই তিনি আর পরিণয় করেন নি। অধ্যাপক চৌধুরী কথাটা শুনে হেসেছেন। একটি সুন্দরী মেয়েকে কেন্দ্র করে কাড়াকাড়ি করতে তিনি অনেক দেখেছেন, দেখেছেন ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে প্রেমাস্পদার ক্ষতি করতে, নির্বিচারে মিথ্যে কথা বলতে। অধ্যাপক চৌধুরী কোন দিন সোমকে মাতান নি, অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি বের হয়ে এসেছেন। এ সব কথা চৌধুরী কোন দিন কাউকে বলেন নি। বলবেন, লোক কোথায়? কাকে বলবেন? কে তাঁকে বিশ্বাস করবে? মনে করবে সাফাই গাইছে কেন?

চৌধুরী ভেবেছিলেন একদিন সর্বরীকে পত্রের ছলে সব বলবেন। কিন্তু সে সব আর বলা হোল না।

হঠাৎ গাড়ীটা খুব একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। অধ্যাপক চৌধুরী সম্বিৎ ফিরে পেলেন। সেদিন রাতের পটভূমিকা তাঁর মনে পড়ে গেল। ঐ কিউবিকিলেই ত রয়েছে তাঁর পরম স্নেহের পাত্রী। দশ বছর পরে দেখা। ঠিক দেখা হয়নি, তবে পাওয়া গেছে একই ছাদের তলায় সান্নিধ্য। ভগবানের কি অভিপ্রায় জানা অসম্ভব। ভগবানই জানেন তাঁর উদ্দেশ্য কি।

গাড়ী তখনও বর্ধমানে পৌঁছায় নি, ডিস্ট্যান্ট

নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে আছে, এরা বর্ধমানে পৌঁছুবে। বর্ধমানে নেমে অন্য গাড়ীতে উঠলেই চলবে। তারপর হরিদ্বারের ভিড়ে মিশে যেতে কতক্ষণ। কে তাঁকে দেখবে।

গাড়ী আবার ছাড়ল। মুষলধারে বৃষ্টি। আকাশ যেন ভেঙে পড়ছে। চৌধুরী হংকং ব্যাগটা গুছিয়ে নিলেন। সমস্ত কামরার যাত্রীরা স্থবির কোলে। কণ্ডাক্টর গার্ড পর্যন্ত আয়েসা পেয়ে ঘুমুচ্ছেন।

গাড়ী বর্ধমান স্টেশনের প্ল্যাটফরমে ঢুকে পড়ল। চৌধুরীর খিঁ টাটানো শিরায় প্ল্যাটফরমের শেড পার হয়ে গিয়ে দাঁড়াল। এখনও বেগে বৃষ্টি পড়ছে। ঐ বৃষ্টিতে চৌধুরী নামবেন কি করে? তিনি নামতে পারলেন না। চৌধুরী ভাবলেন, তাড়াতাড়ির কি আছে, আসানসোলে নামলেই হবে। সবাই ত ঘুমুচ্ছে, তবে আর চিন্তা কি। অধ্যাপক চৌধুরী আবার নিজের বার্থে ফিরে এলেন।

গাড়ী ছেড়ে ছিল।

গাড়ী পৌঁছবে আসানসোলে ১ ঘণ্টা পরে। দুর্গাপুরে গাড়ী অবশ্য থামে তবে দু'মিনিটের জন্য। কামরা বদলান দু'মিনিটে সম্ভব নয়। তাই চৌধুরী বার্থে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লেন। কোনও রকমে দু ঘণ্টা গেলে হয়।

চৌধুরী আবার ভাবতে আরম্ভ করলেন। দশ বৎসর আগেকার দিনগুলির কথা। তখনও পর্ষরীর সাথে তাঁর গভীর পরিচয় হয়নি। একদিন পর্ষরী এসেছিল তাঁর কলকাতার বাড়ীতে। হঠাৎ অধ্যাপক খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু আনন্দ তিনি প্রকাশ করেন নি। পর্ষরীর মনে হয়েছিল তাকে অবহেলা করা হয়েছে। এ নিয়ে পরে চৌধুরীকে কম কথা শুনতে হয় নি। অনেক কষ্টে তিনি আপোষ করেছিলেন।

একবার এক সাতদিনের ছুটিতে পর্ষরীরা কয়েকজন বন্ধু মিলে বেড়াতে বের হয়েছিল। যাচ্ছিল পুরী মেলে। চৌধুরী পর্ষরীকে ট্রেনে উঠিয়ে দিতে গিয়ে প্রথম তার মাথায় খুশু দিয়েছিলেন। পর্ষরী অবাক হয়ে তাকিয়ে স্মিত হাসি হেসে কামরার দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ছুটির পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে পর্ষরী চৌধুরীর ঘরে ঢুকেই প্রথমে বলেছিল, আমি কি এমনি মুৎসিৎ যে আপনি খুশু করেছিলেন।

—খুশু করিনি, খুশু মাখায় দিয়েছি।

—তাই বা দিতে গেলেন কেন?

—পাগল মেয়ে, এটার তাৎপর্যও জান না?

—না, জানি না।

—আচ্ছা তাহলে হাতটা এগিয়ে দাও দেখি।

পর্ষরী নিঃসঙ্কোচে হাতটা এগিয়ে দিয়ে ছিল।

চৌধুরী ওর হাতখানা তুলে নিয়ে আঙুলগুলো কামড়ে দিলেন, আর মাথাটা টেনে নিয়ে তাতে দিলেন খুশু।

পর্ষরী রেগে বলেছিল, 'কি সব নোংরামি করছেন?' দাদার ছেলে বলেছিলেন, 'যা করলাম তার অর্থ কি জান?'

—না, জানিনা।

—এর অর্থ হচ্ছে বাপ, মা, কাকা, জ্যাঠা, মামা প্রভৃতি গুরুজনেরা তাঁদের আশীর্বাদের আয়োজন তৈরী করলেন। এর ফলে কোন অমঙ্গল তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

পর্ষরী হেসে দিয়েছিল, বলেছিল আপনি এসব বিশ্বাস করেন?

—করি বই কি, মনে প্রাণে বিশ্বাস করি; তাইত সেদিন তোমার এলাহাবাদ যাবার দিনে তোমার মাথায় খুশু দিয়েছিলাম। আঙুল কামড়াতে পারিনি লোক-লজ্জার ভয়ে। পর্ষরী সেদিন হেসেছিল খুব।

বলেছিল, আপনি আমাকে ভালবাসেন খুব, তাই না?

—হ্যাঁ বাপি, আমার পক্ষে তোমাকে যতটুকু ভেতরে ভাল বাসা চলে ততটুকু নিশ্চয়ই ভালবাসি।

—আমি ভালবাসি কিনা না জেনেই আমাকে ভাল-বাসেন?

—হ্যাঁ, তাই বাসি। কারণ তোমার না ভালবাসার সাথে আমার ভালবাসার ত কোন clash নেই। তাইত তোমাকে ভালবাসতে পারছি।

আর সেদিন এ বিষয়ে কোন কথা হয়নি। তারপর প্রতিদিনই দেখা হয়েছে। কত আসে যায়ে কত কথাই

না হয়েছে। যত রাজ্যির যত কথা আছে, সব কথা শর্বরী বলেছে। ছোট শিশুর কথা ফুটলে সে যেমন সবকথা কথা বলতে চায়, শর্বরীরও যেন সে বয়সই হয়েছিল। প্রফেসার চৌধুরীর সাথে দেখা হলেই সে খুব কথা বলত। কথায় যেন ফুলঝুরি। এত কথা সে কারুর সাথেই বলত না।

একদিন বিকেল বেলা শর্বরী এসেছিল সাগরের বাড়ীতে। কথা ছিল এক সাথে চা খেয়ে যাবে কাছেই এক গ্রামে। সেই গ্রামে থাকে শর্বরীরই এক বান্ধবী। সে নিমন্ত্রণ করেছিল সাগর ও শর্বরীকে।

পাঁচটা বাজবার একটু আগেই তাঁরা রওনা হয়ে ছিলেন। শর্বরীর হাতে কাগজের এক বাক্স রসগোল্লা সন্দেশ। সাগর কিনে এনে ছিল শর্বরীর বন্ধু বন্ধুর ছোট ভাইবোনগুলির জন্য। কথা বলতে বলতে তাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন গ্রামের দিকে। নিচু দেওয়া রাস্তা।

এমন সময় তাঁরা এক হৈ চৈ শুনে তাকিয়ে দেখলেন, এক দল লোক লাঠি উঁচিয়ে দৌড়ে আসছে আর তাদের আগে দৌড়চ্ছে এক পাগলা কুকুর। লোকগুলি চিৎকার করে, বলছে 'সরে যান, সরে যান, পাগলা কুকুর।

কিন্তু কোথায় তাঁরা সরে যাবেন? কুকুরটি কাছে এসে পড়েছে যে। কুকুরটির জিভ বের হয়ে পড়েছে, তা দিয়ে পড়ছে লালা, লেজটি পেছনে গুটিয়ে নিয়েছে। নির্ঘাৎ পাগলা কুকুর, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আজ দু' জনকেই পাগলা কুকুরে কামড়ে দেবে। ওরা কি করবেন স্থির করতে পারছিলেন না। কুকুরটি খুব কাছে এসে পড়েছিল।

হঠাৎ শর্বরী এগিয়ে গিয়ে প্রফেসার চৌধুরীকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে সন্দেশের বাক্স উঁচায় করে কুকুরটার মুখের কাছে মেলে ধরল। পাগলা কুকুরটা তখন হাত দশেক দূরে। কুকুরটা যেন হঠাৎ বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়াল। সে সন্দেশ খেল না, শুধু তাকতে লাগল।

ইতিমধ্যে পিছনের লোকগুলি এসে পড়েছে। পাগলা কুকুরটি পিছনে হৈচৈ শুনে শর্বরীদের দিকে না তাকিয়ে মাঠে নেমে দৌড়াতে লাগল. লোকগুলিও পিছনে ছুটল।

পাগলা কুকুরের কামড়ের হাত থেকে উদ্ধারে অভাবিত ভাবে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলেন

প্রফেসার চৌধুরী বললেন শর্বরী, আজ তোমার জন্যই পাগলা কুকুরের কামড়ের হাত থেকে বেঁচে গেলাম।

—কামড়ালে ত দু'জনকেই কামড়াত, শুধু আপনাকে কামড়াবে কেন?

—তা ঠিক, আমাকে বোধহয় কামড়াতই না, তোমাকেই কামড়াত, তুমিই আমাকে আড়াল করে ছিলে। প্রথমেই তোমাকে পেত।

—না না ঠিক আড়াল করিনি, অতটা নিঃস্বার্থপর নই আমি. আমি শুধু কুকুরটাকে ডাক করবার জন্য আপনার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম

সাগর শর্বরীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, পাগল মেয়ে, আমাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের উপর যে ঝুঁকি নিয়ে ছিলে, তা স্বীকার করতে আপত্তি কি?

শর্বরী উত্তরে কিছু বলেনি তারপর দিনের পর দিন গেছে। উত্তরের সাথে দেখা হয়েছে হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক চৌধুরীর নিজস্ব ঘরে, না হয় বাড়ীতে। কত কথা হয়েছে। তার কি কিছু হিসেব আছে। কিন্তু বিষয় বস্তু কি?

বিষয়বস্তু কিছুই নয়। বকা শর্বরী। অধ্যাপক চৌধুরী প্রায় নীরব শ্রোতা হয়ে থাকতে চান। কিন্তু থাকা সম্ভব হয় না। তাকে কথা বলতে হয়। উত্তর না দিলে শর্বরী রেগে যায়। ছেলেমানুষ আর কাকে বলে।

শর্বরী বলে যায় নিজের ছোটবেলার কথা, বাবা মায়ের, ভাই বোনের কথা। সেখানেই থেমে যায় না। বলে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। কত বন্ধুর মর্মস্পর্শী আবেদন, কত সহপাঠীর প্রেমলিপি, কত দীর্ঘনিঃশ্বাস, কত অশ্রু বিসর্জন তাকে ঘিরতে চেয়েছিল তার ইতিবৃত্ত সে দিয়ে যায়।

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

— ১৯৫৪ —

(৬৩)

ঠাকুর, ওরা বলে 'তোমার চাবি আমার কাছে রাখিয়া গিয়াছে'। সত্যই কি তাই? তোমার চাবি আমার কাছে? আমি কি তাহার যোগ্য? তোমার সিন্দুক-ভরা তত্ত্ব কি আমি খুলিয়া সকলের সামনে ধরিতে পারিব? তাহাই করিও। স্বামী আমার! আমার স্বামীর মত করে গুণে যোগ্যতার এমন উজ্জ্বল স্বামী কাহার আছে? তোমাতে বুকে লইয়া আমি চলিব। রাজরাজেশ্বর আমার, তোমার এই বিজয়-অভিযানের পথে আমি এসেই চলিয়াছি তুমি জান. আমি নিশ্চিন্ত। 'I am in the thick of fight'—আমাকে বল দেও। সকালে মঠে যাই। পূর্ণেন্দুর দল ক্লান্ত; তাই তাহারা আজ কীর্তনের কাজ করিবে না বলিয়া স্থির করিয়াছিল। অনেকে বাজারে বাহির হইয়া গিয়াছে। আমি তখন পূর্ণেন্দুকে জাগিয়া কীর্তন দিতে আরম্ভ করি। সামনের দিক, পিছনের দিক কীর্তন হইল। আজও বইয়ের স্টল দুবেলা দেওয়া হয়। পূর্ণেন্দুর দল ৭টার মধ্যে এখানে খাইয়া দলগ্রাম রওয়ানা হইয়া যাইবে স্থির হইল।...৮টার সময় পূর্ণেন্দু ভাগবত ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন তাঁহাকে ঠাকুরের কিছু বই ও আমার 'নিত্যপ্রসঙ্গ' দেওয়া হয়। নগেন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেয়। তাহার পর কালীকীর্তন হয়। বিজ্ঞানানন্দের কীর্তন হয়। আমার উপরও যে ঠাকুরের দর্শন প্রকাশের ভার ঠাকুর দিয়াছেন—এই ধারণা মঠের অনেকের মধ্যে দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ নিয়া মঠে বেশ আলোচনা চলিয়াছে। ঝরিলালের অনুকারেক্সের পর বাঙ্গলায় একটা প্রতিষ্ঠা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইবারকার সত্যবাদিকীর সঙ্গে মধ্যে দিয়া কতকটা প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছে। রেণুও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। আজিকার অমৃতবাজারে বেশ বড় করিয়া প্রায় এক কলম বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে হোয়াইটহেডের 'It is as true' এবং Jeans-এর 'The old Physics' ইত্যাদি বাহির হইয়াছে:...

১২ই এপ্রিল

ঠাকুর, তুমি বর্তমান যুগস্রষ্টা। তুমি সর্বক্ষেত্রকে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিতে আসিয়াছ। তোমার চরণতলে সারা বিশ্ব গড়িয়া উঠিবে, তাহারই সূচনা দিকে দিকে। 'তোমার পতাকা তুমি যারে দাও তারে বহিবারে দেও শকতি'—সত্যই যদি তুমি আমার কাছে 'চাবি' রাখিয়া গিয়াছ, তাহা কি শুধু তোমার কাগজপত্রের, তোমার দর্শনের চাবি? তোমার দর্শনকে কার্যে রূপদান করিতে হইলে যে অর্থের দরকার, সেই টাকার সিন্দুকের চাবি কি আমার হাতে রাখিয়া যাও নাই? অর্থের অভাবে তোমার দর্শন প্রচারিত হইবে কি করিয়া? আমাকে ধন দেও, জন দেও, যোগ্যতা দেও যাহাতে তোমার পতাকা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। সকালে মঠে যাই। রেণু সজনীকান্তের ওখানে ফোন করে। সজনী-বাবু একদিন স্বীকার করিয়াও আজ বলিলেন, 'আমাকে আরও 'অভিজ্ঞ' করিয়া নিন, আমি এখন কিছু বলিব না'।...রাস্তায় বাসের ধরিয়া মঠের আবর্জনা সাফ করাইবার বন্দোবস্ত করে।...আমার উপর অভিযোগের অন্ত নাই। ৪টায় পূর্ণেন্দুবাবু ভাগবত ও কোরাণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ৮টার পরে ত্রিপুরারী চক্রবর্তী আসেন। তিনি নিজে আসিবেন ভাবিয়া আমরা কাহাকেও পাঠাই নাই, তিনিও আমরা কেহ যাই নাই

বলিয়া আসেন নাই'। প্রফুল্লকে টাকাকড়ি দিয়া পাঠাইলে হইলে তিনি আসেন। আসিয়া দাঁড়াইয়াই তিনি বলেন, 'আমি দক্ষিণাপেক্ষী ব্রাহ্মণ নই। মহাভারতের শিক্ষা আচার্যকে মানিতে হয়'। আমি বলিলাম, 'ক্ষমা করুন'। তাঁহাকে অভিবাদন, ঠাকুরের বাণী ও সংঘবদ্ধমূর্তি নিত্যগোপাল দেই। চা ও মিষ্টি খাওয়ানো হয়। তাহার পর আমরা সব চলিয়া আসি। ঠাকুর, আমি কেমন করিয়া তোমার প্রচার চালাইয়া যাইব? মঠের ভিতরে একটা শৃঙ্খলা স্থাপিত না হইলে বাহিরের লোক ডাকিয়া কি হইবে?

১৩ই এপ্রিল

আমার পরাণপুতলী রাধারাণী, তোমাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চলিয়াছি একা, একেবারে একা এই নির্জন প্রান্তর বাহিয়া। তুমি অনন্ত, আদি-নূতন-নীলের বন্ধন-ছেঁড়া বিরহবন্ধী। তুমি নিত্য অভিযুক্ত, আমিও অভিযুক্ত। যাহার জন্য যতটুকু আমার করা সঙ্গত, তাহা করিয়াছি। কিন্তু আমার উপর কত অভিযোগ। কি আমি করিব রাধারাণী? আমার সাগর-সেচা মাণিক, অন্তের যষ্টি—'তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে'। তুমিই তো নিত্যগোপাল-সাজে আসিয়াছ। ধন্য আমি, তৃপ্ত আমি—'তোমার পতাকা যারে তারে বহিবারে দাও শকতি'। তোমাকে বহিয়া নিবার শক্তি আমায় দেও। সকালে মঠে যাই। ৮৷৷ টায় পর ট্রাস্টীদের সভা বসে। আমাকে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করা হয়। আমি থাকি। প্রথমে তুলসী 'জ্ঞানানন্দ সেন্টিনারী' ও কাশীর প্রচারিত প্রচারপত্র সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত করে। পরে যতীনবাবু ১০০০৲ টাকা অগ্রসারিত হইবার বিষয় উত্থাপন করেন। ১১টায় পর চলিয়া আসি।...৪৷৷টায় পর আমি কুসুম মিশ্র ও গোপা বাসে যাই, রেণু যায় ট্রামে। বুক-ষ্টল খোলা হয়। নির্ভা বালিক সংসদ কর্তৃক ৬৷৷ টায় 'গুরুগ্রন্থ' পাঠ হয়। মেয়ে পুরুষের মিশ্রিত কণ্ঠে বেশ মনোজ্ঞ হইয়া ছিল। পরে অভিনন্দন জানাই। ঠাকুর বলিয়াছেন, কালী পুরাণে কোথাকে গুরুগ্রন্থ যেন আছে। কীর্তনের পূর্বে হয়তো সিংহ কিছু বলেন। ৭৷৷ টায় ত্রিপুরারীবাবু মহাভারত শুনান। 'ধর্ম' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গুরুভক্ত মানুষ—মানুষের সেবাই ধর্ম' প্রবন্ধ প্রধান উপজীব্য ঠাকুরের শেষ উপদেশ পাঠ করি এবং মহাভারতের নায়কের ছবি ঠাকুরের জীবনে দেখিয়াছি বলি। সর্ব ধর্মের সমন্বয় ছাড়া মহাভারত রচনা হয় না এবং শ্রীনিত্যগোপাল তাহাই ছিলেন ইহা বলিয়া অভিনন্দন জানাই। ১০ টার পর আসি। প্রফুল্ল বসু বলিল, সত্যই ঠাকুর আপনার কাছে চাবি কাঠি রাখিয়া গিয়াছেন।...১লা বৈশাখ বলিয়া ৪টার পর মঠে সকল উপস্থিত গুরুভ্রাতাদের ফটো তোলা হয়। নিত্যানন্দজী আসিলেন না।...

১৪ই এপ্রিল

ঠাকুর, তোমার চিরন্তন মহাভারত-নায়কের ছবি দেখিয়াছি। তুমি মহাভারত-স্রষ্টা, মূর্তিমান মহাভারত। সর্ব ধর্মের সমন্বয় ছাড়া মহাভারত রচনা হয় না। তুমি সর্বধর্মের সমন্বয়-মূর্তি, সর্বকর্ম সমন্বয়-মূর্তি, সর্বজাতি সমন্বয়-মূর্তি, মূর্তিমান গৌরব। তোমাকে বুকে লইয়া অভিমান করিব, বল দাও, শক্তি দাও, বুদ্ধি দাও। আমার সহিত তোমার যে সম্পর্ক তাহা তুমি সকলকে জানাইয়া গিয়াছ, আমার চিঠি তুমি তোমার শিষ্যগণকে শুনাইয়া দিয়াছ। সত্যই কি তুমি আমার কাছে তোমার সম্প্রদায়ের চাবি কাঠি রাখিয়া গিয়াছ? সম্পর্ক যাহা, তাহাতে তাহা মানায় বটে। আমাকে যোগ্য করিয়া লও। আজ আর সকালে মঠে যাই না। ৪টায় পর সভা আরম্ভ হয়। হাওড়াবিদ্যার সভাপতি হন।...'মায়াবাদের উপরে ঠাকুরের দর্শন প্রতিষ্ঠিত'—ইহা যে কতবড় মিথ্যা তাহা প্রকাশানন্দও বুঝিয়াছে। প্রকাশানন্দের কিছুটা হইয়াছে। ব্রহ্মমায়ার সম্বন্ধের উপর ঠাকুরের দর্শন প্রতিষ্ঠিত। ঠাকুরের জীবনে যে সর্বগুণ-সমন্বয়, সর্ববাদ সমন্বয় রহিয়াছে তাহা প্রকাশানন্দ বলে। তবে তাহার mode of speech ভাল নয়। সে আমাকে তাহার বক্তৃতার সময় উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিল। সভার পূর্বে 'তারকবাবু' নামে এক বৃদ্ধ (retired magistrate) আসেন, আমার সঙ্গে কথা বলেন। 'সমন্বয়-মূর্তি

বিদ্যাগোপাল' তিনি পড়িয়াছেন। ভাল লাগিয়াছে। বেলুকে প্রশংসা করিলেন। শিশির (হরিপ্রসন্নানন্দের শিষ্য) বলিল, 'আপনাদের এক গুরুভ্রাতা বলিয়াছেন যে শতবার্ষিকী হইবে না ষষ্টী হইবে'। এই অবস্থায় তিনটা দিন ৭ দিন উৎসব হইয়া গেল। ভালোই তো হইল। ঠাকুরের কথা আমার বলার সুযোগ হইলে আরও বেশী কাজ হইত। কিন্তু আমার তো সে আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করাই উচিত। আমি যে শতবার্ষিকীর সভাপতি। যাক্, লজ্জাবারণ লজ্জা ঢাকিয়াছেন, মুখ রাখিয়াছেন। কোনও দিন তো যে-অনুষ্ঠান সাজান নাই। ২০০৲ টাকার উপর বই বিক্রয় হইয়াছে। ছেলে আজ বন্ধ হইল। কাল প্যাণ্ডেল খোলা হইবে। আজ বিসর্জনের বেদনা। অতীনবাবুরা সকালে বিগ্রহ লইয়া দক্ষিণেশ্বর যান লহিতে, লহির কাছে উপস্থিত ছিলাম।

১৭ই এপ্রিল

ঠাকুর, মহাভারত উজ্জল ভারত সৃষ্টি করিতে হইলে যে সর্ব দর্শন-সমন্বয়-দর্শনের প্রয়োজন, তুমি তাহারই মূর্ত বিগ্রহ। কেহ তোমাকে চিনিত না, আজ বাংলা-দেশে তুমি আর অপরিচিত নও। তোমার স্থান এইবার পাকা পোক্ত করিয়া গড়িয়া তোল। তোমার শততম জন্মোৎসবকে কেহ কেহ মুক্তকণ্ঠে প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহাদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া তোমার উৎসব তুমি করিয়াছ। কিন্তু ইহার পরে কি পারিবে? এই ambitious scheme কি চালাইতে পারিবে? ইহারা তোমার মঠ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিবে? কিন্তু আমি যাইব কোথায়? তোমাকে প্রতিষ্ঠার জন্য সারা জীবন পথে পথে কাঁদিলাম। পাই নাই কিছু। বল দেও। সকালে মঠে যাই। ট্রাস্ট বডির সভায় যোগদান করি। ১০টার পর চলিয়া আসি। ৫টার পর আবার যাই। জ্ঞানবিদাদা গীতা পাঠ করেন। ঠাকুরের মতে যার যে নিষ্ঠা, ইহা তিনি বলেন। ইহা শুনিয়া খুব ভালো লাগিল। তাঁহার বলার পর আমি ৫ মিনিট বলি। এই শতবার্ষিকীতে 'সিদ্ধান্তদর্শন' খুঁজিয়া পাইয়াছি। ঠাকুরের আশীর্বাদে প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনা হইয়া গিয়াছে। ভগবানকে পাওয়ার পথ সাধনা। মায়াবাদে সাধনার পথ সিদ্ধি। 'ভক্তিযোগ সাধনাদ্বারা সিদ্ধিলাভ না করিলে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হওয়া যায় না'—ইত্যাদি বলি। স্বয়ংসেবী ভগবান পাইয়াছি, পাওয়ার পর সাধনা করিয়া সেই পাওয়াকে ঘন করিতে হইবে। সত্যই খুব আনন্দিত হইয়াছি। ট্রাস্ট বোর্ডের সভা হয়। ১০০০ টাকা চুরির ক্ষিতীশবাবু ১৫০ টাকা, শৈলেনবাবু ৫০ টাকা, ট্রাস্টীগণ ২০০ টাকা, আমি ১০ ও বাকী ভাবিনীবাবু দিবেন। দারিদ্র্যজ্ঞানহীনতার জন্য, ঐ টাকা কয়টি পূরণের দায়িত্ব স্বীকার না করাও এতদুপলক্ষে চরম ঔদ্ধত্য প্রকাশের জন্য সে মঠের পক্ষে অবাঞ্ছিত। অবিলম্বে তাহাকে মঠ ত্যাগ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইল। ১০টায় চলিয়া আসি। বেলু...ও মিষ্টর ওষুধ নিয়া আসি। বিকেল সন্ধ্যার পর আসিয়া বই বিক্রয়ের হিসাব ঠিক করে। শ্রীশ্রীতাগোপাল দর্শনে ও জীবনে ২১ টাকার উপর হইয়াছে। সমন্বয়-মূর্তি ৩২ টাকার উপর হইয়াছে।

১৬ই এপ্রিল

ঠাকুর, আমার সদা-প্রিয়, তোমাকে লইয়া আমি বড় বিপন্ন বোধ করিতেছি। সত্যই কেহ কি তোমায় চায়? তোমার বিগ্রহের খোঁজ কে রাখে? তুমি সর্ব ক্ষেত্রে বিগ্রহের বীজ বুনিয়া রাখিয়া গিয়াছ। তোমাকে বুকে লইয়া অভিযান করিবার মত শক্তি দেও, বুদ্ধি দেও, যোগ্যতা দেও। তোমার প্রতিষ্ঠা ছাড়া আমি কিছু চাই না।...আমার তো তোমাকে ছাড়িয়া থাকিবার যো নাই। তুমি আমার, আমি তোমার, তুমি আমি, আমি তুমি। সকালে মঠে যাই। ৮।। টায় ট্রাস্টীদের সভা আরম্ভ হয়। আজিকার অধিবেশনে বাজেট ঠিক করা হয়। চৈতন্য আসিয়া ক্ষমা চায়। অন্ততঃ ৫০টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবে বলিল। আসিতে ১২টা বাজে। রিকশায় (৸৵) আসি। ৫টার পর আবার যাই। শতবার্ষিকীর আর্থিক অবস্থা ভাল নয় বলিয়া চিদানন্দকে আর ৩৫ টাকা করিয়া দেওয়া সম্ভবপর নয়। এ বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য ট্রাস্টবোর্ড শতবার্ষিকীকে অনুরোধ

করিয়াছে।...সন্ধ্যার পর বিমল আসে, বই বিক্রয়ের হিসাব শেষ করে। ৮টার মধ্যে মঠ হইতে ফিরি। সচ্চিদানন্দের ট্রাস্টী হইতে অপসারণ করার প্রস্তাব আলোচনা হয়। চরিত্র-ভ্রষ্টির অভিযোগ। অমূল্য আজ শতবার্ষিকীর জন্য ৩৩.০০তে ২০ টাকা পাঠাইয়াছে, কুসুম দশ টাকা দিয়াছে, সুধাংশু ৫ টাকা।...

১৭ই এপ্রিল

ঠাকুর, বাঙ্গালাদেশে তোমার যেটুকু প্রতিষ্ঠা হইল তাহাকে নিয়াইয়া রাখো, বাড়াইয়া তোলার জন্য যে সুযোগ সুবিধা দরকার, তাহা আমাকে দেও। আমি যদি তোমার আশিস মধ্যে আমার আমি চুকাইয়া দিতে পারি, আমি বুঝি বা সেবমন্ত্র একটা প্রাণে আনিতে পারি, রক্ত বহাইতে পারি। প্রাণনের যে ছবি তুমি আমার কাছে প্রকট করিয়াছিলে, যাহার ভিতরে তুমি আমাকে লইয়া নৃত্য করিতেছিলে, সে ছবি কি বাস্তবের ক্ষেত্রে রূপ পরিগ্রহ করিবে না? আমায় বল দেও, বুদ্ধি দেও। আজ আর সকালে মঠে যাই না।...৩টার পর জয়াকে দেখিবার জন্য যাই...। ৫টার পূর্বে সেখান হইতে বীকর পাড়ীতে মঠে আসি। কিছু পরে নগেনদাদা কাশী যান, তাঁহাকে 'নিত্যগোপাল-দর্শনে ও জীবনে' দেই। সকালে ট্রাস্ট বক্তির সভা শেষ হইয়াছে। ওখানের সব অধিবাসীদের ডাকিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যেন আশ্রমোচিত জীবন যাপন করেন, মঠের কাজ করেন, পাঠ কীর্ত্তন করেন, ম্যানেজারের নির্দ্দেশ মত চলেন। তাহারা রাজী হইয়াছেন। চৈতন্য সম্বন্ধে প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হইয়াছে।...

১৮ই এপ্রিল

ঠাকুর, তোমার চরণ প্রান্তেই আমার নিত্য স্থান। তোমার চরণতলে আমার নিত্য স্থানে পড়িয়া থাকিবার মত যোগ্যতা আমাকে দেও। 'মধ্যপিত মনোবুদ্ধি' না হইলে শুধু পড়িয়া থাকিলেই তো পড়িয়া থাকা হয় না। তোমার দেহপ্রাণমনের ছাচে আমাকে গড়িয়া তোল। লোকে যখন বলে—তোমার চেহারার মত অনেকখানি আমার চেহারা, তখন উহা উপহাস বলিয়া মনে হয়। কোথায় তুমি আর কোথায় আমি! তোমার এক কণা যোগ্যতা আমার থাকিলেও তো হইত। তোমাকে কত লোক ভালবাসিত, আর আমার কাছে থাকিবার জন্য কয় জন আছে? আমার একাকিত্বের সাথী তুমি, স্বামী তুমি। তুমি আমার এক-বন্ধু, এক-সখা, এক-সুহৃৎ, এক-স্বামী। সকালে মঠে যাই না।... ৪টার পর আমি প্রতিভা বেণু ও গোপা স্কুলে মঠে যাই। লালমোহন দত্ত মঠে আসে। তাহাকে কলিকাতার ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউট ও মহাবোধি সোসাইটি হল ভাড়া কত তাহা জানিবার জন্য বলি। রামমোহন লাইব্রেরীর কথাও বলি। আজ ঠাকুরের গলার সোনার হার সকাল ৭ টার পূর্বে চুরি হইয়াছে। ৭॥ টার পর আমি ও লালু বাসে চলিয়া আসি...

১৯শে এপ্রিল

ঠাকুর, তুমি ছাড়া আমার কিছু নাই। এমন সুহৃৎ একজনও নাই যাহার সঙ্গে একত্র হইয়া তোমার কাজ প্রাণ খুলিয়া করিতে পারি। কাহাকেও তো দিলে না। অথচ যাহারা তোমার নাম ভাঙাইয়া খাইতেছে তাহাদের ধন-জনের অভাব নাই। আমি আমার প্রতিষ্ঠা খুঁজি, না তোমাকেই চাই—তুমি তাহার সাক্ষী। যে পর্যন্ত না ইহাদের মধ্যে তুমি আমাকে প্রতিষ্ঠা দিতেছ সে পর্যন্ত কাজ করিব কি করিয়া? তোমাকে বুকে লইয়া আদাইতে দেও, দোহাই তোমার। আমার প্রাণ যে বড় পাগল হইয়াছে। সকালে আমি ও বেণু মঠে যাই। 'সহস্রমূর্ত্তি নিত্যগোপাল' ও বাসী বিল্বদল ৫৮ টাকা চিদানন্দকে দিয়া আসি। গত রাত্রিতে যোগেশের গানের সময়ে মুরলী ঘর তাহার গলগল লইয়া পালাইয়া গিয়াছে। আমি পূর্বেই যোগেশকে সরাইবার কথা বলিয়া ছিলাম। তারিণীবাবু অনেক বাদ দিয়া কথা শোনেন। কি করিব? ৩৫ টাকা না পাইলেও চিদানন্দ কাজ করিবে মনে হইল। ২ হাজার টাকা হইলে দেনা শোধ হইবে চিদানন্দ বলে। এস্টেটের ১০০০+সুশীলার ৫০০+আমার নিকট ৪০০+বটু পাল বাবদ ৬৩+ তারিণীবাবুর ৮৫ টাকা আছে।...আজ আর আমি

বিকালে মঠে যাই নাই দীর্ঘ মাস পরে।

২০শে এপ্রিল

মানুষ, আমাকে তোমার অধীকৃত কর। তোমার অঙ্গের সঙ্গে আমাকে মিলাইয়া রাখ, আমি তোমার মাঝে হারাইয়া যাইতে চাই, তোমার আমি বনিয়া যাইতে চাই। তোমায় আমার বিশ্বতা বুঝিয়া যাক। তুমি আমি এক অদ্বৈত হই, ওগো আমার আমি। তোমাকে আমার 'তিনি' 'তুমি' করিয়া রাখিতে প্রাণে বেদনা বোধ করি। তোমার 'আমি' হইব—ইহাই আমার সাধ। আমার এই পথ-চলার একাকিত্বের মধ্যে তুমিই আমার সখা সাথী বন্ধু পরম সুহৃৎ স্বামী। তোমার কথা আমাকে শুনাও, আমার কথা তোমাকে শুনাই। পরস্পর পরস্পরের কথা বলিতে বলিতে শুনিতে শুনিতে একান্ত হইয়া অনন্ত পথ চলিব। তোমার জয় হউক আমার জীবনে, তোমার জয় হউক আমার জীবনে।...আমি ৪॥টার পর মঠে যাই।...এক বছরের জন্য একটী প্যাণ্ডেল করার কথা হয়। ডেকরেটার ডাকিয়া পরামর্শ করা হয়। টিনের ছাউনি দিয়া করিলে ৪২৫ টাকার মধ্যে হয়।...তুলসী হর যোগেশের কীর্তন বন্ধ করার জন্য অনুতপ্ত। সে-ই আবার যোগেশকে ডাকিয়া আনে। কীর্তন হইবে স্থির হয়। মেয়েদের আগ্রহ আছে। ঠাকুরের ২টী প্রতিমূর্তি (১টী এখানের, অপরটী নিত্যানন্দের মঠের জন্য) করার জন্য দেওয়া হইয়াছে। ৭০০টাকার মধ্যে দুইটী হইতে পারে। একটী লোকের করা ঠাকুরের অরেল পেন্টিং আর আনন্দময়ীর মঠ হইতে মহানির্বাণ মঠে অশ্বিনীবাবুর তাগিদের কালী (হিমাংশু) দিয়া যায় বৈকালে।...

২১শে এপ্রিল

পূর্ণযৌবনা আমার, তুমি প্রকৃতির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া নিজ জীবনে তাঁহাকে অঙ্গীকৃত করিয়াছ, নিত্য-সোপানক্রমে প্রকট হইয়াছ। প্রকৃতির অন্তর রূপ স্বীকার করিয়াই তুমি প্রকৃতিরঞ্জন; তুমি বিশ্ব-সংস্কৃতির এক নবীন রূপ স্থাপন করিয়া গেলে। তুমি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। তুমি সনাতন, তুমি চির নবীন। আমার তুমি ছাড়া কেহ নাই। সহায় সম্বলহীন আমি, অথচ বুকভরা আমার কর্ম-প্রেরণা। তোমাকে বিশ্ব-দরবারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া না যাওয়া পর্যন্ত আমি যে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। আমি না খোঁচাইলে তাঁহারা বেশ নিশ্চিন্তে থাকিতে পারেন। আমারই কি সব দায়? অথচ পূরণ করিবার সামর্থ্য কোথায়? তুমি কি মুখ তুলিয়া আমার দিকে তাকাইবে না? আমি কি আমার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল? সকালে মঠে যাই না, বৈকালে ৫টার পর মঠে যাই। রেণু ২টার পর রাইটার্স বিল্ডিং-এ এই বৎসরের 'উদ্বোধন-তারতে'র জন্য দরখাস্ত, সেক ডিপোজিট, বিশ্ব-বিদ্যালয়, হিন্দুস্থানে সাবিত্রীবাবু, বোধে মিউচুয়াল-এ যায়।...আমার ভাগ্যে কাহারও সেবা নাই। সেবাভাগ্যের জন্য সাধনা চাই বা কপাল চাই। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। মানুষের কল্যাণ করিতে পারিব না অথচ সেবা লইব, পা টেপাইব, পা টেপাইব, ইহা আমার ধাতে সয় না। ওদের দেখি—ওরা কত সহজে লোকের মধ্যে সেবা নেয়। আমার তো গা শিরশির করে। কেমন সঙ্কোচ বোধ করি। ঠাকুর আমাকে একা রাখিয়াছেন, একাই আমাকে চলিয়া যাইতে দেন। কে আমাকে দেখিবে তুমি ছাড়া? সবাই আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। কে এমন হতভাগার সঙ্গে থাকিবে? সঙ্গে থাকিলে কাজ হইত। কাজ আমি চাই। সেবার জন্য মানুষ চাই না। একজন বিলে তোমার কাজ হইত। আমি কিছু exploit করিতাম না।: আমি তো পৃথক সংসার করি নাই যে তোমার সেবার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিব? প্রতিভার গ্লাসের উপরের ফোঁটা হইতে রস ঝরিতেছে।

২২শে এপ্রিল

ঠাকুর, তোমার কাজ করিতে হইলে সংসারের মধ্যে যতটুকু ধন ও যত জনের সম্বল চাই, তাহা তো আমার নাই। কি আশ্রয় করিয়া, কাহাকে আশ্রয় করিয়া আমি সংসারের সাথে লড়িব? কেহ তো আমাকে স্থান দিল না। তুমিই আমার কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, তোমার সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ, তুমিই আমার অধিকরণ।

ভিক্ষা করিয়া পাওয়া আমার সব কিছু খালি হইয়া গিয়াছে। আমি আজ শূন্যের মধ্যে বাস করিতেছি। তুমি আমাকে পূর্ণ কর। এ সংসারে ধরিবার ছুঁইবার মত—যাহার উপর ভিত্তি করিয়া বাস করিতে পারি, আগাইতে পারি—কিছুই নাই। তুমি আমার সব হও। সকালে মঠে যাই না। রেণু ২টায় পর বাটা, কীমায়, ওয়ালটায় টম্পসন, বঙ্গলক্ষ্মী প্রভৃতি স্নান হইয়া ফেরে ৬টায়। আমি ৫টায় পর মঠে যাই। ফিরি ৮টায়।... ঘোষ করিয়া সেবা আদায় না করিলে কেহ সেবার সময় পায় না। অবসর মত সেবা কি আবার সেবা? দাদা সেবা আদায় করিয়াছেন। না করিলে ছাড়ে কে? আমার তো সে রকম প্রকৃতি নয়। যিনি সারা জীবন দাদার সেবা করিয়াছেন, তাঁকেই তিনি পথে বসাইয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার খাবার চলে না। অনন্যা লুট করিয়া খাইতেছে। তাহারাই ছিল দাদার আপনার। বৌঠাকুরুণের টাকাতেই তো দাদার সব কিছু। অথচ তাঁহার আজ কত কষ্ট! প্রীতিমত পথ্যাদি পান না। এই তো দুনিয়া! আমি দুনিয়ার কাড়াকাড়ির মধ্যে নাই। কর কর, না কর, বাবা, আমি বেশ আছি। আমাকে জ্বালাতন করিও না। আমি হাঙ্গামার মধ্যে নাই। যাহা 'সত্য' নয়, আমি তাহার মধ্যে থাকিতে পারিব না।

২৩শে এপ্রিল

ঠাকুর, নিত্যপথিক, নিত্যপথচারী, তুমি যে সত্যম প্রাণের পথ বহিয়া চলিয়াছ, সে পথের খোঁজই এ পর্যন্ত কেহ পায় নাই। আমি তোমার চরণ চাহিয়া চলিব। এই পথ চলিয়াছে পরস্পর-বৈপরীত্যের মাঝখান দিয়া।... অসীমের-সসীমেরই তো পরিপূর্ণ সমন্বয়! কবে বিশ্বমানব তোমার এই সনাতন-নবীন পন্থায় খোঁজ পাইবে, সেই পথায় চলিবে? আমি যে বড় একা। অনন্তবাবু লিখিয়াছেন, "কলিকাতা 'জয়' করিতে হইবে"। তাহাই কর। আমি সেবা করিবার জন্য উন্মুখ। আমি যখন ভাবি, তখন হাসি পায়। আমি তোমার মন্দিরে যাবার মধ্যে একবার গেলাম না, তোমাকে দেখিলাম না! আমি তোমাকে বুঝি ভালবাসি না। উহারা শুনিলেই বা কি মনে করিবে? আমি উহাদের হইতে কত পৃথক। মেলে বাহির হয় না। আমি প্রতিভা রেণু ও সোনা ৫টার পর মঠে যাই। আজ সাধু কমিটীর এক সভা ৬॥টায় আরম্ভ হয়। হিসাব মোটামুটি দেখানো হয়। ৬০০০৲ টাকার উপর খরচ হইয়াছে। এখন ১৩০০ টাকার মত দেনা। এস্টেট হইতে ১০০০ টাকা পাওয়া যাইবে। ৩০০ টাকার মত ব্যাঙ্কে ও অন্যত্র আছে। উদ্বৃত্ত চাউল ডাউল বাবদ ২০৭ টাকার উপর পাওয়া যাইবে। আমার নিকট ৪১১ টাকার দেনী আছে। ছোট প্যাণ্ডেল তোলা হইবে...।—উৎসবের দিন অন্তরায় প্রসাদ না পাওয়ার কথা অভিযোগের সুরে বলেন। নিজেদের ত্রুটি নিজেদেরই অগ্রসর হইয়া সংশোধন করিতে হয়।...

২৪শে এপ্রিল

ঠাকুর, মুক্তিধন তোমার ঐ শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া আমার সকল ক্ষেত্রের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি আনিয়া দিউক। তোমার সঙ্গে যদি আমার একাত্মতাই না হয়, তবে তোমার নাম নেওয়া, প্রসাদ পাওয়ার অর্থ কি হয়? সবই তখন নিরর্থক হয়, আচারমাত্রে পর্যবসিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের মুখের 'তাম্বূল' গ্রহণে শ্রীরাধার আবোদক্ষ হইত, জীবনে নাড়াচড়া পড়িত, বিপ্লব নামিয়া আসিত। তাই না প্রসাদ-গ্রহণ শ্রীরাধা-জীবনে সার্থক? একাত্ম হওয়ার জন্যই তো সব কাছে কাছে থাকা, একত্র থাকা, পরস্পর আলাপ আলোচনার প্রয়োজন। আমার তাই হউক। তুমি-আমি এক হইব—দেহে প্রাণে মনে বিজ্ঞানে আনন্দে আত্মায়। ইহা ছাড়া আর আমার কিছু কামনা নাই। তোমার মত আর কাহাকেও তো খুঁজিয়া পাই না। তুমি আমার, আমি তোমার। তুমি আমার—ইহা আমার সকল গর্বের চরম গর্ব। ৫-৪০-এ মহেন্দ্র মহন্তের সঙ্গে রিকসায় 'গীতা-ভবনে' যাই। ৩৫ পাতা অতিভাষণ বিতরণ করা হয়। ৬॥ টায় আলোচনা আরম্ভ করি, ৭॥টায় শেষ করি। সমস্ত সাধনার মূল কথা—'একাত্মতা' লাভ করা। কৃষ্ণকে ভালবাসিয়া কৃষ্ণময় হইতে হইবে।...বীরেন বহুর নিকট হইতে

উদ্বোধনের গ্রাহক বাবদ ৫টাকা আনি। ...সকালে চিন্তানন্দ আসে। গত দিনের সভার বিবরণী নিবার জন্য আসে। মেজাজ শান্ত রাখিয়া কে কি বলিয়াছে তাহার দিকে দৃষ্টি না দিয়া সেবা-বুদ্ধিতে কাজ করিয়া যাওয়া উচিত—ইহা আলোচনা করি।

২৫শে এপ্রিল

ঠাকুর, তোমাকে লইয়া আমি কি করিব? তোমার দর্শন ও জীবন আমি কেমন করিয়া মানুষের কাছে উপস্থিত করিব? কেউ যে আমার সহায় নাই। তোমার যারা তারা কেহ ইহার মধ্যে নাই। তাহাদের কাহাকেও পাওয়া যাইবে না। যদি বা জনসাধারণের কাছে একটু পরিচয় করানো গেল, ইহার পরের অধ্যায় কাহাদের লইয়া চালাইব? আমার ধন নাই, ধন নাই। তত বড় একা আমি, তুমি তাহা সবই জান 'শুধু জীবন-মন তোমাকে দিনু'—আমার দেহ প্রাণ লইয়া তোমার প্রচার তুমি করাইয়া লও—ইহাই শুধু প্রার্থনা। আমি 'সর্বারম্ভ-পরিত্যাগী'—তুমি তোমার প্রচার নিজেই করিবে। আমি নিমিত্তমাত্র হইব। কৌড়ার জন্য রেণু বাহির হয় না, ঘরের কাজ করে। সাময়িকী 'নিত্য-গোপাল জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব' শেষ করে। ৫টার পর আমি মঠে যাই। রেণু যায় ৬টার পর বই বিক্রয়ের টাকা বুঝাইয়া দিতে। সেখানে শিশির নিয়োগী (কেদার মিত্রদের বন্ধু, নিতাইবাবুদের পরিচিত, আমারও, নিখিল-বাবুর মতন) আসিয়া উপস্থিত মাসিক চাঁদা দিতে। ...গুরুভ্রাতাদের বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়া যে মঠের সমস্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইতেছে, তাহা বলি। উঁহারা যখন এখানে আসিবেন, ভাইয়েরা সব একত্র থাকিবেন, ভাইয়ের শিষ্যগণ পরস্পর মেলামেশা করিবে, তবেই না একটা সঙ্ঘ টেকে? প্রশিষ্যগণ যে-যার গুরু লইয়া ব্যস্ত; গুরুর গুরুভ্রাতাগণ যেন তাহাদের কেউ নন। এইভাবে নিত্যগোপালই বাদ পড়িয়া যাইতেছেন। যে পর্যন্ত না প্রশিষ্যগণ নিজ গুরুর গুরুভ্রাতাগণের সঙ্গে যুক্ত হইতেছেন, ততদিন গুরুভক্তিও মোহ ছাড়া আর কিছু নয়। উহা তো বিষয়ীর ভালবাসা। ব্যাপকতা কোথায়? গভীরতা কোথায়? এখানে আসিয়া বাহির হইতে প্রশিষ্যদের নিজ নিজ গুরুসেবা করিতে দেওয়া চলিবে না, এক একটা pocket সৃষ্টি করিয়া বিচ্ছিন্ন দল সৃষ্টি করিতে দেওয়া দীর্ঘদিন চলিতে পারে না। ঠাকুরের স্থানে সকলেই শিষ্য। যে যাহার গুরু হউন, এখানে গুরু নিত্যগোপাল।...

২৬শে এপ্রিল

রাধারাণী, সারা জীবনের কল্পনার মূর্তিমতী সার্থকতা আমার, বিশ্বপরিকল্পনার মূর্তিমতী সফলতা তুমি। তোমার ছন্দে জীবন চালাইব, তোমার ঢং-এ যাবতীয় ব্যবহার করিব, তোমার প্রাণ-পথ বহিয়া চলিব—ইহাই তো সারা জীবনের সাধ। তোমাকে নিত্যগোপালরূপে পাইয়াছি। ওগো আমার আমি, আমায় বিচ্ছিন্ন আমি তোমার মাঝে নিশিয়া যাউক, মুছিয়া যাউক, তুমি আমি এক অদ্বৈত হই। তুমি কায়া আমি ছায়া, তুমি আছ আমি নাই। আমার না-থাকাতেই আমি সত্য আছি। 'নিত্যগোপালোঽহম্' ইহাই আমার শেষ পরিচয়। তুমিই আমার পরম আমি। তুমিই আমার 'I am'। তোমার মাঝে নির্বাণ লাভ করিয়াই আমি জাগিয়া উঠিব। তুমি আমি, ওগো আমার আমি। সকালে আজ মাখনবাবু আসে। রেণু ১১টার পর কলিকাতা যায়। জানলার বিজ্ঞাপন পায়: ওরিয়েন্ট পাবলিসিটির —বলিয়াছেন, 'আমি দীর্ঘদিন মহানির্বাণ রোডে ছিলাম। মঠে যাহারা থাকে, তাহারা অলস। কোনও আধ্যাত্মিক উন্নতিও নাই ইত্যাদি।'—এই তো মঠ সম্বন্ধে ধারণা। আমি ৫টায় মঠে যাই।...যোগেন্দ্রনাথ সরকার আসেন। কথাবার্তা হয়। তিনি জ্ঞানানন্দ লাইব্রেরীতে রেণুর লিখিত 'মুখিত শাবাশ' পড়িয়াছেন। উদ্বোধনের গ্রাহক হইবেন।... বৈকালে রামদাস মোদকের সঙ্গে দেখা...। নীলরতনবাবু শ্রীনিত্যগোপাল-দর্শনে ও জীবনে সিদ্ধান্তদর্শনের সঙ্গে পড়িতেছেন।

২৭শে এপ্রিল

ঠাকুর, আমার জীবনের যাহা কিছু সবকিই তুমি। তুমি ছাড়া আমার আমি বা আমার কিছুই নাই। তুমি

পূর্ণ, আমি শূন্য ; তুমি আছ আমি নাই, তুমি আছ আমি ছায়া। তুমি স্বমহিমার স্বমাধুর্যে প্রকাশিত হও স্বেচ্ছায়, আমি নিমিত্তমাত্র হইব। তোমাকে জীবনে বহিয়া বিশ্বসভায় প্রবেশ লাভ করিবার মত বল দেও, বুদ্ধি দেও, সুযোগ দেও। জাগো নিত্যগোপাল, বিশ্ব সত্যস্তাকে বরন করিয়া আমার জীবনমনেধন শ্রীনিত্যগোপাল আমার। আমার সকল তুমি, আমার সামনে তুমি, আমার পশ্চাতে তুমি, বামে তুমি দক্ষিণে তুমি, ঊর্ধ্বে তুমি, অধস্তে তুমি, তুমি আমি, আমি তুমি। তোমার আমিই আমার আমি, আমার আমি নাই, নাই। তোমার আমির জয় হউক। রেণু ১০টার পূর্বে বাহির হইয়া পোষ্টাফিস ব্যাঙ্ক ও রেশন অফিস হইয়া আসে। খাইয়া আবার চলিয়া যায় রাইটার্স বিল্ডিং, প্রেস সিণ্ডিকেট, মেট্রোপলিটান, এস সরকার, এস সি সরকার ও প্রেস হইয়া তাহার মায়ের ওখানে খাইয়া মঠে যায় প্রায় ৭টায়। আমি ৫টার পর মঠে যাই। আজও যোগেন্দ্রনাথ সরকার স্ত্রীসহ আসেন।...আমি বৈসুণ্ঠের দ্বারে সনন্দাদির সঙ্গে অস্ত্র-বিজয়ের ঝগড়ার প্রসঙ্গ তুলি। গিরিধারী প্রসঙ্গ আলোচনা করি—'অহম্ শৈলোঽস্মি'। বিশ্বব্যাপী কালের যে একটী divine রূপ আছে, তাহা বলিলে যোগেনবাবু ব্রজেন শীলের উল্লেখ করেন। ব্রজেনবাবু আমার কথাই abstruce ভাবে বলিয়াছিলেন জগন্নাথের মন্দিরগাত্রে অশ্লীল ছবির ব্যাখান প্রসঙ্গে। মহাপ্রভুরই ক্রমবিবর্তিত রূপ যে নিত্যগোপাল এবং কৃষ্ণই যে নিত্যগোপাল ইহা তত্ত্বতঃ আলোচনা করি। যোগেনবাবু বলেন, world force আজ এমনভাবে কাজ করিতেছে যে তাহাতে নিত্যগোপালের প্রকাশ অনিবার্য। শ্রীনিত্যগোপাল বর্তমান যুগসমস্যার সমাধানমূর্তি। তিনি প্রকাশিত হইবেন, বিশ্বের প্রয়োজন আছে। যোগেনবাবু ৪টাকা দেন। ১০ই এপ্রিলের সভার ভাড়ার জন্য তোলা হইয়াছিল, আজ তাহা মঠে আসিয়াছে। বেশ হইয়াছে। আমার ছবিটাও বেশ উঠিয়াছে। দাম নাকি খুব বেশী। আমি ও রেণু ৯টায় ট্রামে আসি। রাধাগোবিন্দ রায়ের ওখানে তারিণীবাবু ফোন করিয়া জানিয়াছেন যে, তিনি ৯ই যে এখানের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। কাল প্রতাপ গুহরায়ের ওখানে রেণু ও তারিণীবাবু যাইবেন। যোগেনবাবুর বুঝিবার বেশ শক্তি আছে রেণুর সঙ্গে দেখা হয়।

২৮শে এপ্রিল

ঠাকুর, বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্কটসময়ে তুমি আসিয়াছিলে নিত্য-অনিত্য সমন্বয় তত্ত্ব লইয়া, ষড়্-অষড় সমন্বয়তত্ত্ব লইয়া। যিনি যতদূর এই সংস্কৃতির বিষয়ে বলিতে পারিয়াছেন, বলিয়াছেন। তুমি দিলে চুপ করিয়া (নি—চুপ)। আজ সেই বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্কটতম সময়ে ১০০ বৎসর পরে তুমি আত্মপ্রকাশ করিলে। তোমার জয় হউক। তোমার চরণতলে দিব তাহার উষ্ণ মস্তিষ্ক রাখিয়া সুস্থ হউক, স্বস্থ হউক। তুমি সর্বতন্ত্রের ঘনবিগ্রহ, আমার স্বামী। তুমি 'শেষরূপ ধন, তোমার প্রকাশের উপযুক্ত সময় ইহাই বটে। তাই বুঝি তুমি বলিয়াছিলে ২।১০ বৎসর আর সবুর সয় না ? ২·১০ বৎসর অর্থ ১০×১০=১০০ অর্থাৎ তোমার শতবার্ষিকী। তোমার জয় সফল হউক। রেণু...কলিকাতা যায়—স্টাণ্ডার্ড ফ্যাসাসিউটিক্যাল, মেট্রোপলিটান প্রভৃতি স্থান, সর্বশেষে ক্যালকাটা কেমিক্যাল।...রেণু ও তারিণীবাবু প্রতাপ গুহরায়ের ওখানে যায়, ফেরে ৯টার পর। প্রতাপবাবু ১ই মে-র সভায় যাইবার চেষ্টা করিবে। তবে কিছু বলিবে না। আমি বলিলে সে কিছু বলিবে না, ইহার পর সে এতদিন বলিবে, সেদিন আমি বলিব না। আমার সম্বন্ধে অনেক কথা তারিণীবাবুর কাছে বলে। 'বাঙলা দেশে শরৎ ঘোষের মত এই আলোচনা করিবার মত আর কেহ নাই। আপনারা শুনিয়া যাবুন। সে নিত্য নূতন কথা বলিতে পারে ইত্যাদি'। মঠের পূজারী—নাকি ঠাকুর ভোগের ভাল ভাল জিনিষ আগে সরাইয়া রাখে। এমন আশ্চর্য কথা তো শুনি নাই। এমন লোভী মানুষ হয় ? ঠাকুর, কোথায় তুমি ? এমন ক্ষুদ্রতা লইয়া কি করিয়া তোমার সন্তানরা বাঁচিবে ?...

২৯শে এপ্রিল

ক্রমশঃ

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের মূল তাৎপর্য্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত 'সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

"মুমুক্ষুণা কিং ত্বদিতেতরেণ,
সৎসঙ্গতি র্নির্মমতেন ভক্তিঃ।"

ঐ পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের প্রথম শ্লোক দেখিলে, তাঁহারও দ্বৈতবাদ ও ভক্তি ছিল, স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি বলিয়াছেন,—

"শ্রীহরিং পরমানন্দস্বরূপমেকমীশ্বরম্।
ব্যাপকং সর্ব্বলোকানাং কারণং তং নমাম্যহম্॥"

শ্রীমদ্ভগবৎ-শ্রীমদ্গোবিন্দ-পাদাচার্য্য পরিব্রাজক পরমহংস স্বামী বিরচিত অদ্বৈতানুভূতি নামক গ্রন্থের প্রথম শ্লোকও দ্বৈতবাদ ও ভক্তির পরিচায়ক। সেই শ্লোক এই প্রকার,—

"স্বর্গস্থিতি প্রলয়হেতুমচিন্ত্যশক্তিং
বিশ্বেশ্বরং বিদিতবিশ্বমনন্তমূর্ত্তিং
নির্মুক্তমন্ত্রমপারসুখাম্বুরাশিং
শ্রীবল্লভং বিমলবোধঘনং নমামি।"

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের বিবিধপ্রকার স্তোত্র পাঠ করিলেও তাঁহার দ্বৈতবাদ এবং ভক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ আনন্দগিরিকৃত তাঁহার সুবিখ্যাত শঙ্কর-দিগ্বিজয় এবং কেরলোৎপত্তি নামক গ্রন্থদ্বয় অধ্যয়ন করিলেও, শঙ্করাচার্য্যের দ্বৈতবাদ, ভক্তি এবং প্রেমের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ অনুশীলন করিলে অবগত হওয়া যায়, তাঁহার দ্বৈতাদ্বৈত উভয় বাদই ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয় ভাগ

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য রচিত আত্মবোধ গ্রন্থ সম্বন্ধে মত

প্রথম সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য—

"অল্পোক্তি ক্ষীণপাপানাং শাস্ত্রানাং বীতরাগিণাম্।
মুমুক্ষূণামপেক্ষাহেয়মাত্মবোধো বিধীয়তে॥"

বলায়, তাঁহার বহু মুমুক্ষু স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারও বহুবোধ ছিল না, বলা যায় না। তাঁহার কেবল এক ব্রহ্মাত্মা আছেন বোধ থাকিলে তিনি 'তদপোহিঃ কীদৃশ পাপানং শাস্তানং দীপ্তাগ্নিগণং' এবং 'মুমুক্ষুণাং' বলিতে পারিতেন না। বহু-বোধ যাহার আছে তাঁহাকে অদ্বৈতবাদী বলা যায় না। শ্রুতি বেদান্তানুসারে মুমুক্ষুকেও অনাত্মা বলা যায় না। ঐ শ্রুতি ব্রহ্মানুসারে অবশ্য মুমুক্ষুও অনাত্মা। সেইজন্য বহু মুমুক্ষু স্বীকার করা যায় না। তবে তিনি অদ্বৈতবাদী নন, তিনি অবশ্যই বহু মুমুক্ষু স্বীকার করিতে পারেন। একাত্মার বহুবিকাশ স্বীকার করিয়া তাঁহাতে বহু বলিলে, নির্বিকার আত্মারও বিকার আছে স্বীকার করা হয়। তাহা হইলে পরিণাম-বিহীন আত্মারও পরিণাম আছে স্বীকার করা হয়।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থে দ্বিতীয় শ্লোকের শেষাংশে বলা হইয়াছে—'জ্ঞানং বিনা মোক্ষো ন সিধ্যতি'। বেদান্ত মতের কোন গ্রন্থেই আত্মা এবং মোক্ষ অতিরিক্ত বলা হয় নাই। সুতরাং সে মতেও মোক্ষ সৎ নহে। সে মতেও মোক্ষকে অসৎ-অনাত্মা বলিতে হয়। সুতরাং নির্বিকার আত্মজ্ঞানীর পক্ষে, মোক্ষও অতি তুচ্ছ। প্রকৃত কথা বলিতে হইলে, নির্বিকার নিরঞ্জন আত্মার কখনই আত্ম-জ্ঞানের অভাব হয় না। সুতরাং সেই আত্মার কখন মোক্ষও প্রয়োজন হয় না। কোন ব্যক্তিকে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার সেই বন্ধন মুক্ত করিতে হইলে কি কর্মের প্রয়োজন হয় না? তাহার সেই বন্ধন মোচন করাও যে কর্ম। উক্ত উদাহরণানুসারে জানা যায়, বন্ধন মোচন করিতে হইলেও কর্মের বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মতে 'জ্ঞানং বিনা মোক্ষো ন সিধ্যতি' স্বীকার করিলে, সেই জ্ঞানকেই এক প্রকার কর্ম বলিতে হয়। আর শঙ্করাচার্য্যের এই আত্মবোধ গ্রন্থেই—

"অজ্ঞানবদ্ধস্য হীদং জ্ঞানাভ্যাসাদিনির্ধনং।
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জ্ঞানং কস্তত্রযত্নবৎ॥

শ্লোকানুসারে জ্ঞানেরও অনিত্য বলিতে হয়, কারণ উক্ত শ্লোকানুসারে জ্ঞানও নষ্ট হয়। নষ্ট যাহা হয়, শ্রুতি বেদান্তানুসারে তাহা নিশ্চয়ই অনিত্য। সুতরাং সেই অনিত্য জ্ঞানদ্বারা অনিত্য-মোক্ষে, নির্বিকার নিরঞ্জন নিত্যতার প্রয়োজনই হইতে পারে না। যদি আত্মার বন্ধন স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আত্মা নির্বিকার নিরঞ্জন নহেন শ্রুতি বেদান্তানুসারে আত্মা নির্বিকার নিরঞ্জন স্বীকৃত হইলে, তাঁহার অবশ্যই বন্ধন এবং মোক্ষ উঠিয়াই যায়। শ্রুতি বেদান্তানুসারে এবং শঙ্করাচার্যের উক্তগুলি শ্লোকানুসারে বন্ধনও অনাত্মার বিকাশ এবং মোক্ষও অনাত্মার বিকাশ বলা যাইতে পারে। ঐ অনাত্মার বিকাশ মোক্ষ লাভের জন্য, অজ্ঞান সাধনার প্রয়োজন হয় না, তাহা দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ-শ্লোকানুসারে বুঝিবার কোন কারণ নাই। ঐ শ্লোকানুসারে বোঝা যায়, মোক্ষলাভ করিতে হইলে যে সকল সাধনার প্রয়োজন হয়, সে সকলের মধ্যে মোক্ষলাভ সম্বন্ধে বোধ বা জ্ঞানই প্রধান সাধনা। কোন সাধনাই অক্রিয় নহে। সুতরাং মোক্ষলাভ সম্বন্ধেও ক্রিয়ার প্রয়োজন আছে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতে—

"অবিরোধিতয়া কর্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্ত্তয়েৎ।
বিদ্যাহবিদ্যাং নিহন্ত্যেব তেজস্তিমিরসংঘবৎ॥ ৩।"

আলোকও অনাত্মার বিকাশ, অন্ধকারও অনাত্মার বিকাশ, অথচ অন্ধকার তিরোধানের কারণ আলোকই হয়। তদ্রূপ অনাত্মা-অবিদ্যার বিকাশ কর্ম, ইহাও স্বীকার করিলে, কোন প্রকার কর্ম দ্বারাই যে অবিদ্যা নিবৃত্ত হইতে পারে না, এইরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ এক প্রকার কর্ম দ্বারাও ত অপর প্রকার কর্ম নিবৃত্তি হইতে দেখা গিয়াছে। যেমন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রহার করিতেছে; যে ব্যক্তি প্রহার করিতেছে তাহা

অপেক্ষা কোন বলবান ব্যক্তি দণ্ডাদিগত বলপ্রয়োগদ্বারা সেই প্রকার কার্য্য নিষ্পাদন করিতে পারেন। সুতরাং কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম নিবৃত্তি হইতে পারে অস্বীকার করা যায় না। যেমন আলোকই আলোক-দর্শনের কারণ হয়, তদ্রূপ কর্ম্মই বা কর্ম্ম-নিবৃত্তির কারণ হইবে না কেন? শঙ্করাচার্য্যের মতেই যে বিদ্যাও অনাত্মা এবং অবিদ্যাও অনাত্মা, বিদ্যা বা জ্ঞানও যে অনাত্মারই এক বিকাশ, তাহা তাঁহার এই আত্মবোধ নামক গ্রন্থের পঞ্চম শ্লোক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ঐ পঞ্চম শ্লোকানুসারে জ্ঞানেরও নাশ আছে, সুতরাং জ্ঞান বা বিদ্যা কখনই নিত্য নহে, তাহা অবশ্যই অনিত্য। শ্রুতি বেদান্তমতে অনিত্য যাহা, তাহাই যে অনাত্মা-অবিদ্যা। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের পঞ্চম শ্লোকানুসারে জ্ঞান বা বিদ্যাও অনাত্মা-অবিদ্যা। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য আত্মবোধের তৃতীয় শ্লোকের শেষার্দ্ধে—'বিদ্যাহবিদ্যাং নিরস্যোম তেজস্তিমিরসংঘবৎ' বলায় সেই অনাত্মা-অবিদ্যা বিদ্যাই অবিদ্যা নাশের কারণ হয়। অতএব প্রকারান্তরে অনাত্মা-অবিদ্যা-বিদ্যাই সেই অনাত্মা অবিদ্যা বিদ্যার নাশের কারণ হয়। কেহ আপনি আপনার নাশের কারণ হইলে, সে আপনি নিশ্চেষ্ট থাকে না, সেই জন্যই শঙ্করাচার্য্য আত্মবোধের পঞ্চম শ্লোকে বলিয়াছেন,

"অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাদ্বিনির্ম্মলং।
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কতকরেণুবৎ॥"

চতুর্থ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের চতুর্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"পরিচ্ছিন্ন ইবাজ্ঞানাত্তন্নাশে সতি কেবলঃ।
স্বয়ং প্রকাশতে হ্যাত্মা মেঘাপায়েঽংশুমানিব॥

অংশুমানের অংশু ও সেই অংশুকে দর্শন করে না। যদি অংশুমানের অংশু সেই অংশুকে দর্শন করিতে পারিত, তাহা হইলে সেই অংশুমানের সমস্ত অংশু মেঘ দ্বারা আবৃত হইলেও অংশু,—অংশুকে দেখিত। আত্মা-অংশুমানেরও জ্ঞানাংশু আছে। সুতরাং তিনি অজ্ঞান-মেঘদ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও তিনি আপনি আপনাকে দর্শন করেন। আত্মাংশুমান যে নিত্য অংশুমান। সুতরাং তাঁহার আত্মজ্ঞান নামক অংশুও নিত্য। সেই জন্যই আত্মার আত্ম-দর্শনও নিয়ত হইতেছে। তাহার বারণ, অজ্ঞান মেঘ হইতেই পারে না। অংশুমানের অংশু দর্শন করিবার জন্য অপর কেহ আছে। সেইজন্য মেঘ-রূপ দ্বারা বস্তুত সেই দর্শক 'এক' অংশুকে পরিচ্ছিন্ন-রূপে দর্শন করিতে পারেন। কিন্তু সেই আত্মাকে দর্শন করিবার জন্য ত অপর কেহ নাই আত্মাই আত্মাকে দর্শন করেন। সুতরাং পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, অজ্ঞান আত্মার—আত্মাকে দর্শনের প্রতিবন্ধক হইতেই পারে না। অন্য কেহ যদি ঐ আত্মা দর্শন করিবার জন্য থাকিত, তাহা হইলে অজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধক বশত, সেই ব্যক্তি ঐ অখণ্ডাত্মাকে খণ্ড খণ্ড রূপে দর্শন করিত।

পঞ্চম সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চম শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাদ্বিনির্ম্মলং।
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কতকরেণুবৎ॥"

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মনামাবলী-মালা নামক গ্রন্থে 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' বলায়, তাঁহার 'অজ্ঞানকলুষং জীবং' বলা উচিত হয় নাই শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মনামাবলী-মালাতে জীব ও ব্রহ্ম যে অভেদ, ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। শ্রুতি বেদান্তমতে ব্রহ্মের সঙ্গে অজ্ঞানের কোন সংস্রবই নাই। সুতরাং সেই ব্রহ্ম-জীবেরও অজ্ঞানের সহিত কোন সংস্রব থাকিতেই পারে না। অতএব শঙ্করাচার্য্যের 'অজ্ঞানকলুষং জীবং' উপদেশ, তাঁহারই 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' উপদেশদ্বারাই খণ্ডন করা হইল। উক্ত পঞ্চম শ্লোকানুসারে জানা যায়, জ্ঞানও অভ্যাস করা যায়। অভ্যাসই সাধনা, এবং সাধনাই ক্রিয়া। সুতরাং জ্ঞান বা বিদ্যার সহিত কর্ম্ম বা ক্রিয়ার বিরোধ নাই, স্পষ্টই জানা যাইতেছে। আত্মবোধ নামক গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোকানুসারে অবিদ্যার সহিতও কর্ম্ম বা ক্রিয়ার বিরোধ নাই। ঐ তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"অবিরোধিত্বয়া কর্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্ত্তয়েৎ,
বিদ্যাঽবিদ্যাং নিহন্ত্যেব তেজস্তিমিরসংঘবৎ ॥"

উক্ত তৃতীয় শ্লোকানুসারে জ্ঞানেরও নাশ আছে,। সুতরাং জ্ঞানও নিত্য নহে। ঐ জ্ঞানেরই অপর নাম বিদ্যা।

ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"সংসারঃ স্বপ্নতুল্যো হি রাগদ্বেষাদি সঙ্কুলঃ।
স্বকালে সত্যবদ্ভাতি প্রবোধেঽসত্যতাং ব্রজেৎ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে, সংসার স্বপ্নের ন্যায়। স্বপ্ন-দর্শনকালে স্বপ্নকে সত্য-বোধই হয়। সেই বোধটীকে তুমি ত অবোধ বা অজ্ঞান বলিতে পার না। যে অবস্থায় সংসার এবং সাংসারিক সমস্ত ব্যাপারই বিদ্যমান বোধ হয়, সে অবস্থায় সে বোধকে অবোধ বা অজ্ঞান বলিতে পার না। জাগরণে সেই দৃষ্ট-স্বপ্ন মিথ্যা বোধ হইলে, সেই জাগরণের বোধকে অবোধ বা অজ্ঞান বলিতে পার না। যে অবস্থায় সংসার এবং সাংসারিক সমস্ত ব্যাপারই মিথ্যা বোধ হয়, সে অবস্থায় সেই বোধকেও অবোধ বা অজ্ঞান বলিতে পার না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য,—উক্ত স্বপ্ন-বোধ সত্য? না জাগরণে সেই স্বপ্নকে যে মিথ্যা-বোধ হয়, সেই জাগরণের বোধ সত্য? অদ্বৈতমতে বোধ বা জ্ঞান একই। কোন কোন অদ্বৈতমত-প্রতিপাদক গ্রন্থে, বোধ বা জ্ঞানকে নিত্য বলা হইয়াছে। কিন্তু পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ নামক গ্রন্থের পঞ্চম শ্লোকানুসারে জ্ঞান বা বোধকে নিত্য বলিতে পারা যায় না, কারণ ঐ শ্লোকানুসারে জ্ঞানও নষ্ট হয়। যাহা নষ্ট হয় তাহা নিশ্চয়ই অনিত্য। সুতরাং তাহা নিশ্চয়ই আত্মা নহে। আত্মা নহে যাহা, তাহাই অনাত্মা। সুতরাং জ্ঞান বা বোধও অনাত্মা, সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? অতএব সংসার এবং সাংসারিক সমস্ত ব্যাপার যে অবস্থায় সত্য বোধ হয়, সে অবস্থায় সে বোধও নশ্বর, অনিত্য এবং অনাত্মা। যে অবস্থায় সংসার এবং সাংসারিক সমস্ত ব্যাপার মিথ্যাবোধ হয়, সে অবস্থায় সে বোধও নশ্বর, অনিত্য এবং অনাত্মা। ঐ প্রকার নশ্বর, অনিত্য এবং অনাত্মা যে জ্ঞান বা বোধ, তাহা নিশ্চয়ই নিত্যাত্মার অস্তিত্ব বোধেরও কারণ হইতে পারে না; এবং সেই নিত্যাত্মা কি তাহাও ঐ প্রকার জ্ঞান বা বোধ কখনই অবধারণ করিতে পারে না। যে বোধ বা জ্ঞান একই বিষয়কে কখন সত্যরূপে অবধারণ করায় এবং কখন বা অসত্যরূপে অবধারণ করায় সে জ্ঞান বা বোধের কোন্ নির্দ্দেশ বিশ্বাস করা যাইবে? অতএব সেই জন্য সংসার সত্য কিংবা মিথ্যা বলিবে? আমি বলি, যাঁহার সংসার এবং সাংসারিক ব্যাপারের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংস্রব রহিয়াছে, যাঁহার সংসার প্রত্যক্ষ হইতেছে, যাঁহার সংসার ও সাংসারিক সমস্ত ব্যাপারই সত্য বোধ হইতেছে, তিনি সংসার এবং সাংসারিক সমস্ত ব্যাপার অসত্য কি প্রকারেই বা বলিবেন?

সপ্তম সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের সপ্তম শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"তাবৎ সত্যং জগদ্ভাতি শুক্তিকা রজতং যথা।
যাবন্নজ্ঞায়তে ব্রহ্ম সর্ব্বাধিষ্ঠানমদ্বয়ং ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে অবগত হওয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ব্রহ্মই সর্ব্বাধিষ্ঠান জ্ঞান থাকে। সর্ব্বের বিদ্যমানতা রহিলে, জগন্নোপেরই বা প্রয়োজন কি? শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মমাধবনী-মালার একোনবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"ঘটকুণ্ডাদিকং সর্ব্বং মৃত্তিকামাত্রমেবহি।
তদ্বদ্ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমিতি বেদান্ত ডিণ্ডিমঃ।"

ক্রমশঃ

সাময়িকী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-জন্মোৎসব—ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ ও গীতার ভাষ্যকার অবধূত শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের পঁচাশীতম জন্মতিথি কার্ত্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমী ছিল বিগত ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ বুধবার (ইং ২১শে নভেম্বর ১৯৬৭)। ঐদিন বাঙ্গইআটি অশ্বিনীনগরস্থিত নরনারায়ণ আশ্রমের তাঁহার সমাধিস্থানে নীরব শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গব্যাপী সেদিন হরতাল থাকায় বাহির হইতে কেহ আসিতে পারেন নাই। স্থানীয় অধিবাসী কেহ কেহ স্নান করিতে বিকালে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এই জন্মোৎসব পরবর্ত্তী রবিবার ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সেদিন আশ্রম-দেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের বিশেষ পূজা আদি অন্তে আশ্রমস্থিত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অঞ্জলি প্রদান করে। অতঃপর শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের ভোগের প্রসাদ বিদ্যালয়ের শিশুগণসহ প্রায় তিনশত জনকে বিতরণ করা হয়। বুধবার হইতেই যে অনিশ্চিত অবস্থার বিপজ্জনক পরিস্থিতি চলিতেছিল, তাহাতে সকালে যে মহিলার নামকীর্ত্তন গাহিবার কথা ছিল, তিনিও আসেন নাই, এবং শ্রীমৎ স্বামিজীর শিষ্যশিষ্যা বা ভক্তবন্ধুগণও সকলে আসিতে পারেন নাই। এদিকে রবিবারের বিকালের সভায় যাঁহাদের স্বামিজীর সম্বন্ধে বলিবার কথা ছিল তাঁহারা শনিবার জানাইলেন যে কেহ কেহ একেবারেই আসিতে পারিবেন না, কেহ কেহ দুপুরে আসিয়া বিকালের আগেই চলিয়া যাইবেন। এ অবস্থায় রবিবার বিকালের সভা স্থগিত রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে হওয়ায় সেইরূপ বিজ্ঞপ্তি দৈনিক পত্রিকায় প্রচারিত হইল। তবে আমরা যাহারা বিকাল পর্যন্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন তাঁহাদের সহ স্থানীয় ভক্তবৃন্দের সঙ্গে সমবেত হইয়া শ্রীমৎ স্বামিজীর জীবন ও দর্শন মোটামুটিভাবে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাত্রের গানও হইতে পারে নাই। এই বিপর্য্যয়ের মধ্যেও শ্রীমৎ স্বামিজীর শিষ্যশিষ্যাগণ ব্যতীত যাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রী লালমোহন দত্ত, নিশীথনাথ কুণ্ডু, সন্তোষকুমার অধিকারী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ দে, সন্তোষ বসাক, জিতেন্দ্রমোহন রায়, নির্মলকুমার গুপ্ত, কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, রমেনচন্দ্র ভৌমিক, মোহিত ভট্টাচার্য, শংকরনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতি আরও অনেকে ছিলেন।

পালামৌ (বিহার)-র অন্তর্গত খেলারী নামক স্থানের বন্ধুবর শ্রীঅনিলকুমার সরকার জানাইতেছেন যে "তাঁর খেলারীর মায়াপুরস্থ নিজ ভবন কবিতানিলয় প্রাঙ্গনে যুগাবতার মহামানব শ্রীশ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের জন্ম দিবস বহু গণ্যমান্য বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী জন সমাবেশে পালিত হয়। সারাদিন অখণ্ড হরিকীর্ত্তন খুব সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীমৎ স্বামীজীর জীবনের সামান্য আলোক সম্পাত করেন অনিলবাবু; শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতপ্রবর নবীনচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় গীতার ব্যাখ্যা করেন—স্বামীজী-লিখিত উজ্জ্বল ভাষ্যে প্রকাশিত গীতাতত্ত্ব হতে। দরিদ্র নারায়ণদের এক বেলার খাদ্য পরিবেশিত হয় এবং অন্ধ আতুরদের দশ জনকে দশখানি ধুতি কম্বল পরিবেশিত হয়। আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ দুধ ও শিশুরা চকলেট ও দুধ প্রসাদ পান দুপুরে।

অনুষ্ঠানে বিশেষত্ব ছিলো যে কাউকেই চা-পান-বিড়ি সিগারেট দ্বারা আপ্যায়িত করা হয় না।

আগামী বৎসর অনুষ্ঠানটি বড় এবং আনন্দপূর্ণ রূপে সম্পাদন করবার সংকল্প গ্রহণ করে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

নরনারায়ণ আশ্রম-সঙ্ঘের বার্ষিক সাধারণ সভা

নরনারায়ণ আশ্রম সঙ্ঘের ১০।১০।৬৭ তারিখের

সাধারণ সভায় সঙ্ঘের ১৯৫৫-৬৬ ও ৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ বৎসরের বার্ষিক বিবরণ ও ব্যালান্স সীট উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়। সভায় ৩৩ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। বার্ষিক বিবরণটী এইস্থানে প্রকাশিত হইল—

নরনারায়ণ আশ্রম-সঙ্ঘ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রমেরই কর্মান্তর দিক। শ্রীমৎ স্বামিজীর আদর্শ ছিল ধরার ধূলিকে ব্রহ্ম-ধূলি ও ধরার মানুষকে ব্রহ্ম-মানুষ রূপে আস্বাদন করা। সেবা মনোবৃত্তিতে কর্ম করাই এই আদর্শের চলার পথ। নরনারায়ণ আশ্রম-সঙ্ঘ নরনারায়ণ আশ্রমের এই লোক-সংযোগ ক্ষেত্র—যেখানে তাহার মুক্তির পরীক্ষা। শ্রীমৎ স্বামিজী তাঁহার কাজ একটা নির্দিষ্ট পথে আরম্ভ করিয়া দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার ও শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের প্রত্যক্ষ আশীর্বাদে তাঁহাদের আরব্ধ সমাজ-সেবামূলক কাজগুলি নানা বিপর্যয় মাথিয়াও চলিয়া আসিতেছে। মানুষ লইয়া কাজ করিতে বিপর্যয় তো থাকিবেই, বিশেষতঃ আজকালকার দিনে। বিপর্যয়ের আরও কারণ সাধারণভাবে আমাদের লোকাভাব এবং সেই সঙ্গে আমার দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা। যাহা হউক, কারণ যাহাই হউক মানুষের সঙ্গে কাজ করিতে বিপর্যয় থাকিবেই এবং সে বিপর্যয় খুব জটিলও বটে। তথাপি সমস্ত বিপর্যয় সত্ত্বেও আশ্রম সঙ্ঘের প্রত্যাগার, শিল্প কেন্দ্রের দুই দিক সীবন ও চরকা-তাঁত এবং নিম্ন বুনিয়াদী ও প্রাক বুনিয়াদী বিদ্যালয় মোটামুটি ভালই চলিতেছে। ইহাদের মধ্যে চরকার দিকটাই সব চেয়ে কম সন্তোষজনক। কেননা চরকার কাজ করিবার জন্য কোন মানুষ যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি চরকা কাটিবার লোকও পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। তবে ঘরে ঘরে গিয়া চরকা কাটিবার আবেদন করিয়া যাইতে পারিলে হয়তো আমাদের যেটুকু লক্ষ্য ছিল পঞ্চাশ হইতে একশত চরকা গ্রামের মধ্যে চালান—সেটা মোটামুটি পারা যাইত বলিয়া মনে করি। কিন্তু মাহিনা ছাড়া কাজ করিবার লোক পাই নাই। ১৯৫৫-৬৬তে প্রায় ৪৫ খানা মত চরকা চালান সম্ভব হইয়াছিল; কেননা তখন একজন কর্মী পাওয়া গিয়াছিল, আবার সেই সঙ্গে স্টেট খাদি বোর্ড হইতে চরকা কর্মীর জন্য কিছু ভাতাও পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ১৯৬৬-৬৭তে আর ভাতা পাওয়া যায় নাই, সেই কর্মীও রহিল না। ভাতা পাওয়া গেলে হয়তো কর্মী পাওয়া যাইত। যাহাহউক, তবু আমরা চরকা একেবারে ছাড়িয়া দিব না। শ্রীমৎ স্বামিজী যেমন চরকা কাটাকে ধর্মনিক-ভাবে সমর্থন করিতেন, তেমনি আজও ইহার বাস্তব প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি। আজ আমরা অন্নহীন—চারিদিকে ক্ষুধার্ত নর নারীর বীভৎস দিন যাপন। আমাদের প্রত্যেককে আজ অন্ন সৃষ্টি করিতে হইবে। ঠিক চাল আমরা সৃষ্টি করিতে পারি না—সে যোগ্যতা সমাজের অল্প একটী অংশেরই আছে। কিন্তু কিছু সৃষ্টি আমাদিগকে করিতেই হইবে—যাহা সস্তা তাহিতকারী সৃষ্টি এবং আর যাহা আমাদের ঐ খাদ্যের মতই একান্ত প্রয়োজন কিছু বস্ত্র সৃষ্টি। ঐ বস্ত্র সৃষ্টি আমাদের উপর এমন কিছু চাপও দিবে না আবার উহারাও কিংবা উহা কিনিতে হইবে না বলিয়া যে অর্থ আনিতে পারে তাহারাও আমরা অন্ন কিনিতে পারি। আমি জানি আমাদের আজিকার এই সম্মিলন চরকার তত্ত্ব আলোচনার জন্য নয়—তবু এত বাধা সত্ত্বেও এবং সারা বছরের কাজ সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও কেন আমরা চরকার কাজ একেবারে ছাড়িয়া দেই না, তাহারই জন্য এতটুকু কথা বলা সঙ্গত মনে করিলাম। চরকা না ছাড়ার আরও একটী কারণ আছে। শিল্প কেন্দ্রের সীবন শিক্ষাকেন্দ্রে সেন্ট্রাল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড যে সাহায্য করে তাহার এই সর্ত যে আমরা আরও কিছু শিল্প কাজ নিশ্চয়ই করিব। অন্য যে কোন শিল্প কাজ অপেক্ষা চরকাই আমরা সহজ করি বলিয়া বোর্ডের সর্ত মানিতে চরকাই বাছিয়া লইয়াছি। সঙ্ঘের সকল সভ্যের নিকট এইখানে ইহাও আমরা উল্লেখ করি যে চরকা ও তাঁত শিল্পের কাজ যতটুকু হইয়াছে তাহা অপেক্ষা আরও বেশী করিতে না পারিলে ওয়েল-ফেয়ার বোর্ডের সর্ত রক্ষা করা কঠিন

হইয়া পড়িবে। দোহাইউক তাঁতের কাজ কিছু কিছু হইতেছে। এ পর্যন্ত আমার খান ৫৪ গজ, খান ধুতি ৩৬ গজ, শাড়ী ৪ খানা, চাদর ১ খানা হইয়াছে।

সেলাই স্কুলে প্রিপারেটরী বিভাগে ৬৫-৬৬-তে ১০জন ছাত্রী ভর্ত্তিহইয়া ৬ জন পরীক্ষা দিয়াছিল, ৬৬-৬৭তে ৪ জন ভর্ত্তি হইয়া ৩জন পরীক্ষা দিয়াছিল। আর সাধারণ ক্লাসে ১৯৬৬তে মাসে গড়ে ১৫ জন ছাত্রী উপস্থিত ছিল; ৬৭তে এ পর্যন্ত ১৪ জন। এখানকার ডিপ্লোমার সেলাই পদ্ধতিগুলি শিক্ষা পরিচালিকা-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে গ্রহণ করিয়া থাকে, আর আশ্রম-স্কুলের অধিক প্রদর্শনীতেও অনসাধারণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া থাকে। তবে ছাত্রী সংখ্যা দুই বিভাগেই আরও বেশী থাকা খুবই উচিত। অধিক কারণে ডিপ্লোমা ক্লাসে ছাত্রীদের হওয়ার ঘটনা হইলেও সাধারণ ক্লাসে আরও অনেক ছাত্রী হওয়া উচিত ইহা অত্যন্ত সত্য কথা। কিন্তু আমাদের যেমন প্রচারের দিকটা কম থাকায় চারি পাশের গ্রামের সকল লোক এখনও জানে না যে আশ্রমে এই রকম বন্দোবস্ত আছে, তেমনি জানেও এমন বহু মেয়েরাও কোন কল্যাণমূলক কর্ম্মে উদ্যোগী নয়—ইহাও বেশ সত্য কথা। যাহা হউক, ছাত্রী সংখ্যা আরও বাড়ানর দিকে আমাদের প্রচেষ্টা চালান উচিত।

গ্রন্থাগারের কাজ মোটামুটি ভাল চলিতেছে। গ্রন্থাগারে ৩০-৬-৬৬ তারিখে বইয়ের সংখ্যা ছিল ২৭৯৫ খানা

ঐ „ সভ্য ৬৫ জন

মাসিক পত্রিকা ৩৩ খানা মত

৬৬-৬৬ বার্ষিক বৎসরে ২ই issue হইয়াছে ২৮৭৬ খানা

৩০-৬-৬৭ তারিখে বইয়ের সংখ্যা ২৯০৭ খানা

ঐ সভ্য ৭৪ জন

মাসিক পত্রিকা ৩০ খানা মত

৬৬-৬৭ বার্ষিক বৎসরে ২ই issue হইয়াছে ৪০১১ খানা। লাইব্রেরীতে স্থানাভাব বিশেষভাবে উপলব্ধ হইতেছে। বই রাখার স্থানেরই খুব অভাব। এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। লাইব্রেরীর কাজকর্ম মোটামুটি ভাল হইলেও আরও অনেক ভাল হওয়া উচিত ইহাও প্রতি মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করি। কিন্তু নানা কারণে আকাঙ্ক্ষা অনুরূপ কাজ করিতে পারি না।

ছোটদের দুইটি বিভাগেরও মোটামুটি ভাল চলিতেছে। প্রাক্ বুনিয়াদী বিভাগে মাত্র তিরিশ জন শিশুই রাখার অনুমতি আছে—মোটামুটি উনত্রিশ ত্রিশ জনই থাকে। উহাদের দৈনিক এক ঘণ্টা পড়ান হয়, বাকিটা খেলা, গান, খাওয়া ইত্যাদি করান হয়। ৬ বৎসর বয়স হইয়া গেলে এই বিভাগে আর উহাদের রাখা হয় না।

জুনিয়ার বেসিক স্কুল-এ নানা কারণে ১৯৬৫ ও ১৯৬৬-র প্রথম দিকে শিক্ষক শিক্ষিকার কিছু বদল হইয়াছে—তবে ১৯৬৬-র মাঝামাঝির পর হইতে আর শিক্ষকশিক্ষিকা বদল হয় নাই—বর্ত্তমানে পাঁচজনই স্থায়ী শিক্ষক শিক্ষিকা রহিয়াছেন। অন্যান্য বিবরণ এইরূপ—নূতন ছাত্র ভর্ত্তি ১৯৬৫-৬৬-তে ৫৫ জন, মোট ছাত্র-সংখ্যা ছিল ১৫৫, ৬৬-৬৭-তে ছাত্রভর্ত্তি ৪৬, মোট ছাত্রসংখ্যা ১৭২। দুই বৎসরে প্রতি ক্লাশে পাশের এবং উপস্থিতির হার শতকরা এইরূপ—

	১৯৬৫	১৯৬৬	১৯৬৫	১৯৬৬
I	৭২%	৯০%	৫৭.৯৬%	৬৩.৬৪%
II	৭৭.৪%	৮২%	৫৯.৮%	৫৬.১২%
III	৭৭%	৭২%	৭২%	৭৮%
IV	৫৭.১৫%	১০০	৬৪.৪%	৬৭.৭৭%
V	৪৫.৫%	৫৪%	৬১.৩৫%	৭৯.৪%

বৃত্তি পরীক্ষার পাশের হার—

১৯৬৫-তে ১৭ জন পরীক্ষার্থীর ১০০%

৬৬ „ ২৩ „ „ ৯২%

স্কুলে লেখাপড়া কি রকম হয় সে সম্বন্ধে এই বলা যায়—শিক্ষক-শিক্ষিকারা শতকরা এখন দিনই ঠিক সময়ে স্কুলে আসেন, প্রায়ও তাঁহারা নিয়মিত করেন—প্রাথমিক স্কুলগুলিতে যাহা ঠিক সাধারণতঃ হয় না। ছেলেমেয়েরা প্রতি শ্রেণীতে আরও যোগ্য হইয়া উঠুক ইহা খুব ইচ্ছা হয় তবে নানা কারণে এখনও তাহা হয় নাই। তাহার একটী বড় কারণ আমাদের স্কুলে যাহারা পড়ে তাহাদের শতকরা ৭৫ জনের পিতামাতা বা অভিভাবকগণ

অশিক্ষিত—বাড়ীতে তাহাদের লেখাপড়ার কোন ব্যাপার নাই বলা চলে—তাই গুণগত বৈশিষ্ট্য অর্জন অসুবিধা জনক। তথাপি শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের প্রতি আমার আবেদন—ছাত্রদের এই গুণগত বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য তাঁহারা আরো যেন খানিকটা বেশী মনোযোগ দেন। তাঁহাদের আরও কিছু করণীয় আছে ইহা সত্য কথা। এই গেল আশ্রম-সঙ্ঘের কাজের বিবরণ। প্রতি বিভাগের কাজ আরও সুষ্ঠুভাবে করিবার জন্য আমি সকলের নিকট সহযোগিতা ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

বাংলার রাজনীতি কোন্ পথে ?

বাংলাদেশের আজ এ কী হইল ? চৌদ্দ দলের সম্মিলিত যুক্তফ্রন্ট যেদিন বাংলাদেশের শাসনভার হাতে লইয়াছিল, সেদিন সত্যিই বড় আশা লইয়া উৎফুল্ল হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম। উৎফুল্ল হইবার বিশেষ কারণ এই ছিল যে শ্রীশ্রীনিতাগোপালের একটি কথায় সকল যুক্ত ফ্রন্টের অবস্থাটা মিলিয়া গিয়াছিল। আমরা রাজনীতির কূটনীতি বুঝি না—তবে জীবনধর্মের মধ্যে রাজনীতি একটি অপরিহার্য বিষয় ইহা বুঝি। Water-tight compartment দেওয়া জীবন আমরা বুঝি না—ধর্ম করিব, রাজনীতি হইতে শতহস্ত দূরে থাকিব, কিংবা রাজনীতি করিব আর ধর্মকে রাত ৯টার পরের ব্যক্তিগত ব্যাপার করিয়া রাখিব—জীবনকে এ রকম তাপাতাপি করিয়া দেখিবার যুগ পিছনে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। জীবন একটী সমগ্র বস্তু। যাহাহউক, চৌদ্দ দলকে সম্মিলিত হইয়া যাতায় খাওয়ার সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইতে দেখিয়া শ্রীশ্রীনিতাগোপালের সেই বাণী মনে পড়িয়াছিল—যেখানে তিনি বলিলেন যে তিনি কোন সম্প্রদায় গড়িতে আসেন নাই, তাঁহার কোন দল নাই—তাঁহার 'সকল দল লইয়া এক অখণ্ড দল'—এই কথা ভাবিয়া পুলকিত হইয়াছিলাম। বাংলাদেশ দিবে অভাবনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে—সকল দল মিলিয়া এক অখণ্ড দল হইয়া বাংলাদেশকে বাঁচাইবে। কিন্তু কয় মাস যাইতে না যাইতে এ কী হইল ? খাওয়ার অপরিসীম কষ্ট পাইয়াও মানুষ ধৈর্য ধরিয়া ছিল—সময় তো দিতে হইবে—যদিও কোন দল ক্ষমতাসীন হইবার আগে সাত কোন কোন সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। যাহাহউক, সকল আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতীক্ষা চুরমার হইয়া উঠিতে লাগিল যখন দেখিতেছিলাম নির্বাচিত দলগুলির মধ্যে দলের অখণ্ডতা নষ্ট করিয়া নিতেছেন এমন ব্যক্তি বা দল আছেন, তখনই ভীত হইয়াছিলাম। আদর্শগত অমিল বড় হইয়া উঠিতে পারিত না যদি কোন, এক আচার আচরণের সততায়, দুই দেশ-কল্যাণ-বোধের তীব্রতায়, ক্রমে দেখা গেল দুই জায়গাতেই ছিদ্র হইয়াছে। ফলে যাহা হওয়া স্বাভাবিক তাহাই হইল !

ভক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ থাকিতে পারিলেন না। তাহার পরবর্তী ঘটনাবলী আরও দুঃখজনক। আইন লইয়া বহু ভাগ্য চিরদিন হইয়াছে, চিরদিন হইবে—আমরা আইন জানি না—সে পথের সমাধান ভাবিতে চেষ্টা করিয়া লাভ নাই। যাহা হইল তাহা খুব ভাল হইল কি না ভবিষ্যৎ তাহার সাক্ষ্য দিবে। আমরা আজ আর কিছুই করিব না। কিন্তু দুই চারিটী কথা যাহা মনে হইতেছে তাহা বলি।

প্রফুল্লের অজয় মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে কচি প্রবৃত্তির মানুষ বলিয়া আমাদের ধারণা তাহাতে তিনি নিজের বোধ বিচার মতই চলিবেন এবং তাঁহার আদর্শের সঙ্গে পরের কথা ও ব্যবহারের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকিবে, ইহাই আমাদের আশা ছিল—কিন্তু তাহা থাকিল না কেন ? কংগ্রেসের সঙ্গে যেমন তিনি কাজ করিতে পারিলেন না, বাহির হইয়া আসিলেন, নিজের বিচারে দাঁড়াইয়া আপাইয়া চলিলেন—এখানে যখন তাঁহাকে বলিতেই হইয়াছিল যে একটি দলের সঙ্গে কাজ করা যায় না, তাহারা [illegible]হিতার কাজ করে ইত্যাদি তখন এ বিপর্যয়ের পরে তাহাদেরই সঙ্গে সুর না মিলাইয়া এখান হইতেও বাহির হইয়া তাঁহার নিজস্ব পথে চলাতেই কি

তাঁহার মর্যাদা থাকিত না? আজ কি তিনি তাহাই পদে পদে আচরণ করিতেছেন না? একটা কথা তিনি বলেন যে জনসাধারণই তাঁহার সুপ্রীম কোর্ট। কিন্তু সে কোন্ জনসাধারণ? জনসাধারণ বলিতে কি একদল হাবলাখোকা লোককেই বুঝিব? সবত্র সকল সময়ে চিরকাল ঘরকেই, বংশকেই, একমাত্র বলিয়া ধরিয়া পথ চলে যাহারা তাহাদের কত বুদ্ধির সঙ্গে তিনি বুদ্ধি মিলাইলেন কি করিয়া? আমরা তাঁহার দিকে তাকাইয়া আশা করিয়া রহিলাম তিনি তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গিতেই তাঁহার জীবন দিয়া তিনি আফ্রিকার এই ঘটনার উত্তর দিবেন।

ডক্টর প্রফুল্লকুমার ঘোষ বিশেষ সাহসিকতার কাজ করিয়াছেন। এত আবর্তের মধ্যে তিনি কিছু করিতে পারিবেন এই সাহস করিয়া তিনি যে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার প্রতি উৎসুক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। পুরাণ বোতলে নূতন মদ ঢালিয়া তিনি কি করিতে পারেন দেখা যাক।

সব শেষের কথা হইল এবং সেটাই খুব বড় কথা—যে কথাটা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম—অংশকে যাহারা সমগ্র বলিয়া জানে—mass-ই যাহাদের নিকট সমাজ—এবং যে mass-ও সেই শৃঙ্খলাপূর্ণ সঙ্ঘ-শক্তি নয় যাহা অংশের মধ্য দিয়াও সৃষ্টি করিতে করিতে তাহাকে মর্যাদা করিয়া চলিবে, শ্রেণী সংগ্রামের অন্তহীন রক্ত-সংঘাতই যাহাদের কাছে একমাত্র সমাধান—তাহাদের এই ভুল দর্শনের জন্যই তাহাদের দিন শেষ হইয়া আসিল প্রায়। বিশ্বের অন্তরাত্মা দীর্ঘকালের ধনিকের শোষণের প্রতিক্রিয়ায় শ্রমিকের শোষণের পালাও ঘটাইয়া লইয়া এতদিনে সে অধ্যায়টাকেও ছাড়াইয়া আসিয়াছেন প্রায়। সকল নিপীড়িতের যাত্রা ও মর্যাদা স্বীকৃতি যাহাদের জন্য বিশ্বের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রয়োজন এই মতবাদ উদ্ভূত হওয়ার মূলে ছিল—সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে—প্রতিক্রিয়ার আজ এতদিনের নিপীড়িতই নিজেদের শুদ্ধ সমগ্র সমাজকে নিপীড়ন করিতেছে তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল আচার আচরণই যারা। তাই চিন্তাধারার গোড়ায় ভুল করিয়া ইহাদের ক্ষমতার আসনে আসীন না থাকা সকল দিক দিয়াই শ্রেয়ঃ বলিয়া ভবিষ্যৎ বিশ্ব সাক্ষ্য দিবে। শ্রেয়ঃ কেন তাহার অপর কারণ নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া যাহারা অপর দেশের ততটুকু গ্রহণ করিতে পারে না, এজন্য যাহাদের আহ্বানে বলি দিতে হয়—যাহারা অতীতে দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনেও সঠিক ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই—বিভ্রান্ত-দৃষ্টি সম্পন্ন সেই দলকে আজ বুঝিতে হইবে যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব সংঘাতই শেষ পথ নয়, সমাজের অংশই সমগ্র সমাজ নয়। এ চিন্তাধারা বদল করিবার সময় আসিয়াছে। [illegible] নিঃশেষ খুনে অপরের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, উহা বিশ্বের আইন হইলেও মনুষ্যত্বের স্তরের আইন নয়। আফ্রিকার বিশ্বে দুইটী পক্ষই বাঁচিবে কিন্তু প্রতিপক্ষ হইয়া নয়—একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নয়—উভয়ে মিলিয়া এক সমগ্র—বাঁচিবে এই ভাবেই। এ কথা সকল ব্যক্তি ও সকল দল যত শীঘ্র বুঝিবে, মানিবে ততই মঙ্গল।

শাসক-পরিবর্তন বাংলাদেশের পক্ষে কল্যাণকর হউক—আমরা এ আশ্বাস লইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। যেখানে সেবা সেখানেই কল্যাণ। শাসক ও শাসিত সকলের মধ্যেই সেবা-বুদ্ধি জাগ্রত [illegible] ব্যক্তি ও সমষ্টি সুস্থতার উহাই একমাত্র পথ।

শ্রীসুধাংশু মিত্র কর্তৃক নয়নারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।